# আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন

পিএইচ. ডি উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ


তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া

গবেষক

আঞ্জুমান লিপি

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা: A00BE0400118

বর্ষ: ২০১৮

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২



২০২২

# Certified that the Thesis entitled

**"আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন"** Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under Supervision of Professor Dr. Ananya Baruya, Department of Bengali, Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Ananya Baruya

Supervisor:

Dated: 02/09/2022

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Candidate: Anjuman Lipi

Dated: 02/09/2022

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির জন্য আমি সবথেকে বেশি কৃতজ্ঞ, আমার তত্ত্বাবধায়ক, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অনন্যা বড়ুয়া ম্যামের কাছে। কাজের ক্ষেত্রে তিনি যেমন স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেমনি হাতে ধরে সঠিক কাজ করার অর্থ বুঝিয়েছেন। শিরোনাম ঠিক করা থেকে শুরু করে অধ্যায়বিভাজনে তাঁর সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কাজকে ভালোবেসে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার মন্ত্র তিনিই শিখিয়েছেন। অমনোযোগী ছাত্রীকে যেমন তিনি তিরস্কার করেছেন, তেমনি আন্তরিক স্নেহাশিসে উৎসাহ যুগিয়েছেন। বানান সংশোধন থেকে শুরু করে, বাক্যগঠনের দিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি আমাকে বারবার ঋণী করেছে। তাঁর সহযোগিতা, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমাকে সময়ের মধ্যে অভিসন্দর্ভটি লিখে ফেলতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমার কাজের বিষয়সংক্রান্ত ভাবনাকে তিনি নানাভাবে বিকশিত করেছেন। একথা সর্বান্তকরণে স্বীকার্য যে, ম্যামের সহৃদয় সাহচর্য আমার কাজকে সঠিক দিশা দেখিয়েছে।

আমি বিশেষভাবে ঋণী গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বাংলাবিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. বিকাশ রায় মহাশয়ের কাছে। তিনিই প্রথম আমায় আফসার আমেদের লেখা সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। একজন মুসলিম নারী হওয়ায়, আফসার আমেদের কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আমার সুবিধাগুলো দেখিয়ে, তিনি আমায় এই ব্যাপারে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন। স্যারের আত্মার শান্তি কামনা করি।

গবেষণা কর্মের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে, সুস্থ মতামত প্রদানে বারবার সহযোগিতা করেছে আমার সহকর্মী ভাই ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য। মানকর কলেজের, বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অরিজিৎ ভট্টাচার্যকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। মানকর কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমার গবেষণার কাজের জন্য নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন। মানকর কলেজের গ্রন্থাগারের কাছেও আমি ঋণী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, গ্রন্থকারিক ও শিক্ষাকর্মীদের নিকট আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বাংলাবিভাগের সম্মাননীয় অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী মহাশয়া ও তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের সম্মাননীয় অধ্যাপক ড. ইপ্সিতা হালদার মহাশয়ার নিকট। তাঁদের সুপরামর্শ ও অনুপ্রেরণা আমার কাজের গতিকে যেমন ত্বরান্বিত করেছে, তেমনি করেছে সমৃদ্ধ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার আমার কাজের ক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, বাংলাদেশ একাদেমির উপ-পরিচালক ড. তপন বাগচি মহাশয়ের নিকট। আফসার আমেদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাসংক্রান্ত নথি থেকে শুরু করে, আফসার আমেদ

সম্পর্কে প্রকাশিত নানান তথ্য, সুদূর বাংলাদেশ থেকে সরবারাহ করে তিনি আমার কাজকে নানাদিক থেকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করায় সহযোগিতা করেছেন।

আমি আমার পরিবারের প্রত্যেকের কাছ থেকেই, গবেষণাকর্মে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। আমার পড়াশোনা ও কাজের জন্য তারা যে স্বাধীনতা আমায় দিয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকের জন্যই রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

সবশেষে আফসার আমেদ ও তাঁর পরিবারকে জানাই সালাম, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। লেখক বেঁচে থাকাকালীন, তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে উত্থাপিত, কিন্তু আমার কাছে দুরূহ কিস্‌সার সমাধান করে দিতেন ফোনের মাধ্যমে। তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ করার কথায়, তিনি খুব আনন্দিত হতেন। বারবার সাক্ষাতের কথা বলতেন। এতবড় মাপের একজন লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একেবারেই সাধারণ মানুষ। তাই আমাদের মত সাধারণ মানুষ খুব সহজেই, তাঁর আন্তরিক ব্যবহারে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাই। আফসার আমেদের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নাসিমা খাতুনের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। যেহেতু অনেক দূর থেকে তাঁদের বাগনানের বাড়ি ‘ধানজ্যোৎস্না’য় যাই, তাই প্রতিবারই তিনি মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করে রাখেন। লেখকের সমস্ত বই ও তথ্য প্রদানে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে নানাভাবে ঋণী করেছে। আফসার আমেদের কন্যা কুসুম হিয়া ও পুত্র শতাব্দ আমেদকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, নানাভাবে সহযোগিতা করার জন্য। নাসিমাদির অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমি হতবাক। তাঁদের প্রত্যেকের সুস্থতা কামনা করি।

আঞ্জুমান লিপি

(বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

# সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|
| ভূমিকা | ১-১৮ |
| **প্রথম অধ্যায়** | |
| কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদঃ জীবন ও সাহিত্য | ১৯-৫১ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ১৯৮০- ১৯৯০ | ৫২-১৩৬ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | |
| আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ১৯৯১-২০০০ | ১৩৭-২৭৪ |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | |
| আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ২০০১-২০১০ | ২৭৫-৩৫১ |
| **পঞ্চম অধ্যায়** | |
| আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ ২০১১-২০১৮ | ৩৫২-৩৬৫ |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়** | |
| আফসার আমেদের সমসাময়িক অন্যান্য কথাকারদের রচনায় মুসলিম নারীর জীবন | ৩৬৬-৩৯১ |
| উপসংহার | ৩৯২-৩৯৫ |
| গ্রন্থপঞ্জি | ৩৯৬-৪০০ |

# ভূমিকা

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, এখানকার সকল নাগরিকের একইরকম ও সমান সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অধিকার বর্তমান। শুধু তাই নয়, সংবিধানে আরও বলা হয়েছে, ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেক নাগরিক নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে, এক জাতীয় ঐক্য ও সংহতির আলোয় দেশের নাম সমুজ্জ্বল করে তুলবে বিশ্বের দরবারে। কিন্তু স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও সংবিধানের এই প্রস্তাবনা ও মৌলিক অধিকার অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন। একটি গণতান্ত্রিক দেশের সার্বিক উন্নতি ও সফলতা নির্ভর করে আপামর জনসাধারণের উন্নতির উপর। একই কথা খাটে কোন একটি রাজ্যের সফলতার ক্ষেত্রেও। আমাদের দেশ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ধর্মের ভিত্তিতে একটি খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করে। মুসলমান জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ধর্ম নয়, দেশকে ভালবেসে পাকিস্থান যেতে অস্বীকার করে এবং ভারতের সংখ্যালঘু নাগরিকরূপে সংবিধান স্বীকৃত সকলের মতো সমান মৌলিক ও ধর্মীয় অধিকার লাভ করে। এই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় অধিকাংশই গ্রামে বাস করে এবং কৃষিকাজ ও দিনমজুরের মত কায়িক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরুর কাছে, একটি সাম্প্রদায়িক জাতি রূপে উপেক্ষা, অবহেলা ও বঞ্চনা পেয়ে এসেছে। তাই এই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অশিক্ষিত, অন্ধকারাছন্ন সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় আজও প্রান্তিক, অপর, পশ্চাদপদ। প্রতি পদে পদে সে বঞ্চনার শিকার হতে হতে, মূল জনস্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করে। পাশাপাশি উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে আসা নানান অভিঘাত ও বিচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তারা অনেকসময় নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের এই নিরাপত্তাহীনতা, বঞ্চনা, অশিক্ষা ও পশ্চাদপদতার মর্মান্তিক রূপটি প্রথম সামনে আসে ২০০৬ সালে প্রকাশিত সাচার কমিটির রিপোর্টে।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রাজেন্দ্র সাচার সহ ছয়জন সদস্য। নানান পর্যবেক্ষণের পর কমিটি ৪০৩ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন তৈরি করে এবং তা ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর লোকসভায় উপস্থাপিত করে। এই রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মাথাপিছু ভোগ, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ও সাক্ষরতার নিরিখে ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থা হিন্দুদের তুলনায় অনেকটাই পেছনে। এমনকি মুসলিম সংখ্যালঘুদের অবস্থান আমাদের দেশের তফশালি জাতি ও উপজাতিদের থেকেও নিম্নমুখী। মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক দুরাবস্তার পাশাপাশি এই কমিটি দেখিয়েছে, স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক সম্মানীয় ক্ষেত্রেই মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কতটা কম। আর তাদের এই অবনতি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ। এই রাজ্যে প্রায় ২৭ শতাংশ বাঙালি মুসলিমের বাস, কিন্তু সরকারি চাকরিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২.১ শতাংশ। সরকারি চাকরির উচ্চপদে যোগদানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন মুসলিম চাকরিপ্রার্থীর অভাব থাকায় না হয়, পশ্চিমবঙ্গে সরকারি উচ্চপদে মুসলিমদের অংশগ্রহণ মাত্র ৪.৭ শতাংশ। কিন্তু ২০০৭-০৮ এর তথ্য অধিকার আইন এর রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই রাজ্যে পুলিশ কর্মীর মধ্যেও মুসলমানের অংশগ্রহণ মাত্র ৯.১৩ শতাংশ। এই রাজ্যে মুসলিমদের প্রায় ৮৩ শতাংশ গ্রামে বসবাস করে। সাচার কমিটির রিপোর্টের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মুসলিম প্রধান গ্রামগুলোতে প্রাইমারি স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডাকঘর, বাসস্টপ ও পাকারাস্তা প্রভৃতি সবরকম প্রাথমিক সরকারি সুযোগসুবিধা তুলনামূলকভাবে কম। এই বঞ্চনার কারণ সরকারী ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্যপরিষেবা সুলভ নয় বলেই অশিক্ষিত, দরিদ্র মুসলিমরা চিকিৎসার ব্যাপারে কখনো হাতুড়ে ডাক্তারের উপর নির্ভর করে, আবার কখনো পিরের দরগা ও মৌলবির দোয়া-তাবিজের উপর নির্ভর করে। সবকিছু মিলিয়ে অনেক সময় চিকিৎসার অভাবে গর্ভবতী মা ও সদ্যোজাত শিশুকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়।

সাচার কমিটির অনুসন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের শিক্ষার ভয়াবহ অবস্থাও সর্বসমক্ষে আসে। তাতে বলা হয়, গ্রামের ৫৪.৬ শতাংশ এবং শহরের ৬০ শতাংশ মুসলিম কখনো স্কুলে

যায়নি। এর একটি বড় কারণ হল, মুসলিম প্রধান এলাকায় তুলনামূলকভাবে স্কুলসংখ্যা অনেক কম। বাড়ির কাছাকাছি কোন স্কুল না থাকায়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাছাকাছি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। যেহেতু এই রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ মুসলিম দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। তাই বিনা খরচে শিক্ষা, খাওয়া ও থাকার সুবিধার জন্য এই মাদ্রাসাগুলো দরিদ্র মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয় রূপে দেখা দেয়। যদিও সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র তিন শতাংশ মুসলিম শিশু মাদ্রাসায় যায়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মুসলিমরা একেবারেই পিছিয়ে। সাচার কমিটির মতে, স্নাতকোত্তরে ২৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে, মাত্র একজন মুসলিম। 'প্রিমিয়াম কলেজগুলোতে' স্নাতকোত্তর ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র একজন মুসলিম শিক্ষার্থীকে পাওয়া যায়। আজও কলকাতা, প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরিখে দেখা যায়, মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৩ থেকে ৪ শতাংশ। অন্যদিকে শিক্ষকতায় এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম প্রতিনিধি মাত্র ১ শতাংশ। তাছাড়া রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম, চব্বিশপরগনা, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও নজরে পড়ার মতো বৈষম্যমূলক। মুর্শিদাবাদে এতদিনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদেই সবথেকে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার বসবাস। সাচার কমিটি সংখ্যালঘু মুসলিম জনজীবনের এই অন্ধকারময় বঞ্চনার ইতিহাসকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছে।

সাচার কমিটি সংখ্যালঘুদের কোন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখে, ভারতের নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার কথা বলেছে। একটি দেশের সব নাগরিকের সমান সুযোগ ও সমান অধিকারের বিষয়টির উপর কমিটি জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে 'সাবকে সাথ সাবকা বিকাশ' এর কথা আজ মুখে বলছেন, তা শুধুমাত্র মুখে বা আইনে নয়, সমাজের সর্বক্ষেত্রে যদি এর বাস্তবায়ন হয়, তবেই একটি দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব। স্বাধীনতার পর বারবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটেছে কিন্তু সাচার কমিটির নির্দেশিত প্রস্তাবনা আজও কোন কাজে আসেনি। আজও মুসলিমরা একইরকমভাবে প্রান্তিক। সাচার কমিটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় কারিগরি ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা, স্কুল-কলেজ তৈরি করা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার মধ্য দিয়ে যে সামাজিক উন্নয়নের কথা বলেছিল, তার কোন পদক্ষেপ সরকার তেমনভাবে গ্রহণ করেনি। আজও তারা নিজগৃহে পরবাসীর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ

ও সরকারের কাছে চরম অবহেলার শিকার। ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট সরকার সাচার কমিটির রিপোর্টকে অস্বীকার করে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত গুজরাট প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলে, রাজ্যে মুসলিমদের নিরাপদ বাতাবরণ দেওয়ার কথায়, বড় করে দেখায়।

একথা সত্য যে, বামফ্রন্ট সরকার তার চৌত্রিশ বছরের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখায় অনেকটাই সফল হয়েছিল। চাপড়া এবং পরবর্তীতে কাটরা মসজিদকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা, আদবানির রথযাত্রার সময় ঝালদার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কলকাতার দাঙ্গার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতিকে বামফ্রন্ট সরকার কৃতিত্বের সঙ্গে সামাল দিয়েছে। যদিও প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সংঘর্ষে নিহত পার্টিকর্মীর ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৮০ জনই মুসলিম। এমনকি জেলবন্দীদের মধ্যেও প্রায় ৪০-৫০ জন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। এর একটি বড় কারণ হল দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। তবে বাম আমলে পঞ্চায়েতি রাজ, ভূমিসংস্কার, অপারেশনবর্গা তফশালি জাতি-উপজাতির পাশাপাশি বেশকিছু মুসলিম ভূমিহীন চাষির পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছিল। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মধ্য দিয়ে কিছু দরিদ্র মেধাসম্পন্ন মুসলিম ছাত্রছাত্রী শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছিল। বিদ্যালয়গুলোতে আগে শিক্ষক নিয়োগ করত বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি। সেখানে যোগ্যতার জায়গায় প্রাধান্য পেতো টাকার অংক। ফলে শিক্ষকতার পেশাটি কিছু বিত্তশালী মানুষের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। এসএসসির নিরপেক্ষ নিয়োগে আস্থাশীল, বেশ কিছু দরিদ্র মুসলিম ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবুও সার্বিক বিচারে মুসলিমদের এই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ছিল একেবারেই যৎসামান্য। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাচার কমিটির সদস্য আবু সেলাহ শরিফ বলেছেন যে, দাঙ্গাবধ্বস্ত গুজরাটের চেয়েও পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থা মর্মান্তিক। কারণ বাংলায় সরকারি চাকরিরত মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব যেখানে ২.১ শতাংশ, অনুপাতে গুজরাটে এই সংখ্যা ৫.৪ শতাংশ।

সাচার কমিটির রিপোর্ট এবং মুসলিমদের বঞ্চনার ইতিহাসকে হাতিয়ার করে তৃনমূল সরকার মুসলিমদের আস্থালাভ করে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পরই আমাদের মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিমদের উন্নয়নের ৯০ শতাংশ করে ফেলেছেন বলে ঘোষণা করেন। একথা ঠিক যে, মুসলিম দরদী মানুষ রূপে তিনি কখনো কখনো মাথায় কাপড়

তুলে দোয়া করেন, আবার কখনো দরিদ্র ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতারও ব্যবস্থা করেন। তবে সবসময় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালখুদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে রাজ্যের ১০ হাজার খারেজি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। অথচ এই রাজ্যে তিন হাজারের বেশি মাদ্রাসা নেই বলে অভিজ্ঞমণ্ডলী মনে করেন। তাছাড়া মাদ্রাসাগুলোর আধুনিকীকরণের যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন, তারও বাস্তবায়ন দূর অস্ত। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক নিয়োগের কথা বললেও, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাদ্রাসার আর্থিক দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে অনেকটাই নীরব থাকেন। অথচ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এই আপাত মুসলিম প্রীতিহেতু সংখ্যাগুরুদের মনে আরও বেশি মুসলিম বিদ্বেষ দানা বাঁধে। মুসলিম তোষণের নামে মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী যে অনেকসময় নিজের ভোটব্যাংক ঠিক রাখায় প্রত্যাশী, আজও মুসলিম সমাজের দারিদ্র্য, পশ্চাদপদতা, অশিক্ষা ও আর্থসামাজিক অবস্থান সেকথা সহজেই প্রমাণ করে। কুণ্ডু, স্ন্যাপ এবং প্রতীচীর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০১৬ সাল অর্থাৎ সাচার রিপোর্ট প্রকাশের দশ বছর পরেও, রাজ্যের মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থার তেমন কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয় নি। এই সমস্ত সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ২০১৬ সালেও প্রায় ৩৮ শতাংশ মুসলিম পরিবার মাসে প্রায় আড়াই হাজার টাকা এবং ৮০ শতাংশ মুসলিম পরিবার মাসে প্রায় পাঁচ হাজার টাকারও কম উপার্জন করে।

তাছাড়া মুসলিমদের মধ্য থেকে মাত্র ১.৫৫ শতাংশ স্কুল শিক্ষক এবং ১.৫৪ শতাংশ হল সরকারী চাকরিজীবী। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জনপদের রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানীয়জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবার ক্ষেত্রেও সরকারের অনীহা লক্ষণীয়। ২০২১ সালের মাঝামাঝি এসেও দেখা যায় যে, কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু এলাকা ছাড়া প্রায় সর্বত্র মুসলিম এলাকাগুলোতে অস্বাস্থ্যকর ঘনবসতি দেখা যায়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি শহরেই মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলোকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। মাত্রাতিরিক্ত জনঘণত্ব, জল নিকাশের অব্যবস্থা, সরু রাস্তার বেহাল দশা এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্মীয়মাণ বাড়ি তাদের আর্থসামাজিক দুরাবস্তারই পরিচয়বাহী। এই শতকে এসেও মুসলিমরা শহরে সহজে কোন বাড়ি ভাড়া পায় না। সুতরাং সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে দেওয়া, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতির

তেমন কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ মেলে না। রাজনৈতিক পালাবদল তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির সহায়ক না হয়ে, অনেক সময় শাসকদল নিজেদের ক্ষমতা রক্ষার ঘুঁটি রূপে ব্যবহার করে আসছে এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পশ্চাদপদতাকে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। বরং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে NRC আতঙ্ক।

তবে গত কয়েক দশকে মুসলমানরা উচ্চশিক্ষায় আসছে। সংখ্যায় কম হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। আমরা দেখেছি এক্ষেত্রে এস.এস.সির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাছাড়া ওবিসির সংরক্ষনের কোটায় বর্তমানে কিছু কিছু মুসলিম প্রার্থীরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক রূপেও যোগদান করছে। সংরক্ষণের জায়গা থেকেই এই সমাজের অনেক শিক্ষার্থী বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে, নানাবিষয়ে গবেষণা করারও সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া মোস্তাক হোসেন, সাজাহান বিশ্বাস প্রভৃতি সমাজসেবী, প্রগতিশীল মানুষের উদ্যোগে আল আমিন মিশন, জি ডি স্টাডি সার্কেল ও ভয়েস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে, গত কয়েক দশকে অনেক সংখ্যালঘু মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা নিট পাশ করে ডাক্তারি পড়ছে। যদিও অনেক কঠিন পরীক্ষায় পাশ করেও, অনেক দরিদ্র মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা নেমে আসছে। এক্ষেত্রেও অন্য কারও সাহায্য ও সরকারী বৃত্তিই তাদের ভরসা। ২০২০ সালের নিটেও সংখ্যালঘুদের নজরকাড়া সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাশ্রী প্রকল্প মুসলিম নারীদের শিক্ষার পথকে অনেকটায় মসৃণ করেছে। মুসলিম নারীর জীবনের অগ্রগতিতে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এই মানবিক কর্মসূচি নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাছাড়া বর্তমানে যে কমসংখ্যক উচ্চশিক্ষিত, চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠছে, তারা সন্ধান করছে উপযুক্ত ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রীর। ফলে উচ্চশিক্ষার প্রতি মুসলিম মেয়ের পরিবারের আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। সংখ্যালঘুদের এই অগ্রগতি খুব ধীর গতিতে হলেও, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

অবশ্য সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের এই পশ্চাদপদতার পেছনে কেবলমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের উদাসীনতাকে দায়ী করা যায় না, এই পশ্চাদপদতার ইতিহাস আরও সুদুরপ্রসারী। প্রসঙ্গক্রমে এর কারণগুলো আমাদের আলোচ্য, -

(১) মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশদের হাতে পরাজিত হওয়ার দরুন, একসময় মুসলিমরা ব্রিটিশদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতো। পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশদের শত্রু মনে করতো এবং সেইহেতু তাদের সমস্ত শিক্ষা, আধুনিক ধ্যানধারণা ও জ্ঞ্যানবিজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে পক্ষান্তরে নিজেদের হীনবল করে তোলে। অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায় ব্রিটিশদের আনুগত্য স্বীকার করে ধীরে ধীরে নানাদিক থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে আগত আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত নবজাগরণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায় দূরে সরে থাকে। এখান থেকেই এই দুই সম্প্রদায়ের পথচলা আলাদা হয়ে যায়। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় এখানেই বাধার সূত্রপাত হয়।

(২) ইংরেজি শিক্ষা ও ধ্যানধারণাকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় নানারকম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে মুসলিমরাও এই আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করতে শুরু করে। বাঙালি হিন্দুর মতো বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিরও উদ্ভব হয়। কিন্তু এই দুই প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মিলিত অগ্রগতিতে ব্রিটিশ সরকার মনে মনে প্রমাদ গণে। এই সূত্রেই লর্ড কার্জনের ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের ঘোষণা। শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত ধরে আসে একটি খণ্ডিত স্বাধীনতা। এপার বাংলার উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল মুসলিমরা প্রায় সকলেই পূর্বপাকিস্থানে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায় এই সম্প্রদায়ের দরিদ্র খেতমজুর, দিনমজুর ও কৃষকেরা। যাদের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামে বাস করে। এই সমস্ত অসহায়, অশিক্ষিত ও দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মুসলিমদের মধ্যে উপযুক্ত প্রগতিশীল নেতা বা স্বরের অভাব দেখা দেয়।

(৩) অন্যদিকে প্রগতিশীল উচ্চশ্রেণির হিন্দুসমাজ আজও মুসলিমদের দেশবিরোধী মনে করে। অথচ এখানকার পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলিমরা কখনোই দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় নি। তবে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ও অর্থের প্রয়োজনে অনেক মুসলিম যুবকেরা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। আবার দীর্ঘদিনের নাগরিক বঞ্চনা, উদাসীনতা ও উপেক্ষার শিকার, এই সমস্ত পশ্চাদপদ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ একটি সাম্প্রদায়িক বৈরিতা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করছে। ফলে মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সামাজিক অবস্থান থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পেতে তারা ব্যর্থ হচ্ছে।

(৪) বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্য যে বাঙালিরা গর্ববোধ করেন, তার অন্তঃসারশূন্যতা সাচার কমিটি তুলে ধরেছে। উচ্চবর্ণের বাঙালি ভদ্রলোকশ্রেণি প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের বাঙালি বলে মেনে নিতেই নারাজ। তাই তারা কখনই এই পশ্চাদপদ শ্রেণির পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের অগ্রগতির তেমন কোন চেষ্টায় করে নি। অথচ সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, বাংলার সুলতানেরা সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্যবাদের হাত থেকে বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আজও বেশির ভাগ উচ্চবর্ণের হিন্দুর চোখে মুসলিমরা লুঙ্গি ও টুপি পরা, নারীকে বোরখায় অবরুদ্ধ করে রাখা, অনেক সন্তানের জন্ম দেওয়া, তালাক ও বহুবিবাহে আসক্ত, অমার্জিত, অসহিষ্ণু, জঙ্গি, দাঙ্গাবাজ ও গরুখোর একটি জাতিবিশেষ।

(৫) তাছাড়া বিভিন্ন সিনেমায় মুসলিম সংস্কৃতির বিকৃত রূপ তুলে ধরে, বাংলা সিনেমা মুসলমানদের পরিচয়কে ভুলভাবে উপস্থাপন করে চলেছে সাধারণ মানুষের কাছে। এরফলে অমুসলিমদের বৃহত্তর অংশ কেবলমাত্র মুসলিমদের সম্পর্কে ভুল ধারণা ও মিথকে সত্যি বলে গ্রহণ করেছে। এই বৃহত্তর সমাজের ভুল ধারণা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, উপেক্ষা ও অবহেলায় বাঙালি মুসলিমদের উত্তরণের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশে দীর্ঘদিন সুলতানি শাসন থাকা সত্ত্বেও, বাংলা সিনেমায় তার কোন প্রতিফলন দেখা যায় নি। বাংলা সিনেমার নায়ক রূপে সচরাচর কোনো বাঙালি মুসলিমকে দেখা যায় না, বরং আদর্শবাদী, সৎ নায়কের বিপরীতে কিছু সমাজবিরোধী গুণ্ডা রূপেই সাধারণত মুসলিম চরিত্রকে দেখা যায়। তাছাড়া এই সমাজ থেকে বাংলা সিনেমায় আজ অবধি কোন ভালো নির্মাতাও আসে নি, যাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে বাঙালি মুসলিমের আর্থসামাজিক সংকটকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে, অমুসলিমদের মনে প্রচলিত ভুল মিথগুলোকে ভেঙ্গে দিতে পারে।

(৬) এমনকি পরাধীন ভারতবর্ষে রচিত বেশ কিছু ইতিহাস আশ্রিত সাহিত্যেও মুসলিমদের দেশবিরোধী শত্রু রূপে দেখানো হয়েছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় টডের Annals and Antiquities of Rajasthan অবলম্বনে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’(১৮৫৮)। তখন আমাদের দেশ ইংরেজদের হাতে পরাধীন। এক্ষেত্রে ইংরেজশক্তি যেহেতু মুসলিম শাসকদের হাত থেকে সরাসরি ক্ষমতা দখল করেছিল, তাই তারা

ভারতীয় মুসলিমদের প্রতি হীন মনোভাব পোষণ করত। স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদের রচিত ইতিহাসে মুসলিমদের হীনভাবে অঙ্কন করে। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার নিজেদের আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য, ভারতীয়দের মনে সবসময় একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরির চেষ্টা করত। ব্রিটিশদের রচিত ইতিহাসেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। আর আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা তাঁদের রচিত ইতিহাস অনুসরণেই ইতিহাস আশ্রিত কাব্য, উপন্যাস রচনা করেছেন। যে সময়কালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও জাতীয়তাবাদী ঐক্যের সবথেকে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই সময় এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা মুসলিম বিদ্বেষ জন্ম নিচ্ছে অমুসলিমদের মনে। উনিশশতকের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাসাশ্রিত কিছু কিছু উপন্যাসও এই পর্যায়ে পড়ে।

(৭) সাচার কমিটির রিপোর্টে দেখা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা আর্থসামাজিক দিক থেকে তপসিলি জাতি-উপজাতিদের থেকেও পিছিয়ে। একথা ঠিক যে, উচ্চশ্রেণির বাঙালি হিন্দুরা দীর্ঘদিন ধরে নানানভাবে নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের উপেক্ষা, অবহেলা ও শোষণ করেছে। ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হলেও, তাদের পেশা এবং পদবি অনেকক্ষেত্রে একই থাকে। তাই বাঙালি মুসলিমদের অনেকের উপাধি হল মণ্ডল, মল্লিক, হাজাম, লস্কর প্রভৃতি। তাদের মধ্যে অধিকাংশ কৃষক, শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, সব্জিবিক্রেতা, দর্জি, মাঝি, রিক্সা বা ভ্যানচালক। ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলিমরা কিন্তু আবার নিম্নশ্রেণির হিন্দুর কাছেও উপেক্ষিত ও অবহেলিত। তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছেও উপেক্ষিত। কারণ নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা এস.সি ও এস.টির সংরক্ষণের আওতায় এসে আর্থসামাজিক দিক থেকে এই বাঙালি মুসলিমদের তুলনায় আজ অনেক বেশি উন্নত। মুসলিমরা ওবিসি সংরক্ষণের সুবিধা অনেক পরে পেয়েছে। তাছাড়া ওবিসিদের সংরক্ষণের সংখ্যাটাও তুলনামুলকভাবে অনেক কম। ওবিসি-এ ১০ শতাংশ এবং ওবিসি-বি ৭ শতাংশ, তার মধ্যে আবার ওবিসি-বি এর মধ্যে অনেক অমুসলিম গোষ্ঠীও বর্তমান। এদিক থেকেও তারা শিক্ষা ও সরকারি চাকরির অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্য থেকে কোন একজন ভালো পত্রিকার সম্পাদক, তথ্যচিত্রনির্মাতা,

শিক্ষাবিদ বা রাজনীতিবিদ পাওয়া যায় না, যারা নিজেদের সমাজের পশ্চাদপদতার কথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরবে, প্রতিবাদী স্বরে নিজেদের উন্নয়ণের প্রতিকূলতাকে জয় করবে।

(৮) তাছাড়া বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিমকে উপেক্ষা করে, একটি রক্ষণশীল মুসলিমদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। যারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের কথা না ভেবে, নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক ঠিক রাখায় বেশি আগ্রহী। সম্প্রতি এদেশের মূল্যবোধহীন রাজনীতিতে যেভাবে আদর্শচ্যুতি ঘটছে, তা সমাজ তথা দেশের পক্ষে অত্যন্ত আশংকাজনক। প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও মানবিক জ্ঞ্যানসম্পন্ন জনসেবকের আজ সত্যিই খুব অভাব দেখা দিচ্ছে। গান্ধীজী, নেতাজি, ক্ষুদিরাম, দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের দেশ ভারতবর্ষের, রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই আজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অপরাধের সঙ্গে জড়িত। ভোটের আগে যেসমস্ত দেশসেবা ও জনসেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা সহজ-সরল জনসাধারণের ভোটের মধ্য দিয়ে গদি লাভ করেন, ভোটশেষে তাঁদের আর দেখা মেলেনা। বরং অনেক সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজের গদি বাঁচানোর তাগিদে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মধ্য দিয়ে দেশের শান্তি নষ্ট করেন। সাধারণ মানুষের জীবনে তখন নিরাপত্তার প্রশ্নটায় বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে এইসমস্ত পশ্চাদপদ মানুষ তাদের নির্বাচিত নেতাদের জীবনকে আলোকিত করে, নিজেরা সেই অন্ধকারেই পড়ে থাকে।

(৯) ভারতীয় মুসলমানদের জীবনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও বারবার সরকার শরিয়তি আইনের দোহাই দেখিয়ে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে। কখনো কখনো মুসলিম নারীর তালাক, বহুবিবাহ ও পিতৃহীন সন্তানদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার নিয়ে অনেক সময় প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ সরকারী আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা দাবী করেছে। কিন্তু রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের বিরোধিতায় ও মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে সরকার এই ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের অগ্রগতির পথে সরকারের এই উদাসীনতা, তাদের সার্বিক উন্নয়নের পথে কোন না কোন ভাবে অন্তরায় হয়ে উঠেছে।

(১০) সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ২০০টি। যার মাত্র ২৩ হাজারের মতো সম্পত্তি রয়েছে ওয়াকফ বোর্ডের আওতায়।

বাকি প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার সম্পত্তির কোন খোঁজ নেই। অনাথ ও অসহায় শিশুদের জন্য, উদার ও মানবিক মুসলিমদের দান করে যাওয়া অয়াকফ সম্পত্তি, কিছু অর্থলোভী ও স্বার্থপর মুসলিমদের জন্য আজ প্রোমোটরগোষ্ঠী জবরদখল করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। আর এক্ষেত্রে কিছু রাজনৈতিক দল তাদের সহযোগিতা করেছে। সরকারি সহযোগিতায় যদি ওয়াকফ সম্পত্তির সম্পূর্ণ সদব্যবহার সম্ভব হত, অনেক মেধাসম্পন্ন দরিদ্র শিক্ষার্থী, নিজেদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেত। কিন্তু কিছু স্বার্থপর মুসলিম ও সরকারের দায়িত্বহীনতার জন্য এই বিপুল সম্পত্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দরিদ্র বাঙালি মুসলিম শিক্ষার্থীরা।

(১১) মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে বাঙালি মুসলিমরা এতোটাই ব্রাত্য ও প্রান্তিক যে, তারা তাদের জীবনযাপন প্রণালী, লোকাচার, সংকট, অসহায়তা প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে তোলার কোন চেষ্টায় করেনি। এই অপরিচয়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে একটা দূরত্ব বেড়েছে, বেড়েছে উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অবহেলা, বৈষম্য ও বিদ্বেষ। এমনকি মুসলিম সমাজ তথা পরিবার জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত কথাসাহিত্যও তাদের এই উপেক্ষা ও উদাসীনতার শিকার হয়েছে। মুসলিম জনজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রেক্ষাপটে রচিত বলেই হয়তো কাজী নজরুলের লেখা উপন্যাস তিনটির কথা অনেক সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী জানে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কতজন শিক্ষার্থী উপন্যাসিক নজরুলকে চেনেন, এই ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অতি সম্প্রতি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক স্তরের পাঠক্রমে নজরুল ইসলামের 'বাঁধনহারা' উপন্যাসকে স্থান দিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালি মুসলমান জীবনকেন্দ্রিক কথাসাহিত্যকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলে, হয়তো বা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অপরিচয়ের দূরত্ব কিছুটা হলেও কমতো। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে মুসলিম জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য আজও সমানভাবে উপেক্ষিত। অনেক পাঠকের কাছে উপেক্ষিত মুসলিম সাহিত্যিক আবুল বাশার, আফসার আমেদের অনেক রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি। এই উদাসীনতার জন্যই, সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসেও, পরস্পরের সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অবগত নয়। এইপ্রসঙ্গে আফসার আমেদের মৃত্যুতে শোকাহত, অকৃত্রিম বন্ধু অনিশ্চয় চক্রবর্তীর অনুভূতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 'সিঁড়ি পার হয়ে বসার ঘরে তখন শোয়ানো রয়েছে আমার বন্ধুর চাদরে ঢাকা প্রাণহীন শরীর। সামনে একজন বসে নিবিষ্ট মনে কোরান

পাঠ করছেন। আমি একটা চেয়ারে বসে কিছুতেই চোখের জল সামলাতে পারছি না। এতকালের বন্ধুত্ব নিয়েও আমি যে মুসলিম রীতিনীতি কিছুই জানি না, সে তো আমাদের এই সমাজেরই অভিশাপ, আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতার সঙ্গেই।'[অনিশ্চয় চক্রবর্তী, 'বন্ধু, লেখক আফসার আমেদ', আলিয়া, অক্টোবর-২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯]।

যেখানে একজন বন্ধুর কাছেই মুসলিম রীতিনীতি অজানা, সেখানে যে সমস্ত সংখ্যাগুরু অপরগোষ্ঠীকে দূর থেকে অপর রূপে সন্দেহের চোখে দেখে, তাদের এই অদেখা, অজানা, অচেনার জায়গা থেকেই মুসলিমরা এক একসময় বৈষম্যমূলক বিদ্বেষের কারণ হয়ে ওঠে। কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দল এই বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় অসহায়, দরিদ্র, পশ্চাদপদ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। জামাতি ইসলাম, বাবরি মসজিদ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাভ জেহাদ এবং গো রক্ষাকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নটা বারবার চলে আসছে। বর্তমানে NRC-এর প্রসঙ্গ তাদের জীবন তথা বাসস্থানের নিরাপত্তার প্রশ্নকে অনেকবেশি ঘনীভূত করে তুলেছে। ফলে সামাজিক ন্যায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। ফলে ক্ষতি হয় গরিব মুসলমানদের, সার্বিকভাবে একটি রাজ্যের, একটি দেশের সর্বোপরি মানবসম্পদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলা যায় –

'যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে,
পশ্চাদে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাদে টানিছে।'

তাই বিশ্বের ১০৭টি দেশের ক্ষুধার সূচকের তালিকায় ভারতের অবস্থান অত্যন্ত খারাপ। আর রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হল পশ্চিমবঙ্গ [The Economic Times, 13$^{th}$ July, 2010]। এমনকি উন্নতির সূচকে নবগঠিত, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশও ভারতকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে। সমস্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদায়, এক জাতীয় ঐক্য ও সম্প্রীতি পারে আমাদের এই দীনতা থেকে মুক্ত করতে। আর প্রয়োজন 'সাবকে সাথ সাবকা বিকাশ'।

(১২) তবে একথাও সত্য যে, বাঙালি মুসলিমদের পশ্চাদপদতার সবচেয়ে বড় কারণ হল মাদ্রাসা শিক্ষা। এখানে মাদ্রাসা বলতে কিন্তু শুধুমাত্র বেসরকারী, ব্যক্তিনিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসার কথা বলা হচ্ছে। এই মাদ্রাসাগুলো অর্থনৈতিকভাবে সমাজের ধর্মীয় কর, যাকাত ও ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভর করে। কখনো কখনো বৃহত্তর সমাজ তথা রাজনৈতিক দল এই মাদ্রাসাগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের কোন মাদ্রাসায় জঙ্গি বা দেশদ্রোহী কার্যকলাপের কোন ভিত্তি বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই ধারণা একেবারেই অমূলক ও যুক্তিহীন। এখানে যারা শিক্ষকতা করেন, তাঁদের মাইনে কোনোভাবেই সম্মানজনক নয়। আর যারা এখানে লেখাপড়া করে, তারা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। এক্ষেত্রে ধর্মশিক্ষা বা লেখাপড়ার চেয়েও খাওয়া ও থাকার নিরাপত্তার দিকটি, তাদের কাছে বেশি প্রাধান্য পায়। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষাও তারা এখানে পায় না। তাছাড়া এটি ধর্মীয় শিক্ষাদানের কেন্দ্র হলেও, বিদেশি আরবি ভাষার কঠিন বেড়াজাল ভেদ করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই তাদের থাকে না। তাদের উদ্দ্যেশ্য ইসলামের মহান আদর্শ ও নীতিশিক্ষালাভে নিজেকে সমৃদ্ধ করা নয়, তাদের উদ্দেশ্য মাদ্রাসার শিক্ষাশেষে মৌলবির পাগড়ি লাভ করা। এর ফলে এই সমস্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা কোন মসজিদ, মক্তব বা মাদ্রাসায় সামান্য বেতনের বিনিময়ে, বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করার সুযোগ পায়। সুরেলা কণ্ঠে গজল গাওয়ার জন্য ও আকর্ষণীয় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনেকে আবার বিভিন্ন জলসায় বক্তা হিসেবে ডাক পায়। স্বনামধন্য বক্তা কিন্তু প্রতিটি বক্তৃতার জন্য বেশ সম্মানজনক টাকা আদায় করে জলসার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তাই তারা মাদ্রাসায় পড়াকালীন গজলের সুর ও টান অভ্যাস করে এবং ধর্মীয় কোন কথাগুলো দর্শকস্রোতা শুনতে পছন্দ করবে, পবিত্র কোরান ও হাদিসের সেই বাণীগুলো তারা বলার চেষ্টা করে।

মূলত এখানে শ্রোতা কিন্তু সেই অশিক্ষিত, দরিদ্র, পশ্চাদপদ, পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ। যে সমাজের পুরুষেরাই উচ্চবর্ণের দ্বারা অবহেলিত, বঞ্চিত এবং প্রান্তিক, সেই সমাজের নারীরা যে আরও বেশি অবহেলিত, বঞ্চিত এবং অত্যাচারিত, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশভাগের পর ওপারবাংলার নারীরা নবজন্ম লাভ করে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং রাজনীতিতে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। অন্যদিকে এপার বাংলার নারীরা

দেশভাগের ফলে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিমের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং মূলস্রোত থেকে দূরে সরে এক অন্ধকারময় জীবনে প্রবেশ করে। পুরুষতান্ত্রিক মোল্লাসমাজের আধিপত্যে তাদের জীবনে তালাক ও হালালার মতো মর্মান্তিক শাস্তি নেমে আসে। তাছাড়া তাদের জীবনের এই সংকটকে আরও বেশি ঘনীভূত করে সে মাদ্রাসায় পাগড়ি পাওয়া মৌলবিরা। যেহেতু পুরুষেরা জলসার আয়োজন করে, পুরুষেরা তাদের পেমেন্ট করে, তাই তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষসমাজকে খুশি করার জন্য, জলসায় মেয়েদের নিন্দা করে। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মেয়েদের স্বামী ও সংসারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বারবার জলসায় তুলে ধরে। আর স্বামীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে, জাহান্নামে কোন কোন শাস্তি পাবে, সে সম্পর্কে নারীকে ভয় প্রদর্শন করে। অথচ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত নারীর অধিকার এবং স্বামীসম্প্রদায়ের স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যসকল তারা জলসায় প্রায় আলোচনা করে না। অশিক্ষিত সমাজ যেহেতু এই মৌলবিদের অন্ধের মতো বিশ্বাস করে, তাই তাদের সমস্ত কথা মেনে চলার চেষ্টা করে যায়। তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত নারীসমাজ, পাশাপাশি পুরো মুসলিমসমাজ।

এইসমস্ত ধর্মব্যবসায়ী মৌলবাদী শ্রেণি ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আচরণের উপর জোর দিলেও, এই সমাজের আত্মিক উন্নতির কোন চেষ্টায় তারা করে নি। তাছাড়া নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এই শ্রেণী সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের উন্নতিও চায় নি। কারণ তারা জানে, উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষিত সমাজে তাদের দোয়া, তাবিজ, ফতোয়া ও আধিপত্য একেবারেই থাকবে না। অবশ্য তারা যে সমাজ তথা পরিবার থেকে উঠে এসেছে, তাতে তাদের কাছ থেকে মহৎ কিছু আশাও করা যায় না। অথচ তারা ইচ্ছে করলে মুসলিম ধর্মের মহান আদর্শকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে সেই পশ্চাদপদ জনসমাজকে কিছুটা হলেও আলোর সন্ধান দিতে পারতো। ইসলাম ধর্মে নারী – পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে জ্ঞানশিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারা ধর্মের মহৎ আদর্শ থেকে নিজেরা চ্যুত হয়ে, পুরো মুসলিম সমাজকেই পশ্চাদপদ করে রেখেছে। নারীকে দমিয়ে রাখতে গিয়ে, পুরো সমাজই নিজের উত্তরণের পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। এই সমাজে বিয়েকেই মেয়েদের একমাত্র মোক্ষ ভাবা হয়। ফলে তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিউ বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। ধর্মান্ধ পুরুষেরা মেয়েদের অবরুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে, নিজেদের অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে ফেলেছে। ফলে

সমগ্র মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষা, সাহিত্য ও চিকিৎসা থেকে দূরে সরে মূলস্রোত থেকে আরও বেশি পিছিয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের এই সামগ্রিক সংকট অবশ্য জাতিধর্মনির্বিশেষে অনেক সাহিত্যিককেই বিচলিত করেছে। দেবেশ রায় থেকে শুরু করে অনেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্য ও পুরোহিততন্ত্রের বারবার সমালোচনা করেছেন। তেমনি আবার আবুল বাশার, আফসার আমেদ প্রভৃতি কথাসাহিত্যিকগণ, সংখ্যাগুরুসমাজের সমস্ত অবহেলা ও উপেক্ষাকে সরিয়ে রেখে বাঙালি মুসলিমের প্রকৃত অবস্থানকে নিজেদের লেখায় স্পষ্ট করে তুলছেন। এই সমাজের একজন শিক্ষিত নাগরিকরূপে আফসার আমেদ, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেও সাহিত্যসৃষ্টি করে গেছেন নিরলসভাবে। এই প্রসঙ্গে লেখকের মুসলিম সমাজের প্রতি সহানুভূতির দিকটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, 'মুসলমান মাত্রেই অশিক্ষিত, নোংরা, অপরাধপ্রবণ ও গরিব সংখ্যাগুরুর মানুষদের মনে এই ধারণা বসে থাকে। তাদের এই পৃথক থাকার ভিতর জন্ম নেয় কিছু ভ্রান্ত ধারণারও। মুসলমান মানেই অপরাধপ্রবণ একথা ঠিক নয়, হ্যাঁ গরিব তো বটেই, কিন্তু খুব সহৃদয় তারা, অতিথি বৎসল, সরল সাদাসিধে—হ্যাঁ খুব কষ্টেসৃষ্টে বাঁচে। শিক্ষাপ্রাপ্ত তেমন হয় না তারা। সরকারি চাকরিতে তাদের উপস্থিতি খুবই কম। এই বঞ্চনার দিকটি ভেবে দেখতে হবে আমাদের। আর সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে যে স্বেচ্ছা-বিচ্ছিন্নতা এবং হীনম্মন্যতা তাদের সঙ্গী হয়ে চলেছে, তা দূর করার কাজে আসতে হবে মুসলমানদেরই। তাদের মধ্যে যারা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন, তাঁদের আগে ধর্মীয় আবেগ ঝেড়ে ফেলে, মুসলমানদের এগিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে।'( আফসার আমেদ, 'অন্ধকারের উৎস হতে', 'মুসলমান সমাজঃ নানাদিক', দে'জ পাবলিশিং, ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৪) এই সহানুভূতির জায়গা থেকেই লেখক আফসার আমেদ, পশ্চিমবঙ্গের অশিক্ষিত, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজের কথা বিশেষ করে তুলে ধরেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। ১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়কালকে তিনি ছুঁয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজেরও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। স্থানভেদেও এই পরিবর্তন স্পষ্ট। সমাজ ও সময়সচেতন লেখক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে এই পরিবর্তনের স্বাক্ষরও সুস্পষ্ট। মূলত

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার গবেষণার বিষয়, 'আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন'। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে--

ভূমিকা,

১) প্রথম অধ্যায়—কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদঃ জীবন ও সাহিত্য,

২) দ্বিতীয় অধ্যায়—আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন: ১৯৮০-১৯৯০,

৩) তৃতীয় অধ্যায়-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন: ১৯৯১-২০০০,

৪) চতুর্থ অধ্যায়-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন: ২০০১-২০১০,

৫) পঞ্চম অধ্যায়-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন: ২০১১-২০১৮,

৬) ষষ্ঠ অধ্যায়—আফসার আমেদের সমসাময়িক অন্যান্য কথাকারদের রচনায় মুসলিম নারীর জীবন,

উপসংহার।

**ভূমিকা**—এই অংশে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমসমাজের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান ২০০৬ সালের সাচার কমিটির রিপোর্ট ধরে স্পষ্ট করা হয়েছে।

**প্রথম অধ্যায়**—কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ: জীবন ও সাহিত্য, পর্বে আফসার আমেদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিজীবন, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবন সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের অসাধারণ সৃষ্টি-রহস্যের মূল উৎস অনুসন্ধানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে নানাসূত্রে। আফসার আমেদের

সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিকে গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে ভাগ করে, নানান দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর এই সৃষ্টিসম্ভার লেখককে যে সমস্ত সম্মাননা ও পুরস্কারে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে, তার একটি বিস্তারিত আলোচনাও এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

**দ্বিতীয় অধ্যায়**—আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন: **১৯৮০- ১৯৯০,** পর্বে লেখক মূলত মাটির কাছাকাছি বসবাসকারী দরিদ্র, অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ মুসলিম জনসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন নিজের লেখনীকে। এই সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় বিধান তথা সংস্কার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুসলিম নারীর জীবনে কতটা আনন্দ বা বেদনা বয়ে আনে তার একটা সুস্পষ্ট রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। এই সময়কালে রচিত তাঁর ‘ঘরগেরস্তি’, ‘স্বপ্নসম্ভাষ’, ‘সানু আলির নিজের জমি’, ‘বসবাস’, ‘আত্মপরিচয়’ প্রভৃতি উপন্যাসের পাশাপাশি বেশকিছু ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করা হয়েছে।

**তৃতীয় অধ্যায়**-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন: **১৯৯১-২০০০,** পর্বে রচিত কথাসাহিত্যে লেখক ধীরে ধীরে, গ্রামীণ জনসমাজের পাশাপাশি শহুরে মানুষের জীবনযন্ত্রণার সঙ্গী হয়ে উঠছেন। মুসলিম জনসমাজে প্রচলিত তালাক, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও অসমবিবাহের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম পরিণয় সংক্রান্ত সমস্যা ও সংকটকেও তুলে আনছেন তাঁর সাহিত্যপ্রাঙ্গণে। এমনকি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রসঙ্গও লেখক প্রেক্ষাপট রূপে গ্রহণ করেছেন এই অধ্যায়ে। এই পর্বে লেখকের অসাধারণ কিস্‌সার আলোচনাও উঠে এসেছে। তাঁর বিভিন্ন ধরণের ছোটগল্পের পাশাপাশি ‘অন্তঃপুর’, ‘ধানজ্যোৎস্না’, ‘সঙ্গ-নিঃসঙ্গ’, ‘ব্যথা খুঁজে আনা’, ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা’, ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’, ‘দ্বিতীয় বিবি’ ও ‘এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা’ উপন্যাসগুলো এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**চতুর্থ অধ্যায়**-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন: **২০০১-২০১০,** পর্বে লেখকের বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে রচিত সাহিত্যের অঙ্গনে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম নারীর জীবনে যে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা যায়, তার অভিব্যাপ্তিও এই সময়কালে রচিত কথাসাহিত্যে স্পষ্ট। নারীরা এই সময় সবলা হতে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজাল কাটিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ।

লেখকের এই সময়কালে রচিত 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা', 'অশ্রুমঙ্গল', 'প্রেমপত্র', 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা' উপন্যাস ও ছোটগল্পে এই সত্যই রূপায়িত।

**পঞ্চম অধ্যায়**-- আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন: ২০১১-২০১৮, পর্বে লেখকের একমাত্র উপন্যাস 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' নিয়েই শুধুমাত্র আলোচনা করা হয়েছে। এই সময়কালে রচিত লেখকের বেশিরভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্পে অমুসলিম জনসমাজ প্রতিফলিত, যা আমার গবেষণা সন্দর্ভের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া এই সময়কালে লেখক মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন বলে, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সংখ্যাও সীমিত। তবুও এই অধ্যায়ে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'সেই নিখোঁজ মানুষটা'য় লেখকের অসাধারণ কৃতিত্বের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

**ষষ্ঠ অধ্যায়**—আফসার আমেদের সমসাময়িক অন্যান্য কথাকারদের রচনায় মুসলিম নারীর জীবন, পর্বে আফসার আমেদের সমসাময়িক কথাকার আব্দুল আজিজ আল আমান, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, গৌরকিশোর ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও আবুল বাশারের রচনায় প্রতিফলিত মুসলিম নারীর জীবনের নানান সমস্যা, সংকট ও টানাপড়েনের দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে অন্যান্য কথাকারদের তুলনায় আফসার আমেদের রচনায় প্রকাশিত মুসলিম নারীর প্রতি লেখকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির দিকটিও।

**উপসংহার**—এই অংশে গবেষণাসন্দর্ভটির একটি সামগ্রিক মুল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি আফসার আমেদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যসম্ভারের বিভিন্ন দিক নিয়ে, গবেষণার স্বতন্ত্র অবকাশের দিকটিও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য।

# প্রথম অধ্যায়ঃ

# কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ-- জীবন ও সাহিত্য

ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক উপমহাদেশ। এখানে হিন্দু- মুসলিম, বৌদ্ধ-জৈন, খ্রিষ্টান-পার্সি প্রভৃতি নানা ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করেন। অথচ দীর্ঘদিন একসাথে বসবাসেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তার অভাব আজও পরিলক্ষিত হয়। দেশভাগ ও খণ্ডিত স্বাধীনতা উভয় সম্পদায়ের কাছেই এক যন্ত্রণাময় ইতিহাস। দেশভাগের সময় ভারতবর্ষ থেকে যে সমস্ত মুসলিম জনসাধারণ দেশত্যাগ করে পূর্বপাকিস্থানে চলে যান, তাদের অধিকাংশই শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষই গরিব ও অশিক্ষিত। এমনকি অধিকাংশের বসবাস দারিদ্র্যসীমার নিচে। যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে তাদের কাছে বেশি প্রাধান্য পায় ধর্মীয় শিক্ষা। ফলে দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসহায় মুসলিম জনসমাজ রক্ষণশীল মোল্লা-মৌলবির দ্বারা চালিত হতে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা তথা মুসলিম ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য না জানার জন্য, নানাধরণের ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামিতে তারা আচ্ছন্ন। আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সঙ্গীত ও সংস্কৃতি থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার দরুন, তারা পশ্চিমবঙ্গের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরফলে বৃহত্তর জগতে প্রবেশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন, দারিদ্র-পীড়িত, অসহায়, পশ্চাদপদ জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

কথাসিহিত্যিক আফসার আমেদ এমন একটি সামাজিক পরিমণ্ডলে, ১৯৫৯ সালের ৫ই এপ্রিল হাওড়া জেলার বাগনান এলাকার কড়িয়ায় জন্মগ্রহন করেন। বাবা সেখ খলিলুর রহমান এবং মা আরফা বেগমের তিনি তৃতীয় সন্তান। কড়িয়ার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তারপর বাইনান বামনদাস হাইস্কুল থেকে তিনি ১৯৭৬ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৭৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাঠের জন্য তিনি 'শিবপুর দীনবন্ধু ইন্সটিটিউটে' ভর্তি হন। কিন্তু পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য প্রায় দুবছর পড়াশোনা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে বাগনান কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৮৩ সালে বাগনান কলেজ থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি

স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। বি.এ পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। লেখা অন্তপ্রাণ আফসার আমেদ বি.এড ডিগ্রি করার কথা একবার ভেবেছিলেন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত করেন নি। সেইসময় তাঁর পক্ষে স্কুল বা কলেজে চাকরি জোগাড় করা খুব একটা কঠিন হত না। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ও লক্ষ্য ছিল একজন লেখক হয়ে ওঠা। তাই তিনি তেমন ভাবে চাকরির চেষ্টাও করেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল চাকরিসূত্রে বাঁধা জীবন হয়তো তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই লেখালেখির মধ্য দিয়ে রোজগারের কঠিণ পথকেই তিনি নির্বাচিত করার সংকল্প করেন।

হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামের দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারের সন্তান আফসার আমেদের এই পথচলা কিন্তু সহজ ছিল না। দেশভাগের পর তাঁর জেঠা-কাকাদের প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গে চলে যান। মা আরফা বেগমের ইচ্ছের জোরে, বাবা খলিলুর রহমান এদেশেই রয়ে যান। সন্তানদের মানুষ করতে খলিলুর রহমান কখনো ক্ষেতে, কখনো ধানভানা কলে কাজ করেছেন, আবার কখনো বিহারের চাইবাসার চীনেমাটির খনিতে শ্রমিকের কাজ করেছেন। এমনকি কলকাতা বন্দরের শ্রমিক রূপেও অনেক দিন তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। তবু অভাব ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। মাঝে মাঝে তাঁদের আধপেটা খেয়েও থাকতে হত। ছেলেবেলায় লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় বই পর্যন্ত তিনি ঠিকমতো কিনতে পারেন নি। স্কুলে সময়মতো মাইনে দিতে না পারায় স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেকসময় তাঁর পরীক্ষার রেজাল্ট আটকে দিতেন। শুধুমাত্র মায়ের অপরিসীম চেষ্টায় তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। উচ্চমাধ্যমিক, বি.এ ও এম.এ পড়ার খরচ অবশ্য তিনি লেখালেখি থেকেই জোগাড় করেছেন।

অনেক অল্পবয়স থেকেই আফসার বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সম্পাদক বন্ধু কাজী কামালউদ্দিনের সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে ১৯৭৫ সালে 'ময়দান' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সম্পাদক অশোক পোড়িয়ার সহযোগিতায় তিনি ১৯৮৩ সালে 'কালগোধূলি' নামে আর একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৮৭ সালে 'জাগর' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তাছাড়া জীবনের শেষপর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার জন্য তিনি নিরলসভাবে লিখে গেছেন।

লেখক আফসার আমেদ তাঁর এই লেখনীর জন্য একদিকে যেমন বিভিন্ন অধিবেশনে ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনাচক্রে আমন্ত্রিত হয়েছেন, তেমনি ফেলোশিপ থেকে শুরু করে

বিভিন্ন পুরস্কারে হয়েছেন সম্মানিত। এমনকি ১৯৮৭ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশিয়া লেখক সংঘের অধিবেশনেও তিনি আমন্ত্রিত হন। আসামে বরাক উপত্যকার সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন ১৯৯০ সালে। সাহিত্য অকাদেমির ভ্রমণ ভাতা নিয়ে তিনি ১৯৯৩ সালে মধ্যপ্রদেশ ভ্রমনে যান। ২০০০ সালে বাংলাদেশের খুলনার ফুলতলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়িতে, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত হন। তাছাড়া ২০১৫ সালে বাংলাদেশের রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত জীবনানন্দ উৎসবেও তিনি আমন্ত্রিত হন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুবাদ সাহিত্য বিষয়ক জাতীয় আলোচনাচক্রে ২০০৮ সালে তিনি অংশগ্রহণ করেন। একই বছরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জীবনী পাঠমালায় বক্তা হিসেবে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। ২০০৮ সালে প্রাইম মিনিস্টার হাইলেবেল কমিটির আমন্ত্রণে, সাচ্চার মহাশয়ের সভাপতিত্বে দিল্লিতে ভারতবর্ষের মুসলিম নারীদের অবস্থান নিয়ে যে দু-দিনের গোলটেবিল বৈঠক হয়, সেখানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। কুলটি কলেজে ও লখনৌ-এ বেঙ্গলি ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন ২০০৯ সালে। এমনকি এই সময়ে সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত, জীবনানন্দ ও জসীমউদ্দিন বিষয়ক জাতীয় আলোচনাচক্রেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

আফসার আমেদ তাঁর এই নিরলস সাহিত্য সাধনার দরুন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৯৮ সালে। ১৯৯৯ সালে কথা পুরস্কার ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার লাভ করেন। অনুবাদের জন্য তিনি ২০০০ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। ২০০৪ সালে মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মারক পুরস্কার ও ২০০৭ সালে ‘লোকসংস্কৃতি পুরস্কার’, ‘ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি পুরুস্কার’ ও ‘নতুন গতি পুরস্কার’ লাভ করেন। তাছাড়া বঙ্কিম পুরস্কার লাভ করেন ২০১০ সালে এবং ২০১৬ সালে তিনি মহাশ্বেতা দেবী স্মারক পুরস্কার লাভ করেন। ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসের জন্য তিনি পুনরায় ২০১৭ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভে ধন্য হন।

ব্যক্তি হিসেবে আফসার আমেদ ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ মাটির মানুষ। কম উচ্চতার সরল, সাদাসিধে মানুষটি ছিলেন রাগহীন, বিনয়ী এবং প্রচারবিমুখ। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে

তাঁর বিনম্র ব্যবহার তাঁকে সম্মানীয় করেছিল আরও বেশি। এতো বড় মাপের লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন অহংকার ছিল না। তিনি তাঁর লেখার প্রশংসা এবং সমালোচনা দুটোকেই হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। লেখার প্রতি তাঁর নিবিড় আকর্ষণ ও আন্তরিকতা ছিল। তাঁর সাহিত্যে মুসলমান সমাজ প্রাধান্য পেলেও তিনি কিন্তু রক্ষণশীল ছিলেন না। তাঁর গল্প ও উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হল মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মানুষকে কাছে থেকে জানা এবং অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাই 'মেটিয়াবুরুজে কিসসা' উপন্যাসটি লেখার আগে তিনি বার বার মেটিয়াবুরুজ এলাকা পরিভ্রমণ করেছেন। এমনকি নিজের জানার পরিধি ও অভিজ্ঞতাকে ব্যাপ্তি দানের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৯৭-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত খুবই সামান্য পারিশ্রমিকে প্রান্তিক জনকল্যাণ সমিতি এনজিওতে পথশিশুদের পাঠদান করেছেন। তাঁর এই বাস্তবলব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিকে অনেক বেশি বাস্তবানুগ এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। তাঁর জীবনের চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও, তিনি যে বেঁচে থাকার আনন্দ পেয়েছিলেন, তারও প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে একদিকে লেখক রূপে প্রতিষ্ঠা পেতে যেমন অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, তেমনি তিনি পাশে পেয়েছেন বেশকিছু শুভাকাঙ্ক্ষী সাহিত্যকার ও সুহৃদ বন্ধুদের। বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার প্রাপকের প্রতিভাষণ 'এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা'য় তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি হয়তো একজন মিস্তিরি হতাম। আমাদের পাড়ায় সেই প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু ১৯৭৬ সনে আমাকে খুঁজে পেলেন সাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী। আর পৌঁছে গেলাম সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের সংস্পর্শে। আমার আর মিস্তিরি হওয়া হল না। অমলেন্দু চক্রবর্তী একেবারে কাছের বন্ধু ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে খুব কষ্ট পেয়েছি। দেবেশ রায়ের সম্পর্কে এসে লেখা-সর্বস্বতা আমাকে পেয়ে বসল। দেবেশ রায় আমার বন্ধু, সখা। আমাকে জাগিয়ে তুললেন। আজও চলেছে সেই সম্পর্কের অভিসার। আমার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বাড়ি ঘরদোর হয়ে উঠল, অরুণ সেন, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তীর বাড়ি। আমি এঁদের পরিবারের সন্তানদের সঙ্গে মানুষ হয়েছি। এই ঋণ কখনো আমি ভুলব না। আমার আর একটা বাড়ি ছিল প্রিয়ব্রত দেব, স্বপ্না দেবের বাড়ি। চার বছর বন্ধু মহম্মদ মনিরুল তাঁর বিধাননগরের ফ্ল্যাটে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'[১]

তিনি পাশে পেয়েছিলেন দে'জ পাবলিশিং এর কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে মহাশয়কে। যিনি অনেকটা আর্থিক ঝুঁকি নিয়েই আফসার আমেদের প্রায় সমস্ত বই প্রকাশ করেন। মূলত তিনি লেখকের একজন অন্তরঙ্গ পারবারিক বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। আফসার-নাসিমার বিয়ে থেকে শুরু করে পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানের একজন সুহৃদ ছিলেন তিনি। অসুস্থতার সময়ও নানাভাবে লেখকের পাশে দাঁড়িয়ে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পারিবারিক বন্ধুর মতই। অনুভূতিপ্রবণ মাটির মানুষ আফসার আমেদকে বাংলা কথাসাহিত্যে দেবেশ রায়ের একজন সার্থক উত্তরসূরি বলেও দে মহাশয় মনে করেন। তাছাড়া সেই সময়কার বহু পত্র-পত্রিকাও আফসার আমেদের লেখা গল্প উপন্যাসকে পাঠকের কাছে অনায়াসে পৌঁছে দিয়েছে। যা তাঁর লেখকসত্তাকে করেছে অনেক বেশি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত।

আফসার আমেদের বাল্যকৈশোর থেকে শুরু করে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর অনুভূতিতে সার্বিকভাবে মিশে আছেন মা আরফা বেগম। সেই সময় গ্রামের মুসলিম নারীরা সচরাচর লেখাপড়া করত না। অথচ আরফা বেগমের অবসর সময় কাটতো বই পড়ে ও ছেলেমেয়েদের গল্প শুনিয়ে। সাহিত্যের প্রতি মায়ের এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আফসার আমেদের জীবনে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা যোগায়। দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে তিনি তাঁর সন্তানদের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ও অভাব অভিযোগকে ভরিয়ে তুলতেন রাতের বিছানায় গল্প শোনানোর মধ্য দিয়ে। অনেকগুলো ভাইবোনের মাঝেও মায়ের একেবারে পাশে শুয়ে থাকার অধিকার পেয়েছিলেন আফসার। তিনি নানাধরণের গল্পের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন আফসারের বাল্যজীবনে কল্পনাশক্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, তেমনি সমস্ত দুঃখদারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে লেখার একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন। সন্তানের সাহিত্যচর্চার প্রতি আগ্রহকে তিনি বারবার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন আফসারের লেখার একজন মুগ্ধ পাঠিকা। মায়ের প্রতি আফসারের যে অনাবিল ভালবাসা ও শ্রদ্ধা, লেখকের বিভিন্ন বক্তব্য ও স্মৃতিচারণায় বারবার পরিস্ফুট। মায়ের মৃত্যু তাই আফসারের জীবনে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করে। তাঁর 'আয়রে সোনা চাঁদের কণা' ছোটগল্পে, জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত আফসার আমেদের, শিশুরূপে মায়ের স্নেহ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃস্নেহে আপ্লুত

লেখকের নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর কথাসাহিত্যে নারীর জীবনেতিহাস বর্ণনায়।

নারীর জীবন তথা জগৎকে আরও ভালোভাবে জানার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি মঞ্জুরা খাতুন ও নাদিরা খাতুন–এই দুই দিদির সান্নিধ্যে। ছেলেবেলা থেকেই তিনি দুই দিদির অনাবিল স্নেহভালোবাসায় যেমন তৃপ্ত হয়েছিলেন, তেমনি তাদের সংস্পর্শে ছুঁতে পেরেছিলেন, নারীর চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাংখা, দুঃখ-বেদনা, আবেগ এবং স্বপ্নকে। ফলে তাঁর কথাসাহিত্যে বর্ণিত নারীর জীবন এত জীবন্ত ও বাস্তব রূপে প্রতিভাত হয়। তাছাড়া তাঁর বাবা খলিলুর রহমান যখন বিহারের চাঁইবাসার খনিতে কাজ করতেন, তখন কিছুদিনের জন্য তিনি সেখানকার আদিবাসী নর-নারীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাদেরই একজন আদিবাসী রমণী ফুলমতিয়ার আবেগপ্রবণ স্নেহ ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর ছেলেবেলা। তাঁর কথাসাহিত্যে বর্ণিত নারীজীবন এদের সংস্পর্শে হয়ে উঠেছে অনেক বেশি সুন্দর ও সমৃদ্ধ।

মা ও দিদিদের প্রতি আফসারের যেমন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল গভীর, তেমনি বাবার প্রতিও ছিল তাঁর অপরিসীম দায়িত্ববোধ। তাই মায়ের মৃত্যুর পর বাবাকে তাঁর বাগনানের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং আমৃত্যু সপরিবারে বাবার সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। একজন ব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু ছেলেমেয়েকে স্নেহপ্রবন পিতার মতই অনাবিল স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন। এমনকি লেখাপড়ার ব্যাপারেও তিনি তাদের সহযোগিতা করেছেন। স্বামী হিসেবে তিনি কতটা উঁচু দরের মানুষ ছিলেন, তা জানা যায় নাসিমা বিবির সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে। বয়সে তেরো বছরের ছোট স্ত্রীর প্রতি তাঁর যেমন অমলিন ভালোবাসা ছিল, তেমনি ছিল আন্তরিক নির্ভরশীলতা। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, একসময় যখন তাঁর স্ত্রী নাসিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন লেখক, প্রয়োজনে রান্না-বান্না করে পরিবারকে সামলেছেন, স্ত্রীকে সুস্থ করে তুলেছেন একজন প্রকৃত সহানুভূতিশীল স্বামী হিসেবে। সেদিক থেকেও ব্যক্তি আফসার আমেদ নিঃসন্দেহে একজন সফল ও শ্রদ্ধেয় মানুষ।

আফসার আমেদের লেখকসত্তাকে পরিণতির দিকে পৌঁছে দিতে যাঁর অবদান অতুলনীয়, তিনি হলেন আফসার আমেদের স্ত্রী নাসিমা খাতুন। ১৯৯১ সালের ৮ই মার্চ হাওড়া জেলার

আজাদ আলি সর্দারের কন্যা, নাসিমা খাতুনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়। জীবনে চলার পথে নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে একজন প্রকৃত সহধর্মিণীর মতোই তিনি লেখকের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে লেখকসত্তাকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার অবকাশ দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের সংসারে আসে পুত্র শতাব্দ আমেদ এবং কন্যা কুসুম হিয়া। সংসার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব থেকে শুরু করে সন্তানদের লেখাপড়া, সব দিকেই ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। নিজে চা খেতে অপছন্দ করলেও বারবার লেখককে সময়মত চায়ের জোগান দিয়েছেন, যেন তিনি নির্বিঘ্নে ও ক্লান্তিহীন ভাবে লিখে যেতে পারেন। লেখার সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ দিয়েছিলেন বলেই লেখক এতো বেশি পরিমানে গল্প উপন্যাস লিখে যেতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে। 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার প্রাপকের প্রতিভাষণে' তিনি বলেছেন, 'নাসিমা আমাকে লিখতে দেখলে বড়ো আনন্দ পায়, সে আমার স্ত্রী, সহধর্মিণী। আমার দুই ছেলে মেয়ে শতাব্দ ও কুসুম লেখা চলার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে নেয়। ছাপা হলে আর তাদের পড়তে হয় না। এরা আমার সঙ্গেই আছে।'[২] 'আত্মপক্ষ', 'রাত কত হল?', 'নিরুপায় অলৌকিক' প্রভৃতি তাঁর আত্মজৈবনিক ছোটগল্প। এই সমস্ত ছোটগল্পে তাঁর স্ত্রী নাসিমা, সন্তানদ্বয় শতাব্দ ও কুসুম এবং ব্যক্তি আফসার আমেদের উপস্থিতি, তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে পরস্পরের পরিপূরক করে তুলেছে।

লেখক যখন অসুস্থ, তখন তাঁর স্ত্রী নিজের সর্বস্ব দিয়ে সেবা করেছেন। বাংলা আকাদেমিতে তখন তিনি কর্মরত। সেখানে তিনি যা মাইনে পেতেন, তাতে তাঁর সংসার চালাতে তেমন কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু লেখকের কঠিন অসুখের চিকিৎসা চালান খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল নাসিমা বিবির পক্ষে। প্রবল অসুস্থতায় লেখক তাঁর স্মৃতিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। এমনকি হাঁটা-চলার জন্যও তিনি একান্তভাবেই স্ত্রীর উপর এইসময় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। তবে কলকাতার আমরি হসপিটালে চিকিৎসাধীন থেকে তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। আবার নতুন নতুন লেখার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার দরুন তাঁর শৈশবের স্মৃতি এবং নিজেকে নিয়ে উপন্যাস লেখার সাধ শেষপর্যন্ত অপূর্ণই থেকে যায়। এমনকি মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ঔরঙ্গবাদের দক্ষ ও দূরদর্শী শিল্পপতি মোস্তাক হোসেনের

জীবনীগ্রন্থ লেখার যে পরিকল্পনা আফসার আমেদ করেছিলেন, মৃত্যুর করাল হাতছানিতে তাও স্তব্ধ হয়ে যায়।

আফসার আমেদের জীবনে সঙ্গীতের একটি বড়ো ভূমিকা ছিল। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার উপলক্ষে অভিভাষণ 'আমার আমি ও আপনারা'য় এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের গান আমাকে স্নাত করে, একই গান পরে আবার যখন শুনি নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনায় সিক্ত হই। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত আমাকে সজীব রাখে। মহৎ শিল্প মাধ্যমের কাছে মনে হয় আমি কত ক্ষুদ্র। সেখান থেকে আমি উজ্জীবনে পৌঁছানোর মন্ত্র পাই।' তাই লেখকের জীবিতকালে বাগনান স্টেশনের কাছে তাঁর সাদা রঙের দোতলা বাড়ি 'ধানজ্যোৎস্না' বেশিরভাগ সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে ভরে থাকতো।

লেখকের স্বপ্নের বাড়ি এই 'ধানজ্যোৎস্না'। স্বপ্নের মতোই অনেক যত্নে তিনি বাড়িটি ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন। বাড়িটির নাম প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি শ্যামলকুমার মিত্রকে বলেন 'আসলে আমি যে মাঠের ধারে বাস করছি, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ধান ফলতো সেখানে। আর তারই এক প্রশস্ত প্রান্তে বাড়ি তৈরির পর মনে হল এখানে এসে পরিচয় খুঁজে পেলাম। নিসর্গশোভা একীভূত হয়ে গেছে এখানে। আবার আমার এই নামের উপন্যাস নিয়েই বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক চিত্র নির্মাণ করেছেন। এই নাম দিলে সেই স্মৃতিও জাগরিত হয়ে থাকবে। এইসব ভেবে বাড়ির নাম রাখলাম 'ধানজ্যোৎস্না'।'[৩] জীবনের শেষ কটা দিন এই প্রিয় বাড়িতে কাটানোর আকুলতায় লেখক অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই চিকিৎসা জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। চিকিৎসাধীন ডাক্তারদের মতো তাঁরাও জানতেন বাড়িতে রাখার মতো শারীরিক অবস্থা লেখকের ছিল না। শেষপর্যন্ত ২০১৮ সালের ৪ঠা অগাস্ট তাঁর প্রাণহীন দেহ 'ধানজ্যোৎস্না'য় নিয়ে আসা হয়। নিসর্গসৌন্দর্য বেষ্টিত আফসার আমেদের স্মৃতিবিজড়িত 'ধানজ্যোৎস্না'য় আজ তাঁর সমস্ত সাহিত্য, লেখালেখি, চিঠিপত্র মানপত্র, পুরস্কারসহ সন্তানদের অনেক যত্নে, ভগ্নহৃদয়ে আগলে রেখেছেন তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া নাসিমা খাতুন। আজ আর বাড়িটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে না।

বাংলা কথাসাহিত্যে লেখক আফসার আমেদের গল্প উপন্যাস যেমন এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে, তেমনি ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁর বেশকিছু গল্প উপন্যাস হিন্দি ও ইংরেজি

ভাষায় অনূদিত হয়ে সমাদৃত হয়েছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচিতে সংযোজন করা হয়েছে তাঁর 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসটি। তাছাড়া তাঁর 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাস অবলম্বনে বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন 'আমার ভুবন' নামে কাহিনিচিত্র নির্মাণ করেন ২০০২ সালে। আবার ২০১২ সালে তাঁর 'হত্যার প্রমোদ জানি' উপন্যাস অবলম্বনে 'রাত কত হল' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন পরিচালক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। এইভাবে কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ তাঁর অসাধারণ লেখনিগুণে পৌঁছে যান সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের কাছে। লেখক দীর্ঘজীবী হলে বাংলা কথাসাহিত্য আরও কিছু কালোত্তীর্ণ গল্প উপন্যসে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় ভরে উঠত একথা অনস্বীকার্য।

**মুসলিম সমাজের অন্যতম রূপকার আফসার আমেদ**

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজ তথাকথিত সাহিত্যিকদের রচনায় অনেকটাই অবহেলিত ও বঞ্চিত। কথাসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাঙালি মুসলিম সমাজ তার সার্বিক পরিচয় নিয়ে বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের রচনায় তেমনভাবে স্থানলাভ করে নি। এই অভাববোধই আফসার আমেদকে সাহিত্য রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ছেলেবেলায় মনে হত লেখালেখির ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে। আমার মত করে আমারও কিছু বলার আছে। আমার কৈশোর-বাল্যের যা কিছু সমকালীন লেখাজোখা পত্র-পত্রিকায় ও বইয়ে পড়তাম, সেই পাঠের ভিতর খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়তাম, এই প্রতিক্রিয়ার বোধে যে, যা যা পড়ছি, তাতে আমি অখুশি, অতৃপ্ত – আমি যেন তার ভিতর আর একভাবে বলতে চাই। আর লিখতে বসার উৎসাহ খুঁজে পেতাম। বিশেষত গ্রামের মানুষ জীবন নিসর্গ আমার বাল্যকৈশোরে যে ঘনিষ্ঠতায়, সত্যে, ঔদার্যে ও সহজাত অনুভূতিতে ধরা দিয়েছিল, তার সাক্ষাত তেমনভাবে আমার সঙ্গে ঘটছিল না সেই সব সাহিত্যপাঠের ভিতর। আর সেই তাড়নায় বুঝি বা লিখতে বসা আমার।...কেননা আর সব লেখার পাঠের ভিতর অসুখী ভাবই আমাকে লিখতে অনুপ্রেরণা জোগাত।'[৪] এই জায়গা থেকেই লেখক সাহিত্যের পটভূমিরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁর আজন্মলালিত গ্রামবাংলার পরিচিত সমাজবাস্তবতাকে। বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম জনসমাজ, ধর্মনীতি, জীবিকা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিরহ-যন্ত্রনা

প্রভৃতি প্রেক্ষাপট নিয়ে নানান উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে, এক অভিনব জীবনদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ। মুসলিম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে সার্বিক পরিচয় তাঁর কথাসাহিত্যে ধরা পড়েছে, তাতে তাঁকে মুসলিম সমাজের একজন অন্যতম রূপকার বলা যেতে পারে। প্রথানুগত্যে, ভাষাব্যবহারে, জীবিকায়, শব্দচয়নে, সমাজনীতি ও ধর্মনীতিতে আফসারের সৃষ্ট বেশির ভাগ চরিত্র একেবারেই মুসলিম। এই সম্প্রদায়েরই একজন মানুষ হওয়ার সুবাদে, তাঁর মুসলিমসমাজ আশ্রিত গল্প-উপন্যাস হয়ে উঠেছে অনেকবেশি জীবন্ত ও প্রাঞ্জল।

## পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিম সমাজ

আফসার আমেদের বাল্য-কৈশোরকালে গ্রামে বসবাসকারী নিম্নবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও নানান কুসংস্কার। পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য কৃষিজমি কোন কারণে হাতছাড়া হয়ে গেলে, তারা অনেক সময় শহরে এসে রিক্সা চলায়, ভ্যান টানে, শহরের বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজমিস্ত্রি ও জোগানদার শ্রমিকের কাজে যোগ দেয়। অনেকে আবার গ্রাম থেকে তরকারি কিনে শহরের বাজারে বিক্রি করে। অবশ্য অনেক সময় তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা মুসলিম নারীও বেঁচে থাকার তাগিদে বাজারে সব্জি ও চাল কেনা-বেচার কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেকে আবার প্রতিষ্ঠিত দালাল বা ঠিকাদারদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে দুইমাস থেকে দশমাস বা তারও বেশি সময়ের জন্য মাটি কাটা ও নির্মাণের কাজ নিয়ে পরিবার ছেড়ে বিদেশ (এখানে বিদেশ বলতে অন্য কোন জেলা বা রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে) গমন করে। তাছাড়া গ্রাম ও শহরের সিংহভাগ দর্জিই কিন্তু এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আজকের দিনেও অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে মুসলিম চাকরিজীবীর সংখ্যা চোখে পড়ার মত নগণ্য, যা সাচার কমিটির রিপোর্টে স্পষ্ট হয়। এই সমাজবাস্তবতার কাহিনি আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত।

## মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত দুই-ধরণের মাদ্রাসা দেখা যায়। প্রথমত ধর্মীয় মাদ্রাসা, দ্বিতীয়ত সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা। ধর্মীয় মাদ্রাসা সরকার অনুমোদিত নয়। গ্রামের মসজিদ থেকে আসা ধর্মীয় কর ও বাইরের ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে আসা অর্থের উপর এইসমস্ত মাদ্রাসা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এখানে সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয় আরবি শিক্ষার উপর। অন্যদিকে সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসায় আরবি ভাষার পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুরূপ পাঠক্রমও অনুসরণ করা হয়। আর এইসব মাদ্রাসায় মূলত গ্রামের দরিদ্র ছেলেরাই লেখাপড়া করে থাকে। অবশ্য ধর্মীয় মাদ্রাসাগুলোতে সাধারণত বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত  ছেলেরা পাঠগ্রহণ করে। এর পেছনে অবশ্য একটি বড় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ বর্তমান। এই সমাজে দরিদ্র পিতা-মাতার পক্ষে অনেকগুলো সন্তানের খাবার জোগাড় করা খুব কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাই তারা একটু বড় হলেই ছেলেদের মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে ছেলেরা বিদ্যালাভের পাশাপাশি বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পায়। তাছাড়া শিক্ষালাভের শেষে অনেকে সেই মাদ্রাসায় শিক্ষকপদে যোগ দেওয়ার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গে মসজিদের সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। প্রত্যেক মসজিদে একজন করে মৌলবি নিয়োগ করা হয়, ধর্মীয় মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের মধ্য থেকেই। কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় জলসায় সুবক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়। আবার অনেকে বাড়িতে মক্তব খুলে সামান্য বেতনের বিনিময়ে শিশুদের কোরান পাঠের ব্যাবস্থা করে। এইসমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মাইনে অত্যন্ত কম হলেও, দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারে কোনোরকমে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার একটা পাথেয় হয়ে উঠেছিল এই সমস্ত পেশা।

## মুসলিম সমাজ ও নারীশিক্ষা

আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগেও গ্রামের নিম্নবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরা স্কুল বা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতে পারত না। এর একটি বড় কারণ ছিল মুসলিম সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা। তারা গ্রামের মসজিদে যে মৌলবি থাকে, তার কাছেই আরবি শিক্ষালাভ করত। কেননা সেই সমাজে আরবি ও ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েরা,

পাত্রপক্ষের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুসলিম মেয়েরা মসজিদে বা স্কুলে না গিয়ে, গৃহশিক্ষকের নিকট অন্তঃপুরেই পড়াশোনা করত। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন অন্তঃপুর শিক্ষিতা, প্রগতিশীল লেখিকা বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। স্বামীর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে, ১৯০৯ সালের পয়লা অক্টোবর ভাগলপুরে পাঁচজন ছাত্রীকে নিয়ে তিনি একটি স্কুল শুরু করেন। ১৯১১ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে, মুসলিম মেয়েদের অবরুদ্ধ-অন্ধকারাচ্ছন জীবনকে, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা। সেই সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'পদ্মরাগ'(১৯২৪) উপন্যাসের লেখিকা রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যকর্ম ও জীবনসংগ্রাম নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

একবিংশ শতকে গ্রামে বসবাসকারী মুসলিম ছেলে-মেয়েদের শিক্ষালাভের চিত্র কিন্তু অনেকটায় আলাদা। প্রতিবেশি অমুসলিমদের মত তারাও শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। এস. এস. সি. হওয়ার সুবাদে, বহু মুসলিম দরিদ্র মেধাসম্পন্ন ছেলেরা মাস্টার্স কমপ্লিট করায় আগ্রহী হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আসে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে। বর্তমানে দেখা যায়, সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলোতে ছেলেদের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর হার অনেক বেশি। বোরখা নয়, তারা সালোয়ার কামিজ পরে সাইকেলে বা পায়ে হেঁটে মাদ্রাসা বা স্কুলে যায়। যদিও একথা সত্য যে, আজও বাবা–মা মেয়েদের শিক্ষার পেছনে পর্যাপ্ত পরিমাণ খরচ চালানোয় বিমুখ। মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করার ব্যাপারে আজও অধিকাংশ অভিভাবকের মধ্যে চরম অনীহা লক্ষ্য করা যায়। তাই স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেরা ভালো ও দূরের নামকরা কোন স্কুলে পড়ার সুযোগ পেলেও মেয়েরা কিন্তু এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। যতই উচ্চমেধাসম্পন্ন কন্যা সন্তান হোক না কেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের লেখাপড়া মাঝপথেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'এলাটিং বেলাটিং সই লো...' ছোটগল্পে আফসার আমেদ এই সমাজসত্যের পরিচয় তুলে ধরেছেন। সাধারণত এই সমাজে সপ্তম অষ্টম শ্রেণির পরই শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা কমতে থাকে। বাকিরা কোনোরকমে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। আফসার আমেদ যথার্থই বলেছেন 'এখনও পর্যন্ত মুসলমান

মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি মুসলমানরা দোলাচল। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। যে অংশে ছেলেরা পড়াশোনা করেন তাঁদের ভেতর সমানভাবে মেয়েরা পড়তে আসছেন না। সাধারণত মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়ে ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হয়। যেন অভিভাবকেরা তাদের বিয়ের বয়সটুর অপেক্ষা করেন। উচ্চশিক্ষা তো দূর অস্ত। বাঙালি মধ্যবিত্তের নারীশিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, এখনও।'[৫]

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যাও অবশ্য অনেকটাই কমে যায়। আর্থিক অনটনের জন্য তারা যেকোন উপায়ে অর্থ উপার্জনে বাধ্য হয়। ফলে খুব কম মুসলিম ছেলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। এদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে যারা সরকারী কর্মচারী রূপে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তারা প্রায় সকলেই গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস শুরু করেন। ফলত গ্রামের দরিদ্র, অসহায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সেই তিমিরেই রয়ে যায়। 'মুসলমান সমাজঃ নানাদিক' প্রবন্ধে আফসার আমেদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন-'এটা আশার কথা যে, কিছু মধ্যবিত্ত মুসলমান পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরা কেউ অধ্যাপক, কেউ ব্যাঙ্ককর্মী, শিক্ষক, সরকারি চাকুরিজীবী ইত্যাদি। মুসলমান মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব গড়ে উঠেনি। বিপুল জলরাশির মধ্যে একটু ফেনার মতো যে মুসলমান মধ্যবিত্তের সন্ধান পাওয়া যায় তারও থাকে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব, যাকে আড়ালে থাকতে হয়, তার স্ফূর্তি যেভাবে হবার কথা, তা হয় নি। মধ্যবিত্তের উঁকিঝুঁকি যাঁদের মধ্যে দেখা যায়, মূলস্রোতের বৈশিষ্ঠ্য নিয়ে তেমন প্রকাশ হতে পারেন না। তাঁরা মুসলমান জনগোষ্ঠী থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, তেমনি মূলস্রোত থেকেও।'[৬] বেশকিছু বাঙালি মুসলিম ব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করে আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তাদের সংশ্রব না থাকায়, তারাও মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করার মানসিকতা অর্জন করতে পারেন নি। 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা', 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা', 'আত্মপরিচয়' প্রভৃতি উপন্যাসে আফসার আমেদ এই সমস্যাজনিত জীবনযন্ত্রণার বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ধনী ব্যবসায়ীগণ সমাজের সার্বিক উন্নতির কথা না ভেবে, মোল্লা ও মৌলবিদের সহযোগিতায় ধর্মকে আশ্রয় করে তালাক ও বহুবিবাহের নামে নারীর জীবনকে এক নিরাপত্তাহীন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে তোলায় বেশি তৎপর।

## তালাকের যূপকাষ্ঠে বলি মুসলিম নারীর জীবনযন্ত্রণার কথাকার আফসার আমেদ

ইসলাম ধর্মাবলম্বী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার জন্য ইসলাম ধর্মে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকেই বলে তালাক। আরবি তালাক শব্দের অর্থ হল বাঁধন মুক্ত করা। কিন্তু ইসলামধর্মে তালাককে যতদূর সম্ভব প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামধর্মের প্রচারক ও শেষনবী হজরত মহম্মদ(সাঃ) বলেন, ‘তোমরা বিয়ে করো, কিন্তু তালাক দিও না। কারণ, তালাক দিলে আল্লার আরশ কাঁপে।’[৭] আর একটি বর্ণনায় মহানবী বলেন যে, আল্লাহর সবচেয়ে অপছন্দের বৈধ কাজ হল তালাক। মূলত ইসলাম ধর্মে নারীর সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা অনেক বেশি। এই ধর্মে নারীর সম্মতি ভিন্ন বিবাহ সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে ইসলাম। এমনকি তার স্বাধীনতা আছে অপছন্দের পুরুষকে ডিভোর্স দেওয়ারও। কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজে কোরান-হাদিসের অপব্যাখ্যা করে নারীর এই অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়। এমনকি তিন তালাক ও শরিয়তের নামে সমাজে প্রতিনিয়ত এক চরম অবমাননা ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয় মুসলিম নারীসমাজ।

সমাজের এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে, আমাদের দেশের বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রচলিত তাৎক্ষনিক তিন তালাকের প্রতি সমাজসচেতন লেখক, আফসার আমেদ অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ধর্মের আশ্রয় নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তালাকের নামে নারীকে নানাভাবে অপমান করে। ‘নিকাহ হালালার’ নামে সে ধর্ষিত হয় সমাজের অনুমোদনে। মূলত নারী-অবমাননার একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এই তিন তালাক। যে হাতিয়ারে ক্ষতবিক্ষত হয় নারীর সম্মান, নারীত্ব, মাতৃত্ব এবং জীবনে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। কারণ একজন তালাকপ্রাপ্ত রমণী একই সঙ্গে স্বামী, সন্তান ও তার আশ্রয়টুকুও হারিয়ে ফেলে। অনেক স্বপ্ন, পরিশ্রম ও ভালবাসা দিয়ে গড়ে তোলা স্বামীর সংসার ও সম্পত্তিতে তার আর কোন অধিকারই থাকে না। একজন বিধবার থেকেও তার মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। ১৯৮৬ সালে শাহবানু মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট মুসলিম মহিলাদের একটি আর্থিক নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জীবনকে অনেকটাই সুরক্ষিত করতে পারত। কিন্তু জামাত-ই ইসলামি হিন্দ, ইত্তেহাতুল মুসলেমিন, মুসলিম লিগ, জামিয়াত এ উলমা এ হিন্দ

প্রভৃতি সংগঠনগুলোর বিরোধিতায় এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে, এই রায় শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হতে পারে নি।

মুসলমান সমাজে তালাক সম্পর্কে আবার মুফতিদের নানারকম মতবিরোধ আছে। অনেকে টানা তিন তালাককে বৈধ মনে করেন। আবার অনেকে তাৎক্ষণিক তিন তালাকের বিরোধিতাও করেন। তাঁরা মনে করেন, একসঙ্গে একাধিকবার তালাক উচ্চারণ করলেও সেটাকে একটি মাত্র তালাক রূপে গণ্য করা হবে। তাই এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী যদি মনে করে, তাহলে পুনরায় স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন-যাপন করতে পারে। কিন্তু তারা যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তাহলে পরের মাসে দ্বিতীয় তালাক এবং ইদ্দতকাল পূর্ণ হলে বা তিন থেকে চার মাস পর শেষ তালাকের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি তাদের বিচ্ছিন্ন হতে পারে। মুসলিম সমাজের একজন প্রগতিশীল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিনিধি রূপে আফসার আমেদ, তুলনামূলক ভাবে তালাকের দ্বিতীয় রীতিকে সমাজের পক্ষে 'শুভ ও উপযুক্ত' বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, 'মুসলমান সমাজে এমত বিবাহ বিচ্ছেদ দু ধরণের। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এক, রোষের বশে দুই, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে। যাঁরা রোষের বশে উচ্চারণ করেন তাঁরা ধর্মের এই বিধানের বাধার শিকার হন। ধর্মের এই বিধিই তাঁদের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীটিকে চরম দুর্দশা ও দুরবস্থায় পড়তে হয়। দীর্ঘকাল সংসার করার পর স্বামী ও সন্তানদের ছেড়ে চলে যেতে হয়। স্বামী চাইলেও ফিরে পায় না স্ত্রীকে। এমনকী, স্বামীর কাছ থেকে কোন সাহায্যও পেতে পারবে না। নারীটি সমাজে উচ্ছিষ্টের মতো স্থান পায়। আর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যাঁরা তালাক দেন তাঁদের ক্ষেত্রে ধর্মের এই বিধিবিধান সহায়ক হয়। আসলে তাঁরা ধর্মের এই বিধিকে ঘৃণ্য স্বার্থস্থিতির কাজে লাগান। তাঁরাই একটার পর একটা বিয়ে করেন, তালাক দিয়ে ছেড়ে দেন। সমাজের চোখে তাঁরা অপরাধী, ধর্ম তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করতে পারেন না।'[৮] আফসার আমেদের এই অনুভূতির প্রকাশ ঘটে তাঁর 'ঘরগেরস্তি'(১৯৮২), 'ধানজ্যোৎস্না'(১৯৯৩) বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'(১৯৯৫), 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক'(১৯৯৬), 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'(২০০৩),প্রভৃতি উপন্যাস ও 'নোঙর'(১৯৯২, প্রতিক্ষন) ছোটগল্পে।

## বহুবিবাহের আত্মিকসংকটে দীর্ণ মুসলিম নারীজীবনের কথাকার আফসার আমেদ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহুবিবাহ একটি অন্যতম সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি নির্মূল করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এগিয়ে এসেছিলেন আরও অনেক প্রগতিশীল বিদ্বজ্জনেরা। শেষপর্যন্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুসমাজে আইন করে বহুবিবাহ রোধ করা সম্ভব হলেও নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজে আজও বহুবিবাহের যূপকাস্টে বলি হচ্ছে অসংখ্য মুসলিম নারীর জীবন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মে ইচ্ছেমত বহুবিবাহের সার্বিক অনুমোদন নেই। মূলত সপ্তম শতকে ওহোদের যুদ্ধে বেশকিছু মুসলিম পুরুষসৈন্য নিহত হন। যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই, হিজরি সনের ৪র্থ বছরে অর্থাৎ ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে কোরানের চতুর্থ অধ্যায় ‘সুরা নিসা’র ২-য় অংশে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে, একজন পুরুষকে সামর্থ্য অনুযায়ী অনধিক চারটি বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কোরানের এই মহান উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে, নিজের স্বার্থ ও ভোগ-লালসা পরিতৃপ্তির মানসে, বহুবিবাহে নারীকে করে চলেছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। আফসার আমেদের ‘এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মালু খাঁ মৌলবি এই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাছাড়া তাঁর ‘স্বপ্নসম্ভাষ’১৯৯১), ‘দ্বিতীয় বিবি’(১৯৯৭) প্রভৃতি উপন্যাস এবং ‘জিন্নতবেগমের বিরহমিলন’(১৯৮০,গল্পসংখ্যা পরিচয়), ‘সমুদ্রের নিলয়’(১৯৮৮,শারদীয় পরিচয়), ‘দুই বোন’(১৯৯৪, শারদীয় আজকাল) প্রভৃতি ছোটগল্পের মধ্যে বহুবিবাহে ক্ষতবিক্ষত মুসলিম নারীর জীবনযন্ত্রণার ইতিহাসকে লেখক জীবন্ত করে তুলেছেন।

## বোরখার অবরুদ্ধতায় বিরূপ কথাকার আফসার আমেদ

নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আফসার আমেদ অবরোধ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করেন, নারীশিক্ষার অন্তরায় হয়ে, অবরোধপ্রথা নারীর সার্বিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। বাঙালির সাধারণ পোশাকের পরিবর্তে নারীকে বোরখা পরিধানে বাধ্য করার প্রতিও তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন

লোক'(১৯৯৬), উপন্যাস এবং 'দুই নারী'(১৯৯২, শারদীয় কালান্তর), 'এলাটিং বেলাটিং সই লো...' (২০০৯, শারদীয় বারমাস) প্রভৃতি ছোটগল্পে লেখকের এই মনোভাব প্রকাশিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' উপন্যাসের অংশবিশেষ উল্লেখ্য – 'এমনকী গোটা রেহানা তো বোরখার ভেতর ঢাকা পড়ে আছে। অপ্রকাশ আছে। অপ্রকাশের ভেতরেই প্রকাশমানতা তৈরি করে দেয় বোরখা। কেননা গরিব পাড়া থেকে অনেক বউ-বিটিই রাস্তায় বেরয়, তাদের মধ্যে একজনই বোরখা পরে। বরং আরো জাঁকালোভাবে সে চোখে পড়ে। বোরখার রং আর হাঁটাচলার ধরণ দিয়ে মিলিয়ে নিতে হয়। যেহেতু দেখা যায় না, তাই কল্পনায় দেখা বাড়ে। কল্পনার অবকাশ যেখানে তৈরি হয় সে কল্পনা অনেকদূর পর্যন্ত এগোয়। রেহানা অনেক বেশি রূপসি হয়ে পড়ে বোরখার মধ্যে। অনেক বেশি যৌন-অনুভূতিতে লোভনীয় হয়ে ওঠে।'[৯] যদিও নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মুসলিম নারীসমাজের চিত্রটি একেবারেই আলাদা। আর্থসামাজিক কারণে বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে বোরখা ছাড়াই হাটে-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, স্টেশনে, খেয়াঘাটে চলাফেরা করতে হয়। পর্দা বা অন্তঃপুর ত্যাগ করে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, প্রায় সর্বত্র কাজ করতে বাধ্য হয় সে। ধর্ম বা সমাজ তখন আর তাদের পর্দার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলে না। 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন'(১৯৮০, গল্পসংখ্যা পরিচয়), 'হাসিনার পুরুষ'(১৯৯১, শারদীয় আজকাল) প্রভৃতি ছোটগল্পের মধ্যে আফসার আমেদ সমাজের এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

**সাধারণ মুসলিম সমাজের পীর ও গাজীদের প্রতি অন্ধভক্তির স্বরূপ বর্ণনায় আফসার আমেদ**

আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে বারবার উঠে এসেছে পীর ও গাজীদের প্রতি সাধারণ মুসলিম সমাজের অন্ধভক্তির কথা। 'প্রবাদ-প্রবচনে মুসলমান সমাজচিত্র' প্রবন্ধে তিনি এর কারণ উদ্ঘাটন করে বলেছেন 'বাঙালি মুসলমান মূলত নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মান্তরের ফল। তাঁদের মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি আদব-কায়দা যথাযথ অভ্যাস করানো যায়নি। ধর্মগ্রন্থ বিধৃত ধর্মবিশ্বাসও তাঁরা যথাযথ গ্রহণ করেননি। নিজস্ব লোকজীবন ও মানসের দ্বন্দ্বের জন্যই তা সম্পূর্ণতা পায়নি। পীর আউল যাঁরা ধর্মপ্রচারক তাঁদের ধর্মান্তরিত করেছিলেন, তাঁদের ভেতর অলৌকিক ক্ষমতার সন্ধান তাঁরা করেছিলেন, তাঁরাও অলৌকিকতাকে হাতিয়ার করেছিলেন,

কিন্তু তাঁরা মূলত খাঁটি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছেন।'[১০] আফসার আমেদ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছেন দরিদ্র, অসহায়, অশিক্ষিত মানুষের এই পীর-গাজিদের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের চিত্রটি। অনেকসময় মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার হাত থেকে মুক্তি পেতেও তারা চিকিৎসার পরিবর্তে, পীরের দরগায় মানত করে। যার পরিণতি হয় অনেকসময় মর্মান্তিক। অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে নারীরা যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদের লেখনীতে তা পরিস্ফুট।

তবে একথাও সত্য যে, শহরে গিয়ে ব্যায়বহুল চিকিৎসার খরচ চালাতে গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র মুসলিম জনসমাজই অপারগ। তারা আস্থা রাখে মোল্লা-মৌলবিদের দোয়া, তাবিজ এবং কেরামতির উপর। ফলে তারা মালু খাঁ মৌলবির মত কেরামতিওয়ালা মানুষের দ্বারা কিভাবে প্রতারিত হয়, তার একটি বাস্তবানুগ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' ১৯৯৮) উপন্যাসের মধ্যে। তাছাড়া 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক', 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'(২০০৩), 'ঘরগেরস্তি' প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'গোনাহ'(১৯৮০, পরিচয়), 'দুই নারী', 'দুই বোন' প্রভৃতি ছোটগল্পে সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ মোল্লা-মৌলবির আধিপত্যে নারীর জীবনে নেমে আসা সংকটকে তুলে ধরেছেন। যেখানে ধর্মের আশ্রয়ে তালাক, বহুবিবাহ এবং 'নিকাহহালালাহ'র নামে তাদের দেওয়া বিধান নারীর সম্মান ও স্বপ্নকে বারবার ক্ষতবিক্ষত করে তোলে।

**নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজেরও কথাকার আফসার আমেদ**

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ শুধুমাত্র নিম্নবর্গীয় ও অশিক্ষিত মুসলিম সমজের কথায় বলেন নি, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনালেখ্যও তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজে, বিবিদের অসহায় জীবন-যন্ত্রণাকে। যেখানে ধর্ম নয়, স্বামী-স্ত্রীর রুচিগত পার্থক্য এবং চাওয়া-পাওয়ার ভিন্নতার দরুন সম্পর্কের জটিলতা এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলিম উচ্চবিত্ত পরিবারে বধূ হয়ে আসে মধ্যবিত্ত

পরিবারের সুন্দরী, শিক্ষিতা রমণী। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই স্বামীগৃহে জীবনের সমস্ত স্বাধীনতা হারিয়ে খাঁচায় বন্দী পাখির মত, এক নিরানন্দময় জীবনযাপনে বাধ্য হয়। 'স্বপ্নসম্ভাষ'(১৯৯১), 'আত্মপরিচয়'(১৯৯০), 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'(২০০৩), 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা'(২০১০), 'সানু আলির নিজের জমি'(১৯৮৯) উপন্যাস এই সমাজসাক্ষ্যই বহন করে। আবার 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা'(২০১০) উপন্যাস এবং 'সন্ধ্যাবাসরের কথকতা'(২০০৫, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা) ছোটগল্পে লেখক তালাক নয়, ডিভোর্সের কথা বলেছেন। এখানে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মুসলিম রমণী, যন্ত্রণাময় দাম্পত্য থেকে মুক্তি পেতে, তাদের স্বামীদের ডিভোর্স দিয়ে দেয়।

'প্রেমপত্র'(২০০৩) উপন্যাসে বিধবা যুবতী আনারকলির ধর্মনিষ্ঠা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আড়ালে সুপ্ত শারীরিক ও মানসিক চাহিদাকেও লেখক অস্বীকার করেন নি। তাঁর 'রক্তলজ্জা'(১৯৯১, প্রতিক্ষণ) ছোটগল্পটিও নারীর অবৈধ সম্পর্কের জটিলতায় অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া পাশাপাশি বসবাস তথা একই সঙ্গে পড়াশোনাকালে দুজন নরনারীর মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত হয় জাতিধর্ম নির্বিশেষে। সমস্ত প্রতিকূলতা অস্বীকার করে ভিন্নধর্মের নরনারীর মধ্যে প্রেমঘটিত বিবাহ এবং পরবর্তীতে তাদের জীবনে আসা সমস্যার কাহিনি হল 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাস এবং 'একটি গিটার'(২০০৬, শারদীয় বারমাস) ছোটগল্প।

## ধর্মনির্বিশেষে মানুষের কথাকার আফসার আমেদ

'ভূমিকম্পের আগেও পরে'(২০১৪), 'প্রেমিকা নেই?'(২০০৬) 'খোঁজ'(২০০১),'বাঁচার খোঁজে'(২০১৮), 'একটি মেয়ে'(২০১৪) প্রভৃতি উপন্যাস ও 'একটি রহস্যের সমাধান', 'কারা যেন রঙিন ঘুড়ি ওড়ায় দূর আকাশে'(১৯৯৩), 'ঘরের কথা'(১৯৯৪), 'প্রবাসের রূপক', 'অর্থহীন কথা বলার নির্ভরতা'(১৯৯৮, শারদীয় বর্তমান), 'মেয়ের মা'(১৯৯৯), 'প্রেম'(২০০২,আজকাল), সুখ অসুখ'(২০০৪), 'সাড়ে বারোটায় রান্না শেষ হচ্ছে'(২০০৫), 'সুধা অ্যাপার্টমেন্ট'(২০০৬), 'কল্পভাবনার অধিকার'(২০০৭), 'খুনের অন্দরমহল'(২০০৮), 'কোনোদিন দেখা হয় যদি'(২০০৯), 'খাঁচার পাখি'(২০১০), 'অভিসার'(২০১০), 'অন্ধকার স্টেশন'(২০১০) প্রভৃতি ছোটগল্পে আফসার আমেদ অমুসলিম সমাজের জীবনযন্ত্রণাকে রূপায়িত করেছেন। দাম্পত্য

সংকট থেকে শুরু করে অবসাদগ্রস্ত মানুষের বেদনা, অবৈধ সম্পর্কের জটিলতা, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই প্রভৃতি আধুনিক জীবনের নানা দিক তুলে ধরায় তিনি এক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'পাথর পাথর'(১৯৯০) 'ঘরের কথা'(১৯৯৪) প্রভৃতি ছোটগল্পে, নিষিদ্ধ পল্লীর সমাজ জীবনের বাস্তবতা বর্ণনায় লেখকের অভিজ্ঞতা আমাদের বিস্মিত করে। 'পাথর পাথর'(১৯৯০), 'শীতজাগর'(১৯৯০) প্রভৃতি ছোটগল্পে কলকাতার ফুটপাথের জনজীবনের অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত বর্ণনা পাঠককে একটি ভিন্নজগত সম্পর্কে সচকিত করে। 'অর্থহীন কথা বলার নির্ভরতা' ছোটগল্পের জন্য তিনি ১৯৯৯ সালে কথা পুরস্কার লাভ করেন।

## প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক আফসার আমেদ

গল্প ও উপন্যাস ছাড়াও রয়েছে তাঁর বেশকিছু প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত রচনা, প্রকাশিত ফিচার, প্রকাশিত রিপোর্ট, বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, সমীক্ষা প্রভৃতি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'মুসলমান অন্দরে বিয়ের গীত' নামক একটি প্রবন্ধ। পরবর্তীতে প্রায় সতেরোটি প্রবন্ধের সংকলন 'মুসলমান সমাজঃ নানাদিক' ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হল 'দপ্তরীপাড়ার ডায়েরি'। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য শিশু কিশোর সাহিত্য হল 'বাগনানের ভূত'(১৯৯৫)। তিনি অনুবাদক রূপেও খ্যাতি অর্জন করেন। আব্দুস সামাদের উর্দু ভাষায় লেখা 'দো গজ জমিন' উপন্যাসটি 'সাড়ে তিন হাত ভূমি'(১৯৯৮) নামে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করেন কালিম হাজিক। তাছাড়া তিনি হরি মোটোয়ানির সিন্ধি ভাষায় লেখা উপন্যাস 'আজহো'র অনুবাদ করেছেন 'আশ্রয়'(১৯৯৮) নামে। এই অনুবাদকর্মে তাঁর সহযোগী ছিলেন দুর্গা থাবরানি। এই সমস্ত অনুবাদ সাহিত্যের জন্য ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন।

## 'কিস্‌সা'র কথাকার আফসার আমেদ

মুসলিম সমাজে ধর্মীয় তথা নৈতিক দিক থেকে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য আবহমানকাল থেকেই বিভিন্ন ধরণের কিস্‌সার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এই সমাজের

সমস্ত মানুষের কাছেই এই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষামূলক কিস্‌সাগুলো অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়ে আসছে। কিস্‌সার বিষয় ও চরিত্র সাধারণত মুসলিম ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরান ও হাদিস থেকে গৃহীত। তবে অনেক সময় ধর্ম তথা আদর্শের জন্য আত্মনিবেদিত কোন পীর, ফকির বা দরবেশও চারিত্রিক মহানুভবতার জন্য, অনেক সময় কিস্‌সার চরিত্র হয়ে ওঠেন। তাছাড়া আরবি ও ফারসি লোককাহিনিও এই কিস্‌সার অন্যতম উপাদান। বাংলা সাহিত্যের একটি শাখা হিসেবে আঠারো উনিশ শতকে কিস্‌সা সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে। এই সাহিত্য মূলত মুসলিম ধর্ম, নৈতিকতা, যুদ্ধ, প্রেম ও বীরত্ব নিয়ে মুসলিম লেখকদের সৃষ্টি। যেহেতু 'কিস্‌সাসাহিত্য' মুসলিম ধর্মাশ্রয়ী কাহিনিনির্ভর এবং আরবি, ফারসি ও উর্দু মিশ্রিত ভাষায় রচিত, তাই এই সাহিত্য শাখা উচ্চবর্ণের অমুসলিম সমাজে তেমন আদৃত হয় নি। তবে মুসলিম জনসাধারণের ঘরে ঘরে কিস্‌সা কাহিনি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। অনেক সময় অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ ও দরিদ্র মুসলিমদের জীবনে কিস্‌সার আসর একটা বিনোদনের অঙ্গ হয়ে উঠত। তাই মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম-গঞ্জে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ কিস্‌সা কথকের বেশ চাহিদা ছিল সবসময়। এই প্রসঙ্গে আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বহুলপ্রচলিত কিস্‌সার অন্তর্ভুক্ত হল ইউসুফ-জুলেখা, শিরি-ফারহাদ, লায়লি-মজনু, বনি-ইস্রাইল প্রভৃতি। প্রেম ও নৈতিক কাহিনি ছাড়াও কোরান-হাদিসে বর্ণিত নানান শিক্ষামূলক কাহিনি এবং বিভিন্ন নবি ও পীরের অলৌকিক জীবনের নানান ঘটনাসমূহও একই গোত্রের।

এইসমস্ত 'কিস্‌সাসাহিত্য' উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বটতলা থেকেই প্রকাশিত হত। পুরাণকাহিনি, লোককাহিনি, পাঁচালি ও পঞ্জিকার পাশাপাশি বটতলা প্রকাশনার 'কিস্‌সাসাহিত্য' সাধারণ ও অর্ধশিক্ষিত মুসলিম পাঠকের চাহিদা মেটাত। তবে বটতলার মুদ্রণ ও প্রকাশনা যেমন ধীরে ধীরে নিজের ঐতিহ্য হারিয়ে রুচিসম্পন্ন লেখক, পাঠক ও প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকের উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে, তেমনি 'কিস্‌সা' শব্দটিও তার প্রকৃত অর্থ, আভিজাত্য, গাম্ভীর্য ও মহিমা হারিয়ে, ক্রমে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের কাছে একটি বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল ও নিন্দাপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে যায়। উচ্চবর্ণের অমুসলিম সমাজে, ফারসি 'কিস্‌সা' এবং সংস্কৃত 'কুৎসা' শব্দদুটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিন্দাসূচক 'কেচ্ছা' শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। একসময়

ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও পারবারিক কলহ থেকে সৃষ্ট নানান ধরণের অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, নিন্দাসূচক কেচ্ছার ধারা গ্রামীণ চণ্ডীমণ্ডপে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এইসমস্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আক্রমণাত্মক কলঙ্ককাহিনির অধিকাংশই, নরনারীর অবৈধ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে প্রচারিত হত। অবশ্য গ্রামীণ মুসলিম সমাজে আজও এই ধরণের কেচ্ছার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

ক্রমে গ্রামীণ চণ্ডীমণ্ডপের কেচ্ছার ধারা শহর কলকাতাতেও চলে আসে। এক্ষেত্রে কলকাতার হুজুগপ্রিয় ধনী ও নববাবুরা এই কেচ্ছার কেন্দ্রভূমিতে অন্যতম বিষয় রূপে উঠে আসেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের রচিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'( ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ)। কিন্তু তাঁর নকশায় হুতোমের কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্ষোভ ছিল না। যেহেতু হুতোমের দৃষ্টি ছিল সমাজসংস্কারের দিকে, তাই তিনি কোন একজন ব্যক্তিকে নয়, সামগ্রিক ভাবে সমাজকে আক্রমণ করেছেন তাঁর নকশায়। তাঁর আক্রমণের বাহন হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন তৎকালীন কোলকাতার চলতি গদ্যভাষাকে। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'কেচ্ছা' শব্দটিকে এদিক থেকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে, একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কাহিনি বর্ণনার মাধ্যম করে তোলেন। আর বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যে আফসার আমেদ এই নিন্দাসূচক 'কেচ্ছা' বা 'কিস্‌সা' শব্দটিকে বিকৃতির হাত থেকে মুক্ত করে, তার প্রকৃত অর্থকে পুনরুদ্ধার করেন। পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগত কাহিনি থেকে শুরু করে বাঙালি মুসলিম সমাজের ধর্মান্ধতা, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, প্রেম-কামনা ইত্যাদি সমাজসত্যকে তাঁর 'কিস্‌সা সমগ্রে'র ছয়টি উপন্যাসের মধ্যে একটি স্বতন্দ্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর কিস্‌সার বাহন হয়েছে এই বাঙালি মুসলিম সমাজের চলিত মুখের ভাষা। লেখক আফসার আমেদ যেমন কিস্‌সা শব্দটিকে সনাতনী মর্যাদায় ফিরিয়ে আনেন, তেমনি কিস্‌সার লেখক রূপে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় পরিচিতি লাভ করেন।

বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত আফসার আমেদের ছয়টি উপন্যাসের সংকলন রূপে 'কিস্‌সা সমগ্র' প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে। এই ছয়টি উপন্যাস হল 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'(১৯৯৫) 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক'(১৯৯৬), 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা'(১৯৯৮), 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'(২০০৩), 'হিরে

ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা'(২০০৭), এবং 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা'(২০১০)। এই উপন্যাসগুলোর অবাস্তব কাহিনির অন্তরালে লুকিয়ে আছে মুসলিম নারীজীবনের কঠিন বাস্তবতার কথা। যেখানে তালাক, বহুবিবাহ এবং 'নিকাহ হালালাহ'র নামে পদে পদে ধূলিসাৎ হয় নারীর স্বপ্ন, সম্মান ও নিরাপত্তা। এখানে লেখক 'কিস্‌সা' শব্দটিকে যেমন স্বমহিমায় প্রতিস্থাপন করেছেন কাহিনি অর্থে, তেমনি আখ্যানের বর্ণনা করেছেন এক নতুন পরীক্ষা মূলক পদ্ধতিতে, যা কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদকে এক স্বতন্ত্র মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে লেখকসমাজে। তাঁর কিস্‌সা জুড়ে অসংখ্য পুরুষচরিত্রের ভিড় থাকলেও 'কিস্‌সা' মূলত মুসলিম নারীর অন্তরলীন ব্যথা-বেদনা ও স্বপ্ন-আকাঙ্খার কাহিনি। এই প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন- 'নিশ্চয়ই কিস্‌সা সিরিজের আমার লেখাগুলিতে আখ্যানের নতুন ধরণ আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি। আর এসেছে মুসলমান সমাজ জীবন, যেখানে ধর্মীয়-পরিচয়ও বাদ দেওয়া হয় নি। হয়তো মেয়েদের অসহায়তার দিকগুলি বেশি এসেছে। কেউ কেউ বলেন আমি এখানে ঘোরতর নারীবাদী। ধর্ম সমাজ তো পুরুষতান্ত্রিক, সেখানে অর্ধেক আকাশের কথা যদি বা বেশি করেই এল। তারাও তো আমার জননী-জায়া-কন্যা। ইতিহাস জুড়ে বর্বরতা তো কম হয়নি।'[১১]

আফসার আমেদের লেখার বিষয় পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ। আর কিস্‌সা এই সমাজমানসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ধর্মাবলম্বী বাঙালির মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস, পারলৌকিক ভয়, লোকশ্রুতি, লোককাহিনি এবং জিন-হুরি-পরি সংক্রান্ত অলৌকিক ধর্মাশ্রয়ী ধারণা ও কাহিনি প্রচলিত, তা তারা সত্যি বলেই বিশ্বাস করে। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনকে তারা এই সমস্ত বিশ্বাস ও ধারণা দ্বারা অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি কুরআন ও হাদিসের বহু ইতিহাস ও কাহিনি-কিস্‌সা থেকে তারা আবার জীবনযাপনের উপযোগী জ্ঞান ও উপদেশও গ্রহণ করে। ফলে অনেকসময় সহজ-সরল মানুষদের জীবন পরিচালনার পথ ও পদ্ধতি হয়ে ওঠে এই সমস্ত ধর্মাশ্রয়ী কিস্‌সা। আজন্মলালিত কাহিনিগুলো সর্বশ্রেণির মানুষকেই এমনভাবে ভয়গ্রস্ত করে তোলে যে, অনেকসময় তারা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকেও উপেক্ষা করে, বিকৃত ও প্রচলিত কাহিনিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে ফেলে। আর কিছু কামুক ও অসাধু ধর্মব্যবসায়ী সাধারণ মানুষের এই অন্ধবিশ্বাস ও ভয়কে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। তারা নিজেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী

হিসেবে জনসাধারণের কাছে প্রচার চালায় এবং শেষপর্যন্ত সফল হয়। 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা'য় আফসার আমেদ এই সমাজ সত্যকেই তুলে ধরেছেন।

তাছাড়া বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষেরা কোনো একসময় পারিবারিক, সামাজিক বা নরনারীর অবৈধ সম্পর্কজনিত সমস্যার বিচার বা সালিশের জন্য আদালতে না গিয়ে, গ্রামের পঞ্চায়েতের বিচার বা সালিশের উপর বেশি নির্ভর করতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রামাঞ্চলের মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আজও এই বিচার সভা প্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে যাঁরা বিচার বা সালিশ করেন, তাঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে না পারলে, প্রচলিত কোনো না কোনো কিস্‌সার প্রেক্ষাপটে নিজেদের রায় দেন। এই বিচার সভায় 'শোলোকী কিস্‌সা' বা 'শ্লোকী কিস্‌সা'ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিচার সভায় প্রথমে ধাঁধার আকারে একটি শ্লোক বলা হয় আর উপযুক্ত কাহিনি দিয়ে সেই ধাঁধার জট ছাড়াতে হয়। কারণ প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্তরালে এক বা একাধিক কাহিনি থাকে। এই কাহিনি সমাজে বাস্তব ঘটনা থেকেও গৃহীত হতে পারে, আবার সমাজে প্রচলিত কিস্‌সার কল্পলোক থেকেও নেওয়া যেতে পারে। আফসার আমেদ এই 'শ্লোকী কিস্‌সা'র প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসে।

যেহেতু আফসার আমেদ এই সমাজের একজন মানুষ, তাই তিনি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, বিভিন্ন উপন্যাসে সমাজে প্রচলিত বাস্তব-অবাস্তব কাহিনির অবতারণা করে, সেই সমাজবাস্তবতাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিপুণ ভাবে। তিনি কিস্‌সার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলোর রহস্যময় আচরণে নানান বিভ্রম রচনা করেছেন, মিথ্যাচার দেখিয়েছেন। অথচ তিনি সেই মিথ্যাচার ও বিভ্রমের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মানবচরিত্রের চরম সত্যটিকে তুলে ধরেছেন সুনিপুণভাবে। সমগ্র কিস্‌সা জুড়ে নানান অলৌকিক ও অবাস্তব ঘটনা সন্নিবেশের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে লেখকের সমাজসচেতনতা ও জীবনের সমগ্রতাবোধ। এই প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন 'কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাসগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের সত্য অনেক কিছুতেই আছে, কিন্তু সত্যের আধার করেছি বেশি। যা প্রকাশ করছি অতিকল্পনা, উদ্ভটত্ব, কৌতুক, শ্লেষ—তার ভেতর দিয়ে এক সাহিত্যিক সত্যে পৌঁছোতে চেয়েছি। সেই সত্য হয়তো বা প্রত্যক্ষ সত্যের চেয়ে আরও

বেশি তীব্র, আরও বেশি মর্মভেদী—আমার স্বাধীন লীলা হয়ে উঠতে পেরেছিল কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাসগুলি। এত স্বাধীন অন্য উপন্যাসের ভিতর হইনি। এই সিরিজের লেখাগুলির আনন্দময়তা, ফুর্তি, আমাকে অনুসন্ধিৎসু করেছে অন্য আত্মজিজ্ঞাসায়।'[১২] অথচ লেখক তাঁর স্বাধীন লীলার মধ্যেই তুলে ধরেছেন ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতিকূলতায় বন্দী পরাধীন মানুষের আর্তনাদকে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মবিধানের বেড়াজালে বন্দিনী নারীর মানসিক যন্ত্রণাকে। পাশাপাশি লেখক তাঁর কিস্‌সার অন্দরমহলে সমস্ত বর্বরতা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে নারীর একটি প্রতিবাদী সুরেরও মূর্ছনা জাগিয়েছেন। ফলে তাঁর 'কিস্‌সা সমগ্র' বাংলা উপন্যাসের জগতে এক অভিনব সংযোজন রূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায়কে অনুসরণ করে বলা যায় যে, আফসার আমেদের এই ছয়টি কিস্‌সা জুড়ে রয়েছে মুসলিম ধর্মাশ্রয়ী মানুষের কথা, যারা কাজে কর্মে নতুন নতুন পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেও, বিশ্বাস ও অভ্যাসের ব্যাপারে পুরোপুরি ইসলামি ঐতিহ্যে বাঁধা। তিনি কিস্‌সার বিষয় ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এগুলোকে 'বাঙালি মুসলিম জীবনের এক পুরাণ' বলে অভিহিত করেছেন। পরক্ষণেই তিনি আবার পুরাণের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে, কিস্‌সার স্বরূপ বর্ণনায় আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে, আফসার আমেদের 'কিস্‌সা সমগ্র' এর ভূমিকায় বলেছেন, 'এগুলোকে পুরাণ বলাটা হয়তো বাংলা আলোচনার ভাষায় মানানসই কিন্তু এই লেখাগুলির অন্তরস্বভাবের সঙ্গে 'পুরাণ' খাপ খায় না, একমাত্র এই কারণেই যে পুরাণ যতই স্বাধীন কাহিনির সমাহার হোক 'পুরাণ' ঐতিহ্য ('সেকুল্যার') সাহিত্য নয়, পুরোপুরি ধর্মীয় সাহিত্য আর 'কিস্‌সা' পুরোপুরি ঐহিক সাহিত্য। চলাফেরা, কাজকর্ম করে যে-নরনারী বেঁচে বর্তে আছে জীবনের নানা চাহিদা পূরণ অপূরণের মধ্যে, সেই নরনারীই ঐহিক সমস্যার সমাধানে ধর্মাশ্রয়ী কোনো-কোনো ধারণা—জিন, হুরি, পরি সক্রিয় হয়ে উঠেছে, আবার কোনো-কোনো সময় এই ধর্মাশ্রয়ী ধারণাগুলি ঐহিকের সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, সমকালীন বিশ্বের অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যেও, জনজীবনের দৈনন্দিনে ধর্মাশ্রয়ী সংস্কারগুলিকে একসঙ্গে এমনই পরাক্রান্ত, অনতিক্রম্য ও হাস্যকর করে দেওয়া হয়েছে। যেমন আফসার করেছেন বলে তো পড়ি নি। সমকালীনকে চিনে নেওয়া সাহিত্য ও শিল্পরুচির প্রধানতম ও কঠিনতম দায়। তাঁর এই ছয় কিস্‌সায় বিশ্বব্যাপী সমকালীন ধর্মীয়

সাম্প্রদায়িকতাকে আফসার আমেদ কঠিন বাস্তব আর নমনীয়তম নিয়তি বা ইতিহাসকে মানবিক উল্লাসের অট্টহাসিতে গেঁথেছেন।'[১৩] কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ ও তাঁর কিস্‌সা সম্পর্কে এতো উপযুক্ত ও সুন্দর মূল্যায়ন আর কিছু হতে পারে না।

আরবি ও ফারসি কিস্‌সার মতোই আফসার আমেদের কিস্‌সা জুড়েও রয়েছে হাস্যরস ও টানটান উত্তেজনায় ভরপুর প্রেক্ষাপটসমূহ। তবে তাঁর কিস্‌সা কেবলমাত্র কাল্পনিক, জাঁকজমকপূর্ণ, হাস্যরস ও উত্তেজনায় সমৃদ্ধ ঘটনাপরম্পরার বর্ণনা নয়, সমাজবাস্তবতার পাশাপাশি এখানে রয়েছে পাত্রপাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, তাদের চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনা ও প্রেম-বিরহের এক অনবদ্য বিশ্লেষণ, যা তাঁর 'কিস্‌সা সমগ্র'কে করে তুলেছে আধুনিক জীবনযন্ত্রনার এক বাস্তবোচিত আলেখ্য। কিস্‌সার পাত্রপাত্রীরা কেউ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। কিন্তু এই সমস্ত সাধারণ মানুষের সাদামাটা জীবনে অনেক সময় অতর্কিতে যে যন্ত্রণা নেমে আসে, তার সবসময় বাস্তবোচিত ব্যাখ্যা মেলে না। তাদের সাদামাটা জীবনের বর্ণনা লেখক অত্যন্ত সাদামাটা ভাষাতেই দিয়েছেন, 'কিস্‌সার ঘটনাগুলো অনিয়ন্ত্রিত যেন। ঘটনাগুলো ঘটবেই বিনা বাধায়, বিনা আপত্তিতে। জাহানের কিছু করার থাকবে না। একা মেয়েমানুষ, সে কিস্‌সার বিবি হয়ে যেতে পারবে শুধু। যে কিস্‌সার বিবি পুরুষগুলোর কামনার হাতে চলে যায়। তার যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তার তালাক না পাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।'[১৪] তাই কাঙ্ক্ষিত জীবনকে জাহানের মতো নারীরা কল্পনায় খুঁজে পেতে চেষ্টা করে বারবার আর মজমুন বিকল্প কিস্‌সায় যায়। কারণ নারীর শরীরের উপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জোর খাটালেও, তার মন থাকে মুক্ত।

তাছাড়া আরবি ও ফারসি কিস্‌সার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনৈতিক, ষড়যন্ত্রকারী, অসামাজিক ও মূল্যবোধহীন মিথ্যার পরাজয় এবং সত্যের জয় দেখানো হয়। সাধারণ মানুষের জীবনে, বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে সবসময় মিথ্যার পরাজয় ও আদর্শের জয় সম্ভব হয় না। তাই আফসার আমেদের কিস্‌সায় জাহান, রেহেনা, শাহনাজ, শাবানা, পারভিন ও রওশনেশাদের নীতিহীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লোভ, লালসা, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতার কাছে বারবার হেরে যেতে হয়। আর এখানেই তাঁর 'কিস্‌সা সমগ্র' নিয়তিতাড়িত আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণার আলেখ্য হয়ে ওঠে। তবে ছয়টি কিস্‌সাকে যদি অখণ্ড ধরে আলোচনা করা যায়, তাহলে

সবগুলো উপন্যাসের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। 'কিস্‌সা সমগ্রের' প্রথম উপন্যাস 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'য় জাহান পাগল স্বামীর সঙ্গে যে ঘর করার স্বপ্ন দেখেছিল, তা এই সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' উপন্যাসের নায়িকা রেহানার জীবনে বাস্তবায়িত হয়। আবার তৃতীয় উপন্যাস 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'য় শফী পাগল না হলেও, মাকে তালাক দিয়ে মেয়েকে বিয়ে করার ব্যবস্থাপনায় সে সমাজের চোখে একজন পাগলেরই নামান্তর। অথচ ধর্মের চোখে শফীর কোনো অপরাধ হয় না, কারণ সে বিবাহিত নতুন স্ত্রী শাহানাজকে সম্ভোগসঙ্গমের আগেই, ধর্মীয় বিধান মেনে কর্মচারীদের সাক্ষী রেখে পরপর তিনটি তালাক দেয়। এই অমানবিক ঘটনা জনসমাজে প্রচলিত অনেক কিস্‌সা-কাহিনিকেও হার মানায়- 'কিন্তু মা ও মেয়ের একই ব্যক্তি স্বামী হয়ে উঠছে, এই ঘটনা সমাজের চোখে খুবই ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য আপাতদৃষ্টিতে, কিন্তু ধর্মের দিক থেকে তার ন্যায্য ও পবিত্র বিধান আছে, তাই এক সংঘর্ষ ঘটবেই। মাকে বিয়ে করার পর মেয়েকে আবার বিয়ে করছে, সমাজমানসের বিরুদ্ধে ধারণা নিয়ে তো আর চললে হবে না, তাকে ধর্মের পথে যেতে হবে।'[১৫] তাই সফী এই সমাজসত্য থেকে নিজেকে চনমনে ও দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখতে মিথ্যে কল্পঘটনায় যায় এবং সেখানে সে নিজেকে একজন সুন্দর, সৎ ধর্মপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরূপে আত্মতুষ্টিতে বিভোর রাখে।

উক্ত তিনটি উপন্যাস জুড়ে চলেছে ধর্মীয় বিধান তালাকের নামে নারীর সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কিস্‌সা। আবার পরবর্তী উপন্যাস 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা'য় মালুর ধর্মব্যবসার পাশাপাশি উঠে এসেছে বহুবিবাহে জর্জরিত নারীর আর্তনাদ। পাশাপাশি এই উপন্যাসে লেখক একজন মুসলিম বিধবা যুবতির জীবনতৃষ্ণা ও কাঙ্ক্ষিত পুনর্বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখার বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এই চারটি উপন্যাসে অপছন্দের পুরুষের সঙ্গে সংসার করার যে যন্ত্রণা নারী পেয়েছে, তা থেকে 'হিরে ও ভিখারিনী সুন্দরী রমণী কিস্‌সা'র রিজি মুক্ত। সে যে ঘোড়ার স্বপ্ন দেখে, তার বাস্তবায়ন ঘটে এই সিরিজের শেষ উপন্যাস 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা'য়। শুধু তাই নয়, এই উপন্যাসে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মজমুন শেষপর্যন্ত নীতিহীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নাগপাশ থেকে ডিভোর্সের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করে। যে নারী সমাজ দিনের পর দিন ধর্মান্ধ পুরুষতান্ত্রিক

সমাজের হাতের পুতুল হয়েছিল, নারীর ধারাবাহিক প্রতিবাদ ও প্রচেষ্টায় সে যেন স্বাধীন হয়। যদিও এই স্বাধীনতা তার জীবনকে পরিতৃপ্তির পরিপূর্ণতা দান করতে পারে না। কারণ দীর্ঘ বারোবছরের প্রেমহীন দাম্পত্যে নাজিমের ক্রমাগত ধর্ষণ, তাচ্ছিল্য, লাথি মেরে গর্ভস্থ সন্তান হত্যা এবং মা হওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, মজমুনের সুন্দর মন ও সুস্থ মানসিকতার মৃত্যু ঘটে। তাই সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি প্রতিরোধস্পৃহায় ও অর্থের অহংকারে, নানারকম বিকল্প কিস্‌সা তৈরি করে, অবদমিত ইচ্ছের বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, যা মোটেই সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। এইভাবে জাহানের যাত্রা যদি মজমুনে গিয়ে শেষ হয়, তাহলে বলতে পারি আফসার আমেদের ‘কিস্‌সা সমগ্র’এর অন্তর্গত ছয়টি কিস্‌সায়, সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, কিস্‌সার স্বরূপ প্রকাশেও সফলতা অর্জন করে, যার অভিনব আখ্যান উপন্যাস সাহিত্যকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে নিঃসন্দেহে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আফসার আমেদ ‘কিস্‌সা সমগ্র’এ শুধুমাত্র নতুন বিষয়কেই অবলম্বন করেন নি, এর কথনতত্ত্বের (Narratology) দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি যেমন তার উপন্যাসগুলোর শিরোনাম তুলনামূলক ভাবে বড় আকারে দিয়েছেন, তেমনি পরিচ্ছদগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রেও তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। শুধুমাত্র একটি-দুটি শব্দ নয়, অনেকক্ষেত্রে বড় বড় একাধিক বাক্য দিয়েও তিনি পরিচ্ছদগুলোর নামকরণ করেছেন। যেমন ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’ উপনাসের চার নম্বর পরিচ্ছদের নাম দিয়েছেন, ‘ওরা ফুলের গন্ধ নিয়ে বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে বসে আছে। যেহেতু বাস্তবসন্ধান তাদের হাতে নেই সেহেতু কিছু বলতে পারে না। বলা তাদের উচিতও হবে না, কেননা তাদের ছেলে পাগল।’ আবার ‘এক বশীকরণ কিস্‌সা’য় তেরো নম্বর পরিচ্ছদের নাম দিয়েছেন, ‘লোকে জানেই না পুরুষের প্রতি তাঁর কামনা-বাসনা, তার মধ্যে মজুদ আছে; দোজবরে তেজবরে টাকওয়ালা আধবুড়োরা তার প্রাণিপ্রার্থী হওয়ার বাসনা করবে কী করে তাহলে?’ তাছাড়া আফসার আমেদের এই কিস্‌সায় মুসলিম ধর্মে তথা সমাজে প্রচলিত নানান পয়গম্বর, পরি, দেও প্রভৃতি অলৌকিক ও আধিভৌতিক কিস্‌সা-কাহিনিকে অনায়াস প্রয়াসে ব্যবহার করেছেন। এইসমস্ত কল্পকাহিনিতে হারিয়ে গিয়ে আফসারের চরিত্ররা কঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ভালো থাকার আরাম খুঁজে নেয়। ধীরে ধীরে এক অলীক

জগত তৈরি করে কেউ কেউ মৃত্যুপরবর্তী জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বাস্তব জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে দূরে থাকে, আবার কেউ আপাতধার্মিকতার অন্তরালে, মানুষের ধর্মীয় ও লোকসমাজে প্রচলিত ভয়কে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। 'কিস্‌সা'য় লেখক একাধারে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সময়কালকে স্পর্শ করেছেন। আফসার আমেদের এই অভিনব বিষয়নির্বাচন ও রচনাশৈলী বাংলা উপন্যাসসাহিত্যকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

এই প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন, 'আখ্যান রচনার প্রসিদ্ধিও ভাঙতে চেয়েছি। চলতি লেখার ধরণ নয়। একেবারে জনমানসের ভেতর থেকে রচিত হবার লক্ষণ থাকবে যে লেখায়, সে লেখা লিখতে চেয়েছি। আমাদের প্রবহমান জীবনের ভিতর স্বতঃস্ফূর্ত যে কাহিনি-কথন আছে, তার ভিতর নিমজ্জিত হতে চেয়েছি। আর স্থানিকতাকে পরিহার করতে চেয়েছি। আঞ্চলিকতার যুগ আর নেই, বিশ্বমানবিকতার সন্ধান চেয়েছি। কী করেছি, সে পাঠকরা বলবেন। আমার কাজ আমি সাধ্যমতো করেছি।'[১৬] লেখকের এই অভিনব প্রচেষ্টা সার্বিক সার্থকতা লাভ করেছে। তাছাড়া 'কিস্‌সা'য় ব্যবহৃত ভাষাশৈলী, সেই জনসমাজকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। এই জনসমাজের একজন রূপে মালু, আশিককে বশীকরণের পদ্ধতি বলে এই ভাষায়, 'ও তোর বশীকরণের পলিতা, চারটে কাগজে বয়ান লিখে দিয়েছি কি না, তাতে আবার তোর নাম, তোর বাপের নাম লিখেছি, আর তোর মাশুকের নাম আর তার মায়ের নাম লিখে দিয়েছি। তারপর প্রেমিকার আঁচলের চারকড়া কাপড় জোগাড় করে, চারটে পলতে বানিয়ে, নতুন আনকোরা একখানা চেরাগে সরষের তেল দিয়ে জ্বালা, চারদিন পর তোর প্রেমিকা এসে যাবে তোর কাছে, বশ হয়ে তোর পায়ে পড়ে যাবে। তবে সাবধান, নিকা করার আগে মাশুকের সাথে সুরতি করার চেষ্টা করবি না, তাহলে পাগল হয়ে যাবি নিশ্চয়।'[১৭] কিংবা 'তালাক দেওয়া বিবিকে নিয়ে ঘর করবি? হারামজাদা, শুয়োর! তোর কবরে আগুন জ্বলবে।' চোখে আগুন ঝরাতে ঝরাতে দোকান থেকে বেরিয়ে যায় কাসেমমিঞা।'[১৮] এইভাবে আফসার আমেদ তাঁর কিস্‌সায় অভিনব আখ্যানসন্ধান করেই শুধু থেমে থাকেন নি, তাকে নতুন শৈলীতে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের এক বৈচিত্র্যময় দিক স্পর্শ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। কিস্‌সার মধ্যে দিয়ে তিনি মুসলিম ধর্ম, সমাজ তথা মুসলিম বিশ্বের বর্ণনায়, সেই জনসমাজের ব্যবহৃত ভাষা প্রয়োগে অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এইসমস্ত কিস্‌সা-কাহিনি, শব্দ বা

ভাষার ব্যবহার অনেকসময়, সবধরণের পাঠকের কাছে অপরিচিত মনে হতেই পারে, সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির কাছে দায়বদ্ধ। এক্ষেত্রে উপন্যাসের প্রকৃত রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে পাঠকের দায়বদ্ধতা থাকে অপরিচিত সমাজজীবনের সার্বিক পরিচয়, রীতিনীতি, ভাষা ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে জানা, যা তাকে এক অনাস্বাদিত জগতে পৌঁছে দেবে, এখানেই 'কিস্‌সা'র কথাকার আফসার আমেদের সার্থকতা।

**গদ্যশিল্পীরূপে কথাকার আফসার আমেদ**

আফসার আমেদের ভাষারীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মুখের ভাষা সমাজ তথা পরিবেশ অনুসারী। এর ফলে চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে বাস্তবানুগ ও জীবন্ত। তাঁর বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পে ব্যবহৃত ভাষা অনেকক্ষেত্রে আপামর জনসাধারণের বোধগম্য না হলেও, সেই সমাজ ও প্রতিবেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত শব্দরূপ, ধ্বনিরূপ ও লোকজ শব্দের উচ্চারণ চরিত্রগুলোর সার্বিক রূপ প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। তিনি এমন কিছু শব্দের ব্যবহার করেছেন, যা কোনো অভিধানে নেই, কিন্তু সেই শব্দের ব্যবহার সেই চরিত্র তথা তার সমাজকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করেছে। যেমন, 'কি কইলে'? তেড়েফুঁড়ে বিছানায় উঠে দাঁড়ায় জরিনা। 'কানের দুটো লুড়লুড়ি আছে তাতেও লোভ'(ঘরগেরস্তি)। লেখক তাঁর কথাসাহিত্যে, মুসলিম সমাজে প্রচলিত বেশকিছু প্রবাদ-প্রবচনকে অমরতা দিয়েছেন, 'মেয়ে বিয়নু জামাইকে দিনু, ব্যাটা বিয়নু বউকে দিনু, আপনি হনু বাঁদি, দুয়ারে বসে কাঁদি'(সানু আলির নিজের জমি), 'যাকে দেখে করি ডর, সে হয় বিয়ের বর'(আদিম), 'স্বামীর থাকে তো আঁচলে বেঁধে খাই' (আদিম), 'ভাতারের নাম জানি নি ওহে বলে ডাকি' (জিন্নতবেগমের বিরহমিলন), 'ভেয়ের ভাত, ভাজের হাত' (হাড়)। তাছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে লেখকের বক্তব্যের স্পষ্টতা একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। যেমন 'কলজেটা হাক হাক করছে', 'রব্বানি ঝোড়ার আড়ালে লুকিয়ে টান মারে ভূষ ভূষ'(ঘরগেরস্তি), 'যা দিকিনি মা লাইলি, তুলে ফ্যাল টক টক করে', 'ঘা ঘা করে বেলা যায় গো লাইলির মা'(ডিপটিউবওয়েলের দাম কত?)। চিত্রকল্পের ব্যবহারেও আফসার আমেদের নিজস্বতা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে, 'কাঠফাটা রোদে দুপুরের গরমে বাসের ধকলে এমনিতেই সইফু মরাকাঠের মতো চিমসে মেরে

ছিল'(বিরহ) বা 'শাকুর মোটা ঠোঁট দুটো গোরুর নাদ বেরবার মতো সরে টরে যায়'(ডিপটিউবওয়েলের দাম কত?)। তাছাড়া লেখকের গদ্যশৈলীতে বাক্যের গঠন অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোথাও একটি বাক্যের পরিধি যেমন অনেকটাই বড়, তেমনি আবার কোথাও এক-একটি শব্দই একটি বাক্য হয়ে ওঠে, 'শূন্যতায় আঁধারে সে হাফেজার তিলের স্পর্শ পেতে চায়। কোনো অবয়ব নেই অথচ স্পর্শ পাবার তর্জনী, ইচ্ছায় ঘোরাফেরা করে। এই চোখ। মুখ কপাল। চিবুক। ঠোঁট। ঠোঁট। ঠোঁট। হাত অসাড় হয়ে যায় ঠোঁটে কি না থুতনিতে? স্পর্শ পাওয়া যায় না। হয়তো ঠোঁটেই'(আদিম)। তবে আফসার আমেদের একটি বড় কৃতিত্ব হলো কিস্‌সা শব্দটিকে পুনরুদ্ধার করে কাহিনি অর্থে ব্যবহার করার মধ্যে। তাঁর কলকাতাকেন্দ্রিক উপন্যাসের গদ্যশৈলী আবার আধুনিক মান্য চলিত ভাষা। ভাষাশৈলীতে দক্ষ আফসার আমেদের, গ্রামীণ সমাজ ও নাগরিক সভ্যতার অনুসারী গদ্যের সুনিপুণ ও যথোপযুক্ত ব্যবহার তাঁর কথাসাহিত্যকে করে তুলেছে প্রাঞ্জল ও বাস্তবানুগ।

মুসলিম নারীসমাজের প্রতি লেখকের আন্তরিক সহানুভূতির জায়গা থেকেই আমাদের আলোচ্য 'আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন'। ধর্মের দোহাই দিয়ে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত নারীর অবমাননার ইতিহাস তুলে ধরেছেন অনুভূতিপ্রবন, সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে। তালাক, বহুবিবাহ এবং অবরুদ্ধতার নামে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার জীবনের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। যার ফলস্বরূপ সমাজের সার্বিক বিকাশ হয় বাধাপ্রাপ্ত। এই জনসমাজ মূলত ধর্মের মহান উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে, মনুষ্যত্বকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে চলে। শিক্ষা ও প্রকৃত ধর্মনৈতিক জ্ঞানের অভাবে অপমানিত হয়ে চলে নারীর অস্তিত্ব, নারীত্ব-এই সমাজসত্যই আফসার আমেদের উপন্যাসের মূল উপজীব্য। তাঁর কথাসাহিত্যে বর্ণিত উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের অবস্থানকারী নারীর বৈচিত্র্যময় জীবন সংকটের অনুসন্ধান আমার গবেষণার বিষয়বস্তু।

**উৎসনির্দেশ:**


১. আফসার আমেদ, বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার প্রাপকের প্রতিভাষণ, *গাধা,* আফসারআমেদসংখ্যা, *এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা,* পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৩৪-২৩৫

২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৩৬

৩. শ্যামলকুমার মিত্র, *সাহিত্যিক আফসার আমেদের সঙ্গে কিছুক্ষণ,* সাহিত্যসেবক, শারদ সাহিত্যসেবক-১৪২৫, ১৮ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা, বাগনান, হাওড়া -৭১১৩০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৬

৪. আফসার আমেদ, *গাধা,* আফসারআমেদসংখ্যা, *লিখতে হয়, লিখে যেতেই হয়,* বাণীতবলা উলুবেড়িয়া, হাওড়া ৭১১৩১৬, পৃষ্ঠা- ২২৪

৫. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এখনও তৈরিই হল না,* সুধাংশুশেখর দে, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭

৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৪৪

৭. ইবনে আদীর আলকামিল, *কানজুল ওমমা-ল,* ৯-ম খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৯২

৮. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ,* সুধাংশুশেখর দে, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫৯-৬০

৯. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-১, কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক,* ২০১৬, সুধাংশুশেখর দে, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৫৩

১০. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, প্রবাদ-প্রবচনে মুসলমান সমাজচিত্র,* সুধাংশুশেখর দে, দে’জ পাবলিশিং, আফসার ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৯

১১. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, কিস্‌সাঃ অন্তরালের কথা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, আফসার ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮৯-৯০

১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯২

১৩. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-১, ভূমিকা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১

১৪. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-১, বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১৪

১৫. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-১, মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৮১

১৬. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, কিস্‌সাঃ অন্তরালের কথা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯১

১৭. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-২, এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৪

১৮. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-১, বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬১

# দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

# আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন

# (১৯৮০-১৯৯০)

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবি, নহি সামান্যা নারী,
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি;
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তুমি চিনিতে মোরে।[১]

চিত্রাঙ্গদার এই উক্তির মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রীরই এক চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। নারীর এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে সংসারজীবন স্বর্গীয় প্রেমের মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জীবনে চলার পথে সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক চাহিদার ভিন্নতার দরুন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে বা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে সার্বিকভাবে নষ্ট করে, ফলে তাদের দাম্পত্যজীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। তখন এই অসহনীয়, চরম যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় হল 'তালাক'।

আরবি তালাক শব্দের অর্থ হল বাঁধন মুক্ত করা। ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার জন্য যে ইসলামি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকেই বলে তালাক। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মে তালাককে যতদূর সম্ভব প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ আছে। ইসলাম ধর্মের প্রচারক শেষনবী হজরত মোহাম্মাদ(সাঃ) এই ব্যাপারে বারবার মুসলিম সমাজকে সাবধান করেছেন। আরও একটি বর্ণনায় দেখা যায়, মহানবী(সাঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ কাজ হল তালাক।

অথচ আবহমান কাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত মুসলিম সমাজে দেখা যায় তালাক নিয়ে চরম অব্যবস্থা। শরিয়তের বিধিকে অবমাননা করে তালাককে পুরুষসমাজ নারী নির্যাতনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে ক্ষতবিক্ষত করেছে নারীর আত্মা, স্বপ্ন, সম্মান ও নিরাপত্তাকে। পুরুষসমাজ কখনো পণের দাবীতে, কখনো একাধিক স্ত্রী পাওয়ার লালসায়, কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধ থেকে শুরু করে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ অজুহাতে ইচ্ছেমত বিবিদের তালাক দিয়ে চলেছে। ফলে তিন তালাক এবং শরিয়ত আইনের নামে মুসলিম সমাজে দেখা যায় নারীর জীবন নিয়ে নৃশংস ছেলেখেলা। ধর্মের দোহাই দিয়ে তালাকপ্রাপ্ত নারীদের 'নিকাহ হালালার' নামে অনেকসময় ঘৃণ্য যৌনতাই লিপ্ত হতেও বাধ্য করা হয়।

ভারতীয় মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে যে, শরিয়ত অনুসারে কোন নারীকে তিন তালাক দিলেই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। এক্ষেত্রে পূর্ব স্বামীর সঙ্গে পুনরায় সংসার করতে চাইলে, তালাকপ্রাপ্ত নারীকে অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে হয়। তার দ্বিতীয় স্বামী যদি মারা যান বা তালাক দেন, তবেই সে তার পূর্ব স্বামীকে বিয়ে করার অধিকার লাভ করে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে অবশ্যই তাকে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই প্রথাটি 'নিকাহ হালালাহ' নামে পরিচিত। সমাজে এই প্রথার আড়ালে নারী অবাধে ধর্ষিত হয়। কিন্তু নিকাহ হালালাহ ইসলাম ধর্মে একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে 'ইসলাম অফ ইন্ডিয়ার' প্রধান মৌলানা মাকসুদ উল কাসমি বলেন, 'এটা এক ধরনের লালসা। ...ইসলামে এসবের কোন জায়গা নেই। ধর্মের নামে এগুলি চরম অপরাধ হচ্ছে সমাজে।'[২] এমনকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনার দাবীও তুলেছেন তিনি।

ইবনে ওমর বলেছেন 'হালালাহকারী ও যার জন্য হালালাহ করা হয় এবং হালালাকৃত নারী সবার উপরে আল্লার লানত ও অভিসম্পাত।'[৩]

ভারতীয় মৌলবাদী রক্ষণশীলদের যুক্তিতে আজও মুসলিম সমাজে মৌখিক তিন তালাক ও 'নিকাহ হালালা' সমানভাবে প্রচলিত। অথচ আমাদের প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্থান, বাংলাদেশ থেকে শুরু করে মরক্কো, ইয়েমেন, তুরস্ক, মালদ্বীপ, ইরাক প্রভৃতি অনেক দেশেই তালাক ও বহুবিবাহের ক্ষেত্রে শরিয়তি আইনকে মানবতার খাতিরে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আয়ুব খানের সময় পাকিস্থানে মুসলিম পারিবারিক আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে, মৌখিক তালাককে গ্রাহ্য করা হয় না। স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে তালাক পেতে চেয়ারম্যানকে একটি নোটিশ করতে হয়। সেখানকার প্রশাসন প্রথমত এই তালাক আটকানোর চেষ্টা করে। প্রশাসনের এই ইতিবাচক চেষ্টা ব্যর্থ হলে, নোটিশ পাঠানোর নব্বইদিন পর অর্থাৎ তিনমাস(ইদ্দতকাল) পর, এই তালাক কার্যকর হয়। বাংলাদেশেও এই একই আইন প্রচলিত।

অন্যদিকে ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশে মুসলিম নারীরা মৌখিক তিন তালাকের যূপকাষ্ঠে আজও সমানভাবে বলি হয়। কখন পণের দাবিতে, পছন্দ না হওয়ার অজুহাতে বা নিজের ভোগবাসনা পূরণের জন্য এই সমাজের কামুক, স্বার্থান্ধ ক্ষমতাশালী পুরুষেরা, ধর্মের আশ্রয়ে খুব সহজেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে। অনেক সময় সন্তানধারণে সক্ষম কিনা, সেই পরীক্ষা না করেই বন্ধ্যা অপবাদে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয় বা দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনে। এক্ষেত্রে এই যুক্তিহীন, অমানবিক আচরণের জন্য স্বামীকে সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্মগুরুর কাছে কোনোরকম জবাবদিহি করার প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগত শরিয়তি আইনের আওতায় থেকে প্রশাসনের হাত থেকে সে একেবারেই মুক্ত। অথচ সমাজের এই ভুক্তভোগী, দুর্ভাগ্যপীড়িত ও পদতলে পিষ্ট নারীর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও সম্মান নিয়ে রক্ষণশীল মৌলবাদীরা কোনো কথায় বলেন না। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করেন, তিন তালাক উচ্চারণের রকমফের নিয়ে (তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ—আফসার আমেদ)। অথবা একবারেই তিনতালাক কার্যকর হবে, নাকি ইদ্দতকাল (তিনমাস) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এই নিয়ে তাঁরা তর্ক করেন। এমনকি আমাদের দেশে এই ব্যাপারে কোনো লিখিত আইন

না থাকায়, মৌলবাদীরা সময়, ক্ষেত্র ও ব্যক্তিবিশেষে তালাকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক বদরুজ্জামান চৌধুরীর 'লাখ টাকার মানুষ' গল্পসংকলনের 'নাম' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। যেখানে টাকার বিনিময়ে মৌলবিদের ধর্মের ব্যাখ্যা বিক্রি করার মতো ধর্মবিরোধী ও অমানবিক কার্যকলাপের সামাজিক সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক।

তাছাড়া তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইদ্দতকালের পর খোরপোষ বন্ধ হয়ে যায় শরিয়তি আইন অনুযায়ী। এর ফলে একজন নিঃস্ব, অসহায়, দরিদ্র নারীর পক্ষে বাকী জীবন অতিবাহিত করার বিড়ম্বনা নিয়েও রক্ষণশীল সমাজ নীরব থাকে। মুসলিম সমাজে অনুমোদিত বহুবিবাহ, নারীজীবনের এই বিড়ম্বনার ইতিহাসে, আরও একটি অধ্যায় যোগ করে। ইসলাম ধর্মে বহুবিবাহের অনুমোদন থাকলেও, প্রত্যেক স্ত্রীকে সমান মর্যাদা, অধিকার ও ভালোবাসা দেওয়ারও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। বাস্তবে ইসলামের এই নির্দেশ অমান্য করে, পুরুষস্বামী একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কোনো স্ত্রীর জীবন ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেও, অন্য স্ত্রীদের কপালে জোটে কেবলমাত্র উপেক্ষা ও অবহেলা। আবার অনেক বিত্তশালী পরিবারে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে স্বামীকে খুশি করার এক অমানবিক প্রতিযোগিতাও লক্ষ্য করা যায়। সমাজে সাধারণত বিত্তশালী কামুক, বহুগামী পুরুষেরাই বহুবিবাহে আসক্ত হয়ে থাকে। তবে বংশরক্ষার নামে অনেকসময় নিম্নবিত্ত পরিবারেও বহুবিবাহ দেখা যায়। এক্ষেত্রে তারা একেবারে অল্পবয়সী কিশোরীকে বিবাহ করায় আগ্রহ প্রকাশ করে। একজন বাবার বয়সী পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন-যাপন, সেই কিশোরীর পক্ষে যে কতটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে, সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার দরিদ্র, পশ্চাদপদ, নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজের অনেক পুরুষই, স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে কাজের সন্ধানে শহরে যায় এবং কিছুদিন পর প্রথম স্ত্রী-সন্তানদের ভুলে গিয়ে শহরে বা ভিন্ন রাজ্যে দ্বিতীয় সংসার পাতে। তখন সেই প্রথম স্ত্রী, সন্তানদের মানুষ করে তুলতে কখনো লোকের বাড়ি কাজ করে, কখনো আবার ভিক্ষে করে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজে প্রচলিত এই ব্যাধি বহু নারীর প্রাণসংশয় ঘটায়। ভারতবর্ষে শরিয়তি আইনের দোহাই দিয়ে এই সমস্ত কামুক, বহুগামী পুরুষসমাজ নির্বিঘ্নে নিজেদের লালসা পূরণে সক্ষম হয়।

অনেক মুসলিম বিধবা ও তার সন্তানদের জীবন 'লা-ওয়ারিশ' প্রথায় শ্বশুরবাড়ির সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে, চরম দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়। এই প্রথায়, শরিয়ত অনুযায়ী

শ্বশুরের জীবিত অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে, সেই বিধবা ও তার সন্তানেরা শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক সন্তানহারা পিতা, তার বৌমা ও অনাথ বংশধরদের, মানবিক জ্ঞানে অন্যান্য পুত্রদের সমপরিমাণ সম্পত্তি দিলেও, শরিয়তের দোহায় দিয়ে অনেকেই আবার তাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। এর কুফল ভোগ করতে হয় মূলত সেই বিধবা নারীকেই। সন্তানদের বড় করে তুলতে তাকে অনেক সময় ভিক্ষে পর্যন্ত করতে হয়। পাকিস্থান ও বাংলাদেশে এই প্রথা বাতিল করা হলেও, ভারতবর্ষে অনেকেই এই প্রথার বলি হতে বাধ্য হয়। মুসলিম সমাজে মেয়েদের পৈতৃকসম্পত্তি লাভের ব্যাপারেও সমানাধিকার দেওয়া হয় না। ইসলাম ধর্মে মেয়েদের বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে, মোহরানা লাভের যে বৈধতা দিয়েছে শরিয়ত, তাতেও তার ন্যায্য পাওনা থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বঞ্চিত করে। তাই যেখানে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে একটি বিবাহ সম্পন্ন হয়, সেখানে মোহরানা বাঁধা হয় যৎসামান্য। আজও ভারতবর্ষে হজযাত্রা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে মুসলিম নারীরা নানাভাবে বঞ্চিত। তার এই বঞ্চনার সবথেকে বড় কারণ হল, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অবরোধপ্রথা এবং ধর্মের নামে স্বার্থান্ধ, রক্ষণশীল পুরুষসমাজের, নারীকে বন্দী করে রাখার মানসিকতা।

যদি ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করে দেখা যায়, নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করে এসেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে আরও অনেক প্রগতিশীল মানুষ। ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংক আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। ১৮৫৬ সালে অনেকের বিরোধিতার মধ্যেও হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইন প্রচলিত হয়। অনেক অল্পবয়সী বিধবা সুস্থ ও মানুষের মতো বেঁচে থাকার একটা আইনি বৈধতা লাভ করে। যদিও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ অবাধে এই আইনকে মান্যতা দেয় নি। অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই আইন, বর্তমান সমাজে কিছুটা জায়গা করে নিলেও, অনেক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষ আজও বিধবা-বিবাহকে তেমন সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। ধীরে ধীরে বেশকিছু মহামানবের ছায়াতলে, সংখ্যাগুরু নারীরা শিক্ষার আলো পেতে শুরু করে। নিজের ও সমাজের ভেতরের সমস্ত অন্ধকার দূর করায় প্রয়াসী কিছু কিছু হিন্দু-নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করে। ফলে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় তাদের জীবন-দর্শন, মনন ও চিন্তন। যদিও তাদের এই পথচলা সহজ ছিল না।

তবু এই সমস্ত শিক্ষিত নারীসমাজ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বহু কুপ্রথার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করে। নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য তারা সোচ্চার হয়। শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষের এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালে হিন্দুধর্ম সংস্কার করে 'হিন্দু কোড বিল' বা পূর্ণাঙ্গ হিন্দু পারিবারিক আইন পাশ করা হয়। এই বিলে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করার পাশাপাশি বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাও বলা হয়। পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারের দাবীকেও এই বিলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার ২০০৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনকে সংশোধন করা হয় এবং এই সংশোধিত আইনে মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া হয়

অন্যদিকে সংখ্যালঘু মুসলিম নারীকে এই বহুবিধ বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির ব্যাপার এই দেশের আইনব্যবস্থা তেমনভাবে এগিয়ে আসে নি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের যে পথচলা শুরু হয়, তাতে দেশের শাসকদল 'অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল' এর দোহাই দিয়ে, মুসলিম নারীর নিরাপত্তা ও প্রগতিশীলতার তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। পক্ষান্তরে ধর্মের নামে মুসলিম মেয়েরা আজ পর্যন্ত এই 'অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল' বোর্ডের দ্বারা কোনো না কোনোভাবে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হয়ে আসছে। আধুনিক যুগোপযোগী জীবনযাপনের প্রয়োজনে, ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ ছবি তোলা, সুদ নেওয়া বা দেওয়া সকলের কাছেই আজ প্রশ্নাতীতভাবে মান্যতা লাভ করেছে। পাশাপাশি মুসলিম সমাজে, বিবাহে যৌতুক নেওয়া, পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেওয়া, অনাথের সম্পত্তি গ্রাস করা এবং বৃদ্ধ পিতা-মাতার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মতো শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপেও মুসলিম ধর্ম তথা সমাজ নীরব থাকে। অথচ শরিয়তের অজুহাত দেখিয়ে অমানবিক মৌখিক তিন তালাক ও বহুবিবাহকে পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ আজও লালন করে চলেছে ভারতবর্ষের মত একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। এই ব্যাপারে অবশ্য রাজনৈতিক নেতারাও কম দায়ী নন। ১৯৫৫ সালে হিন্দু পারিবারিক আইনে সংখ্যাগুরু মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হলেও, মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। এমনকি ১৯৭৮ সালে শাহবানু তালাক পাওয়া স্বামীর কাছে, খোরপোশ পাওয়ার যে মামলা করেন, তাতে ১৯৮৫ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জয়লাভ করেন। সুপ্রিম

কোর্টের এই রায় ছিল, একজন মুসলিম তালাকপ্রাপ্ত নারীর, জীবনধারণের পক্ষে একটি অত্যন্ত মানবিক পদক্ষেপ। অনেক শিক্ষিত, প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

এই সমাজের মৌলবাদী রক্ষণশীল পুরুষেরা শরিয়তের নিয়মকানুনের উল্লেখ করে, শাহবানু মামলা রায়ের প্রতিবাদ চালাতে থাকেন। তাঁরা বলেন, ইসলাম ধর্মের নীতি অনুযায়ী একজন তালাকপ্রাপ্ত নারী, স্বামীর কাছ থেকে আজীবন খোরপোশ পেতে পারেন না। ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে, রাজীব সরকার রক্ষণশীলদের দাবী মেনে, লোকসভায় বিল পাশ করেন। সুপ্রিম কোর্টের একটি মানবিক প্রয়াস মৌলবাদী রক্ষণশীল সমাজ ও ভোটের রাজনীতিতে তলিয়ে যায়। ২০১৮ সালে আবার তাৎক্ষণিক তিন তালাককে সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করে। এই রায়কে দেশের অধিকাংশ মানুষ স্বাগত জানালেও, মুসলিম নারীর সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়। সরকার তালাকদানকারী স্বামীকে ফৌজদারী মামলার আওতায় এনে, তিন বছরের জেল ও জরিমানার কথা বলেন। কিন্তু সেই স্বামীর জেলবন্দী অবস্থায় তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যাপারটা অন্ধকারেই থাকে। আবার তিন বছর পর জেলফেরত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক কী হতে পারে, সেটাও এখানে পরিষ্কার নয়। তাছাড়া 'নিকাহ হালাহ'র মতো একটি অমানবিক রীতির ব্যাপারেও এই রায়ে কোনো সুস্পষ্ট উত্তর মেলে না। আফরোজা খাতুনের 'তালাক ও রাজনীতি' প্রবন্ধগ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং মুসলিম নারীর নিরাপত্তা অনেকটাই সেই অন্ধকারেই থেকে যায়।

মুসলিম নারীজীবনের এই নানাবিধ সংকট বহু প্রগতিশীল মানুষ, লেখক ও সমাজসংস্কারককে ব্যথিত ও আলোড়িত করে চলেছে। বেগম রোকেয়া তাদের এই সংকট থেকে রক্ষার জন্য নারীশিক্ষার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি সংগ্রাম করেছেন নানান সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়েও। তাছাড়া আরও যেসমস্ত সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক মুসলিম সমাজ তথা জীবনকে সাহিত্যসৃষ্টির বিষয় রূপে নির্বাচন করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই আফসার আমেদের নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মহাশ্বেতা দেবী (তালাক), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (রস), আবুল বাশার (ফুলবউ, এক টুকরো চিঠি) থেকে শুরু করে আরও অনেকেই মুসলিম নারীর জীবনের

এই চরম সংকটকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তবে আফসার আমেদের অধিকাংশ কথসাহিত্যের কেন্দ্রেই আছে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদ ও অশিক্ষিত মুসলিম সমাজ। যে সমাজে তালাক ও বহুবিবাহের নামে, নারীর জীবনে নেমে আসে এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এই সমাজের কিছু পুরুষ, স্ত্রীদের নিজের খেলনা মনে করে এবং ইচ্ছেমতো তালাক দেয়। শুধু তাই নয়, 'নিকাহ হালালাহ' এর নামে নিজের অন্ধকার মনের যৌনতা পূরণেরও চেষ্টা করে। ফলে বলি হয় নারীর স্বপ্ন, নারীত্ব, সম্মান ও নিরাপত্তা। ধর্মের নামে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে তাকে বারবার ধর্ষিত হতে হয়। শারীরিক এবং মানসিকভাবে সে ক্ষত-বিক্ষত হয় বাস্তবে, এমনকি অবাস্তব কিস্‌সার মধ্যেও শেষপর্যন্ত তার সম্মানহানি ঘটে। দেবেশ রায় আফসার আমেদের এই বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রশংসা করে বলেছেন 'আফসার তাঁর লেখার বিষয় হিসেবে পৌঁছেছেন কিছুটা শহুরে অথচ এখনো গ্রামীন মুসলিম জীবনের দৈনন্দিনে এবং সেই দৈনন্দিন মেলানো জীবনযাপনে সেই দৈনন্দিন ও জীবনযাপন পুরোপুরি মুসলিম। কাজকর্মে নতুন নতুন পেশার সঙ্গে যুক্ত হলেও বিশ্বাস ও অভ্যাসের ব্যাপারে সেই জনসমাজ ইসলামী ঐতিহ্যে বাঁধা।'[৪]

এই সূত্রেই আমাদের আলোচ্য, আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পকে আমরা সময়কাল অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করবো। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য লেখকের ১৯৮০-১৯৯০ কালপর্বের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীজীবনের নানান সমস্যা ও সংকটের কথা। তালাক, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও অসমবিবাহের মধ্য দিয়ে মুসলিম নারীর জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত। ১৯৮০-১৯৯০এর অন্তর্বর্তী সময়ে পশ্চাদপদ, দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলিম সমাজ, আজকের তুলনায় অনেক বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। সেইসময় মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ায় পথ ছিল একেবারেরই সংকীর্ণ। মুসলিম সমাজ এই সময় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও তালাকের মত সামাজিক ব্যাধির শিকার ছিল। আর এই ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের চালিকাশক্তি ছিল রক্ষণশীল মৌলবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। সাচার কমিটির রিপোর্টেও এই সমাজসত্য প্রকাশিত। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এই সমাজের বাস্তবতাকে তাঁর কথাসাহিত্যে নানাভাবে তুলে ধরেছেন, দেখিয়েছেন নারীজীবনের বিপর্যয়কে। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের নারীর অবস্থানগত পার্থক্য নির্দেশ করে দেখিয়েছেন, মুসলিম নারী উভয় সমাজেই বঞ্চিত ও শোষিত।

## দারিদ্র্যপীড়িত নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজ প্রসঙ্গ (১৯৮০-১৯৯০)

আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের কেন্দ্রভুমিতে আছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিচিত্র জীবন তথা মানুষের চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনা, জীবনসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামের কথা। আছে প্রতিকূল পরিবেশ, দারিদ্র্য ও কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সঙ্গে, তাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার কথা। মূলত এই সমস্ত মানুষ লেখকের আবাল্যপরিচিত ও নিজস্ব মুসলিম সমাজ-জীবন থেকে গৃহীত। তাঁর কথাসাহিত্যের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত, দরিদ্র, সংস্কারাছন্ন গ্রামীণ মুসলিম জনজীবন। তাঁর যে সমস্ত উপন্যাসে এই জনজীবন প্রাধান্য পেয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'স্বপ্নসম্ভাষ' ও 'সানু আলির নিজের জমি'।

### ১)স্বপ্নসম্ভাষ

'স্বপ্নসম্ভাষ' আফসার আমেদের দ্বিতীয় উপন্যাস। এটি প্রথমে 'এখানে নয়' নামে, 'বারোমাস' পত্রিকায় ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে দে'জ পাবলিশিং থেকে 'স্বপ্নসম্ভাষ' নামে ১৯৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এর কাহিনি অংশে আছে একটি অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মুসলিম জনজীবনের নানা সমস্যা ও টানাপোড়েনের কথা। আছে স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভাঙার কথা। মুসলিম সমাজে প্রচলিত সমস্ত রকমের তুতো ভাই-বোনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিও লেখক আলোকপাত করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি তালাকের পাশাপাশি 'ছাড়চিঠির' প্রসঙ্গ তুলেছেন। একজন মুসলিম নারী মাতাল, অত্যাচারী স্বামীর অত্যাচার থেকে 'ছাড়চিঠির' মাধ্যমে যন্ত্রণাময় দাম্পত্য থেকে মুক্তি পেতে পারে। তাছাড়া বহুবিবাহের প্রসঙ্গে নারীর পাওয়া, না পাওয়ার বেদনা ও আর্তনাদের কথা যেমন এসেছে, তেমনি আছে সমস্ত অপমান, অবহেলা ও নির্যাতন ভুলে গিয়ে, স্বামীর প্রেমময় আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কথাও।

খালাতোভাই মুনসুরের সঙ্গে, পাঁচ সন্তানের জননী মাঝবয়সী ফিরোজার দাম্পত্যজীবন নানা ঘাতপ্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। সে তার দীর্ঘ সংসার-জীবনের প্রথমদিকে যেমন স্বচ্ছলতা

দেখেছে, তেমনি চরম দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে সমানভাবে। একইভাবে প্রথম যৌবনে মুনসুরের ভালোবাসায় তার নারীজীবন পূর্ণতা লাভ করলেও, একসময় রোগজীর্ণ, কাঠিসার ফিরোজাকে সহ্য করতে হয় মুনসুরের শারীরিক অত্যাচার, অবহেলা ও উপেক্ষা। ভাই ও ছেলের সাহসে ফিরোজাও অবশ্য মুনসুরকে সারাজীবন উপযুক্ত জবাব দিয়েই এসেছে। পরক্ষণেই সমস্ত মান-অভিমান ভুলে আবার তাদের ভালবাসার সন্তান এসেছে ফিরোজার গর্ভে। কোমরের ব্যথায় অস্থির ফিরোজা কখনো মুনসুরের কাছে কোন সহানুভূতি বা সেবা পায় না। চিকিৎসার ব্যাপারে স্বামীর নিঃস্পৃহতায় কোন অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশের অবকাশও তার নেয়। দারিদ্র্যপীড়িত সংসারজীবনে সদাব্যস্ত ফিরোজা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে লেখকের বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা, তার মত নিম্নবর্গীয় নারীর জীবনকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছে- ‘পাতার আগুন পাকানো ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে নিশারের মায়ের। রোগা কাঠিসার শরীরটা পাঁই পাঁই চরকির মতো এদিক সেদিক ঘোরে। এখুনি চুলোর জ্বাল জোগান রেখে উসরায় হামা দেওয়া পায়খানা করা ছেলেটাকে ধুইয়ে দিয়ে হাতমাটি করে, পা দিয়ে নিকিয়ে দিলে জায়গাটা। বাঁ কোলে ছেলেটাকে ধরে তরকারি নাড়ছে। ফের পাতার জালের জোগান দেয়। নুন নেই তো ঘরের ভেতর নুয়ে পড়া অবস্থায় গিয়ে ধাঁ করে ফিরে আসে। দ্রুত নুন চাখে। হাতের ময়লা জিভের ছোঁয়ায় পরিষ্কার হয়ে যায়। তার মধ্যে খোকার মুখে মাইও পুরে দেয়।’[৫]

তবে শাড়ি ও গয়নার অভাবে বোনপোর বিয়েতে যেতে না পারায় তার অভিমান হয়। অথচ সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়া বিবাহযোগ্যা মেয়ে রশিদার বিনা খরচে, এক চাষেখাটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে খুব খুশি হয়ে ওঠে। কন্যাদায় থেকে মুক্তিলাভ করে, ফিরোজা আনন্দে কেঁদে ফেলে। কান্নার সুরে সে রশিদার বিয়ের খবর পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছে দেয়, বোনের প্রশংসা করে বারবার। জামাই-এর চরিত্র বা রশিদার শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। খালাতো ভায়ের বিয়েতে গিয়ে রশিদার এইভাবে বিয়ে হওয়াটা যে নিন্দা ও অসম্মানের, সেই ভাবনা ফিরোজার মতো গরিব মায়েরা ভাবতে পারে না। তাই সমস্ত ভাবনা ও শারীরিক যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আগত নতুন জামায়ের আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থাপনায় সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য এই ব্যাপারে তার ভাই

হবির মেয়ে রহিমা তাকে সহযোগিতা করে। বড় ছেলে নিশারের সঙ্গে রহিমার বিয়ের কথাও ফিরোজা ভায়ের সঙ্গে পাকা করে রেখেছে অনেক আগেই। একজন সুগৃহিণীর মতই ফিরোজা সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করে শাশুড়ি, সন্তান ও স্বামীর প্রতি সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ঐকান্তিক।

তার দাম্পত্যজীবনে ছন্দপতন ঘটে সাজেতের শালি খোদেজার আগমনে। সাজেদের বাড়ি মুনসুর কখনো কাঠচেরাই করে, আবার কখন তার রিক্সা ভাড়া নিয়ে শহরে চালায়। এই সূত্রে রোজ দুবেলা মুনসুরের সাজেতের বাড়ি যাওয়া। তাই মুনসুরের শরীরে অন্য মেয়েমানুষের গন্ধ পেয়ে ফিরোজা প্রথমেই সাজেতের শালিকে সন্দেহ করে। তার এই সন্দেহের সত্যতা প্রকাশ পায় মুনসুরের খোদেজাকে নিয়ে শহরে যাবার খবরে ও তার মাকড়ি চুরির ঘটনায়। খুব সকালে সাজেদের বাড়ি গিয়ে সে অকথ্য গ্রামীণ ভাষায়, উচ্চস্বরে খোদেজাকে গালমন্দ করে। বারবার খোদেজার মৃত্যুকামনা করে। স্বামীকে এই অবৈধ সম্পর্ক থেকে ফিরে পেতে, ভাই হবি ও ছেলে নিশারকে দিয়ে মুনসুরকে শাসন করার চেষ্টা করে। কিন্তু মুনসুর খোদেজার সুঠাম শরীর ও প্রেমের আকর্ষণে শ্রীহীন কাঠিসার ফিরোজাকে অবহেলা করে। সংসার ছেড়ে সাজেদের বাড়ি আশ্রয় নেওয়ার ফিরোজা সমস্ত মনোবল হারিয়ে ফেলে। স্বামী হারানোর যন্ত্রণা ও সতীনের ভাবনায় তার কোমরের যন্ত্রণা ক্রমে মনকেও গ্রাস করে। শেষপর্যন্ত পুত্রবধূ রহিমা ও নিশারের বাবস্থাপনা ও হাসপাতালের চিকিৎসা তাকে সুস্থ করে তুললেও, মুনসুরের ফিরে না আসার বেদনায় সে মাঝে মাঝে আকুল হয়ে থাকে। শেষে এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে তার কান্না বাঁধ ভাঙ্গে। আর সেই রাতেই খোদেজার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত মুনসুরের আগমনে সে সব অভিমান ভুলে যায়। তার ফিরে পাওয়া সৌন্দর্যে মুগ্ধ স্বামীর সঙ্গে নতুন সংসারের সুখস্বপ্নে, সে পরম নির্ভরতাই শহরে যাত্রা করে নববধুর সাজে।

মুনু খোনকারের অত্যাচারে তার তৃতীয় পক্ষের বউ খোদেজা দক্ষিণপাড়া ছেড়ে বড় জামাইদা সাজেত মিঞার বাড়ি আশ্রয় নেয়। মুনসুরের চোখে কৌতূহল অনুভব করে, সে আইবুড়ো মেয়ের অভিনয় করে চলে। আধবুড়ো মুনসুরের সঙ্গে সে একরকম প্রেমের খেলা খেলে এবং মুনুর কাছ থেকে ‘ছাড়চিঠি’ নিয়ে তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনকি মুনসুরের প্রথম সংসার ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সংসার পাতার ব্যবস্থাও সে করে

ফেলে। রিক্সাচালক মুনসুরকে ব্যবহার করে, সে নিজের সাধ, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণে তৎপর থাকে। অল্পবয়সী সুন্দরী খোদেজার জীবনজাপনের চাহিদা তাদের সমাজের অন্যান্য নারীদের তুলনায় স্বতন্ত্র। তার সার্বিক চাহিদা পূরণে মুনসুর ফিরোজার মাকড়ি চুরি করে, বেশি বেশি রিক্সা টানে। মাতাল, অলস অত্যাচারী মুনুর সংসারে বিয়ের দুবছরেও তার কোন সাধই পূর্ণ হয় নি। পাঁচ ছেলের বাবা, আধবুড়ো মুনসুর কিন্তু তার স্বপের পুরুষ নয়। তবে সে তার সাধ পূরণে সচেষ্ট থাকে, শহরে গিয়ে সিনেমা দেখায়, পছন্দমত খাবার ও উপকরণে তাকে মুগ্ধ করে তোলে। খোদেজার স্বপ্ন পূরণে মুনসুর শহরে ঘরভাড়া নেয়, ঘর সাজিয়ে তোলে। সে অবশ্য মুনসুরকে তার প্রেমের সুখস্বপ্নে বিভোর করে তুললেও, কখনই মুনসুরের কাছে সে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে নি। মুনুর স্ত্রী হওয়ার অজুহাতে সে বারবার মুনসুরকে ফিরিয়ে দেয়। এমনকি শহরে নতুন ঘর সাজানোর অজুহাতে সে মুনুর শহরের দোকান ও অবস্থার উন্নতির সত্যতা যাচায় করে আসে। রাতের অন্ধকারে সে সকলের অলক্ষ্যে তার সাধ ও স্বপ্ন পূরণে সক্ষম মুনুর সঙ্গে দক্ষিণপাড়া ফিরে যায়। সেখানে পরের গৃহিণী খোদেজা মুনসুরকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু অবহেলা করে না।

নীতিবোধহীন, ছলনাময়ী খোদেজার মত মেয়েরা নিজের সামান্য সাধ ও স্বপ্নের হাতে বন্দী। তারা প্রয়োজনে অন্যের সংসার ভাঙতে পারে, লোভী পুরুষের চাহিদাকে বাধাও দিতে পারে আবার নিজের সংসারে ফিরেও যেতে পারে। এমনকি ফিরোজার গালমন্দের সময় সে আত্মগোপন করে, আবার উপস্থিত সকলের সামনে মুনসুরের সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্কের কথা ঘোষণা করে। নিজের পবিত্রতা ঘোষণায় ধর্মকে ব্যবহার করে, স্নান সেরে মসজিদে প্রবেশেও সে ভয় পায় না। সেইসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রামে বসবাসকারী তার মত একজন অশিক্ষিত মহিলার এই দুঃসাহস আমাদের বিস্মিত করে তোলে। নিজের ভালোলাগা ও স্বপ্নপূরণের ঐকান্তিকতায় এই অশিক্ষিত নারী প্রয়োজনে ধর্ম, মুনসুর ও মুনুকেও প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তবে তার জীবনের এই সামান্য আকাঙ্ক্ষা পূরণের বাসনা এবং নিজের জন্য বাঁচার সাধ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সহানুভূতির যোগ্য। কারণ পৃথিবীতে সকল মানুষেরই নিজের মতো বাঁচার অধিকার আছে।

সাজেতের বউ নিজের সংসার ও স্বামীকে সুরক্ষিত রাখার তাগিদে বা বোনের সুখের জন্য অন্য কোন নারীর জীবন ও সংসারে অনিষ্ঠ সাধনে পিছপা হয় না। ফিরোজার স্বামী মুনসুরের জীবনে, সে তার আশ্রিতা ছোটবোন খোদেজাকে একরকম ভাবে জুড়ে দিতে চায়। ফিরোজার কটূক্তিতে সে চুপ করে আত্মগোপন করে, কিন্তু ফিরোজার অনুপস্থিতিতে খোদেজার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে, উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকদের নিজের সপক্ষে আনায় সফল হয়। তার যুক্তিতেই খোদেজা মিথ্যাকে সত্যের প্রলেপ দিতে মসজিদে যাওয়ার সাহস পায়। আবার মুনসুর যেন খোদেজার সর্বনাশ না করতে পারে, সেদিকেও তার সজাগ দৃষ্টি। তার সজাগ দৃষ্টিকে সাজেত ও খোদেজাও ভয় করে। মূলত সাজেদের বৌয়ের মধ্য দিয়ে গ্রামের অশিক্ষিত, সংসারী ও বাকপটু সুবিধাবাদী নারীর জীবনের একটি প্রতিফলন ঘটেছে।

রহিমা ও রশিদা দুই বালিকার মধ্য দিয়ে সমাজে প্রচলিত অপরিণত বয়সের বিবাহকে লেখক তুলে ধরেছেন। এই দুই অশিক্ষিত বালিকা বিবাহের মুহূর্তেই যেন সুগৃহিণীতে পরিণত হয়েছে। তাই ফিরোজার অবর্তমানেও পুত্রবধূ রহিমার কর্মদক্ষতায়, পিসির সংসার সুন্দরভাবেই চালিত হয়। তাছাড়া নববধূ রশিদার বাকপটুতাই ফিরোজা নিজেও অবাক না হয়ে পারে না। যে রশিদা কিছুদিন আগে পর্যন্ত দাদির কাছে কাহিনি শোনার বায়না করতো, তার মুখেই আজ শ্বশুর বাড়ির নানান অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনি শোনা যায়। এমনকি মাকে অনুসরণ করে, খোদেজাকে কটূক্তি করার কাজেও সে বেশ পারদর্শী- 'বাপের মাগ হতে মন গেল হ্যালা বেবুশ্যে নাংকন্নি, বিষ খা, জহর খা—ওই কালো মুখ কাউরে দেখাস নি।'[৬] তার বিয়েটাও যে তেমন সম্মানজনক নয়, একথা সে তখন একবারও ভাবে না। লেখাপড়া শিখে কোন বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন তারা দেখার সুযোগও পায় না। তাদের স্বপ্ন স্বামী সন্তান পরিবৃত্ত একটি সংসারমাত্র। স্বামীসন্তানের রিক্সাটানা, কাঠকাটা, চাষেখাটা, ইটভাটায় কাজ করা ছাড়া অন্য কোণ উন্নত জীবিকার কথাও তারা ভাবে না। মূলত রহিমা ও রশিদার পরবর্তী জীবনের প্রতিনিধি হল ফিরোজা এবং ফিরোজার পরবর্তী জীবনের প্রতিনিধি হল মুনসুরের বুড়ি মা। তাদের মধ্য দিয়ে যেন নারীর জীবনের তিনটি পর্যায় ধরা পড়েছে।

মুনসুরের বুড়ি মা নামাজ পড়া, কলমা পাঠ করা, তসবি গননা করা ও নাতিনাতনিদের কাহিনি বলার মধ্যেই নিজেকে কেন্দ্রীভূত রাখে। স্নেহময়ি মায়ের মতই সে একদিকে যেমন

ক্ষুধার্ত মুনসুরের খেয়াল রাখে, তেমনি আবার অন্য কোন নারীর জন্য সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ায় ও বাড়িতে পুলিশ নিয়ে আসায় সেই সন্তানকেই ধিক্কার জানায়। সাধারণত সমাজে দেখা যায়, শাশুড়ি পুত্রের হাজার দোষ থাকলেও পুত্রবধূরই বিরোধিতা করে। কিন্তু অন্যায় কাজের জন্য, নিজের সন্তানের বিরোধিতা করে পুত্রবধূ ফিরোজার প্রতি মুনসুরের মায়ের সহানুভূতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাছাড়া জয়েদের মা, ফেলুর মাগ, আনসুরার মা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অশিক্ষিত নারীসমাজের একটি বাস্তব চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। ফিরোজার উপস্থিতিতে তারাও খোদেজাকে গালমন্দ করে, ফিরোজার সহানুভূতিশীল স্বজন হয়ে তার সেবা করে। কিন্তু ফিরোজার অবর্তমানে তারাই আবার সাজেতের বউ ও খোদেজাকে সমর্থন করে। তাদের মধ্যে 'জয়েদের মা বলে, 'ভাতার যদি তোর বে-কন্টল হয়, তা ভাতারকে আগে বাঁধ, পরের ঘর চড়াও হোস কি করে?'[৭] তবে একথা সত্য যে, এই সমাজের নারীরা সংসারে পুরোপুরি উপেক্ষিত নয়, গৃহিণী রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই মতির মা মাতাল স্বামীকে চোখ রাঙাতে পারে। সাজেত তার বউয়ের সতর্ক দৃষ্টিকে ভয় পায়। মুনু খোনকার খোদেজার মান ভাঙিয়ে আবার সংসারে নিয়ে যায়। মুনসুর আবার সেই ফিরোজার কাছেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

প্রকৃতপক্ষে 'স্বপ্নসম্ভাষ' উপন্যাসের ফিরোজা, খোদেজা, সাজেতের বউ, রহিমা ও রশিদার মধ্য দিয়ে একটি দরিদ্র, পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের নারীজীবনের নানান সমস্যা, স্বপ্ন ও দৈনন্দিনতার প্রতিফলন ঘটেছে। উপযুক্ত ভাষা ব্যবহারে তারা আরও বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংসারের দায়িত্ব পালনে তারা যেমন পারদর্শীতার পরিচয় দিয়েছে, তেমনি স্বামীর অত্যাচার ও কটূক্তির জবাব দানেও তারা দক্ষ। তবে তারা মনের মধ্যে কোন রাগ বা অভিমানও পোষণ করে না। যে স্বামী তাদের চরম অপমান ও অবহেলায় দূরে ঠেলে দেয়, তাদেরও তারা খুব সহজেই ক্ষমা করে দিতে পারে। মর্মান্তিক মানসিক দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা তথা মানসিক সংকটে তারা তেমনভাবে জর্জরিত নয়। সহজ, সরল, সাদাসিধে মাটির কাছাকাছি বসবাসকারী এই সমস্ত নারীর জীবনের স্বপ্ন ও সাধও খুবই সাধারণ। মূল্যবান জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসেব করার মত বোধ ও বুদ্ধির বিকাশ তাদের তেমন ভাবে হয় নি। উন্নততর জীবনযাপন, শিক্ষাদীক্ষা ও জীবিকার স্বপ্ন দেখার জগতে তারা প্রবেশাধিকার পায় নি। এই

সমাজে আবার মাদকাসক্ত পুরুষ ধর্মের অন্য কোন বিধানকে মান্যতা না দিলেও, বহুবিবাহ ও তালাকপ্রথাকে বাস্তবায়িত করায় সচেষ্ট থাকে। বিপর্যস্ত হয় নারীর জীবন ও স্বপ্ন। উপযুক্ত শিক্ষা, ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা এবং মূলস্রোতের সঙ্গে মিলনের মধ্য দিয়েই উক্ত জনজীবনের একমাত্র পরিবর্তন সম্ভব। অবশ্য আলোচ্য উপন্যাসে আফসার আমেদ এর পূর্বাভাস দিয়েছেন, ফিরোজা ও খোদেজার শহরের মূলস্রোতের কাছাকাছি বসবাসের মধ্যে। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে তাদের পরবর্তী বংশধরেরা, এই পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা উপন্যাসের শেষে ধ্বনিত হয়েছে।

## ২) সানু আলির নিজের জমি

আফসার আমেদের প্রথমপর্বের উপন্যাসগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উপন্যাস হল 'সানু আলির নিজের জমি'। এটি ১৯৮৪ সালে 'শারদীয় প্রতিক্ষণে' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৮৯ সালে 'দে'জ পাবলশিং' থেকে এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের কাহিনি অংশে যে নিম্নবর্গীয়, পশ্চাদপদ, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মুসলিম জনজীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাদের প্রধান ধর্ম হল, প্রতিনিয়ত প্রকৃতি, ক্ষুধা এবং অসুস্থতার সঙ্গে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। অধিকাংশ সময় তাদের আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ভাগচাষী। ধানের মরসুম ছাড়া গ্রামের পুরুষেরা শহরে গিয়ে মজুর, জোগানদার এবং মিস্ত্রির কাজ করে। অনেকে আবার রিক্সা বা ভ্যান টানে। আবার অনেকেই গ্রামের মধ্যেই ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে। বেঁচে থাকার এই লড়ায়ে ভূষণবাগদী, নবীনবাগদী, পঞ্চা, নিয়ামত, মোকসেদ, রুস্তম ও সানু একই গোত্রের। নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনে তারা উদাসীন। তারা স্কুল-কলেজের শিক্ষার ব্যাপারেও একেবারেই উদাসীন। তবে এই অশিক্ষিত মাটির সন্তানেরা প্রকৃতির পাঠ, চাষ-বাস, পশুপালন, মৎস্যশিকার এবং শ্রমদানে অনেক বেশি পারদর্শী। জীবনের বৃহত্তর কোন চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন তাদের তাড়িত করে না। ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পীরের মানত শোধ দেওয়া প্রভৃতি আনন্দ-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নারীদের অন্যান্য অনেক ছোটখাট সাধের জিনিস আসে বাড়িতে। কিন্তু এই ক্ষণিক

আনন্দের মধ্যেই চাপা থাকে নারীজীবনের নানা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং জীবন যন্ত্রণার কথা।

খালেকের বউ রহেলার জীবনের স্বপ্ন, তাদের সমাজের অন্যান্য আর পাঁচজন রমণীর মতই অতি সাধারণ, 'চুলোর আগুনের ঝলসানিতে মুড়ি ভেজেই চলেছে কুলো কুলো। ধান মেলছে। কটকট সুপারি কেটে পান খাচ্ছে। দুপুরবেলা রাতেরবেলা অবসরে তেলাই বুনছে। কাঁথা সেলাই করছে। মরদকে ভাত বেড়ে দিচ্ছে থালা ভরে। নিজেও এত খাবে তাই মরদকে আড়াল করে খাচ্ছে। রহেলার মুখে লালা ভরে ওঠে।'[৮] অথচ তিন সন্তানের জননী রহেলাকে দিনের পর দিন প্রায় অনাহারে কাটাতে হয়। ধানের সময় ছাড়া অন্যান্যদের মত খালেকও কাজের জন্য শহরে যায়। কিন্তু সে শহরে গিয়ে সন্তান ও স্ত্রীর কথা ভুলে যাওয়ার মধ্যেই রহেলার ক্ষোভ লুকিয়ে থাকে। একবার খালেক নিঃসম্বল, সন্তানসম্ভবা রহেলা ও সন্তানদের কোনখবর না নিয়ে তিনমাস সাতদিন পর বাড়ি ফেরে। তার এই ক্ষোভ আরও ঘনীভূত হয় খালেকের অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘরে বসে থাকায়। স্বাভাবিকভাবেই সকলের খাবার জোগাড়ে অতিষ্ঠ রহেলা জোর করেই, রোগজীর্ণ খালেককে শহরে পাঠাতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্বামীর প্রতি ভালভাসা ও আশঙ্কায় সে আবার ব্যথিত মনে, বড়পুকুরের ধারে বসে যেন খালেকেরই অপেক্ষা করে। খালেকের অসুস্থতা, দীনতা, কর্মহীনতা এবং দায়িত্বহীনতাকে ঘৃণা করলেও, শহর থেকে ফেরা অসুস্থ স্বামীর সেবায় ও চিকিৎসায় তার তৎপরতাও লক্ষ্য করা যায়। জীবনের এই অভাববোধ থেকেই সানুর সুঠাম ও কর্মঠ শরীর বা মনের মধ্যে, রহেলা তার কাঙ্ক্ষিত স্বামী পুরুষকেই খুঁজে পেতে চায়। এই না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই সানু ও আমেনার প্রেমঘন মুহূর্ত অল্পবয়সী রহেলাকে ব্যথিত করে। আবার জহুরা ও জায়েদের গায়েপড়া দাম্পত্যকেও সে হিংসে করে। তার এই ক্ষুধা ও যন্ত্রণাময় জীবন থেকে রহেলার অল্পবয়সী নারীমন বারবার মুক্তি পেতে চায়লেও, তিনটি সন্তানের জননী রহেলাকে চরম দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও ক্ষুধার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেই যেতে হয়। ছোট দুটি সন্তানের জন্য, বড়ছেলে জাকিরের ছেলেমানুষি, আবদার এবং অভিমানের সঙ্গেও সে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়।

অবশ্য অশিক্ষিত ও দরিদ্র রহেলার আত্মমর্যাদাবোধও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সকলে মিলে উপোষ করে থাকলেও সে বারবার প্রতিবেশীদের কাছে ধারে জিনিস আনতে আপত্তি

করে। সে তার শাশুড়ি আফসন, মনুর বউ বা জহুরার মায়ের মত ভিক্ষে করতে পারে না। মোড়লগিন্নির বাড়ি গিয়ে সরাসরি কাজের কথাও বলতে পারে না। কাজের আশায় সে মোড়লগিন্নির বাড়ির সামনের পুকুরপাড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাক তোলার ভান করে। এমনকি মোড়লগিন্নির কাজের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী না হওয়ার কায়দা করে। আবার কাজ ধরে রাখার জন্য সে কাঁথা সেলাই করে দিয়ে মোড়লগিন্নিকে খুশি রাখার চেষ্টায় থাকে। এছাড়াও তাকে ক্ষুধার অন্ন ও স্বামীর চিকিৎসার জন্য বাধ্য হয়ে মাঠে ধান কুড়োতে হয়। দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারে রহেলা মাত্র পাঁচটি টাকার বিনিময়ে রেশন কার্ড পর্যন্ত বন্ধক রাখে। তবে এই চরম আর্থিক সংকটের মধ্যেও কিন্তু মোকসেদ ব্যাপারির কুনজর থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। 'ঠুনকি'র জ্বরের যন্ত্রণা থেকে কোনোরকম চিকিৎসা ছাড়াই, শুধুমাত্র বড়পুকুরের ঠাণ্ডা জলে স্নান করেই সে আরোগ্য লাভ করে। দারিদ্র্যপীড়িত রহেলার শরীরও যেন সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত। অথচ রহেলা স্বামী বা শাশুড়ির কাছে তেমন কোন সহানুভূতি পায় না। অসুস্থ অবস্থায় দুর্বল, হীনবল খালেক তাকে তোয়াজ করলেও, উপন্যাসের শেষে ধরা পড়ে, তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আর এক বাস্তব চিত্র, 'দূরের বাকুল থেকে খালেকের শব্দ শুনতে পায় সানু স্পষ্ট। খালেক তার বউকে পেটাচ্ছে। তার বউ হাউ মাউ করে কাঁদছে। রহেলা কাঁদছে। দূরের আলো ধরে হাত আর শরীরের ছায়া গাছগাছালিতে উঠে যাচ্ছে।'[৯]

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ রহেলার জীবনের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যপীড়িত সমাজে, নারীর যন্ত্রণাময় জীবনের এক বাস্তবসম্মত চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। যেখানে দারিদ্র্যপীড়িত বাবা-মা, মেয়ের ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই, কন্যাদায় থেকে মুক্তিলাভের জন্য অপরিণত বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। শৈশব হারিয়ে অল্পবয়সে মা হয়ে, সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালনে সে তখন বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে খালেকের মত স্বার্থপর স্বামীর সংসারে এসে, তাদের সুখী দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন গড়ে ওঠার আগেই ভেঙ্গে যায়। একজন পুরুষের বৃদ্ধা অসহায় মা, সংসার, স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধের অভাবেই রহেলার মত নারীর জীবন চরম সংকটের সম্মুখীন হয়।

একই সংকটের সম্মুখীন হতে হয় রহেলার শাশুড়ি বৃদ্ধা আফসনকেও। অল্পবয়সী বিধবা আফসন অন্যের বাড়ি কাজ করে, অনেক কষ্টে একমাত্র সন্তান খালেককে বড় করে। কিন্তু

খালেক বৃদ্ধা অসহায় মায়ের প্রতি সন্তানের কোন দায়িত্বই পালন করে নি। অন্যের বাড়ি কাজ করার শক্তি হারিয়ে আফসন হয় ভিক্ষা করে, না হয় মাঠে ধান কুড়িয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকে। অথচ তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য, খালেকের উপর সে কোন দোষারোপ করে না। এমনকি সন্তানস্নেহে অন্ধ আফসন, অন্যান্য শাশুড়ির মতই খালেকের হয়ে রহেলাকে আক্রমণ করে। একসময় খালেকের রোজগারের পয়সায় যে রহেলা কদমা, আপেল, বেদানা খেয়েছে, সেই খোঁটা দিয়ে আফসন তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ে। নিজের জীবনে সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত আফসন যেন রহেলার প্রতি সহানুভূতি জানাতে ভুলে যায়। সামান্য একটি রুটি চেয়েও যাকে প্রতিবেশীর দ্বার থেকে প্রত্যাখাত হতে হয়, তার মনের সুন্দর অনুভূতিগুলো হারিয়ে যাওয়াই যেন স্বাভাবিক। অবশ্য জাকির প্রভৃতির প্রতি তার অকৃত্রিম স্নেহের মধ্যে ধরা পড়েছে চিরাচরিত এক স্নেহময়ী দাদিমাকে।

কেলো হাজামের বউ অশিক্ষিতা হলেও সংসার অভিজ্ঞতায় বেশ দক্ষ একজন রমণী। রহেলা ও খালেকের দাম্পত্য কলহের ছদ্ম অভিনয় সে খুব সহজেই ধরে ফেলে। কাশ রুগী স্বামী, কেলো হাজামের সর্বসমক্ষে তাকে লাথি মারার প্রতিবাদ করে সে এবং 'বউয়ের প্রতি অন্যায়েই কেলোর এই দুরারোগ্য কাশি তা কেলোর মারমুখী অবস্থায় বউ তাকে সমঝে দেয় বারবার'। মুসলিম সমাজে অনেকসময় বৃদ্ধবয়সে অল্পবয়সী নারীকে বিয়ে করার যে বাস্তবতা দেখা যায়, তা উঠে আসে আফসনের কথার সূত্র ধরে। তবে রহেলা, আফসন এবং খালেক সকলে মিলে যখন বুড়ো, কেশো, কাঠিসার, দরিদ্র কেলো হাজামের, কোন কচি মেয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলে, তখন অপমানিত কেলোর বউ বিষধর সাপের মত ফুঁসে উঠে, এক অত্যন্ত বাস্তবসম্মত সমাজসত্যকে তুলে ধরে, 'এই মাগী জহন্নমেদের বলতে দে, আসুদা করে বলুক—হেগে মুতে জহুন বুড়ো পড়ে থাকবে তহুন সি-মাগী ফিরেই দেখবে নি—দুদিন খেতে না পেলে জুয়ান বউ ভাতারকে বাপ বলে বুকে লাত মেরে পেইলে যাবে।'[১০] স্বামীর সংসারে থেকেও বাঁদিগিরি না করার যে যুক্তি রাহেলা দিয়েছে, তা সমর্থন করে কেলোর বউ। আবার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আক্রান্ত রহেলার জ্বর যে সাধারণ নয়—'ঠুনকির' জ্বর, তাও সে নিমেষেই ধরে ফেলে। সে সস্নেহে রহেলাকে সুস্থ হয়ে ওঠার পথ দেখায় এবং তার চেষ্টায় বড়পুকুরে স্নান করে রহেলার যন্ত্রণা লাঘব হয়। এইভাবে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ব

পালনে, সংসার অভিজ্ঞতায়, অন্যায়ের প্রতিবাদে এবং সামাজিকতাই কেলো হাজামের বউ এর জীবনের ছন্দ এক স্বতন্ত্র মাত্রালাভ করে 'সানু আলির নিজের জমি' উপন্যাসে।

একজন দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী, অশিক্ষিত বাহারণের সংসার সামলানোর দক্ষতা ও পারদর্শিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসারযোগ্য। বাহারণ তার পরিবারের সদস্যদের ক্ষুধা অনুযায়ী নয়, দারিদ্র্যরীতি মেনে, সংখ্যা অনুযায়ী রুটি দেয়। শ্বশুরমশাই বৃদ্ধ সাজ্জাদ মল্লিকের আরও রুটি চাওয়ার আবদারে, সে বাধ্য হয়ে ছায়ার মত নিজেকে আড়াল করে রাখে। আবার একটি রুটির আবদার নিয়ে যখন ক্ষুধার্ত আফসন তার সংসারে আসে, তখন এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে, বাহারণ কোলের ছেলেটির মাথাটা যেন ইচ্ছে করেই দেওয়ালে ঠুকে কাঁদায় এবং মারধোর করে। জোর করে কান্নার এমন একটা দুর্বিষহ পরিবেশ সে রচনা করে, যাতে আফসনকে ফিরিয়ে দেওয়ার একটা অবকাশ তৈরি হয়। ফলে অভাবের সংসারে ক্ষুধার্ত বয়স্ক প্রতিবেশীকে সরাসরি 'না' বলার সংকট থেকে সে মুক্তি লাভ করে। রান্নার শেষে ছোটননদ নাসিমার আগমনে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও বাহ্যিক সুমধুর আচরণে সে অত্যন্ত পারদর্শী। সাজ্জাত মল্লিক মেজ-বউমা খোদেজার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও, বড়-বউমা বাহারণের সেবা ও ব্যবহারে তিনি সন্তুষ্ট। জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব থাকলেও বাহারণ কিন্তু একই কাহিনি দিয়ে বড়পুকুরের মেয়েদের মজলিসকে জমিয়ে রাখতে পারে। আবার হাজিসাহেবের রূপসী পুত্রবধূ সখিনার প্রসবযন্ত্রণায় সমব্যথী হয়ে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনায়, সখিনার চরম জীবনসংকট থেকে মুক্তির পথ সে অনুসন্ধান করে। বিবাহযোগ্যা কন্যা সাহেরার জন্য তার উৎকণ্ঠাও স্বাভাবিক। পাশাপাশি বিবাহযোগ্য পুত্র সানুর বিয়ের ব্যাপারেও সে যথেষ্ট তৎপর। আমেনার প্রতি সানুর দুর্বলতা মায়ের চোখকে হয়তো ফাঁকি দিতে পারেনি। তবু সানুর জন্য তার পছন্দ হল বাংলা ও আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত ভাইঝি কোকিলা। সেই সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষিতে বাহারণের জীবনভাবনা এদিক থেকে অনেকটাই আধুনিক।

বড় জা সঈদা দশ বছরের সংসার জীবনে কাজের দক্ষতায় শ্বশুর বাড়িতে ভালো থাকার জায়গা তৈরি করে নিলেও, ছোট জা মনবোধ তার তিন বছরের সংসারজীবনেই হাঁপিয়ে ওঠে। গরিব ঘরের মেয়ে মনবোধ, কাজের অপটুতার জন্য শাশুড়ির গালাগাল থেকে শুরু করে মার পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। তবে শাশুড়ির শারীরিক অত্যাচারের থেকেও সে বেশি ভয় পায়,

তার বাবা-ভাই এবং বংশ তুলে গালমন্দ করাকে। দরিদ্র বাবা ও ভাইদের প্রতি অত্যন্ত মমতা ও সহানুভূতিতে মনবোধ পরিপূর্ণ। তাই তাদের বিরুদ্ধে যেকোন খারাপ উক্তিই তার কাছে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। সংসারের সমস্ত নিন্দামন্দ, জ্বালাযন্ত্রণা, গঞ্জনা এবং বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে তার মনে বারবার পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে। কিন্তু বাংলাদেশের কতশত মনবোধের মত শান্ত, প্রতিবাদহীন, সুন্দর মনের নারীর জীবন, শ্বশুরবাড়ির অবহেলা, অত্যাচার ও পণের দাবীতে নিরানন্দময় হয়ে ওঠে, তার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান।

আফসার আমেদের বিভিন্ন উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের বর্ণনায় বারবার উঠে আসে পুকুরঘাটের প্রসঙ্গ। যেখানে মেয়েরা স্নান করা, কাপড়কাচা বা বাসন মাজার সূত্র ধরে একত্রিত হয়। গ্রামের নারীদের নানান চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা এবং সুখ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে ওঠে এই ঘাট। বাহারণ, মনবোধ, সঙ্গীদা, তাহের গিন্নি, তাসের গিন্নি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বয়সের নারীদের সমাগমে এবং তাদের অন্তরলীন জীবনযন্ত্রণার প্রকাশে, কখনো আবার সুমধুর আলাপনে, বড় পুকুরের ঘাট লেখক আফসার আমেদের কথায় মাঝে মাঝে যেন কবিতা হয়ে ওঠে।

এই উপন্যাসের নামচরিত্র সানু আলির মনের মানুষ আমেনা। ‘শরীরের সঙ্গে জরানো এক ফালি কানিতে সানু সুন্দর পুরুষ হয়ে’ ওঠে বালিকা আমেনার চোখে। সেজেগুজে সানুর কাছে এসে দাঁড়ালে তার নিজেকে পাখির মত ভারহীন মনে হয়। সানুর প্রতি অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেও সে নিজেকে সংযত রাখে। এমনকি সে তার এই ভালোলাগার কথা সানুর কাছেও গোপন করে। আর পাঁচ জায়গা থেকে তার বিয়ের প্রস্তাব আসার খবর দিয়ে, সানুর কাছে নিজের মূল্য বাড়াতে চায়। ভালোলাগা পুরুষ সানুর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার ছদ্ম অভিনয় করে। মেশিনে একটি আঙুল কাটা, রোগা-কাঠিসার চাচাতো ভাইকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত সে অকপটে সানুকে জানিয়ে দেয়। কারণ তার পছন্দের পুরুষ হল সানুর মতো কর্মঠ সুপুরুষ। মামাতো বোনের সঙ্গে সানুর বিয়ের প্রসঙ্গ তুলেও সে নিজের প্রতি সানুর আকর্ষণের গভীরতা নিরূপণ করে। সে কখনো সানুর হাতের কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে শিশুর মত কেঁদে ফেলে, আবার কখনো তালগাছে সানুকে দেখে বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়। এমনকি এক দুর্বল মুহূর্তে সমস্ত দ্বিধা, লজ্জা, ভয় এবং সামাজিকতাকে অতিক্রম করে সানুর কাছে আত্মসমর্পণ

করার দুঃসাহস দেখায়, 'সানু আর আমেনা খেতের বুকে মিশে গেছে। খেত হয়ে গেছে কখন।'[১১] তবে সানুর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার শক্তি ও সাহসেও আমেনা পারদর্শী। অথচ সেই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক, আমেনার জীবনের ভবিষ্যৎ প্রতিচ্ছবির ইঙ্গিত দিয়েছেন যেন রহেলার জীবনযন্ত্রণা এবং সখিনার অকালমৃত্যুর মধ্যে।

আমেনার চাচাতো বোন নুরি শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে তিনমাস ধরে বাবার বাড়িতেই আছে। শাশুড়ি ও ননদের সঙ্গে ঝগড়ায়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে ভাশুর তার গায়ে হাত তোলে। প্রতিবাদস্বরূপ সে শশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে আসে। তিনমাস পরে হলেও স্বামী রমযানের আগমনে, নুরি সমস্ত মান-অভিমান ত্যাগ করে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বামীর প্রতি তার মনোভাবের তোয়াক্কা না করেই, যখন রমযানের বিরুদ্ধে বিচার সভা ডাকা হয় এবং অপমানিত রমযান তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন বাবা-কাকার প্রতি নুরির প্রচণ্ড অভিমান হয়। যদিও সে সভার মান রাখে কিন্তু সভার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েই ঘরে খিল এঁটে কাঁদে এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার শাসানী দেয়। মূলত মুসলিম সমাজ জীবনে এইভাবে বাবা-মা বা গ্রামের বিচারসভার অকারণ হস্তক্ষেপে নুরির মত অনেক নারীর জীবনে সংকট নেমে আসতে দেখা যায়। অনেক দাম্পত্যজীবন তছনছ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে নিজেদের সম্পর্ককে সুন্দর একটা অবকাশ দেওয়ার যে চেষ্টা তারা করেছিল, তা সভার হস্তক্ষেপে প্রায় নষ্ট হওয়ার পথে। সমস্ত বাধা কাটিয়ে নুরিকে সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রয়াস করেছিল রমযান, তা যে আর নুরির জীবনে আসবে না—তা বলাই বাহুল্য। পরবর্তীতে তার জীবনে নেমে আসতে পারে 'তালাক' বা 'ছাড়চিঠির' মত কঠিন বাস্তব।

সানুর দাদিমা জয়গুণ সাত বছর বয়সে সাজ্জাত মল্লিকের জীবনে আসে। সংসার জীবনে সে যেমন সাজ্জাতের কাছে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও মর্যাদা পায় নি, তেমনি ছেলের সংসারেও সে অনেকটাই ব্রাত্য। মাঝবয়সে তার জীবনে সতীনকে সঙ্গে নিয়ে সংসার করার মতো যন্ত্রণা নেমে আসে। আবার সতীনের অকালমৃত্যুতে তাকেই নিজের সন্তানের পাশাপাশি সতীনের সন্তানদেরও মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হয়। অথচ বিবাহ পরবর্তীকালে সন্তানের উপর বৃদ্ধ মা-বাবার আধিপত্য ও অধিকার অনেকটাই কমে যায়। নিজেদের স্বার্থের জন্য তথা দারিদ্র্যের দরুণ, তারা তাদের মা-বাবার দীর্ঘদিনের দাম্পত্যে একটা ছেদ সৃষ্টি করে। কারণ

অভাবের সংসারে দুই দম্পতিকে সন্তানেরা ভাগাভাগি করে নেয়। কোন একজন তাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে অপারগ। এই প্রসঙ্গে জয়গুণের মন্তব্য অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও মর্মস্পর্শী ‘ব্যাটার ভাতে খাই। ব্যাটা মানুষ করনু মুই আর আজকালের ছুঁড়িরা এসে কেড়ে লিলি। বলেনি মেয়ে বিয়নু জামাইকে দিনু ব্যাটা বিয়নু বউকে দিনু, আপনি হনু বাঁদি দুয়রে বসে কাঁদি, মোর হয়েচে সেই দশা।’[১২] তবে একথা সত্য যে, ইসলাম ধর্মে পিতার চেয়ে মাতার মর্যাদা অনেক বেশি হলেও, বাস্তব সমাজে ছেলে ও বউয়ের সংসারে বৃদ্ধ শশুরের তুলনায়, শাশুড়িরা অনেক বেশি অবহেলিত ও অসম্মানিত।

তবে একথাও সত্য, এই সমাজের সমস্ত নারীর জীবনের ধারা একই পথে চলে না। তাই কালাম হেলোর প্রথম পক্ষের স্ত্রী, বহুদিন শয্যাগত হয়েও কিন্তু অবহেলিত নয়। অভাবের মধ্যেও কালাম তার ওষুধ কেনে। ছেলেমেয়ে দূরে চলে যাওয়ায় কালাম সংসার এবং অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনা করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরে আনে। এখানে চাষের কাজে ব্যস্ত কালামের সংসারে নতুন কচি বউ আশীর্বাদ হয়ে আসে। যদিও বয়স্ক কালামের সংসারজীবনে আসা অল্পবয়সী নতুন বউয়ের জীবনের বঞ্চনার ইতিহাস সহজেই অনুমেয়।

মূলত ‘সানু আলির নিজের জমি’ উপন্যাসে বর্ণিত, সমাজজীবনের প্রধান ধর্ম হল অশিক্ষা, দারিদ্র্য, ক্ষুধা  এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনে তারা ততটা তৎপর নয়, তবে মাঝে মাঝে আল্লাকে স্মরণ করতে তারা ভোলে না। গুলে, জাকির, সাহেরা, নাশিরা ও মাহিলাদের শৈশব কাটে মাঠে, ঘাটে প্রকৃতির পাঠে। তারা কেউ শিক্ষাঙ্গনে যায় না। যাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিনিধি হল রহেলা, বাহারণ, আফসন, জয়গুণ প্রমুখ নারীর জীবন। তবে এই উপন্যাসে বর্ণিত নারীর জীবনে পরিবর্তন আসার একটা ইংগিত পাওয়া যায়, যখন খালেক তার মেয়ের ভদ্রলোকের বাড়ি বিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে। বাহারণ সানুর জন্য শিক্ষিত ভাইজিকে আনার পরিকল্পনা করে। আবার মোড়লবাড়ির কুচি করে শাড়ি পরা ও ব্রাশ করা বউয়ের বর্ণনার অনুষঙ্গে নারীদের জীবনে পরিবর্তনের একটা সূক্ষ্ম ধারা উপন্যাসমধ্যে লক্ষ্যনীয়।

### ৩) আত্মপরিচয়

আফসার আমেদের 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসেও আমরা দারিদ্র্যপীড়িত মুসলিম সমাজের একটি অতিবাস্তব কাহিনিবৃত্ত পায়, যেখানে নারীজীবনের সমস্যা ও সংকটের অভিনব দিকগুলো উঠে এসেছে। হাজিবাড়ির মজুর বিপত্নীক গফুরের দুই বছরের সন্তান নিশারের দায়িত্ব নেয় তার চাচাতো ভাই নিজাম ও মনবোধ ভাবি। এই দুই দম্পতি তাদের অভাবের সংসারে দুটো সন্তানের সঙ্গে নিশারকেও লালন করে। কিন্তু তাদের জীবনে সংকট ঘনিয়ে আসে একটি দুর্ঘটনায়। নিজাম কলকাতায় রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে, ভারা থেকে পড়ে পায়ে আঘাত পেয়ে পাঁচ মাস ঘরে বন্দী। রোজগার একেবারেই বন্ধ। সংসার চালাতে মনবোধ হাজিবাড়িতে কাজ করে, ঝোড়া বোনে, গ্রামের লোকের মুড়ি ভাজে, চাল কুটোয়, কখনো বা লঙ্কা ও হলুদ গুঁড়ো করে। নিত্যদিনের অভাব, দারিদ্র্য, অসুস্থতা এবং কাজের ব্যস্ততায় মনবোধ নিজামের জীবন থেকে যেন দূরে সরতে থাকে। অসহায়, দরিদ্র, অশিক্ষিত মনবোধ স্বামীকে সারিয়ে তুলতে, প্রথম দিকে টাকার অভাবে দোয়া ও তাবিজ করে, পীরের দরগায় মানত করে। এরফলে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে নিজামের পায়ের গ্যাংক্রিনের পচা ঘা, একদিকে যেমন তার শরীরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে, তেমনি তাদের দাম্পত্য জীবনেও পচন শুরু হয় 'নিজামের সঙ্গে তার প্রেম কমে এসেছে, এটাই তার পাপ। নিজামের চোখে মুখে পরিবর্তনে ধরতে পেরেছে। মনবোধের দিক থেকে এই প্রেম শূণ্য হয়ে আসছে। নিজাম এই বোধ পায়।'[১৩] এই সংকটময় পরিস্থিতিতে, নিজামের চিকিৎসা চলাকালীন, পরমাত্মীয় রূপে নিজামের জামাইদা বখতিয়ার মৌলবির আগমনে, নিজামের মত মনবোধও বিশেষ ভরসায় আনন্দিত হয়। তারা ভাবে বাড়িতে আল্লাওয়ালা মৌলবির নামাজ, দোয়া ও কোরান পাঠে তাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা, অসুস্থতা ও অশুভ শক্তির মায়াজাল দূর হয়ে যাবে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই চিকিৎসা ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে নিজাম ক্রমে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। নিজামের স্নেহময়ী বৃদ্ধা মা ও মনবোধের একমাত্র আত্মীয় গফুরই তখন তাদের সহায় হয়ে ওঠে। অনেক কষ্টে টাকা ধার করে গফুর, নিজামকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। কোলকাতার পিজিতে তার একটি পা কেটে বাদ দিয়েও কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজামকে বাঁচানো সম্ভব হয় না।

মুসলিম সমাজের অনেকের মত একসময় মনবোধ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত, আল্লার কালাম পাঠকারী মৌলবির দ্বারা কখনো কোনো পাপ কাজ হতে পারে না। যদি বা তারা কোনো অন্যায় কাজ করেও থাকে, তবে নামাজ ও কোরানপাঠের মধ্য দিয়ে তাদের সব পাপ মুছে যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যা, ধর্মের মুখোশধারী কিছু কিছু ভণ্ডমৌলবি ধর্মবিরোধী অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যারা ধর্মের নামে চাঁদা তোলে, সরল ও অসহায় নারীদের ধর্মের মায়াজালে বন্দী করে অবৈধ যৌনতায় লিপ্ত হওয়ার সুযোগে থাকে। এইরকম একটি বাস্তব সমাজসত্যের অবতারনা করেছেন আফসার আমেদ, এই উপন্যাসের বখতিয়ার মৌলবির মধ্য দিয়ে। যেখানে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে মনবোধ তার একসময়ের কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকপুরুষ, ভণ্ড-নারীলোভী মৌলবির কাছে রাতের অন্ধকারে আত্মসমর্পণ করে। আল্লার শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে, অন্ধভক্তির জায়গা থেকে, মৌলবির স্ত্রী হওয়ার যে স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকে মনবোধ দেখেছিল, তা বখতিয়ারের অসদাচরণে অচিরেই ভেঙ্গে যায়—'নিজাম মরে গেছে আজ সাতাশ দিন। সব কিছু কোথা থেকে কিসব হয়ে গেল। মনবোধ থমকে গেছে। বোধহয় পাথর হয়ে যাবে। কবর দেওয়ার পর থেকে একদিনও আর বখতিয়ার মৌলবি আসে নি। আসলে লোকটা ভুয়ো, জাল, মৌলবির পোশাক পরে থাকে। তার প্রতি অন্যায় করেছে মৌলবি। এ মৌলবির প্রতি তার আর কোন বিশ্বাস নেই। জীবনে মুখ দেখতে না হয় তার। প্রেমহীন ছিল সে। লোকটা ভুল প্রমাণিত হয়।'[১৪]

উপন্যাসের কাহিনি অংশে দেখা যায়, গফুর মালেকাকে সবার অলক্ষ্যে তার বাবার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে, নিজামের মৃত্যুর পরেই বিরামপুর ছেড়ে চলে যায়। হাজিসাহেব ও আলালের শাস্তির ভয়ে নিজামের কাফন-দাফনের পরেই সে হাজিসাহেবের প্রতিপক্ষ, লুথুমোল্লার জমিদারিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে ট্রাক্টরের নেশায় গফুর তার স্ত্রীর মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলে থাকার রসদ পেয়েছিল হাজিবাড়িতে, লুথুর জমিদারিতে সেই ট্র্যাক্টরই চালায় সে। আর অন্যদিকে তার সন্তান নিশারকে নিয়েই, বিধবা মনবোধ গফুরের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করে। অসহায় নিঃসঙ্গ, বিধবা মনবোধের সংসার খরচ আসে গফুরের কাছ থেকেই। মনবোধের একমাত্র ভরসা গফুর। গফুর না থাকলে শাশুড়ির মত তাকেও যে ভিক্ষে করে সংসার চালাতে হত, একথা মনবোধ বোঝে। তবে ভয় ও বৈধব্যজীবনের নিঃসঙ্গতা তাকে

বারবার তাড়িত করে। পরম আকুলতায় সে গফুরের ছেলে নিশারকে আরও কাছে টানে। শেষে শোভানচাচাদের ও বন্ধু জিয়া ব্যাপারির উদ্যোগে গফুর অসহায় বিধবা মনবোধকে বিয়ে করে এক নিশ্চিত ও নিরাপদ আশ্রয় দেয়। মনবোধের কাঙ্ক্ষিত ও পরিপূর্ণ সংসার জীবনে তাদের সন্তানরাও একটি পরিবারের স্নেহচ্ছায়া লাভ করে।

এই উপন্যাসের নিজামের বৃদ্ধা মা অপরিসীম দুঃখকষ্টে দীর্ণ হয়ে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। তাই সে মাঝে মাঝেই মৃত্যুকামনা করে, গফুরকে কেঁদে কেঁদে বলে 'গফুর রে, মোকে ভারত আর ভাল লাগছে নি। এই ভারত থিকে বিদেয় হব কবে? ভারত বিষ হয়ে যেচ্ছে। সত্তি বলচি, তুই মোর ছেলে—ভারত আর ভাল লাগছে নি।' গফুর জানে তার চাচি ভারত মানে এই পৃথিবীটাকেই বলতে চাইছে। আল্লার দুনিয়াটাকে বোঝাতে চাইছে। বাঁচার আর তার সখ নেই। মরে যাবার পর আর একটা দুনিয়া আছে জানে, আর একটা জীবন। আল্লা আছে জানে। তাই এই বেঁচে থাকার কষ্ট হয়। ভাল লাগে না, তবু বেঁচে থাকে।'[১৫] আফসার আমেদের দূরসম্পর্কের বৃদ্ধা নানি আফসনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার প্রাপকের প্রতিভাষণ'এ তিনি আফসন নানি প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সে মাঝে মাঝে কাঁদত আর বলত, 'ভারত ভাল লাগছে না'--- জগৎকে সে 'ভারত' নামেই চিনত।'[১৬] এইরকম অসহায় দরিদ্র বৃদ্ধারা সমাজ ও পরিবারের কাছে বোঝা হতে হতে নিজের কাছেই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। নিজামের অল্পবয়সী বিধবা মা ভিক্ষে করে সন্তানকে বড় করে। কিন্তু বিয়ের পর তার সন্তান পর হয়ে যায়। তাই সন্তান বড়হলেও তার ভিক্ষাবৃত্তি ঘোচে না। বয়সের ভারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তি কমে আসে, চামড়া ঝুলে পড়ে। তার উপর নিজামের মত মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের জন্য কিছু না করতে পারার অসহায়তা তাকে আরও বিচলিত করে তোলে। তাই সে সাধ্যমতো অসুস্থ নিজামের শরীরে হাত বুলিয়ে দেয়, কখনো ছেলেকে পরম মমতায় চালভাজা খেতে দেয়। অবশ্য অন্যান্য অনেক শাশুড়ির মতই সে মনবোধের সঙ্গে ঝগড়াও করে। তবে নিজামের প্রতি তার মাতৃস্নেহ সবসময়ই উজ্জ্বল রেখায় ধরা পড়ে। তাই আমাশাই আক্রান্ত নিজামকে সে রাতের অন্ধকারে একা ছাড়েনা। যে বয়সে তার সন্তানসেবা পাওয়ার কথা, সেই বয়সেও অসুস্থ নিজামের সে খেয়াল রাখে। জামাইকে দেখে মাথায় ঘোমটা দিলেও মমতাময়ী মা নিজের সন্তানের খোঁজ নিতে ভোলে না, তাদের জন্য দোয়া করে। রোজার মাসে এই সহায়

সম্বলহীন, সন্তানহারা বৃদ্ধা অন্যের হয়ে রোজা রাখে। তাতে অন্তত একমাসের জন্য তার থাকা ও খাওয়ার একটি নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়ে যায়। সুতরাং এক ব্যর্থ জীবনের শোকে, তাপে, ক্ষুধায় ও অবহেলায় এই সমস্ত নারীরা যে সচরাচর মৃত্যুই কামনা করে যাবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আফসার আমেদ অত্যন্ত দক্ষতা ও সহানুভূতির সঙ্গে উক্ত উপন্যাসগুলোতে বিভিন্ন বয়সের নারীদের জীবনের নানান সমস্যা ও সংকটকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন।

**তালাক প্রসঙ্গঃ**

**১) ঘরগেরস্তি**

'মুসলমান সমাজঃ নানাদিক' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত 'তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ' নামক প্রবন্ধে আফসার আমেদ দুই ধরনের তালাকের কথা বলেছেন। একটি হল রোষের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান এবং অন্যটি উদ্দ্যেশ্যপ্রণোদিতভাবে। 'ঘরগেরস্তি' উপন্যাসে লেখক এই দুই ধরণের তালাকের বাস্তবায়নে নারীর জীবনযন্ত্রণা ও নিরাপত্তাহীনতাকে সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। যেকোনো তালাকেই নারীর জীবনে এক চরম সংকট নেমে আসে। তবে রোষের বশবর্তী হয়ে তালাক প্রদানে স্বামীর জীবনও একই সংকটের সম্মুখীন হয়। ধর্ম ও সমাজের বাধায় তারা আর পূর্ব দাম্পত্যে সহজে ফিরে যেতে পারে না। দারিদ্র্য-পীড়িত, অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজে সাধারণত এই ধরণের তালাক দেওয়ার ঘটনাই বহুল পরিমাণে ঘটে থাকে।

আফসার আমেদের প্রথম উপন্যাস 'ঘরগেরস্তি' প্রকাশিত হয় 'শারদীয় কালান্তর' পত্রিকায়, ১৯৮১ সালে। এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে, স্বরলিপি প্রকাশনী থেকে। এই উপন্যাসের কাহিনি অংশে আছে একটি অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম জনজীবনের কথা, যাদের মধ্যে অধিকাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। সামাজিক ও ধর্মনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে তাদের তেমন কোন যোগাযোগ নেই। এই সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে হাঁসু মোল্লা, দানু সেখ, রজব আলি, হাজিসাহেব প্রমুখ আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং মোল্লা-মৌলবিগণ। তারা অনেক সময় দরিদ্র, অশিক্ষিত জনসাধারণের

ভাগ্যও নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মের আশ্রয়ে সমাজে প্রচলিত তালাক ও বহুবিবাহের নামে নারীর জীবন, স্বপ্ন এবং অস্তিত্বকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলায় তাদের অবদান যে কম নয়, এই সমাজসত্যই আফসার আমেদ এই উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন।

'ঘরগেরস্তি' উপন্যাসে চার সন্তানের জননী জরিনাকে, তার স্বামী মুন্নাফ রাগের বশবর্তী হয়ে, রাতের অন্ধকারে একসঙ্গে তিনটি তালাক দিয়ে ফেলে। ষোলবছরের সংসার জীবনে জরিনা হাঁস-মুরগি পালন, কাঁথা সেলাই, পুঁই শাক রোপণ ও ধান ভেনে মুন্নাফের হাতে হাত মিলিয়ে, তিলে তিলে সংসার গড়ে তোলে। সাতদিন ও সাতরাতের ব্যথা সহ্য করে সন্তানদের জন্ম দেয়। দাম্পত্য জীবনে সে অবশ্য স্বামীর ভালবাসা ও সহানুভূতি পায় সমানভাবে। অথচ আর্থিক অনটনে জর্জরিত মুন্নাফ যখন জরিনার কাছে, তার অনেক যত্ন করে তুলে রাখা, পাঁচ আনা ওজনের মাকড়িজোড়া বিক্রি করার জন্য চায়, তখনই তাদের দুজনের মধ্যে কথা বাড়ে। একসময় কথার মাঝে ক্ষুব্ধ মুন্নাফ তাকে তালাক দিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে জরিনার জীবনে চরম সংকট নেমে আসে। তার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে ওঠে। স্বামী, সন্তান ও সংসারে তালাকপ্রাপ্ত জরিনার আর কোন অধিকারই থাকে না। তাই সেই রাতেই মুন্নাফের ছোঁয়া ও পাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য, কচি সন্তানকে নিয়ে সে শোবার ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে আশ্রয় নেয়।

মুসলিম সমাজে তালাকপ্রাপ্ত অন্যান্য রমণীর মত জরিনাও, সবকিছু ছেড়ে প্রথমে বাবার বাড়ি চলে যাওয়ায় স্থির করে। দারিদ্র্যপীড়িত মুসলিম সমাজে কোন তালাকপ্রাপ্ত নারীই পিতৃগৃহে সাদরে স্থান পায় না। এই আশংকা জরিনার মনেও আসা স্বাভাবিক। সংসার ও সন্তানের মায়ায় সে ধর্ম ও সমাজকে উপেক্ষা করে মুন্নাফের সংসারেই পড়ে থাকে। জীবনের এই চরম সংকট থেকে মুক্তি পেতে সে বারবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করে। কিন্তু দুধের শিশুর টানে তার সেই চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়ে যায়। এমনকি তালাকের কথা সে সকলের কাছে গোপন করে, যা তাকে অন্যান্য নারীদের তুলনায় স্বতন্ত্র করে তোলে। তার মত অসহায়, দরিদ্র ও অশিক্ষিত রমণীর, ধর্মের ও সমাজের বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করে, স্বামীর সংসারে থাকার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদও লক্ষনীয়, যা সেই সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত অভিনব। এমনকি, অনুতপ্ত মুন্নাফের আহ্বানে জরিনার পূর্ব দাম্পত্যে ফিরে যাওয়াও একভাবে সেই

প্রতিবাদকেই বাস্তবায়িত করে তোলে। আবার তাদের গোপন তালাকের খবর, যখন তার বড়জা, কুদরতের মায়ের কথায় সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়, তখনও সে সমাজের বিচারসভায় মুন্নাফকে অনুসরণ করে। সেও দুটো তালাকের কথা গোপন করে দুঃসাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। যদিও তার এই সত্যকে গোপন করা নিঃসন্দেহে একটি অন্যায় ও গর্হিত কাজ। তবুও এর ফলেই সে ইদ্দতকাল অর্থাৎ চারমাস পর পুনরায় স্বামী ও সন্তান পরিবৃত নিজস্ব সংসারে ফিরে যাওয়ার অনুমোদন লাভ করে। একই সঙ্গে এক চরম জীবন সংকট থেকে মুক্তি পায় জরিনার সন্তানদের জীবন এবং একজন নারীর জীবন।

জরিনার বড়জা কুদরতের মায়ের মধ্য দিয়ে অনান্য সাধারণ দরিদ্র, সুখী পরিবারের মুসলিম নারীর জীবনের একটি স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। সে ছোটজা জরিনার প্রসবযন্ত্রণায় একজন সমব্যথী সঙ্গীরূপে সার্বিক সহযোগিতা করে। ছোটজাকে সঙ্গে নিয়ে 'মাগহারা' জাফরের বউকে রঙ্গ করে দেখতে যায়। অথচ সে-ই আবার ঝগড়ার সময় জরিনার তালাকের কথা প্রকাশ করে বলে 'ব্যাটাখাকি সেই ব্যাটার মাথা খাস – ওগো তুমরা শুন গো দেশে গাঁয়ের মেয়েমদ্দ, মুন্নাফ তার কচি মাগকে তালাক দিয়েছে—তবু মাগ ঘর করচে।'[১৭] বিচারসভায় সে এই বাপারে সাক্ষ্যপ্রদান করে। একজন সংসারী দরিদ্রা গৃহিণীর মতই সে নিজের প্রয়োজন এবং অধিকার সম্বন্ধে একটু বেশিরকমের সচেতন। এমনকি তার সংসারে আশ্রিত শাশুড়িকে কোণঠাসা করে রাখতে পারে সে, যা সমাজ বাস্তবতার পরিচায়ক।

এই উপন্যাসে লেখক উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারে, নারীজীবনের সমস্যা ও সংকটও তুলে ধরেছেন দক্ষতার সঙ্গে। হাঁসুর প্রথম স্ত্রী দশবছরেও সন্তানধারণ করে নি। তাই হাঁসু তাকে পরিকল্পনামাফিক তালাক দেয়। সন্তানহীনা নারীটি হাঁসুর তালাকের পরে বাবার বাড়ি ফিরে যায়। আবার কিছুদিনেই একজন দোজবরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সেই সময়ের অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, একজন অসহায় সন্তানহীনা নারীর জীবনে এই ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। এরপর হিওপ গাঁয়ের ঝিউড়ি গোলেজানকে হাঁসু বিয়ে করে। কিন্ত সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় মরিয়া হাঁসুর দ্বিতীয় স্ত্রী সুন্দরী, ধার্মিক, শান্ত ও মিষ্টি স্বভাবের গোলেজান বিবিকে স্বামীর হাতে খুন হতে হয়। সন্তান ধারণে অক্ষম নাকি সক্ষম, সেই পরীক্ষা না করেই, বিনা অপরাধে সে শাশুড়ি ও স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হতে

থাকে। তাদের নির্মম অত্যাচারে বিধ্বস্ত গোলেজান বারবার মৃত্যুকামনা করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তার অকালমৃত্যু ক্যান্সারে নয়, তৃতীয়পক্ষের নতুন বউ আনার সুবিধা করার জন্যই হাঁসু 'গোলেজান বিবির বুকে ক্ষুর চালিয়ে দিয়েছিল, যাতে ঘা হয়ে পোকা ধরে বউটা মরে গেল।'[১৮]

হাঁসুর তৃতীয় পক্ষের কচি স্ত্রী আনসুরা কিন্তু তাদের থেকে আলাদা। মুন্নাফের খালাতো বোন আনসুরা, রাতের অন্ধকারে নির্জন বরোজকোলে যেমন মায়াবী ফাঁদ পেতে গণ্ডা গণ্ডা পাখি ধরে, তেমনি তার বাড়ির দিনরাতের মজুর মুন্নাফকেও আকর্ষণ করার সাহস দেখায়। ডাহুক পাখির যৌবনডাকে যেমন অন্যান্য পাখি ছুটে এসে আনসুরার হাতের খাঁচায় বন্দী হয়, তেমনি মুন্নাফকেও সে এক অপূর্ব মায়া ও প্রেমের বন্ধনে বেঁধে ফেলে। দরিদ্র পরিবার থেকে আগত আনসুরার জীবনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন হল, বিত্তশালী হাঁসুর ঘরগেরস্তির নিরাপদ আশ্রয় ও মুন্নাফের সান্নিধ্য লাভ। কিন্তু পীরের দোয়া ও তাবিজের গুনেও বিয়ের দুবছরে সে মা হতে পারে না। মা না হওয়ার অপরাধে, হাঁসু তাকে গ্রামের মুরুব্বীদের সাক্ষী রেখে একটি তালাক দিয়ে রাখে। ইদ্দতকালের মধ্যে কোন সুখবর না দিলে, সে পরবর্তী তালাক পাবে। তাকে হারাতে হবে হাঁসুর আশ্রয়ের পাশাপাশি ভালোবাসার মানুষ মুন্নাফকেও। এই জীবনসংকট থেকে মুক্তি পেতে সে একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ধর্ম ও সমাজের বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন করে আনসুরাও জেনার(ব্যাভিচার) বিচারে ব্যস্ত হাঁসুর অনুপস্থিতিতে, মনের মানুষ মুন্নাফের প্রেমে একাত্ম হয়, 'বরোজের ভেতর আর অন্ধকার। দুটো ছায়া ডুবে যায়। গাছ গাছালিতে আঁধারের অসম্ভব জড়াজড়ি প্রণয় বাতাসে ঝর্ণা বাজে।'[১৯] ইসলাম ধর্মবিধানে এটি একটি বড় ধরণের জেনা অর্থাৎ ব্যাভিচার। আর এর ফলেই, আনসুরার গর্ভে সন্তান আসে। আনসুরা বাঁজা অপবাদ ঘুচিয়ে, জননী হওয়ার সুখ ও মুন্নাফের ভালবাসার তৃপ্তিতে, হাঁসুর সংসারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

### ২) বসবাস

আফসার আমেদের বসবাস উপন্যাসের মধ্যেও স্বল্পপরিসরে তালাকের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে দেখা যায় যে, বুড়ো আনামতের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে, বৃদ্ধবয়সে সর্বস্ব হারিয়ে পাড়ার মিদ্দেদের বাড়িতে কাজ করে খেতে হয়। যে সংসার ও সন্তানকে সে তিলে তিলে গড়ে

তুলেছে, সেখানে তার আর কোন অধিকার নেই। তাই তাকে শেষবয়সে মিদ্দেদের বাড়িতেই আশ্রয় নিতে হয়। সমাজ ও ধর্মের কঠোর নিয়মে অনুশোচনায় দগ্ধ আনামতের দাম্পত্যে ফিরে যাওয়ার পথ অত্যন্ত জটিল। অথচ এই অনিশ্চিত জীবনের জন্য দায়ী স্বামী ও সমাজের কাছে প্রশ্ন করার ভাষাও তার তৈরি হয় নি। তবে বন্যা কবলিত কুলিয়ার বাঁধের উপর, ছেলে লিয়াকত মানবতার জায়গা থেকে, অসহায়ভাবে বসে থাকা আশ্রয়হীনা মাকে নিজের মাচায় আশ্রয় দিয়ে সন্তানের কর্তব্য পালন করে। সেক্ষেত্রে এই বৃদ্ধার ভবিষ্যৎজীবন একটা নিরাপদ আশ্রয় লাভের সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে, মুসলিম নারীজীবনের এই মর্মান্তিক সংকটের বাস্তবসম্মত দিকগুলো উঠে আসে, যা বাংলাসাহিত্যকে করে বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

**পুরুষতান্ত্রিক সমাজঃ নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান**

'ঘরগেরস্তি' উপন্যাসে হাঁসুর মা, মুন্নাফের মা এবং দিনমজুর ইরফানের স্ত্রী-এই তিনজন বয়স্ক রমণীর মধ্য দিয়ে লেখক মুসলিম নারীজীবনের তিনটি পারিবারিক অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন। ছেলে ধরা, পিঠে বানানো ও বিয়ের পাকান তোলায় দক্ষ আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, হাঁসুর মায়ের দাপট ও আধিপত্যে পুত্রবধূ থেকে শুরু করে গ্রামের অনেকেই ভয় পায়। তার অত্যাচারে সহজ শান্ত গোলেজান বিবিকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, প্রায়দিন অনাহারে অতিবাহিত করতে হয়। তবে সাহসী আনসুরা কিন্তু বুড়ির গালাগালকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারে। কচি বয়সের নতুন স্ত্রী আনসুরার প্রতি হাঁসুর দুর্বলতাও বুড়ির পছন্দ নয়। সে ছেলের অবর্তমানে আনসুরাকে গালমন্দ করে চলে। আনসুরাকে ঘিরে, তার নিশ্ছিদ্র পাহারাকে ভয় পায় মুন্নাফও। তাই বুড়ির জীবিতকালে আনসুরার কাছাকাছি যাওয়ার সাহস পায়নি সে। বউজ্বালানী বুড়ির সর্পাঘাতে মৃত্যু হলেও, গ্রামবাসীর বিশ্বাস গোলেজান বিবির আত্মায়, বুড়িকে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছে। অন্যদিকে আর্থিক সহায়সম্বলহীন মুন্নাফের মা, বড়ছেলে আসাদুলের সংসারে থাকে বলে, সবসময় বড়বউয়ের মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। তবে ছোটবউ জরিনাকে সে সুযোগ পেলেই কুকথা শোনায়। অবশ্য বউমারাও তাকে ছেড়ে কথা বলে না। বৃদ্ধ দিনমজুর ইরফান তার বয়স্কা স্ত্রীকে অবহেলা করে, তার বর্তমানে আর একটি বিয়ে করে।

সতীনের সংসারে বৃদ্ধার আর কোন জায়গা হয় না। ইরফানের স্ত্রীকে তাই ছেলেদের সংসারে আশ্রয় নিতে হয়।

উপন্যাসমধ্যে পুরুষসমাজের আলোচনায় অবলীলায় উঠে আসে তালাক ও বহুবিবাহের কথা, যা সেই সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। তাই বৃদ্ধ ইরফানের দ্বিতীয় বিয়েকে তারা সমর্থন করে। জাফরের বছরখানেক ধরে বাপের বাড়িতে থাকা স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা এবং ফিরিয়ে আনার চেষ্টাকে পুরুষসমাজ ঠাট্টা করে। তারা বারবার জাফরকে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য প্ররোচিত করে। বিচার ও মজলিশের মধ্যে পৃথিবীর যেকোনো অমঙ্গলের জন্য তারা নারীকেই দায়ী করে 'মেয়েমানুষ আর পর্দার মধ্যে নেই। সব মাথার কাপড় ফেলে পিঠখোলা ব্লাউজ পরে রাস্তাঘাটে পুরুষের সঙ্গে বেড়াচ্ছে। দুনিয়া পাপে ছেয়ে গেল।'[২০] সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ হাঁসুর, স্ত্রীর প্রতি অমানবিক আচরণকে সমর্থন করে চলে। সন্তান জন্মদানে হাঁসুর অক্ষমতার প্রশ্ন তারা কেউ তোলে না। মুন্নাফের তালাকের বিচার সভায় উপস্থিত রজবের উক্তি, সমাজে মুসলিম নারীর অবস্থানকে আরও স্পট করে, 'ব্যাটাছেলে যদি মাগকে তালাক দিয়ে থাকিস তো কি হয়েচে—ফের বিয়ে করবি—তবে মিথ্যে বলবি? কতবড় গোনাহ তুই করচিস তোর খেয়াল আছে।'[২১] অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে নারীর জীবনের চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা ও নিরাপত্তার কোন মূল্য নেই। তাই হাঁসুর প্রথম স্ত্রীকে তালাক পেতে হয়, দ্বিতীয় স্ত্রী গোলেজান বিবিকে খুন হতে হয়। এই নিষ্ঠুর, অমানবিক সমাজের বিরুদ্ধে নিজের জীবনের সংকট থেকে মুক্তি পেতে তাই জরিনা, মুন্নাফকে অনুসরণ করে সত্যকে গোপন করে এবং আনসুরা নীতিহীন অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে, ধর্ম ও সমাজের বিরোধিতা করে। কেননা তাদের মত অশিক্ষিত, অসহায়, আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল নারীর সোচ্চার ও ন্যায়সংগত প্রতিবাদের ভাষা, তৎকালীন সমাজে অকল্পনীয় ছিল। সেদিক থেকে লেখক আফসার আমেদ অত্যন্ত সমাজ বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন।

**বধূহত্যা, তালাক ও বহুবিবাহঃ উচ্চবিত্ত রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার প্রসঙ্গঃ**

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ মূলত নিম্নবিত্ত বাঙালি মুসলিম সমাজের কথাই তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তবে বিচিত্র প্রতিভাধর লেখকের রচনায়, বৈচিত্র্যময় জীবনের

নানান স্তরের কথা ধরা পড়া স্বাভাবিক। তাই তাঁর বিভিন্ন কথাসাহিত্যে উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, যেখানে মুসলিম নারীজীবনের সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে লেখকের বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আমরা তাঁর ‘ঘরগেরস্তি’ উপন্যাসে তার প্রমাণ পায়। এছাড়াও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তাঁর ‘সানু আলির নিজের জমি’, ‘আত্মপরিচয়’ প্রভৃতি উপন্যাস এবং ‘জিন্নতবেগমের বিরহমিলন’ ও ‘জিন্নতবেগমের দিবসরজনী’ প্রভৃতি ছোটগল্প।

## ১) সানু আলির নিজের জমি

সাধারণত বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্ত পরিবারে দরিদ্র পরিবারের সুন্দরী মেয়েরা, বউ হয়ে আসার সৌভাগ্য লাভ করে। ‘সানু আলির নিজের জমি’ উপন্যাসে লেখক এই সমাজসত্যের অবতারণা করেছেন। এই উপন্যাসে দেখা যায়, ভাটোরার চাষির মেয়ে সখিনা রূপের জোরেই উচ্চবিত্ত ও রক্ষণশীল সাঈম হাজির পুত্রবধূ হয়ে আসে। সোনার খাঁচায় বন্দী পাখির মতোই আভিজাত্য, দামী পোশাক, গহনা ও বোরখায় সে বন্দিণী। প্রসবকালে মহিলা ছাড়া কোন পুরুষ ডাক্তারের সহযোগিতা নেবেন না, হাজি সাহেবের এই অমূলক জেদেই সখিনাকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়। তিনি মুসলিম ধর্মের একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। তার কাছে ধর্ম হল শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ এবং মেয়েদের অবরুদ্ধ করে রাখা। তাই প্রসব যন্ত্রণায় কাতর সখিনার আর্তনাদ তাকে বিচলিত করে না। হাজিসাহেবের এই অমানবিক আচরণের জন্যই দুটো প্রাণ অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। যে সমাজ নারীকে বোরখায় অবরুদ্ধ করে রাখে, আবার প্রয়োজনে মহিলা ডাক্তারেরও খোঁজ করে, সেই সমাজের অন্তঃসারশূন্য দিকটিকে লেখক তুলে ধরেছেন। কখন মহিলা ডাক্তারের অভাবে, কখন চিকিৎসার অভাবে বা অল্পবয়সে মা হওয়ার কারণে সখিনার মত গ্রামের কতশত নারী যে, সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, তার পরিসংখ্যান মেলা ভার। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ নারী জীবনের এই মর্মান্তিক ইতিহাসকে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

## ২) আত্মপরিচয়

আফসার আমেদের 'আত্মপরিচয়' উপন্যাস, নারী জীবনের আর এক মর্মান্তিক ইতিহাসকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশকালে নাম ছিলো 'সমাধিভূমি'। 'শারদীয় প্রতিক্ষণে' ১৯৮৮ সালে এটি 'সমাধিভূমি' নামেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পরে ১৯৯০ সালে দে'জ পাবলিশিং থেকে 'আত্মপরিচয়' নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। লেখকের এই সময়কালের উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'আত্মপরিচয়' বেশ খানিকটা ভিন্নধরণের। কারণ এর কেন্দ্রবিন্দুতে প্রাধান্য পেয়েছে একটি শিক্ষিত কিন্তু ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারজীবনের কথা। যেখানে পুরুষের কথায় শেষ কথা। তাদের ইচ্ছেপূরণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই নারীকে এখানে সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। তাদের কাছে নারীর অস্তিত্ব প্রাণহীন পুতুলের মতো। তার নিজস্ব কোন চাওয়া-পাওয়া ও সুখ-দুঃখের কোনো মূল্য নেই এই পরিবারজীবনে। এর ব্যতিক্রম হলেই নারীকে তালাক পেতে হয়, সার্বিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচতে হয়, নতুবা খুন হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত বিত্তবান রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের আপাত জাঁকজমকের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা নারীজীবনের যন্ত্রণাময় চরম সংকটের এক বাস্তবসম্মত চিত্র লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি দরিদ্র, অশিক্ষিত পরিবারজীবনে নারীর তুলনামূলক স্বস্থিত অবস্থানকে লেখক বর্ণনা করেছেন। শাহবানু মামলার রায়কে কেন্দ্র করে তালাকপ্রাপ্ত নারীকে খোরপোষ দেওয়ায় যে মুসলিম মহিলা বিল পার্লামেন্টে পাশ হওয়ার কথা ছিল, তাতে নির্যাতিতা মুসলিম বধূরা অনেকটাই আশার আলো দেখেছিল। কিন্তু মৌলবাদী অরাজনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতার বিরোধিতায় শেষপর্যন্ত এই বিল সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সমাজ সচেতন লেখক আফসার আমেদ, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একজন নারীর পক্ষে এই মানবিক বিলের উপযোগিতা সম্পর্কেও এই উপন্যাসে আলোকপাত করেছেন।

'আত্মপরিচয়' উপন্যাসের কাহিনি অংশে দেখা যায়, বিরামপুরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, জোতদার, ধার্মিক কাসেম হাজির পরিবারের সুনাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারিত। তাঁর পরিবারের সকলকেই কঠোরভাবে মুসলিম ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে হয়। প্রত্যেক বছর বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই মিলাদ-মহফিলের আয়োজন করা হয় হাজিবাড়িতে। পীরের প্রতি তাঁর

ভক্তিও সর্বজনবিদিত। হাজিবাড়ি মৌলবি ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়মিত নামাজ ও কোরান পাঠে মুখরিত হয়ে ওঠে। অথচ হাজিবাড়ির এই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অন্তরালে ঘটে চলে বেশ কিছু ইসলাম ধর্মবিরোধী অমানবিক কার্যাবলী। ইসলাম ধর্মে নারীকে যে সম্মাননার জায়গা দেওয়া হয়েছে, তা থেকে হাজিবাড়ি ভ্রষ্ট। এই বাড়ির পুরুষেরা স্ত্রীদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে। কাসেম হাজি সেজছেলে কামালের বিয়েতে, শায়রার বাবার কাছ থেকে মোটা অংকের পণ আদায় করেন। বাড়ির কাজের লোকেদের সঙ্গেও তাদের ব্যবহার মানবিক নয়। এমনকি জাল সাক্ষ্য ও মিথ্যাকে আশ্রয় করে তারা বর্গাচাষিকে বরখাস্তও করতে পারে। এই সমস্ত ধর্মবিরোধী কাজের পাশাপাশি, বাড়ির বধূহত্যার মত নৃশংস ইসলাম বিরোধী কাজও তারা অনায়াসেই করে ফেলে। এক্ষেত্রে হাজিবাড়ির বধূদের চরম আত্মিক সংকটের কথা সহজেয় অনুমেয়। সাত সন্তানের জননী হাজিগিন্নি হালিমা প্রকৃত অর্থে স্বামীর অনুসারিণী। তাই আপাতদৃষ্টিতে তার জীবনে কোন সংকট দেখা যায় নি। একটা সময় পর্যন্ত হাজিবাড়ির বাধ্য পুত্রবধূ মালেকার জীবনও দুর্বিষহ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাদের পরিবারের সামাজিক সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বিপরীত হাওয়ায় প্রথম চলতে শুরু করে, বাড়ির সেজছেলে কামালের স্ত্রী শায়রা। হাজিবাড়ির সমস্ত নিয়মকানুন ও অনুশাসন অটুট রাখা ও কামালকে স্বভূমিতে ফেরানোর জন্যই বাড়ির মেজছেলে জামাল, কামালের অনুপস্থিতিতে সেজবউ শায়রাকে খুন করে। আর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে তারা সর্বত্র দুর্ঘটনা বলে প্রচার করে। বাড়ির মজুর গফুরকে সাক্ষী রেখে তারা প্রচার করে যে, সিঁড়ি থেকে পড়ে সেজবউ এর মৃত্যু হয়।

নতিবপুরের মল্লিকপাড়ার মেয়ে শায়রা সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। কামাল বিয়েতে শায়রার বাবার কাছ থেকে পাওয়া পণের টাকাতেই স্বতন্ত্র ব্যবসা গড়ে তোলে। তার ব্যবসার উন্নতি ক্রমে কাসেম হাজির ব্যবসাকেও ছাড়িয়ে যায়। ব্যবসা বাড়ানোর অজুহাতে সে বাড়িতে টাকা দিয়ে কোনোরকম সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকে। অন্যদিকে সে আবার হাজিসাহেবের পরামর্শ না নিয়ে, বেশ খরচ করে তার কারখানার পাশে একটি বাড়ি করে। হাজিবাড়ির নিয়মের বাইরে গিয়ে টিভি কেনে, মোটর সাইকেল কেনে, লরি কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। এমনকি হাজিবাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই দুই দম্পতি নতুন বাড়িতে বসবাসের প্রস্তুতিও নেয়। শিক্ষায়, মানসিকতাই এবং আধুনিক জীবনযাত্রায় তাদের দাম্পত্যজীবন সুমধুর হয়। শায়রার মৃত্যুতে

তাই কামাল বারবার চেতনা হারায়। শায়রাহীন বাড়ি-ঘর সবই তার কাছে বিষাদময়। তাকে দাম্পত্য সুখে ভরিয়ে রাখার সমস্ত আয়োজনই করেছিল কামাল। এমনকি হাজিবাড়ির কঠোর অনুশাসন সে স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করায় প্রয়াসী। কিন্তু কামালের এই সমস্ত আচরণের জন্য হাজিবাড়ির সদস্যরা, শায়রাকে দায়ী করে। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে যেকোনো পরিবারেই, সন্তানের প্রতিকূল আচরণের জন্য, সবসময় পুত্রবধূকেই দোষারোপ করা হয়। তাই তারা অবাধ্য শায়রাকে কামালের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা ভাবে।  তারা এটাও বিশ্বাস করে, কামাল কিছুতেই তাদের কথায় শায়রাকে তালাক দেবে না। তাই নিষ্ঠুর জালাল শায়রাকে খুন করে, একটি সুন্দর নারীজীবনকে হত্যা করে।

মূলত শিক্ষিতা, সুন্দরী, আধুনিক ভাবনায় ভাবিত অল্পবয়সী সেজবউ শায়রাকে খুন হতে হয় তার দৃঢ়, অনমনীয় ও প্রতিবাদী চরিত্রের জন্যও। হাজিবাড়ির পুরুষসমাজ তা মেনে নিতে পারেনি। মেনে নিতে পারেনি দিনের পর দিন পুরুষের শাসনাধীনে থাকা হাজিগিন্নির মত নারীও। তাই জালালের মত তিনিও মনে করেন, হাজিবাড়ির নিজস্ব নিয়মকানুন অমান্য করার জন্যই শায়রাকে ‘শাসন করবার খুব দরকার হয়ে পড়েছিল। সেজবউ দুদিন খায় নি। বাঁকা বাখারির মত ছিল, নোয়ানো সোজা করানো কঠিন ছিল। মিষ্টি কথায় বোঝানো, পাখি-পড়া করা এটা পুত্রবধূদের প্রতি গিন্নি- শ্বশুর- ভাসুরদের ব্যবহার হতেই পারে না। হালিমা তার শ্বশুরকে জানে, কি কড়া ছিল, কি ভয়ঙ্কর ছিল তার সময়ে। নিচের ঘরে একশ তিন বছর উমর নিয়ে বেঁচে আছে। কণ্ঠস্বরে এখনো সেই ভয়ঙ্করতা আছে শ্বশুরের.’[২২] জাতি-ধর্মনির্ব্বিশেষ বেশির ভাগ পুরুষতান্ত্রিক সমাজেই অবশ্য নারীজীবনের এই বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়।

অবশ্য হাজিগিন্নি হালিমা মেজবউকে শাসন ও মারধোর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও, তাকে খুন করা হোক, এটা সে চায় নি। এমনকি মৃত্যুপথযাত্রী শায়রার মুখে ইসলাম ধর্মের রীতি অনুযায়ী জল দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে সে। এখানে হালিমা অনেকটা মানবিক। একসময় জালালের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে সে জ্ঞান হারায়। হাজিবাড়ির অনুশাসনে বন্দী হালিমা শ্বশুর ও স্বামীর পাশাপাশি নিজের সন্তান, জালালেরও শাসনাধীন। সবরকম অধিকার, স্নেহ, মমতা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হালিমার মধ্যেও মাতৃসত্তার মৃত্যু ঘটে এবং শাশুড়ি তথা হাজিগিন্নির সত্তায় প্রাধান্য লাভ করে। বাড়ির পুরুষদের সুখী করা ও হাজিবাড়ির

সমস্ত অনুশাসন মান্য করায়, নারীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, এই লব্ধ শিক্ষায় সে বাড়ির বধূদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। তাই দুদিনের অভুক্ত শায়রাকে মান ভাঙানোর পরিবর্তে চোখ রাঙায়, রান্নার ব্যাপারে বধূদের খোঁটা দেয়, মেজছেলের শায়রার প্রতি অন্যায় আচরণকে সমর্থন করে, এমনকি আলালের অত্যাচার থেকে, বড়বধূ মালেকাকে রক্ষা করতেও এগিয়ে আসে না। হাজিসাহেব যেমন ক্রমাগত মাছ চুরির অপরাধে একটি বিড়ালকে নির্মম ভাবে জবাই করে, তেমনি হাজিগিন্নি, হাত থেকে চিলে মাছ নিয়ে চলে যাওয়ার অপরাধে, কাজের মেয়ে মনবোধকে অপমানে ও নিষ্ঠুরতায় কাঁদিয়ে ছাড়ে।

হাজিগিন্নি হালিমার নিকৃষ্ট সংস্করণ হল জালালের স্ত্রী অর্থাৎ এই বাড়ির মেজবউ। যে জালাল অন্যের স্ত্রীকে শাসন তথা খুন করতে পারে, সে যে নিজের স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। মাঝে মাঝেই সে জালালের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। বড়বউ ও সেজবউ এর সৌভাগ্যসুখে ঈর্ষাকাতর মেজবউ তাদের প্রতি বিরূপ। তাই নিজের খারাপ রান্নার দায় মিতভাষী, শান্ত বড়বউ এর ঘাড়ে চাপলে, সে চুপ করে থাকে। প্রতিহিংসাপরায়ণ মেজবউ, সেজবউ শায়রার হত্যাকাণ্ডে স্বামী জালালকে সমর্থন করে। এমনকি শায়রার এই মর্মান্তিক মৃত্যুবেদনায় আক্রান্ত হয়ে যেখানে হাজিগিন্নি, রিজি, মালেকার পাশাপাশি আগত সমস্ত নারীসমাজ অঝোরে কেঁদে চলে, সেখানে মেজবউকে চোখ টিপে টিপে কান্নার অভিনয় করে যেতে হয়। একজন নারীর প্রতি, স্বামীর এই নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতায় সে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত বা বিচলিত নয়। বড়বউ ও সেজমউ এর মিষ্টি ও স্নিগ্ধ ব্যবহারে মুগ্ধ হলেও, গফুর প্রভৃতি বাড়ির চাকর- বাকরদের কাছে 'জালালের বউ খরখরি, খান্ডাস', জালালের যোগ্য সহধর্মিণী।

হাজিবাড়ির বড় ছেলে আলালের স্ত্রী, হাল্ল্যান গ্রামের মেয়ে সুন্দরী, শিক্ষিতা, ধর্মপ্রাণা, পতিব্রতা মালেকা হাজিবাড়ির অত্যন্ত অনুগত ও বাধ্য। হাজিবাড়ির সমস্ত নিয়ম, অনুশাসন সে নীরবে মেনে চলে। শায়রার মত কখনও কোন কিছুর প্রতিবাদ সে করে নি। রান্না-বান্না, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, কোরান পাঠ প্রভৃতির পাশাপাশি সে গল্প, উপন্যাস ও ডিটেকটিভ বই পড়তে ভালবাসে। তার প্রয়োজনীয় বইয়ের যোগান দেয় তার উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষক স্বামী আলাল। নিজেকে ভুলে গিয়ে সকলের মন যুগিয়ে চলায় ব্যস্ত থাকে মালেকা। সৌন্দর্যে ও আনুগত্যে

আলালের জীবনকে সে পরিপূর্ণ করে তোলে। আপাতদৃষ্টিতে তার সংসার জীবনে, তাই কোন ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের দাম্পত্যজীবনে প্রথম চিড় ধরে শায়রার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। শায়রাকে যে খুন করা হয়েছে এই সত্য আলাল বুঝতে পেরেও, মেনে নিতে অস্বীকার করে। মালেকার মুখে এই নির্মম সত্যকথার অকপট উচ্চারণ আলালকে বিচলিত করে তোলে। কারণ হাজিবাড়ির বিপক্ষ কোন কাজ বা কথা শুনতে সে নারাজ। কিন্তু এই ভয়ংকর, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড শান্ত স্বভাবের মালেকাকে ভীত ও অশান্ত করে তোলে। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে সে হাজিবাড়ি থেকে দূরে গিয়ে, একটি সুন্দর স্বতন্ত্র সংসারজীবনের কামনা করে আলালের কাছে। পরিবর্তে ক্ষুব্ধ আলাল তাকে আশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ এবং শারীরিক নির্যাতন করে। অবশ্য তার এই জীবন সংকটের জন্য 'নিজেকেই দোষ দিয়েছিল মালেকা মনে মনে। ভেবেছিল জালালেরই বড় ভাই আলাল। বারো বছরের সম্পর্কের ভিতর থেকেও আলালের তার প্রতি যেটুকু প্রেম আছে তার মধ্যে বিশাল এক ফাঁক দেখে শিউরে উঠেছিল সে।'[২৩]

তিন সন্তানের জননী মালেকা তার বারো বছরের সংসার জীবনে, হাজিবাড়ির ধর্মের আশ্রয়ে যতদিন সমস্ত ধর্মবিরোধী অমানবিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেও নীরব থেকেছে, ততদিন তার জীবনে কোন সংকট আসেনি। কিন্তু শায়রার মৃত্যুর নীতিহীনতায় তার শিক্ষিত মানবিক মন শিউরে ওঠে। সে বারবার হাজিবাড়ি থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে। আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল বাবার সংসারে নিজের বাড়তি বোঝা চাপানোর ভাবনায় বারবার দ্বিধাগ্রস্থ হয় সে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে, হাজিবাড়ির পচাগলা ধ্যানধারণা, নিষ্ঠুরতা, নীতিহীনতা ও আলালের ক্রমবর্ধমান শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ মালেকা, মুক্তির পথ খুঁজে পায় শাহবানু মামলার সূত্র ধরে। হাজিবাড়ির মিলাদ-মহফিলের ভীড়ে, সুযোগ বুঝে সে তার বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া গয়না ও একমাত্র শিশুসন্তানকে নিয়ে, গফুরের সহায়তায় নিরাপত্তাহীন, সম্মানহীন, প্রেমহীন সংসারজীবন থেকে বেরিয়ে আসার দুঃসাহস দেখায়। আর এখানেই যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পের মৃণাল ও মালেকার পথচলা এক হয়ে যায়। বিন্দুর মৃত্যু মৃণালকে এবং শায়রার মৃত্যু মালেকাকে পরিবারে নারীর স্থান সম্পর্কে সচেতন করে, প্রেমহীন-অধিকারহীন দাম্পত্য থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে।

একথা সত্য যে, নারীর এই জীবন-যন্ত্রণার চিত্র, উচ্চবিত্ত সমাজে আরও বেশি প্রকট। 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মীয় আচারসর্বস্ব পরিবারে বধূহত্যার মত অমানবিক ঘটনাবলির পাশাপাশি বর্ণনা আছে নওসাদ মোল্লার অকালমৃত প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মর্মান্তিক জীবনযন্ত্রণার কথা। শুধুমাত্র কালো হওয়ার অপরাধে নওসাদ তাকে অবহেলা করে একজন মেছেনিকে বিবাহ করে। তাই নওসাদের 'বাবা নিজের ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র করে, নিজের ভাগ্নিকে ছেলের কাছ থেকে তালাক করিয়ে নিয়ে, বাড়ির চাকর কায়েমের সঙ্গে বিয়ে দেয়। কায়েম আর ভাগনিকে নিজের বাড়িতেই রেখেছিল নওসাদের বাবা। তার কয়েক মাস পরে কায়েমকে দেখা গেল নদীর চরে খুন হয়ে পড়ে থাকতে। ...কায়েমের বিধবা বউ শোকতাপ নিয়ে বেশিদিন বাঁচে নি।'[২৪] লেখকের এই সামান্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অমানবিক নিষ্ঠুরতার দিকটি স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। একটি নিষ্পাপ নারীজীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতি নিঃসন্দেহে লজ্জাজনক। মূলত পুরুষশাসিত দাম্পত্যজীবনে নারীর কোন স্বাধীনতা নেই, নেই তাদের স্বতন্ত্র চাওয়া-পাওয়া, ভালোলাগা-মন্দলাগার কোন জায়গাও। তাই যখনই তারা স্বামীর ইচ্ছেপূরণে ব্যর্থ হয় বা স্বামীর মতাদর্শের বিরোধিতা করে, তখনই তাদের জীবনে সংকট দেখা দেয়। হয় তাকে খুন হতে হয় কিংবা তালাক পেতে হয়। অথবা নিজের আত্মিক তাড়না ও জীবন সংকট থেকে মুক্তি পেতে মালেকার মত পালিয়ে বাঁচতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'দেনাপাওনা' ছোটগল্পের নিরুপমার মত শায়রা-মালেকার মত নারীরা, নীতিহীন উচ্চবিত্ত ধনী পরিবারে একেবারেই সুরক্ষিত নয়।

তুলনামুলকভাবে নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা তাদের দাম্পত্যে অনেক বেশি নিরাপদ। তাই 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসে দীর্ঘ অপেক্ষারত ময়নাকে তার স্বামী পুনরায় সম্মানের সঙ্গে তার কাঙ্ক্ষিত সংসারজীবনে নিয়ে যায়। নিশারের মা নাশিরা মৃত্যুর পরেও গফুরের স্মৃতিতে অমলিন। দিনমজুর জাফরের মা ও স্ত্রীর জীবনে দারিদ্রতা থাকলেও স্বামী সন্তানের ভালোবাসায় তারা সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে। সুস্থ জীবন ও মননের জায়গা থেকেই তারা বিধবা, অসহায় মনবোধের গফুরের সঙ্গে পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করে। এ প্রসঙ্গে অবশ্য জিয়া ব্যাপারি ও তার স্ত্রীর কথাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জিয়া ব্যাপারির স্ত্রীর সংসার জীবনেও সুখ

ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটা চিত্র সহজেই অনুমান করা যায়। এদের প্রত্যেকের সহযোগিতায় দুই সন্তানের জননী, বিধবা মনবোধ এক নতুন সংসারজীবন ফিরে পায়। অথচ মালেকা জানে, হাজিবাড়ির বড় ছেলে আলাল, তাকে আর কোনদিনই ফিরিয়ে নেবে না। তাদের সন্তানদের কথাও ভাববে না। তাই নিজের সন্তান ও অধিকারের জন্য তাকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়।

মূলত একজন অশিক্ষিত মজুর গফুরের মতো উন্নতমনের পুরুষের, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পারে নারীজীবনকে সুন্দর করে তুলতে। তাই শিক্ষিত শিক্ষক স্বামী আলালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মালেকাকে কিন্তু গফুরই নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়। মেজবউ এর মৃত্যুতে কোনো অপরাধ না করেও একটা কিছু না করতে পারার বেদনা সে অনবরত বহন করে চলে। অথচ শায়রার হত্যাকারী শিক্ষিত, বিত্তশালী, ধর্মভীরু পুরুষসমাজের মনে কোনো অপরাধবোধ বা অনুশোচনা বিন্দুমাত্র স্থান পায় না। বরং একটি বধূকে খুন করার পরেও সেই পরিবারে মালেকা দিনের পর দিন অত্যাচারিত হয়। মালিক তথা সমাজের চোখরাঙানিকে অবহেলা করেই গফুর শেষপর্যন্ত মালেকার সমব্যথী হয়ে, তার যন্ত্রণাময় দাম্পত্যের বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে আসতে সহযোগিতা করে। শায়রার মৃত্যুর সত্যতা সকলের সামনে প্রকাশ না করতে পারার যন্ত্রণায় সে বারবার পীড়িত হয়। মনবোধকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ও তার সন্তানদের দায়িত্ব নিয়ে প্রকৃত মানুষের পরিচয় দেয়। তাই সমাজে নারীর জীবনকে সুন্দর ও সুরক্ষিত করার জন্য গফুরের মত সাহসী, সৎ ও মানবিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ধর্ম, বিত্ত বা উচ্চশিক্ষা নয়, নারীর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও মানবিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করেই একটি নারীজীবন হয়ে উঠে সুন্দর এবং সার্থক, সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এই সত্যই উপন্যাসটিতে রূপায়িত করেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন, মুসলিম সমাজে অনুমোদিত বহুবিবাহ ও তালাক যেমন অনেকের দাম্পত্যজীবনকে যন্ত্রণাময় ও নিরাপত্তাহীন করে তোলে, তেমনি বিধবাবিবাহের অনুমোদন অসহায়, নিঃসঙ্গ বিধবাকে একটি নিরাপদ ও নিশ্চিত দাম্পত্যজীবন পেতে সহায়তা করে।

### ৩) জিন্নতবেগমের বিরহমিলন ও জিন্নতবেগমের দিবসরজনী

আফসার আমেদের 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন' ও 'জিন্নতবেগমের দিবসরজনী' ছোটগল্পের মধ্যে উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারে বহুবিবাহের এক অমানবিক রূপ প্রকাশিত। উচ্চবিত্ত জিয়াদ শুকটির প্রথম স্ত্রী স্বামীর কাছে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা না পেয়েও বিশ্বাস করে, 'স্বামীর পায়ের নিচে বেহেস্ত'। জিয়াদ তার উপস্থিতিতে আরও তিনটি বিয়ে করে ইসলামের সুন্নত পালন করে। অথচ দিনের পর দিন বড় স্ত্রীকে অবহেলা ও পরস্ত্রীকে কামনা করার মধ্য দিয়ে, ইসলামের নির্দেশকেই সে অমান্য করে চলে। তবুও বড়বৌ আফসন কিন্তু চরিত্রহীন স্বামীর প্রতি তেমন বিরূপ নয়। বরং তার ক্ষোভ হয় অন্যান্য সতীনের উপর। অবশ্য এর কারণও অবান্তর নয়। কারণ মেজসতীন তাকে সিঁড়ি থেকে ফেলে আজীবনের জন্য পঙ্গু বানিয়ে দেয়। তার খাবারে অতিরিক্ত নুন ও লংকাগুড়ো মেশায়। তার মনেপ্রাণে বিশ্বাস, সতীনেরাই তার কাছ থেকে স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে। এই যন্ত্রণাময় জীবনের জন্য সে নারীকেই দায়ী করে। তাই সতীনের কথায় 'বড় বউয়ের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। কী আগুনপারা তাকায়। 'অতি দুশমনের যেন সতীন হয় না গো। মোর জ্বালা কোনো মেয়ে না পায় লো, বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলছে তা পানি ঢাললেও নিভবে নি।' মোর হাতটা বড় বউ বুকের মাঝখানে নিয়া যায়। বুকে গরম। ধুকপুকুনি। এইরকম তো মোর বুকেও হইছে গো।'[২৫] এখানে এসেই বিত্তশালী ঘরের স্ত্রী আফসন চাচি ও নিম্নবিত্ত ঘরের স্ত্রী জিন্নতের জীবনের যন্ত্রণা যেন এক হয়ে যায়। দুজনেই সধবা হয়েও বিধবার চেয়েও জ্বালাময় জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

জিয়াদের দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার বাসনায়, প্রথম স্ত্রী আফসনকে স্বামীর জীবন থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাকে জিয়াদ ব্যর্থ করে, টাকার জোরে আরও দুটো বিয়ে করে। তাই স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে না পাওয়ার যন্ত্রণা ভুলে থাকতে, মেজবৌ বড়সতীনকে কষ্ট দেয় ও পরের দুজন সতীনের মধ্যে ঝগড়া লাগায় আর এইভাবেই ভুলপথে সে নিজের বেঁচে থাকার আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করে। ফলে নারীর দ্বারাই নারী অত্যাচারিত হয়। আবার জিয়াদের শহুরে সেজ স্ত্রী স্বামীর সহবাসের খবর অন্য সতীনদের কাছে প্রচার করেও একরকম আনন্দ পাওয়ার চেষ্টায় থাকে। এমনকি সে আফসনের যুবক ছেলের সঙ্গে এক অবৈধ নোংরামির খেলাও খেলতে পারে। তাছাড়া প্রতিহিংসায় ছোট সতীনের

পায়ে সে জুতো দিয়ে আঘাত করে। তবে একসময়ের চালওয়ালী, জিয়াদের ছোটস্ত্রীও কিন্তু সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য করার মানুষ নয়। তাই জিয়াদের অন্দরমহলে, তার চার স্ত্রীর মধ্যে স্বামীকে পাওয়ার জন্য যে প্রতিযোগিতা, কলহ, অন্তর্দাহ ও নোংরামি দেখা যায়, তাতে বহুবিবাহের অমানবিক মর্মান্তিক সত্যতাই পরিস্ফুট হয়।

**সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও শ্রেণিশোষণ প্রসঙ্গঃ**

সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে সামাজিক শ্রেণিবন্যাসের একটি সুস্পষ্ট চিত্র লক্ষ্য করা যায়। যেখানে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের চিরাচরিত দ্বন্দ্ব ও সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্যের পাশাপাশি সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থানগত পার্থক্যকেও তিনি তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, লেখক মুসলিম সমাজে প্রভাবশালী মোল্লা ও মৌলবিদের প্রকৃত চরিত্রকে বারবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছেন। আর এই সূত্রেই তাঁর কথাসাহিত্যে, নারীজীবনের সংকট ও সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাস্তবসম্মতভাবে ধরা পড়েছে। আমরা তাঁর 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসের মধ্যে এই সমাজ বাস্তবতার একটি চিত্র খুঁজে পায়। লেখকের বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্যেও এর অত্যন্ত সুন্দর একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

**১) গোনাহ**

ছোটগল্পকার আফসার আমেদের প্রতিভার একটি অন্যতম স্বাক্ষর হল 'গোনাহ' ছোটগল্পটি। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৮০ সালে। পরবর্তীতে লেখকের 'শ্রেষ্ঠগল্প' এবং 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনে এটি স্থানলাভ করে। এই গল্পের কেন্দ্রভূমিতে আছে, মুসলিম সমাজ-জীবনের একটি বাস্তবানুগ চিত্র। ধর্মের মুখোশধারী মৌলবি থেকে শুরু করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীলোভাতুর চরিত্রকে তিনি এখানে স্পষ্ট করেছেন। পাশাপাশি স্পষ্ট করেছেন বিত্তশালী মালিকশ্রেণির দ্বারা শোষিত, বাড়ির কাজের লোকের অসহায়তার কথা। আবার তিনি দেখিয়েছেন ধর্মীয় জলসার মজলিশে বসেও নারীসমাজের পরনিন্দা-পরচর্চার মতো ধর্মবিরোধী কার্যকলাপে মগ্ন থাকার চিত্রও।

কাজিবাড়ির কাজের মেয়ে ষোলবছরের ফরিদা রূপে, গুণে ও কাজকর্মে বেশ নিপুণ। কিন্তু গরিবের মেয়ে ফরিদার পায়ে পায়জোড় নেই, হাতে রূপোর চুড়ি নেই, তাই জয়নুদ্দিন কাজির বড়ছেলে, তার সঙ্গে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলায় প্রয়াসী হলেও, তাকে বিয়ে করতে পারবে না। কারণ ফরিদা এই বয়সেই জেনে গেছে, 'মালেক পাশ দেওয়া ছেলে। খানদানি ঘরে বিয়ে হবে। গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও দোষ হয় না। সে যদি পড়ে যেত, দোষ হত।'[২৬] এমনকি কাজিবাড়ির সমস্ত কাজের দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করলেও, কাজি-গিন্নি তাকে অন্যায় ভাবে কথা শোনাতে ছাড়ে না। কাজিও নরম সুরে নয়, হুঙ্কার দিয়েই ফরিদাকে জল আনার হুকুম করে। তার শরীরের আকর্ষণে আর এক বিবাহিত পুরুষ রসিদ, বারবার তার সান্নিধ্যে আসার চেষ্টায় থাকে। ফরিদার মতো দরিদ্র ঘরের মেয়েদের এইভাবেই পুরুষের লালসার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হয়। ফরিদার মন ভোলাবার জন্য রসিদ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে, আজীবন বাপের বাড়ি ফেলে রাখার কথা বলে। এমনকি কাজিবাড়ির মিলাদে আগত মৌলানা পর্যন্ত ফরিদার সুন্দর হাত দেখার অজুহাতে, আরও কিছু পাওয়ার চেষ্টায় থাকে। ফরিদা বোঝে, সুযোগসন্ধানী মৌলানা শুধু তার 'হাত দেখছে না আরো কিছু। হাত দেখছে না আরো কিছু। হাত দেখছে না আরো কিছু। চাপদাঁড়ি লোকটা...না থাক। ও হ্যাঁ, লোকটা অনেক কিছু জানে। হাতের মধ্যে হাত রাখা। সে জানে না।'[২৭] এইভাবে মাত্র ষোলবছর বয়সেই ফরিদা শুধুমাত্র নারীজন্মের জন্যই বিভিন্ন দিক থেকে, শারীরিক ও মানসিকভাবে শোষিত ও পীড়িত হতে বাধ্য হয়।

তবে জীবনের এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও কিন্তু সে স্বপ্ন দেখে কাঙ্ক্ষিত প্রেমিক স্বামীর। আর তার এই কল্পিত প্রেমিক স্বামীরূপে সে বারবার কাজির বড় ছেলে মালেককেই খুঁজে পেতে চায়। এই দুর্বলতার জায়গা থেকেই পাপ বা গোনাহ হবে জেনেও সে বারবার আনন্দ-ঔৎসুক্যে মালেকের কাছে ধরা দেয়। সে এটাও জানে, তার শারীরিক পরিশ্রম কাজি বা কাজিগিন্নি গ্রহণ করলেও, গরিবের মেয়ে ফরিদাকে তারা কোনদিনই পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করবে না। এমনকি তার প্রতি দুর্বলতা সত্ত্বেও মালেক, বাবার বিরোধিতা করার সাহস দেখাবে না। সমস্ত কিছু জেনেও এক অদম্য আকর্ষণে, ফরিদা তার পছন্দের পুরুষ, মালেকের সঙ্গে স্বেচ্ছায় 'অন্ধকারে মিথুন-মূর্তি হয়ে যায়'। তবে অন্য কোন পুরুষের নীতিহীন অপমানকর কামনাকে,

সে তার সাধ্যমতো প্রতিবাদ করে। রসিদ যেহেতু তার পছন্দের পুরুষ নয়, তাই ক্ষুব্ধ ফরিদা রসিদের মুখে এঁটো জল ছুঁড়ে মারার সাহস দেখায়। কেতাব পড়া, পাপ-পুণ্যের ব্যাখ্যাকারী মৌলানার, তার প্রতি অন্যায় আচরণের কথা যে, কেউ বিশ্বাস করবে না, তা ফরিদা ভালোভাবেই জানে। কিন্তু তার মত একজন অসহায়, দরিদ্র নারীর পক্ষে, নারীলোভাতুর মৌলবির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করাও সম্ভব নয়। তাই সে এর প্রতিবাদ স্বরূপ এক অভিনব ও বিকল্প পথ সন্ধান করে। সূচিকর্মে দক্ষ ফরিদা, মৌলবির বালিশে গোপনে ছুঁচ ঢুকিয়ে রাখে। পরিকল্পনা মাফিক মৌলবির বুকে ছুঁচবিদ্ধ হওয়ার আপাত আনন্দে, নির্ভীকভাবে সোজা দাঁড়াতে গিয়েও কিন্তু ফরিদা ভয় ও আতঙ্কে নুয়ে পড়ে। সে জানে প্রকৃত দোষীকে কাজি 'কিন্তু ঠিক চিনে নেবে। ওরা তো দোষী খুঁজবেই'।তাই তার মত দরিদ্র, অসহায় এক নারীর পক্ষে আসন্ন শাস্তির অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

লেখক আফসার আমেদ, মালেকের মায়ের মধ্য দিয়ে, একজন বিত্তশালী পরিবারের গৃহিণীর জীবনকে সুচিত্রিত করেছেন। যারা কাজের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে অনেকটাই অমানবিক। পাড়া প্রতিবেশিদের সঙ্গে তাদের মিষ্টভাষী ব্যবহারের অন্তরালে থাকে নিজেদের মর্যাদা ও অহংবোধকে সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা। এই প্রসঙ্গে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন, 'মালেকের মায়ের কানের মাকড়ি জোড়া দুলদুল দুলছে। নাকে নাকছাবি। বাজুতে রুপোর তাবিজ। আর একটা পানের খিলি গালে ফেলে চিবোতে চিবোতে আত্মপ্রত্যয়ে নাক ফুলিয়ে বলে, 'আমার মালেকের মতন ঠাণ্ডা ছেলে হয় না, কুনু মেয়ে-মাগীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে না, বলেনি বংশ-বুনিয়াদ বলে একটা কথা আছে। তার দাদার কী না ছেল, পাঁচ গেরামের লোক ডেকে লিয়ে যেত বিচার কত্তে।'[২৮] অথচ মালেকের চরিত্রের সত্যতা ধরা পড়ে, বাড়ির কাজের মেয়ে ফরিদার প্রতি নিবিড় আচরণে।

মুসলিম নারীসমাজ মিলাদ-মহফিলের মধ্যেও ধর্মবিরোধী পরনিন্দা-পরচর্চার আসর জমিয়ে ফেলে, এই সমাজ সত্যের পাশাপাশি আফসার আমেদ আর একটি চরম সত্যকেও এই গল্পে রূপায়িত করেছেন জহুর স্ত্রীর প্রসঙ্গ এনে। নারী হয়েও নারীগণ জহুরের স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে, প্রত্যেকেই তার পরপুরুষ হারুনের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করাকে নিন্দা করে। তার অপছন্দের স্বামী জহুরকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে, এই

নারীসমাজ স্বাগত না জানিয়ে সমালোচনা করে। অর্থাৎ নারীর চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দকে সমর্থন করার ইচ্ছা, শিক্ষা বা সাহস কোনটাই তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। অথচ রসিদ যে তার অপছন্দের স্ত্রীকে বিনাদোষে বাপের বাড়ি রেখে আসে ও তালাক দেওয়ার অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাতে তারা কোন মন্তব্যই করে না। জন্ম থেকেই সমাজ ও ধর্মের বিধি-বিধানের ভয় দেখিয়ে নারীকে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুতুলে পরিণত করে। তাই যে মৌলানা নারী-পুরুষের অবৈধ যৌনাচার বা জেনার(ব্যাভিচার) ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে চলেন, তিনিই আবার সুযোগ বুঝে ফরিদার প্রতি এই অন্যায় আচরণ করেন। লেখক অত্যন্ত সচেতন ভাবেই দেখিয়েছেন যে, এই  সমাজ নারীকে ভোগ্যপণ্য রূপে তার শরীর ও পরিশ্রমের মূল্য দিলেও, তার মনের খোঁজ রাখার প্রয়োজনবোধ করে না। যার উপস্থিতি তথা পরিশ্রমে এই সমাজ ও সংসার সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তার সুস্থ ও নিরাপদ আশ্রয়ের কথাও তারা ভাবে না। ইসলামধর্মের মূল বিধানকে লঙ্ঘন করে এই সমাজ, কখনো তার অপছন্দের পুরুষের সঙ্গে জোরপূর্বক বিবাহ দেয়, আবার কখনো কামুক দৃষ্টিতে তাকে ভীত-সন্ত্রস্থ করে রাখার ধৃষ্টতা দেখায়। এর প্রতিবাদে কোন কোন ব্যতিক্রমী নারী, স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার দুঃসাহস দেখায়, আবার কেউ তরোয়াল ব্যবহারের সাহস দেখাতে না পারলেও, সাধ্যমতো ছুঁচের আশ্রয় নেয়।

## ২) গামছা

আফসার আমেদের যে সমস্ত ছোটগল্পে শ্রেণিসংগ্রামের কথা প্রাধান্য পেয়েছে, ‘গামছা’ তার মধ্যে অন্যতম। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘শারদীয় কালান্তর’ পত্রিকায় ১৯৮২ সালে। পরবর্তীকালে এটি আফসার আমেদের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ছোটগল্পে মূলত সমাজের চারটি শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে উপরের শ্রেণিতে আছে মালিক, জোতদার, শোষক ও বিত্তশালী গোষ্ঠী। যার প্রতিনিধি হল মহরম কাজি। তারপরের শ্রেণিতে আছে শোষিত, সর্বহারা, হেলো ও দরিদ্র নিম্নবিত্ত কৃষকগোষ্ঠী। এই সমাজের প্রতিনিধি ইনসুর। তার নিচে আছে এই দুই গোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত নারীসমাজ। এই সমাজের প্রতিনিধি হল ইনসুরের স্ত্রী আলতা। সবচেয়ে নীচে অবস্থান করে গৃহপালিত পশু। মানুষের হাতে পালিত

গরু কখনো গাড়ি টানে, কখনো লাঙ্গল টানে। কিন্তু প্রতিদানে তার উপর নেমে আসে নির্মম চাবুকের আঘাত। প্রতিবাদের ভাষা তার নেই, তাই তার অসহ্য যন্ত্রণায় দুচোখ বেয়ে জল পড়ে। এই শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস অবশ্য নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানবসভ্যতার এই সংগ্রাম আবহমানকাল ধরে চলে আসছে।

কৃষক পরিবারের বধূ আলতার জীবনের ধারা প্রকৃতির মতোই পরিবর্তনশীল। সে সুগৃহিণীর মতই নিজের যত্নে বারবার উনুন ভেঙে নতুন উনুন গড়ে তোলে। কাঁচা ন্যাতায় পা পড়লে সে আবার ন্যাতা দেয়। গোবর কুড়িয়ে ন্যায্য দামে ঘুঁটে বিক্রি করে। তিনসন্তানের জননী আলতার জীবন, তার স্বামী ইনসুরের ভালোবাসায় সমৃদ্ধ হলেও, নিত্যদিনের অভাব অনটনে সে জর্জরিত। পাশাপাশি ইনসুরের মেজাজের উপরও তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভরশীল। ইনসুর যখন আনন্দে থাকে, তখন এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও সে স্বামীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ আনন্দলাভ করে। কিন্তু কোন কারণে যদি ইনসুর মেজাজ হারিয়ে ফেলে, তবে বিনা দোষে আলতাকে চরম শাস্তি পেতে হয়। তাই ইনসুর যেদিন তার প্রিয় বাবলাতলার জমিটা মহরম কাজির কাছে বন্ধক দিতে বাধ্য হয়, সেদিনই আলতার কপালে জোটে চরম শাস্তি, 'আলতা হাত দিয়ে আড়াল করছিল। ইনসুরের ছড়ি হাতেই বেশি পড়ছে। বুকে চেপে বসল যখন তখন পাখির পাঁজরের মত ভেতরে সেঁদিঁয়ে গেল। চুলের মুঠই ধরেছে। এবার মাটিতে ঠুকছে।'[২৯] অবশ্য কৃষক স্বামীর এই মেজাজকে আলতা চেনে। তাই সে তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে, আবার পরম যত্নে ইনসুরের মেজাজ ও সংসার সামলায়। সে যেমন ভালোবাসা ও যত্নে স্বামীকে তৃপ্ত করে, তেমনি অন্তঃপুর ছেড়ে প্রয়োজনে মাঠে লাঙল পর্যন্ত টানে। আবার সমস্ত খাটুনির শেষে স্বামীর জন্য কাজলের টিপ পরে ও চুলে বিনুনি করে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। আলতার এই রূপ ও গুণ ইনসুরকে মুগ্ধ করে তোলে। বড়বাড়ির গিন্নির মতো আলতাকে সার্বিক সুখ ও নিরাপত্তা না দিতে পারার অসহায়তায় ইনসুর ব্যথিত হয়। তাই ইনসুর বাবলাতলার জমির বন্ধকী ছাড়িয়ে আলতাকে নিয়ে সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনে। আলতাও তাই তার তৃতীয় সন্তানের নাম দেয় 'রাজা'।

তবু সবকিছুর মধ্যেও আলতার নিরাপত্তার প্রশ্নে ইনসুর ব্যথিত হয়। আলতার মতো দরিদ্র নারীদের অনেক সময় নানা প্রয়োজনে অন্তঃপুর ছেড়ে মাঠে যেতে হয়। আর তাদের এই

অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করে মহরম কাজির মতো নারীলোভী বিত্তশালী পুরুষেরা। তবে কৃষকের জমি তারা দখল করতে সক্ষম হলেও, তাদের নারীকে দখল করা সবসময় সহজ হয় না। তাই এই মালিক শ্রেণি কৃষকের স্ত্রীর প্রতি খারাপ দৃষ্টির জন্য অনেক সময় বিপদে পড়ে। আলতাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখার জন্য অসন্তুষ্ট ইনসুর মহরমের দিকে ইচ্ছে করে গোরুদুটোকে ছেড়ে দেয়। এই ছোট ছোট ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে একসময় এই দরিদ্র, অসহায়, শোষিত কৃষক সমাজ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে এবং সংগ্রাম করে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেবে। যেভাবে বুদ্ধু ও সমীর গোরু হয়েও ক্ষুধার জ্বালায় অসহিষ্ণু হয়ে মালিক ইনসুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি মালিক শ্রেণির দ্বারা বঞ্চিত, শোষিত ও অত্যাচারিত কৃষকশ্রেণিও এক বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে লেখক এই ইঙ্গিতই দিয়েছেন, ‘চাবুকের আঘাতে মুখ ফিরিয়ে আচম্বিতে প্রথমে বুদ্ধু পরে সমীর ইনসুরের কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুখে টেনে নেয় নতুন গামছাটা। ইনসুর গামছা ধরে ঝুলে পড়ে। এদিক থেকে তীরবেগে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলতা। দুটি মানুষ দুটি পশুর সঙ্গে লড়াই করছে, এ লড়াই আসলে লড়াইয়ের আগের লড়াই।’[৩০]

## ৩) হাড়

লেখকের ‘হাড়’ ছোটগল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘শারদীয় পরিচয়’ পত্রিকায় ১৯৮৩ সালে। পরবর্তীতে এই ছোটগল্পটি তাঁর ‘সেরা ৫০ টি গল্প’ সংকলনে স্থানলাভ করে। মালিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির অবস্থানগত পার্থক্যের পাশাপাশি নারীর জীবনের চাওয়া-পাওয়ার কথাও এখানে বর্ণিত। জাতি ও ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে তা হয়ে উঠেছে নারীর সার্বজনীন চাহিদার কথা। এই চাহিদা পূরণে তারা ক্রমাগত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে চলে। মুনাফালোভী মালিকশ্রেণির অতিরিক্ত লোভ ও শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা মেটানোর প্রতি অনীহা যে কত দরিদ্র সংসারে ছন্দপতন ঘটায়, এই সত্য আফসার আমেদ আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন।

হাড় কারখানার মালিক শের আলি শ্রমিকদের কাজের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখলেও, হপ্তাবার শনিবারেও শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা না মেটানোর অজুহাত তৈরি করে। এদিকে সেদিন

প্রত্যেক বাড়ির রমণীগণ কিছু প্রয়োজনীয় ও কিছু সখের জিনিস পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কলিমের বৃদ্ধা মা ছেলের পয়সা নিয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় ধৈর্য হারিয়ে, কারখানা পর্যন্ত চলে যায়। কলিমের স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষায় স্বপ্ন বোনে। নিজেদের প্রয়োজনে হপ্তার দিন কলিমের মা ও যুবতি স্ত্রী, কলিমের কাছাকাছি যাওয়ার প্রতিযোগিতা করে, 'বুড়ি ছেলের আরো কাছে এসে বসে। 'হ্যাঁ বাবা, মোর ওষুধ এনেছিস তো? মনে মনে ধেয়ান করি বিনে চিকিচ্চেয় মলুম—নিজের মরদ চলে গেছে। ই হপ্তায় যা লেদি ছ্যালো সব লিলো মিদ্দেদের বউ। তিন ট্যাকা চারানা হল মোটে—তা চাল কিনতে ফুরলো—জ্বালানি তেল এই সাঁঝের বেলা মরে মরে কিনে আননু। এই ব্যায়রাম শরীরে আর গোবর আনতে পারিনি বাপ। পরনের কাপুড়টা ছিঁড়ে ফাঁতি ফাঁতি। ছিয়োত্তরের কাঙালি ঘুরচি।'[৩১] অন্যদিকে কলিমের বউ সুরাতুন একটি লাল জামার আবদার করে। দিনরাত বুড়ি জায়েদা, সুরাতনকে নানারূপে জ্বালাতন করলেও, হাপ্তার দিন সে কিন্তু কোন অশান্তি করে না। অন্যদিকে সুরাতন কলিমের ভালোবাসায় শাশুড়ির দেওয়া খোঁটা ভুলে যেতে চায়। মূলত এই দুই নারীর জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, মান-অভিমান বাড়ির রোজগেরে পুরুষ কলিমকে কেন্দ্র করে। একথা জানে বলেই, হাপ্তা না পাওয়ায় সেদিন কলিমের মাথা গরম হয়ে ওঠে। মা ও স্ত্রীর সামান্য প্রয়োজন মেটাতে না পারার অসহায়তা থেকেই সে রাগের মাথায়, ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে চলে যায়। তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই কলিম টাকা ধার করতে বেরিয়ে মাতাল হয় এবং ট্রেনে কাটা পড়ে। এই দুই অসহায় নারীর জীবনে নেমে আসে এক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার।

নবীরের স্ত্রী কোনো সন্তানের জন্ম দিতে না পারায়, নবীরের অবহেলা পেয়ে গেছে আমৃত্যু। অবশেষে এই অবহেলিত ও অসহায় নারী তার অকালমৃত্যুতে, জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। স্ত্রীর প্রতি অন্যায়কারী নবীর একদিন, বানভাসী এক রমণীর কান্নায় এবং বাবা ডাকে বিগলিত হয়ে নিজের সংসারে আশ্রয় দেয়। পরবর্তীতে আশ্রিতা কন্যার অসুস্থ স্বামী ফিরে আসে। কিন্তু সে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেও সংসারের হাল না ধরে, নিজের রোজগার মদ খেয়েই শেষ করে। অন্যদিকে নবীরের আশ্রিতা কন্যা ও নাতনি শুধুমাত্র টাকার লোভে বৃদ্ধের যত্ন করে। এমনকি তারা সম্পর্কের সমস্ত মাধুর্য ভুলে, আশ্রয়দাতার টাকাও চুরি করার চেষ্টায়

থাকে। মূলত এই সমাজের নর-নারীর জীবন থেকে, অভাব ও দারিদ্র্যের পেষণে মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে যায় এবং সম্পর্কের মধ্য থেকে কঙ্কাল বা হাড় বেরিয়ে পড়ে।

পাশাপাশি এখানে উঠে ধরা পড়েছে হারুর মেয়ে বাসন্তীর বিপর্যস্ত দাম্পত্যজীবনের কথা। নির্দয় অত্যাচারী স্বামী নকুলের নির্যাতনে 'গা ফেটে ফেটে অক্ত বাসুন্তীর'। এইভাবে এই সমাজের নারীর জীবনে কোন না কোনো দিক থেকে নেমে আসে বিপর্যয়। এই যন্ত্রণা কখনো দারিদ্র্যের জন্য, কখনো শাশুড়ি বা স্বামীর অত্যাচারে আবার কখনো স্বামী-সন্তানের অকালমৃত্যুর জন্য। পুরুষেরা মদ্যাসক্ত হয়ে নিজের দুঃখ ভোলার মধ্যেও নারীকেই যন্ত্রণা দিয়ে যায়। তার উপর মালিকশ্রেণির নির্মম, নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ তাদের জীবনের বেদনাকে করে ঘনীভূত, কখনো কারখানার শ্রমিক ছাঁটাই এর নামে, কখনো সময়মতো হাপ্তা না দেওয়ার মাধ্যমে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দরিদ্র কলিমের অকালমৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে কারখানার মালিক শের আলি দায়ী। যার ফলে সুরাতন ও বুড়ি জায়েদার জীবনে, হাড়ের মতোই নিরেট এবং কঠিন অন্ধকার নেমে আসে।

**৪) ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত?**

আফসার আমেদের 'ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত?' ছোটগল্পটির কেন্দ্রে আছে জুল্লু ও শাকু মিঞার মতো কৃষকের জীবনসংগ্রামের কথা। এই ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায়, ১৯৮৩ সালে। এই গল্পটিও পরবর্তীকালে লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' ও 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। জোতদার ইয়াকুব বা লুথুমিঞা, ডিপ টিউবওয়েলের মতো আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে, কম সময়ে অধিক জমি চাষের সুবিধা পায়। তাই তারা দরিদ্র ভাগচাষীদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার সুযোগ সন্ধান করে। লুথু মিঞার ভাগচাষী শাকুও তাই অন্যান্য কৃষকের মতো আতঙ্কগ্রস্ত। বারোমাসের প্রতিটি ক্ষণেই জমির মাটির সঙ্গে শাকুদের যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা কোনো অংশেই তাদের পরিবার বা সন্তানের থেকে কম নয়। আলোচ্য ছোটগল্পে লেখক আফসার আমেদ দেখিয়েছেন, জমির সঙ্গে একাত্ম একজন দরিদ্র চাষির জীবনে, জমি এবং পরিবারের পারস্পরিক নির্ভরতার কথা। তাই জমির উচ্ছেদ চিন্তার সঙ্গে, শাকুর ছোট মেয়ের পুকুরে পড়ে যাওয়া বা পঙ্গু স্ত্রী নসিবার মাচা থেকে

পড়ে যাওয়ার আশংকা এক হয়ে যায়। দরিদ্র ভাগচাষীর স্ত্রী নসিবার সূত্র ধরেই লেখক অন্যান্য বিত্তশালী ঘরের নারীর জীবনের স্বতন্ত্র অবস্থানও নির্দেশ করেছেন।

একটি পা সরু, পঙ্গু নসিবা দরিদ্রের ঘরণী হলেও শাকুর ভালোবাসা ও যত্নে, অনেক সুন্দরী ও বিত্তশালী ঘরের স্ত্রীর চেয়ে সুখী জীবন অতিবাহিত করে। নিত্যদিনের অভাবে সবসময় প্রয়োজনমতো খাবার না পেলেও, তিনটি সন্তান ও শাকুকে নিয়ে সে একজন যথার্থ গৃহকর্ত্রী। বিয়ের রাতে, পনের বছর আগেই তার পঙ্গুত্বের লজ্জা এবং শাকুর কুৎসিত চেহারার লজ্জা একাকার হয়ে যায়। শাকুর মনে বড়ভাবির 'ধোবো আর নিখুঁত পা' আর মেজভাবির আকর্ষণীয় শরীর দোলা দিলেও, নসিবা তার স্বামীর কাছে কখনো পঙ্গুত্বের জন্য আঘাত পায় নি। তেমনি শাকুর কুৎসিত রূপের মধ্যেও, নসিবা তার সহজ-সরল হাসিতেই মুগ্ধ হয়। অভাবের মধ্যেও শাকুকে খাওয়ানোর মধ্যে তার যত্ন ও আন্তরিকতা ধরা পড়ে। শাকুর জীবনসংগ্রামে পঙ্গু হয়েও সে সমানভাবে সহযোগিতা করে চলে। এমনকি লুথুমিঞার কড়া পাহাড়ার মধ্যেও, সামান্য ধান সরানোর কাজে শাকুকে, সে সহযোগিতা করে সাধ্যমতো। এক্ষেত্রে সে তার ঘরে সাপ ঢুকে পড়ার মিথ্যা ঘটনার আশ্রয় নেয়। আবার অশিক্ষিত হয়েও কিন্তু অন্যের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে সে বেশ সচেতন। তাই লুথুর স্ত্রী বড়ভাবির চার টাকা দরে চাল বিক্রির প্রসঙ্গ তুলে অসন্তুষ্ট নসিবা, শাকুকে বলে, 'নুচে খুঁচে কি আর বলতে পারি? বননু অত দরের চ্যাল খাবার কি মোদের জিব করচে বড়ভাবি—অর চ্যালে যেন সুনা লাগানো, একটা চ্যালে দুটো ভাত জম্‌বাবে।'[৩২] নসিবাকে সুরাপের স্ত্রীর মতো দিনরাত মার খেতে হয় না। আবার মুশাদের বিধবা যুবতী মেয়েটার মতো পেটের দায়ে ভিক্ষেও করতে হয় না। তার প্রতি শাকুর বিশ্বাস, ভালোবাসা ও মান্যতা তাই অনেকের কাছেই অত্যন্ত কাম্য।

নসিবার বড়খুকি লাইলি বাবার খুব আদরের মেয়ে। শাকু পরম মমতায়, আদরের মেয়ে লাইলির চুলের বেনুনি পর্যন্ত খুলে দেয়। যে বয়সের মেয়েরা স্কুলে যায়, তার আগে থেকেই লাইলিকে, মা-বাবাকে নানা কাজে সাহায্য করতে হয়। ক্রমে বিদ্যালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও তাদের নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজের অন্যান্য মেয়েদের মতোই সে বাড়ির কাজ থেকে শুরু করে, জমির কাজ, গোরুর ঘাস কাটা, ছোট ভাইকে সামলানো—সবকাজেই পারদর্শী হয়ে ওঠে। দারিদ্র্যের মধ্যে মানিয়ে নিয়েও লাইলি মাঝে মাঝে নতুন কিছু পাওয়ায় আবেগে

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। যদিও তার এই আবদারও, দারিদ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনা করে, 'বাপ, এবের মোটের ট্যাকা পেলে মোর তরে ছাপাশাড়ি এনে দিবি?'

এই গল্পের বড়ভাবি ও মেজোভাবি সম্পদে, ঐশ্বর্যে, গয়না ও পোশাক পরিচ্ছদে সর্বোপরি শারীরিক সৌন্দর্যে নসিবার চেয়ে আপাতদৃষ্টিতে অনেকগুণ উন্নত। বড়ভাবি বছর বছর গয়না গড়ায়। যখন নসিবার ঘরে চালের অভাব, তখন সে জমিয়ে রাখা চাল চড়া দামে বিক্রি করে। শাকুর কাছ থেকে ভাগচাষের কোনচৌকির জমিটা হাতানোর চেষ্টায় থাকে। এতকিছু পেয়েও তার মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে চলে সারাক্ষণ। স্বামীসোহাগী নসিবাকে তাই নিজের দুর্ভাগ্যের কথা প্রসঙ্গে সে 'বলেছিল, শ-রে ব্যবসা, শ-রের ছুঁড়ি মরদটার মাতা খেয়ে লিল—সতীনের জ্বলনের কথা গো!' তার স্বামী লুথুমিঞা কমলপুরের বাজারের বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গেই বেশি থাকে। বড়ভাবি সে যন্ত্রণা ভুলতেই হয়তো বছর বছর গয়না গড়ে, চালবিক্রি করে, জমির হিসেব করে। আর এইভাবেই সে জীবনের বিকল্প সুখ খুঁজে নিতে ব্যস্ত থাকে। অন্যদিকে ইটখোলার মালিকের স্ত্রী মেজোভাবিকেও স্বামীর অপেক্ষায় বিবি সেজে থাকতে হয়। স্বামীর মনকে ধরে রাখার অবিরাম চেষ্টায় তার এই সাজসজ্জা। সোনার গয়না ও নক্শাকাটা শাল প্রভৃতিতে সে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলে। তবে তাদের এই ঐশ্বর্যের অন্তরালে সঙ্কীর্ণ মনোজগতের পরিচয় পাওয়া যায় শাকুর কুৎসিত চেহেরা ও শীতের সজ্জাকে কেন্দ্র করে হাসি ও তামাশা করার মধ্য দিয়ে। যেখানে বড়ভাবির মতো নারী, জীবনের সমস্ত কোমলতা হারিয়ে, মানবতাহীন লুথুমিঞা ও ইয়াকুব আলির মতো জোতদারের দোসর হয়ে ওঠে।

**দারিদ্র্যপীড়িত নিম্নবিত্ত সমাজে 'শহরমুখো পুরুষ' ও মুসলিম নারীর জীবন প্রসঙ্গঃ**

উপরিউক্ত আলোচনায় গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরের একটি সুস্পষ্ট চিত্র উঠে আসে। গ্রামের কৃষকেরা জমি হারানোর পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রের আগমনে ক্রমে কর্মহীন হয়ে পরে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী এইসমস্ত কর্মহীন, গ্রামীণ, অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ সমাজের মানুষেরা ক্ষুধার হাতে বন্দী। প্রধানত পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা এই দুটোর দ্বারা-ই তারা চালিত। তাই গ্রামের সিংহভাগ পুরুষ, পিতৃপুরুষের দেওয়া চাষের জমি মহাজনের কাছে

হারিয়ে দিয়ে, পরিবারের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বাধ্য হয়ে শহরে যায়। কিন্তু কোনো কোনো পুরুষ 'শহরে গিয়া মাগেদের মুখ ভুলে যায়। নদী দিয়া হাট, হাট পেরিয়ে বাস, বাস হতে ইস্টিশান, তারপরেতে ঝকাঝক রেলগাড়ি। শহর। উঁচা উঁচা মোকাম, গাড়িঘোড়া, লোকজন, ফরশা ফরশা মেয়ে। হাতে ঘড়ি, পায়ে উঁচা জুতা। ভাতারগুোর তাক লেগে গেছে। মুখে লাথি তোদের। ফি শনিবার শনিবার কত মরদ আসে, তোরা আসিস না কেনে? তোদের মন ভোলায় কোন সতীন, তারে পাইলে নুচে খুঁচে মারুম। শহর শহর জানের বালাই, তুই রূপসী সব্বনাশী, মরদগুলানকে আঁচলে বাঁধিস।'[৩৩] এরফলে জিন্নতবেগমের মত নারীরা অন্যপুরুষের ধর্ষকামী চাহনির সঙ্গে, ক্ষুধার সঙ্গে এবং শারীরিক ও মানসিক বিরহের সঙ্গে সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকে। অনেক পুরুষস্বামী আবার মাঝে মাঝে আসে এবং দরিদ্র পরিবারে আর একটি সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ, সমাজ-বাস্তবতার এই চরম সত্যকে তুলে ধরেছেন নারীরই বয়ানে, 'ই কেবল কুলশনের নশিব নয়, সারে গাঁ কে নসিব'।

## ১) জিন্নতবেগমের বিরহমিলন

আফসার আমেদের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম হল 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় গল্পসংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায়, ১৯৮০ সালে। পরবর্তীকালে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয় এই গল্পটি। গ্রামীণ, অশিক্ষিত ও দরিদ্র মুসলিম সমাজে নারীর এক যন্ত্রণাময় জীবনের আলেখ্য হল 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন' ছোটগল্পটি। অন্যদিকে বিত্তবান জিয়াদ শুকটি ঘরে চারজন বউ রেখেও, অন্য নারীর প্রতি খারাপ দৃষ্টিপাত করে। এরফলে জিন্নতের মত নারীর জীবন যেমন সংকটের সম্মুখীন হয়, তেমনি জিয়াদের স্ত্রীদের মানসিক যন্ত্রণা আরও ঘনীভূত হয়। তাছাড়া স্বামীকে পুরোপুরি না পাওয়ার যন্ত্রণা, সপত্নী কলহ ও যৌনক্ষুধার তাড়নায় আক্রান্ত হয়ে তারা কিভাবে নোংরামি করতে পারে, তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। একথা সত্য যে, এই সমাজের নারীরা যে স্বামী, সন্তান ও সংসারকে কেন্দ্র করে সুখী দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন দেখে, তা থেকে কোন না কোন ভাবে তারা বিচ্যুত হয়।

লেখক জিন্নতের মধ্য দিয়ে, নারীর মর্মান্তিক বিরহবেদনাকে রূপায়িত করেছেন। জিন্নতের ছয়মাসের বিবাহিত জীবনে মাত্র দুই মাস স্বামীর সান্নিধ্য পায়। বিয়ের দুই মাসের মধ্যে তার স্বামী করিম প্রতি শনিবার করে শহর থেকে বাড়ি ফিরে এলেও, পরের চারমাস তার কোন খবর পায় নি জিন্নত। এই চারমাস সধবা হয়েও জিন্নত একজন বিধবার মত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। নববিবাহিত জিন্নতের রূপ-যৌবনে ভোরে ওঠা শরীরের প্রতি আসাদ বক্সের মতো পুরুষদের লোভার্ত দৃষ্টিকে সে উপভোগ করে। মুদিখানার অল্পবয়সী দোকানদার নিয়াজ ছোঁড়া, মসজিদের কোরানপাঠকারী মুশুল্লি, বিত্তশালী জিয়াদ মোল্লা থেকে শুরু করে তার বাড়ির চাকর গোঙাও তার সুন্দর শরীরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে অন্যান্য পুরুষের প্রতি জিন্নত বিরক্ত হলেও, বোবার প্রতি কিন্তু তার একটা সহানুভূতি তৈরি হয়। কারণ বোবার মধ্যেও জিন্নত একটা অনুভূতির সন্ধান পায়। অথচ তার স্বামী তাকে ভুলে আছে চারমাস। তাই জিন্নতকে ক্ষুধার অন্নের জোগাড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে জিয়াদের বাড়ি কাজ করতে হয়। কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা ও বয়সোচিত শারীরিক ক্ষুধায় সে তাড়িত। এই সংকট থেকে মুক্তির আশায়, প্রতি শনিবার বাহারনের মা, মর্জিনা, বদরুর মাগের সঙ্গে সেও নদীর ঘাটের ধারে বসে করিমের অপেক্ষা করে। স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য বারবার গ্রামের বড়কান পীরের কাছে মানত করে, মাথা ঠোকে। সে দুহাত ভোরে স্বামী জাগানিয়া চুরি পরে।

স্বামীবিরহে কাতর নববধূ জিন্নত বাল্যসখী কুলশনের, স্বামীর সোহাগের দৃশ্য ভয়ে এড়িয়ে যায়। কারণ সেই দৃশ্য তার শরীর ও মনকে আরও উতলা করে। তার মনকে উতলা করে জিয়াদের বড়ছেলে ও তার সৎমায়ের সান্নিধ্যের দৃশ্যও। পুরুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকে জিন্নতবেগম। তাই জিয়াদের বড়খোকা তার গাল টিপে দিলে বা তার রূপের প্রশংসা করলে জিন্নত মনে মনে খুশি হয়। জীবনে বেঁচে থাকার সমস্ত আনন্দ উপভোগে প্রয়াসী জিন্নত একসময় করিমের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। যে স্বামী চারমাস তার কোন খোঁজ নেয় না, তার মুখে লাথি মারার কথা বলে জিন্নত। এমনকি স্বামীর প্রতি অভিমানে, সে একসময় গ্রামের অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কথাও মনে মনে ভাবে, ‘ভাতারের মুখে লাথি দিই। শহরে থাক। মুই এই গাঁয়ে খেল দেখামু। ‘ও কালোসোনা। আসবে বলে কথা দিলা। কেন এলে না। তোমার তারে সাজিয়ে ছিনু ফুলের বিছানা...।’[৩৪]

সমাজবাস্তবতার দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায়, স্বামী দূরে থাকায়, গ্রামের কিছু ধর্ষকামী পুরুষ, নবযুবতী জিন্নতদের জীবনের সংকটকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। তাই রাতের অন্ধকারে জিয়াদের হিংস্র দৃষ্টির সামনে অসহায়, ভীত, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জিন্নত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই জ্ঞানহারা জিন্নতকেই যখন বাঘের মতো নিষ্ঠুর, মানবতাহীন জিয়াদ ধর্ষণের জন্য একটি ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায়, তখন তাকে রক্ষা করে জিয়াদের চাকর, সেই বোবাটি। এক্ষেত্রে গোঙা মানবতার জায়গা থেকে তার মালিকের বিরোধিতা করার সাহস দেখায়, সে জিয়াদের মাথায় লাঠির আঘাত করে। জিন্নতের সম্মান রক্ষা করে নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই। জিন্নতের ইচ্ছে হয়, তার ঘরে গোঙাকে ধরে রাখতে। কিন্তু ঘুমের আচ্ছন্নতায় সে তা পারে না। অথচ সেই রাতেই ঘটনাচক্রে তার স্বামী ফিরে আসে। কিন্তু তাতে যেন জিন্নত খুশি হতে পারে না। শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত জিন্নতের কান্না পায়। তবু সামাজিক নিয়মে স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে, সে হাসতে বাধ্য হয়। যদিও সে জানে, করিমের এই আগমন ক্ষণিকের জন্য মাত্র। তারপর স্বামীর অবর্তমানে আবার তাকে জিয়াদের মত পুরুষের কামনার সঙ্গে এবং ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করেই বাঁচতে হবে।

জিন্নতের সই কুলশনের সন্তান জন্মদানের সূত্র ধরে লেখক প্রসূতি মায়ের জীবনসংগ্রামের, এক জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থ ও চিকিৎসার অভাবে, আসন্নপ্রসবা নারীদের জীবনে চরম সংকট থেকে মুক্তি পেতে একমাত্র ভরসা, সে গ্রামেরই অশিক্ষিত মহিলারা, সমাজ অভিজ্ঞ লেখক তা দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। উপরন্তু প্রসূতি মায়ের যন্ত্রণাকে আরও বেশি ঘণীভূত করে কন্যা সন্তান জন্মদানের আশঙ্কা। দুই কন্যাসন্তানের জননী কুলশনও এই আশঙ্কায় জর্জরিত। তাছাড়া কুলশনের এই প্রসবযন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে তোলে ক্ষুধা ও স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি। তাই সে প্রসবযন্ত্রণার মধ্যেও প্রিয় মানুষটির জন্য আর্তনাদ করে ‘ওগো হাসিনার বাপ, তুমি দেড়মাস ঘরে আয়সনি গো ও ও ও...ট্যাকাও পাঠাও নাই, পেটেও দানা নাই, ব্যথা খাইতে খাইতে মইরে যাইছি, জু চেঁদিয়ে যায়ছে, মোর মরা মুখে দেইখতে শহর হইতে গাড়ি ধইরা লৌকো করে এসো গো ও ও ও...।’[৩৫] যেখানে একজন গর্ভবতী মহিলার নিয়মিত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর খাবার দরকার, সেখানে স্বামীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়, কুলশনের মত অনেকেই দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

যদিও একসময় কুলশনের মনে হয় 'হাসিনার বাপ আইলে নুচে খুঁচে মারুম'। কিন্তু স্বামীর প্রতি ক্রোধে নয়, তাকে কাছে পাওয়ার আকুলতাতেই তার এই অভিমান। তাই ছেলে হওয়ার আনন্দে ও স্বামীর আগমনে, সব অভিমান ভুলে, সে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং পরবর্তী সন্তান ধারণের জন্য প্রস্তুত হয়।

প্রসবযন্ত্রণায় কাতর কুলশনকে যারা আন্তরিক সহযোগিতা করে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল আসমানির মা। এই দরিদ্র রমণী ক্ষুধার্ত কুলশনকে নিজের হাড়ির শেষ আমানিটুকু অতি যত্নে খাইয়ে দেয়। সে জানে কুলশনের প্রসবযন্ত্রণার সময় এই আমানির প্রয়োজনীয়তার কথা। কুলশনকে মাঝে মাঝে গালমন্দ করলেও, তার সার্বিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি একজন দায়িত্বশীল প্রতিবেশীর পরিচায়ক। রসিকতা, সত্যবাদিতা এবং অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে আসমানির মা গল্পে স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় দেয়। স্নেহময়ী এই মহিলা যে প্রয়োজনে কঠোর হতে পারে, তার প্রমাণ পায় কুলশনের প্রতি তার কর্তব্যপালনে। স্পষ্টভাষী নারীটি আবার কোন কিছুর পরোয়া না করে, যেকোন অন্যায়ের প্রতিবাদও করতে পারে। তাই কুলশনের শাশুড়ি, আগের দুটো মেয়ের জন্ম দেওয়ায় বা তার ছেলের বাড়ি না আসার জন্য কুলশনকে খোঁটা দিলে, আসমানির মা তার যোগ্য জবাব দিয়ে বলে, 'যা লো এখেন থিকে বুড়িমাগি, তোর ভাতারও তরে ছাইড়া থাকত, ইনিদ বিনিদ কত কাঁদতিস মনে নাই? এই গাঁয়ের মরদরা সককলেই শহরে গেলে ভেড়া হইয়ে যায়। ই কুলশনের নশিব নয়, সারে গাঁ কো নসিব। শহরে মন ভুলাইতে সবকিছু আছে, অ্যাত দূর পথে মরদগুলো মাসে-মাসে হাপ্তায়-হাপ্তায় আইলে যে গ্যাঁজায় টান পইড়বে গা। যা বুড়িমাগি।'[৩৬]

কুলশুনের শাশুড়ি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে যায়। একজন নারী হয়েও পরপর দুটো কন্যার জন্ম দেওয়ায়, সে পুত্রবধূকে খোঁটা দিতে থাকে। তার ছেলের বাড়ি না ফেরার জন্যও সে কুলিশনকেই অপরাধী করে। প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলের এহেন অপরাধে সে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়। বাংলার সমাজ জীবনে চিরাচরিত শাশুড়ি বধূর তিক্ত সম্পর্কের প্রতি লেখক আলোকপাত করেছেন। একজন সহানুভূতিশীল মানুষরূপে সে কুলশনের এই দুর্দিনে পাশে না দাঁড়িয়ে, পুনরায় কন্যাসন্তান জন্মদেওয়ার জন্য শাসায়। এমনকি খুকি হলে তার মুখে নুন দেওয়ার মতো নিষ্ঠুর প্রস্তাবও সে দেয়। আবার যখন খোকা

হওয়ার খবর শোনে তখন উল্লসিত হয়ে, মধুর জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পুত্রসন্তানের প্রতি নারীসমাজের এই অযৌক্তিক দুর্বলতা জাতি-ধর্মনির্বিশেষে আজও বেশিরভাগ পরিবারেই লক্ষ্যনীয়।

'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' ছোটগল্পে আফসার আমেদ মূলত মুসলিম নারীর জীবনের সার্বিক পরিচয় দানে দেখিয়েছেন যে, তারা নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েও, স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষায় শনিবার সন্ধ্যা থেকেই নদীর ঘাটে এসে বসে। যে স্বামী, দিনের পর দিন মর্জিনাকে ভুলে শহরে পড়ে থাকে, তার অসুস্থতার খবরে মর্জিনা স্বামীর প্রতি সমস্ত অভিমান ভুলে যায়। অসুস্থ স্বামীকে সুস্থ করার তাগিদে সে পীরের দরগায় মানত করে। নিজের সর্বস্ব দিয়ে স্বামীকে বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত করে সে। বদরুর নতুন বউও স্বামীর ব্যর্থ অপেক্ষায় নদীর ঘাটে অবিরাম চোখের জল ফেলে, স্বামীবিরহে কাতর এই নববধূর 'বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতেছে তাই'। রওশনের বউ-ভাবি ক্ষুধার্ত সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে না পারার যন্ত্রণায়, স্বামীর ব্যর্থ অপেক্ষায় ধৈর্য হারিয়ে কোলের ছেলের মৃত্যু কামনা করে। আবার পরক্ষণেই 'চুমু দেয় কচিটারে'। এইভাবে 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে লেখক নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজে অবস্থিত, নারীজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানকে বাস্তবসম্মত রূপ দিয়েছেন। ভাষাব্যবহার থেকে শুরু করে বাহ্যিক আচার-আচরণ ও অন্তরের বেদনা প্রকাশে, নারীজীবনের এক প্রাণবন্ত রূপ তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর কথাসাহিত্যে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে।

### ২) জিন্নত বেগমের দিবসরজনী

'জিন্নত বেগমের দিবসরজনী' ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় প্রতিক্ষণ পত্রিকায়, ১৯৮৫ সালে। পরবর্তীতে গল্পটি 'আফসার আমেদের ছোটগল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। মূলত এই ছোটগল্পটি 'জিন্নত বেগমের বিরহমিলন' ছোটগল্পের একটি পরিবর্ধিত রূপ। উক্ত গল্পে আমরা দেখেছি, গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরে, গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত পুরুষসমাজ রুজি ও অর্থের টানে শহর কলকাতায় ছুটে যায়। সপ্তাহান্তে কিছু কিছু পুরুষ গ্রামে ফিরে এলেও, জিন্নতের স্বামী করিম বক্সের মতো বেশ কিছু পুরুষ, শহরের চাকচিক্যে পরিবারকে ভুলে যায়

বা দ্বিতীয় সংসার পাতে। তারা কালেভদ্রে গ্রামে ফিরে এসে, কুলসন ও জিন্নতদের গর্ভে সন্তান দিয়ে, আবার চলে যায়। তাই পেটের দায়ে ও গর্ভের সন্তানের জন্য জিন্নতেরা মাঠে-ঘাটে, অনেকসময় শহরে গিয়ে কাজ করে, চাল বিক্রি করে। ফলে স্বামী জাগানিয়া শৌখিন কাচের চুড়ি পরে, স্বামীর সঙ্গে সংসার করার স্বপ্নসাধ তাদের ভেঙে যায়।

তাছাড়া চালের বস্তা বইতে গিয়ে, কাচের চুড়িতে ঘষা লেগে, জিন্নতের হাত রক্তাক্ত হয়, তাই তার আর চুড়ি পরা হয় না। ছয়-সাত মাসের গর্ভবতী হাসিনার এই জীবনসংগ্রাম, গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত সমাজের একটি অতিপরিচিত চিত্র। অনেকদিন ধরেই স্বামী করিম বক্সের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত জিন্নত। করিমের দ্বিতীয় বিয়ের খবর পেলেও, জিন্নতের মনে হয়, শহর কলকাতাই হল তাদের সতীন, স্বামীকে মাসের পর মাস ধরে রাখে। আফসার আমেদ বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও সেই সমাজের ভাষারীতি অনুসরণ করে, জিন্নতের বিরহকাতর নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা ও স্বপ্নসাধকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, ‘ঘরে কেউ নাই। দোকা নাই। একলা থাকতে মোর কষ্ট হয়। এখুন যেমুন রজবমিয়া গায়ের কাছে খুঁটির পারা বইসে আছে টলোমলোয় হাত বাড়ায়ে থির থাকি। তেমন ভিতে উসরা কোণে কেউ থাকুক। কুকুর না হয় মানুষ গো। ন্যাতা দিই রোজ ঝুজকোয়, ধ্যাবড়া পায়ে মানুষ উঠলে বসলে তবু সুখ পাই ফি ন্যাতা দিতে। ভাতার চাই না মানুষ চাই। আঁধার ঘরে টিকটিকি হয় বাঘের পারা। গাছে গাছে হিসহিসিনি। ঘাটে গেলে মন পড়ে নাই ঘরের পানে। উঠুনেতে হাঁটুগেড়ে নাই কেউ। ই-ঘর সি-ঘর পাড়া বুলে ঘরে ফিরি গারাস যেন। পাখি ত নাই টুকুনখানি আদর করে খাঁচায় পুরে রাখি। দুলায়ে দিই একটুস।’[৩৭]

এই অশিক্ষিত নারীরা গর্ভের সন্তানদের ‘কু-লজর’ থেকে বাঁচাতে ‘নীলপড়া ও তাবিজগুলা’র উপর নির্ভর করলেও, সন্তানজন্মের সংকটময় পরিস্থিতির কথায় তারা বারবার তাড়িত হয়। একাকি ধর্ষকামী পুরুষের ‘কু-লজরের’ সঙ্গেও প্রতিনিয়ত তাকে সংগ্রাম করে যেতে হয়। এমনকি ‘একা মানুষ, মরে গেলে তালাশ করার কেউ নাই ত দূরের থাকার সামিল’। তাই জিন্নত এই গ্রাম ছেড়ে, করিমের সঙ্গে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে, রজব সেখের সঙ্গে নতুনহাটে, নতুন জীবন গড়ে তোলায় প্রত্যাশী। কিন্তু করিমের আকস্মিক আগমনে, জিন্নতের সেই স্বপ্নসাধ ভেঙে যায় ‘বুকের কথা উতাল করা নতুনহাট বুকেই থাকে’। আমরা

জানি জিন্নত, করিমের জন্য আজ রজবকে প্রত্যাখ্যান করলেও, করিম আবার যখন শহরে ফিরে যাবে, তখন আর তার রজবের কাছে ফেরা হবে না, তখন অনিঃশেষ বিরহে কাটবে তার দিবসরজনী, আর এটাই তাদের নিয়তি।

### ৩) বিরহ

লেখকের 'বিরহ' ছোটগল্পটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এটি প্রকাশিত হয় 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় ১৯৮৮ সালে। পরবর্তীতে গল্পটি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' ও 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনে স্থান পায়। 'বিরহ' ছোটগল্পের প্রধান চরিত্র সইফুর বিরহের অন্তরালে, প্রকৃতঅর্থে বিরহযন্ত্রণায় কাতর হয় তার স্ত্রী বদরন। সইফু বিয়ের চারমাস পরেই নববিবাহিতা স্ত্রী বদরনকে ছেড়ে চলে যায়। ঝালাইয়ের কাজ করতে করতে সে গিয়ে উপস্থিত হয় রামপুরহাটে। সেখানে লরিতে পাথর উঠানো-নামানোর পাশাপাশি সে সাট্টার নেশায় সে এতোটাই মত্ত থাকে যে, পাঁচ বছরেও তার বদরনের কথা মনে পড়ে না। এই দীর্ঘসময়েও সে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসার 'টেইম' পর্যন্ত পায় নি। কিন্তু জীবনের দীর্ঘ পাঁচ বছর দারিদ্র্যপীড়িত, বিরহকাতর, অসহায় বদরনের স্বামীর অপেক্ষায় কাটানো যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সইফুর স্মৃতিচারণায় স্বামীর প্রতি বদরনের নির্ভরতা ও ভালোবাসার কথাই প্রকাশিত। রক্তস্নাত সইফুর যন্ত্রণায় যেমন সে অঝোরে কেঁদে ফেলে, তেমনি আবার ভয় পেলে পরম আশ্বাসে সইফুকে জড়িয়ে ধরে। অথচ এই পাঁচ বছরে সইফু একবারও তার বিবাহিত স্ত্রীর কাছে ফিরে আসার বা খোঁজ নেওয়ার কোনো প্রয়োজনবোধ করে নি। সে তার সাট্টার নেশার দরুন বদরনকে দাম্পত্যজীবনের সমস্ত আনন্দ ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে গেছে। দিনের পর দিন বদরন তার স্বামীর অপেক্ষায় থেকেছে। শেষপর্যন্ত সইফুর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে তার বিরহ ও অপেক্ষার দিন শেষ হয়েছে এবং জীবনের তাগিদে 'বদরন ঘর বদল করেছে। হাসিবুলের কাছে সইফু জেনেছে সব বৃত্তান্ত। হানিফ বিয়ে করেছে বদরনকে। ভ্যান চালায়। দেওড়ার বাঁধকোলে ঘর হানিফের। ভেতরের পাড়ায় সইফুর ঘর। এই কয়েক বছরে সইফুর ঘর ভেঙে যায়। চাল ফুটো হয়। বর্ষায় দেয়াল পড়ে যায়। দাদা রব্বানি আর ভাবি বদরনকে আশ্রয়

দিয়েছিল। সইফুর মারা যাবার খবর পেয়ে দাদা রব্বানি শ্বশুর আর পাড়ার মৌলবিসাহেব হানিফের সঙ্গে বদরনের বিয়ে দিয়ে দেন। হানিফের বউ মরে গিয়েছিল।'[৩৮]

স্বাভাবিকভাবেই পাঁচ বছর পর হঠাৎ করে প্রথম স্বামী সইফুর আমতাগ্রামে ফিরে আসা, বদরনের জীবনকে এক চরম সংকটের মুখে দাঁড় করায়। যদি সইফু স্ত্রীর দাবী নিয়ে, তার সামনে আসে, তাহলে বদরনের জীবনে আর এক যন্ত্রণার ইতিহাস রচিত হবে। অথচ এক স্বামীর তাকে অকারণে ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে যেমন তার কোনো হাত ছিল না, তেমনি আবার হানিফের স্ত্রী হওয়াতেও তার কোনো ভূমিকা নেই। একজনের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অন্য আর একজনকে স্বামিত্বে বরণ করার মধ্যেও যে তার জীবনের সংকট ঘনীভূত হয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে সইফু বদরনের পুনর্বিবাহে যন্ত্রণাকাতর হলেও, শেষপর্যন্ত আবেগতাড়িত হয় নি। তাই সে নিজের হাতে তৈরি, এই সত্যিকারের বিরহকাতর পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, 'পাঁচবছর বদরনকে ছেড়ে থেকে, পাঁচবছর পর ফিরে এসে একইভাবে বদরনকে দেখবে তা হয় না। বদরনের অবস্থান বদলে যেতে বাধ্য। যেমন রকম আমতা শহর বদলে গেছে।'[৩৯] সইফুর এই সিদ্ধান্তে বদরনের জীবন একটি স্বস্থিত ভূমি খুঁজে পায়, স্বস্তি পায় আমতা গ্রামবাসী ও সমাজও।

**৪) আর্তি**

আফসার আমেদের 'আর্তি' ছোটগল্পটি আপাত দৃষ্টিতে একজন পুরুষের জীবনসংগ্রাম ও অসহায় আর্তির কথা মনে হলেও, এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, স্বামীহারা নারীর জীবনের এক চিরাচরিত আর্তির কথা। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় 'কালান্তর' পত্রিকায়, ১৯৮৯ সালে। পরবর্তীতে তা লেখকের 'সেরা ৫০ টি গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'আর্তি' ছোটগল্পের কেন্দ্রে আছে মোতাহার। মোতাহার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী সালেহা ও তিনজন সন্তানকে বঞ্চিত করে, পূর্বপ্রেমিকা মাসুরাকে সামান্য ধান দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে না। অন্তরে একজন নারীকে ধারণ করেও সংসারে স্ত্রীর প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয় সে। মোতাহারের অন্তরের এই গোপন আর্তির মধ্যে, আমরা হাজার হাজার রমণীর অসহায় আর্তিকেই খুঁজে পায়। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ নারীর অসহায়তা ও আর্তিকে নয়, পুরুষের বেদনাময়

অসহায় আর্তিকেও এই গল্পের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারই সূত্রে ধরে উঠে এসেছে মাসুরা ও সালেহার জীবনের কথা।

এখানে দেখা যায়, পরীর মত সুন্দরী মাসুরা তার অপরূপ রূপের মাধুর্যে, একসময় মোতাহারের মনে প্রেমের ঝড় তুলেছিল। কিন্তু বদুর সঙ্গে তার বিয়ের মধ্যেই এই প্রেমের সমাপ্তি ঘটে। নববধূ মাসুরা বিবাহিত জীবনের পরিতৃপ্তিতে, দেহে ও মনে কানায় কানায় ভরে ওঠে। রাজমিস্ত্রি স্বামীর রোজগার ও ভালোবাসায় সন্তানদের নিয়ে বেশ সুখী জীবন ছিল তার। আর তার শারীরিক সৌন্দর্যের মধ্যেই সেই সুখের বহিঃপ্রকাশ ঘটত। কিন্তু মুসলিম সমাজের অনেক নারীর মতোই মাসুরার এই সুখ বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। কারণ 'দু-বছর হল মাসুরার স্বামী নিরুদ্দেশ। রাজমিস্ত্রির কাজ করত হাওড়া শহরে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে অন্য প্রদেশের শহরেও কাজে যেত। এমনি দু-তিন মাস বাইরে বাইরে থাকত। এমনি করেই মাসুরার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। মাসুরা হারিয়ে ফেলে বদুকে। এই দু-বছরে মাসুরা তার রূপ যৌবন শরীর স্বাস্থ্য ও পরিতৃপ্ত মনকে হারিয়ে ফেলেছে।'[৪০] শেষপর্যন্ত নিজেকে ও সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে মাসুরা নোংরা শাড়ি পড়া, এক শ্রীহীন ভিখারিনীতে পরিণত হয়। এমনকি এক সময়ের প্রেমিকপুরুষ মোতাহারের কাছেও তার বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণ চাল ও টাকা ছাড়া আর কিছু চাওয়ার থাকে না। ক্ষুধার জ্বালায় সে লজ্জা, সংকোচ, প্রেম ও সৌন্দর্য সবই হারিয়ে ফেলে। একটি সুন্দর জীবন বদুর মতো পুরুষের স্বার্থপরতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। মাসুরার এই করুণ, দীনহীন জীবনের বেদনা মোতাহারকে বিচলিত করে। কিন্তু তার মতো গরিব চাষির পক্ষে স্ত্রী-সন্তানের কষ্টার্জিত মুখের গ্রাস, মাসুরাকে তুলে দেওয়া সম্ভব হয় না। এই অসহায়তার যন্ত্রণায় সে বিনিদ্র রাত্রি যাপনে বাধ্য হয়। লেখকের সহানুভূতিশীল মন কেবলমাত্র অসহায় নারীজীবনের বর্ণনাতেই আবদ্ধ নয়, পুরুষের জীবনেও যে এই অসহায়তা বর্তমান, তারই বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এই ছোটগল্পে।

'আর্তি' ছোটগল্পের আর একদিকে আছে মোতাহারের স্ত্রী সালেহা। সেও মাসুরার মত একজন সাধারণ গৃহস্থ রমণী। স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার থেকে শুরু করে, চাষের কাজ পর্যন্ত সমানভাবে করে। এমনকি স্বামীর ভাবনা ও চিন্তার জগতেও সে নিজেকে একাত্ম করায় প্রয়াসী। তাই সে মাঝে মাঝে মোতাহারের ভাবনার জগৎ ছুঁতে না পারার যন্ত্রণায় আহত

হয়। স্বামীর উপর অভিমান করে। সংসারে সকলের মুখে খাবার তুলে দিতে পারার আনন্দেই সে তৃপ্ত। যদিও অন্যান্য নারীর মতোই নতুন শাড়ি, সায়া বা ব্লাউজ পাওয়ার অনেক সাধই তার অপূর্ণ থাকে। তবে মোতাহারের ভালোবাসার উষ্ণ সান্নিধ্যে, সে সেই অপূর্ণ সাধের কথাও ভুলে যায়। কিন্তু মাসুরার বর্তমান করুণ অবস্থা যেমন মোতাহারকে বেদনার্ত করে, তেমনি সালেহাকে মাঝে মাঝেই ভীত ও সন্ত্রস্থ করে তোলে, 'তুমি কারো মতো যদি বিবাগী হয়ে কোথায় চলে যাও, সে জন্যে খুব ভয় হয়।'[৪১] এই ভয় গ্রামে বসবাসকারী অনেক মুসলিম নারীর। এখনো গ্রামবাংলার অনেক নারীই নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর স্বার্থপরতা ও দায়িত্বহীনতায় সন্তানদের নিয়ে এক চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। কেউ কেউ অন্য লোকের বাড়ি কাজ করে, কেউ মাসুরার মতো ভিক্ষা করে সন্তানদের প্রতিপালন করে। অন্যদিকে বদুর মতো অনেক স্বার্থপর পুরুষই স্ত্রী-সন্তানদের ভুলে গিয়ে, শহরাঞ্চলে নতুন সংসার পাতে। পশ্চিমবঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজে নারীজীবনের এই সমস্যা ও সংকট একবিংশ শতাব্দীতেও নির্মূল হয় নি। তবে একথা সত্য যে, আজ টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও নেট ব্যাঙ্কিং এর মধ্য দিয়ে, শহরে কর্মরত স্বামীর সঙ্গে তাদের সবরকম যোগসূত্র রক্ষিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা আশার কথা।

## প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গঃ

### ১) বসবাস

১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়াবহ বন্যা হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আফসার আমেদের 'বসবাস' উপন্যাসটি রচিত। এই উপন্যাসের প্রথম অংশ 'স্রোত' নামে ১৯৮৭ সালে, শারদীয় 'জাগর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই বছরেই এর দ্বিতীয় অংশ 'বসবাস' নামে শারদীয় 'কালান্তরে' প্রকাশিত হয়। পরের বছর ১৯৮৮ সালে এই দুটি অংশ একত্রে 'বসবাস' নামে, 'বাকশিল্প' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বন্যাকবলিত কুলিয়া গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন মানুষের জীবনধারণের বৈচিত্র্যময় আকুলতা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। বন্যায় সর্বস্বান্ত দরিদ্র, শস্যনির্ভর মানুষের করুণ অবস্থার পাশাপাশি মতিন মাস্টার ও শরিফুল প্রধানের স্বচ্ছল পরিবারের সুব্যবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন লেখক,

তাতে দুটি বিপরীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের নর-নারীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ধারার চিত্রটি আরও সুস্পষ্ট হয়েছে এই উপন্যাসে। এই দুর্যোগে মতিন মাস্টার ও শরিফুল প্রধানের বউ যেখানে তক্তপোষে বসে বসে মাংস-ভাত ও পান খেয়ে, গল্প করে সুখে জীবন অতিবাহিত করেছে, সেখানে সর্বস্ব হারিয়ে বাঁধ ও মতিন মাস্টারের পাকা বারান্দায় আশ্রিত রমণীগণ সামান্য চালভাজা, গমভাজা খেয়ে বা না খেয়ে ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্নার সঙ্গে নিজের কান্না মিশিয়ে কোনোরকমে বেঁচে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কেউ কেউ আবার সামান্য ভাতের জন্য, সৎমার সঙ্গে ঝগড়া করে। চরম বিপর্যয়ের মুখে আবার কেউ পুরনো কোন্দল ভুলে গিয়ে, একে অপরকে পরম আত্মীয়তায় জড়িয়ে ধরে। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই আবার আল্লাকে স্মরণ করে, কলমা ও নামাজ পড়ে।

বন্যার প্রাকমুহূর্তে, প্রচণ্ড দুর্যোগপূর্ণ বৃষ্টিস্নাত রাতে, শহিদের স্ত্রী আকলিমা প্রসবযন্ত্রণায় কাতর হয়। তার এই জীবনসংকটে ভীত আকলিমা শহিদের নৈকট্য লাভের আকুলতার পাশাপাশি মনেপ্রানে আল্লাহকে স্মরণ করে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে সে সুরা এখলাস পড়ে। যদিও দৈনন্দিন জীবনের কর্মমুখরতায় এবং শারীরিক অসুবিধার জন্য তার সবসময় ধর্মীয় কাজ বা নিয়মিত নামাজ পড়া হয় না, 'সপ্তাহ দুয়েক হল আকলিমা নামাজ পড়েনি। ছেলে পেটে নিয়ে নামাজ পড়তে এখন কষ্ট হয়। এখন দিনমাস কি না। তবে এরকমটাই হয়—নামাজ ধরে, নামাজ ছাড়ে। ছাড়াটা কচির পেচ্ছাপের মত হয়ে যায়। ধরার পেছনে কিছু কারণ থেকে যায়। বড় কারণ স্বপ্ন। গুয়ে মুতে শুয়ে আছি স্বপ্ন দেখলে—আত্মশুদ্ধি খেলাপ হচ্ছে, তাই স্মরণ পড়ে যায় নামাজের কথা। মৃত দাদিকে স্বপ্নে দেখে যদি! দাদি খুব রাগ গুসসা করছে, পরের দিন থেকে নামাজ পড়ে। কিংবা স্বপ্নে ভয়, সংকট, কান্না দেখা দিলে নামাজ পড়তে শুরু করে। তাছাড়া পাড়ায় কাউকে জিনভূত ধরলে, কাছেভিতে কোনো মিলাদ মহফিল হলে, কেউ মারা গেলে পড়ে। কিংবা মেয়েকুটুম এলে ফজরের নামাজ না পড়ে থাকলেও আসর-জোহর থেকেই শুরু করে দেয়।'[৪২] আফসার আমেদ আকলিমার এই ধর্মীয় জীবন-যাপনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ বাঙালি মুসলিম নারীর জীবনের বাস্তবতাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

দরিদ্রের ঘরণী আকলিমার বৃষ্টিতে না ফেরা পোষা হাঁসগুলোর জন্য খুব কষ্ট হয়। আগত বন্যার আগে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব তাকে পীড়িত করে প্রসবযন্ত্রণার মধ্যেও। তবে এই আসন্ন সংকট থেকে মুক্তি পেতে, সন্তান ধরায় দক্ষ আয়নালের মাকে আকলিমার খুব প্রয়োজন। যদিও দুর্যোগের সময় শহিদকে আয়নালের বাড়ি, নোনাভেড়ির বাঁধে পাঠাতে সে মনে মনে শঙ্কিত হয়। কেননা আয়নালের স্ত্রী সাকিলাকে তার খুব ভয়। সাকিলার প্রতি শহিদের দুর্বলতার কথা স্মরণ করে, এই চরম সংকটময় মুহূর্তেও সে সাকিলার প্রসঙ্গ তুলে, স্বামীকে বারবার সাবধান করে দেয়। এমনকি সেই সূত্র ধরেই সে সন্তান জন্মদানের পরে, দুর্যোগের জন্য না ফেরা স্বামীর অপেক্ষায় কাতর হয়। দুর্বার বন্যায় স্বামীর প্রাণ হারানোর আশঙ্কার পাশাপাশি সে একথা ভেবেও বিচলিত হয়, 'তবে কি আয়নালের ঘরে থেকে গেল। ভাতারখাকি মাগি। যাকে ধরে সে পুরুষ ধ্বংস হয়। মাসুরার বাপ কি করে থেকে যেতে পারল? ও মাগি গ্রাস করে। ডাইনি যাদু জানে।'[৪৩] অথচ বন্যার কবল থেকে ফিরে আসা শহিদের প্রতি সমস্ত অভিমান ভুলে ও সদ্যজাত সন্তানের দিকে তাকিয়ে মাতৃগর্বে সে গর্বিত হয়ে ওঠে। আবার কর্মসূত্রে শহিদ যখন শহরে চলে যায় তখন শহিদের অবর্তমানে সমস্ত অভাব ও কষ্টের মধ্যেও সে সন্তানদের যথাযথভাবে আগলে রাখে। এমনকি স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সে সইফুকে সঙ্গে নিয়ে শহরেও চলে আসে। ততদিনে অবশ্য সাকিলাকে নিয়ে তার সমস্ত আশংকা দূর হয়ে গেছে। গ্রামের জীবন ফেলে এসে আকলিমা নতুন করে শহুরে জীবন শুরু করার আনন্দ ও লজ্জায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আকলিমার নববিবাহিতা ছোটজা অল্পবয়সী হালিমা, পরিস্থিতির চাপে একজন কর্তব্যপরায়ণ পরিপূর্ণ রমণী হয়ে ওঠে। বন্যা কবলিত সংসারে একজন দক্ষ গৃহিণীর মতোই সমস্ত খুঁটিনাটি কাজের দিকে সে লক্ষ্য রাখে। এমনকি অনভিজ্ঞ হালিমা নিরুপায় হয়ে আকলিমার সন্তানপ্রসবে সমস্ত রকম সহযোগিতা করে। আন্তরিকভাবেই বড় জায়ের সন্তানদের সামলায়। মাসুরাকে সঙ্গে নিয়ে বন্যায় ভেজা কাঠ ও ভেজা মাটিতে ইট দিয়ে, সকলের জন্যই ধোঁয়ার যন্ত্রণা সহ্য করে অনেক কষ্টে, জাউভাত রান্না করে। সংসারের বিপদের সময় নববধূকে ঘোমটা দিয়ে যে ঘরের কোণায় বসে থাকা মানায় না, এই সত্যকে উপলব্ধি করে হালিমা কর্তব্যনিষ্ঠারর পরিচয় দেয়। তবে অকস্মাৎ সাপ দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠার মধ্যে,

হালিমার শিশুসুলভ মানসিকতাও ধরা পড়ে। সংসারের সমস্ত দায়িত্বপালনে এবং স্নেহ ভালোবাসায় সে বড়জা আকলিমার মন জয় করে। মূলত সমাজে হালিমার মত সরল ও সুন্দর নারীই, যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, সংসারজীবনকে শতদুঃখের মধ্যেও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে।

শহিদের মেয়ে মাসুরার মধ্যে একটি শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক রমণীর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। সে যেমন বাবার অবর্তমানে শিশুর মতো কাঁদে, তেমনি আবার মায়ের প্রসবযন্ত্রণার সময় ভাইদের সামলে রাখে। এই দুর্যোগে বাবাকে নোনাভেড়ির বাঁধে পাঠানোর জন্য সে একদিকে যেমন তার মাকে দোষারোপ করে, তেমনি আবার মায়ের ক্ষুধা ও পেটে ব্যথার খেয়ালও রাখে। বন্যার মধ্যে ফিরে না আসা শহিদের দুশ্চিন্তায় ক্রন্দনরতা মাকে আবার সে মায়ের মতো সহানুভূতি জানায়। নতুন কাকিমাকে সংসারের কাজে সর্বতোভাবে সে সহযোগিতা করে। দুর্যোগ ও বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে, সে মুসলিম সমাজের একজন পরিণত রমণীর মতো কোরান পাঠের কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে মাসুরার মত বালিকারা সংসারে ছোটছোট ভাই বোনদের খেয়াল রাখতে রাখতে, নিজের শৈশবকে হারিয়ে ফেলে। ছেলেবেলাতেই তারা সংসারের সকলের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র বাবার স্নেহেই তাদের সুপ্ত শৈশব মাঝে মাঝে বিকশিত হয়।

'বসবাস' উপন্যাসের একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীজীবনের প্রতিনিধি হল সাকিলা। পনেরো বছর আগে শহিদের সঙ্গে তার বিয়ের সমস্ত কথা ঠিক হয়েও, শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হতে পারে নি। সেইসময় থেকেই হৃদয়ের অন্তঃস্থলে দুজনেই একে অপরের প্রতি এক অব্যক্ত ভালবাসা লালন করে। সাকিলার প্রথম স্বামী জমির দখল নিতে গিয়ে খুন হয়। পরবর্তীতে আয়নালের সঙ্গে ঘটনাচক্রে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও সাকিলার জীবন সুখী হতে পারে না। তার রূপ-যৌবন বা চরে জেগে উঠা জমির স্বপ্ন, কোনোটাই আয়নালকে আকর্ষণ করে নি। তাই আয়নাল রাতের অন্ধকারে ব্যাঙ ধরতে ধরতে একসময় চোর হয়ে ওঠে। দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে সাকিলার একমাত্র পুত্রসন্তান অপুষ্টিতে জরাজীর্ণ। অন্যদিকে চুরি করতে গিয়ে ধৃত আয়নাল, প্রচণ্ড প্রহারে মৃতপ্রায়। তার সংসার জীবনের এই অসম্পূর্ণতার জন্যই হয়তো, নোনাভেড়ির পাশে চাষে খাটা কর্মঠ শহিদ যেন তাকে বারবার আকর্ষণ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাকিলার

জীবনসংকটকে আরও বেশি ঘনীভূত করে। বন্যার প্রাককালে তার শাশুড়ি ও সন্তান করিমের সহায়তায়, মতিনমাস্টারের বারান্দায় আশ্রয় পেলেও, সাকিলার জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। বন্যার প্রবল স্রোতে মৃতস্বামীর মতো সেও ভেসে যায়। গাছের ডাল ধরে অর্ধউলঙ্গ সাকিলা কোনক্রমে প্রাণে বাঁচে। তবে এই বিপুল নির্জন জলরাশির মধ্যে তার একমাত্র সঙ্গী হয় শহিদ। পরস্পরের সান্নিধ্যে তারা বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে পায়।

কিন্তু নিজের জীবনসংকটের জন্য শহিদ বারবার সাকিলাকেই দোষারোপ করে। তার প্রতি অদম্য আকর্ষণেই শাহিদ পুরোপুরি সংসারে মনোযোগী হতে পারে না। তাই সে একদিকে শাকিলার মৃত্যু কামনা করে, আবার অন্যদিকে একে অপরের শারীরিক সান্নিধ্যে বেঁচে থাকার অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখে। সদ্যবিধবা সাকিলা নিজের দুর্ভাগ্য ও রুগ্ন সন্তানের জন্য মাঝে মধ্যেই কান্নায় আকুল হয়। বন্যার পরিস্থিতি একটু নাগালের মধ্যে আসায়, সংসারের টানে শহিদ এই নির্জন জলরাশির মধ্যে, শাকিলাকে একা ছেড়ে চলে যায়। শহিদের ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি তার আকুলতা বিন্দুমাত্র কমাতে পারে নি। তার প্রতি আকৃষ্ট আর এক পুরুষ করিমের সহায়তায় শেষপর্যন্ত নিজে বাঁচলেও, একমাত্র সন্তানকে সে বাঁচাতে পারে নি। পুত্রের মৃত্যুশোকে সর্বস্বান্ত, সদ্যবিধবা শাকিলা পাথর হয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বহারা শাকিলা গরিব বোনের বাড়ি সাময়িকভাবে আশ্রয় পেলেও, তার থাকা খাওয়ার দায়িত্ব যে কেউ নেবে না, তা শাকিলার অজানা নয়। স্বাভাবিকভাবেই বেঁচে থাকার জন্য তার মত নারীর সামনে দুটো পথ খোলা থাকে, হয় বিপত্নীক করিমকে বিয়ে করে পুনরায় সংসারী হওয়া, নতুবা পয়সা রোজগার করা। কিন্তু জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত শাকিলার মন তুলনামূলকভাবে অনেকবেশি পরিণত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। শাকিলের ভাবনার মধ্য দিয়ে লেখক এই সত্যকে প্রকাশ করেছেন উপন্যাসমধ্যে।

করিম মাঝি সাকিলাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলেও, শাকিলার পরিণত মন অন্য কিছু কামনা করে। পরপর দুটো দাম্পত্যে বিধ্বস্ত শাকিলা, দায়িত্বহীন বোহেমিয়ান করিমের কাছে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পায় না। বরং এই খোঁজ পায় সে, তার বোনের চাচাতো দেওর রোজগেরে, বউহারা ইশার কাছে পায়। ইশা তাকে যেমন রোজগারের পথ দেখায়, তেমনি নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখার সুযোগ দেয়। শহিদের প্রতি তার অব্যক্ত প্রেম ফল্গুধারার মতো বয়ে গেলেও একজন প্রকৃত মানুষের পরিচয় দিয়ে সাকিলা, নিজের স্বার্থের

জন্য আকলিমার সংসার ভাঙতে চায় নি। এমনকি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, লোভহীন শাকিলা, শহিদের আর্থিক সহযোগিতা নিতেও অস্বীকার করে। তবে ইশার সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্নে সে শহিদের মতো একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রকৃত বন্ধুর সান্নিধ্য কামনা করে, 'মোর সনে তুমার পনের বছর জানাশুনা—মোর কষ্ট হলে তুমারও কষ্ট হয়—তুমার বিপদে কাঁটা হয়ে থাকি—পেরথম মরদ জমি লড়াই করতে গেল একা। ...তার কাছে আর কেউ যেয়ে দাঁড়ালনি—কিন্তুক কারু সাথে কি ভাব ভাব জানাশুনা ছিলনি? পরের মরদকে আটকালনি কেউ, চোর হয়ে গেল। মানুষের সাথে সঙ্গে থাকি, তাদের ভাব ভালোবাসা বড় চিজ।'[৪৪] মূলত সাকিলার যন্ত্রণাময় জীবন অভিজ্ঞতাই, ধীরে ধীরে তাকে অনেক বেশি পরিণত মনের মানুষ করে তোলে। জীবনে চলার পথে সে আজ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর। একসময়ের প্রেমিকপুরুষকে বন্ধুরূপে পাওয়ার কামনায়, অশিক্ষিত শাকিলা আধুনিক জীবন ভাবনার পরিচয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে, যা সে জীবন থেকেই অর্জন করেছে।

সাকিলার বোন দিদির প্রতি সহানুভূতি দেখানোর পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের সুগৃহিণীর মতো, সংসারের শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও সচেতনতা দেখায়। দিদিকে অতিথির মতো বসিয়ে খাওয়ানো তার স্বামীর পক্ষে সম্ভব নয়, একথা সে স্পষ্টভাবেই শাকিলাকে জানায়। দিদির বিয়ে দিয়ে সে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালায়। সে তার সংসার জীবনকে নিষ্কণ্টক রাখার উদ্দ্যেশেই বারবার বিয়ের জন্য দিদির সঙ্গে, করিমের হয়ে ঝগড়াও করে। শাকিলা তার হাঁড়িতে চাল ও আলু দিলে যে বেশি জ্বালানি পুড়বে, এই ব্যাপারেও তার হিসেবী মন সচেতন। মূলত সংসারের ভালোমন্দ এবং সামান্য চাওয়া-পাওয়া নিয়েই, তাদের মতো গ্রামবাংলার দরিদ্র, অশিক্ষিত মুসলিম নারীদের সাদামাটা জীবন, অত্যন্ত সাধারণভাবেই অতিবাহিত হয়ে চলে।

গ্রামবাংলার দরিদ্র মুসলিম সমাজে আয়নালের মায়ের মত ভাগ্যবিড়ম্বিত বিধবার জীবনসংগ্রামও অতি পরিচিত, যা এই বন্যায় আরও কঠিন আকার ধারণ করে। সহায়সম্বলহীন অল্পবয়সী এই বিধবারা সন্তানকে বড় করে তুলতে, দ্বিতীয় সুখী সংসারের হাতছানিকে উপেক্ষা করে পরিচারিকার বৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু সুশিক্ষার অভাব ও পরিশ্রমের প্রতি বিমুখ আয়নালের মতো সন্তানেরা, তাদের সমস্ত জীবনসংগ্রামকে ব্যর্থ করে, এক অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। যে সন্তানের জন্য সে তার জীবন ও যৌবনকে নষ্ট করে, সেই সন্তানের

চৌর্যবৃত্তি ও অকালমৃত্যু, তাকে সর্বস্বান্ত করে। একজন সন্তানসর্বস্ব বিধবার জীবনে, এর চেয়ে বেশি বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না। তার জীবন থেকে হারিয়ে যায় বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন নাতিটিও। অথচ মাটির মতো সহিষ্ণু এই রমণীর কারও প্রতি কোন অভিযোগ নেই। বন্যায় সর্বহারা বিধবার জীবনের একমাত্র সম্বল হয় দারিদ্র্য এবং কান্না। একইরকম জীবনযন্ত্রণার চিত্র উঠে আসে মতিন মাস্টারের বাড়ির পরিচারিকা সাজেদার জীবনসূত্রে। স্বামী পরিত্যক্তা সাজেদাকে বেঁচে থাকার তাগিদে মতিন মাস্টারের বাড়ির কাজ করতে হয়। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে গেলে, সেও যে এক অনিশ্চিত জীবনেরই অধিকারিণী হবে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

খালেকের মা বউ-জ্বালানী হলেও পুত্রস্নেহে আপ্লুত। বন্যায় কষ্টে নির্মিত ঘর পড়ে যাওয়ার বেদনায় কাতর খালেকের অভিমান ও অন্তর্দাহ মুছিয়ে দিতে সে তৎপর। পুত্রের মঙ্গল কামনায় সে পুত্রবধূ লায়লির হাতে চুড়ি না থাকার মতো ঘটনাকে মেনে নিতে পারে না। চুড়ির অভাবে সে জোর করে লাইলির হাতে আঁচল বেঁধে রাখে। তবে উপন্যাসের মধ্যে লাইলির জীবনচর্চার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষনীয়। বন্যায় বিপর্যস্ত খালেকের স্ত্রী লাইলি, গ্রামের সাদামাটা জীবন ছেড়ে বাধ্য হয়ে স্বামীর সঙ্গে শহুরে জীবনযাপন শুরু করে। অথচ খুব সহজেই সে এই শহুরে জীবনকে মেনে নেয়, কয়লার উনুন ব্যবহার করতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। কেরোসিন কুকারে দুবেলা চা না হলে তার চলে না। নিয়মিত সিনেমা যাওয়া এবং গুনগুনিয়ে গান গাওয়া তার অভ্যাসে পরিণত হয়। গ্রামীণজীবনের সমস্ত জড়তা, ভয়, লজ্জা কাটিয়ে, সে নিজেই ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নিয়ে আসে, বাজার করে। কোন প্রসাধনী বা সাবান শীতকালে উপযোগী, কোথায় সস্তায় সবজি পাওয়া যায়, এসব তার নখদর্পণে। শহরের পরিবেশের ছোঁয়ায় সে ক্রমে ক্রমে শহুরে মন ও মানসিকতায় আসক্ত হয়ে পড়ে। লাইলির জীবনাচরণের এই আমূল পরিবর্তনে বিস্মিত শহিদ খালেককে বলে, 'তোর বৌ আর দুদিন পরে পরী হয়ে উড়ে যাবে।'[৪৫]

'বসবাস' উপন্যাসের শেষপর্যায়ে লাইলির মতো আকলিমাও গ্রাম ত্যাগ করে শহরে চলে আসে। এমনকি শাকিলাও বোম্বে রোডের ধারে তাদের জন্য জায়গা দখল করে রাখার অণুরোধ জানায় শহিদকে। এইভাবে গ্রামের কৃষিজীবী কিছু মানুষের শহুরে শ্রমিক হয়ে ওঠা এবং

তাদের জীবনচর্চার পরিবর্তনের কথা এই উপন্যাসে সুন্দরভাবে রূপায়িত। এই পরিবর্তন আসে মূলস্রোতের সংস্পর্শে আসা মুসলিম নারীর জীবনেও। শহরের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিকতার যোগসূত্রে যেভাবে বদলে গেছে মতিন মাস্টার ও শরিফুল প্রধানের স্ত্রীদের জীবন-যাপনের প্রণালী। সেইভাবেই ধীরে ধীরে গ্রামীণ মুসলিম সমাজ কুসংস্কার, ব্যাধি, অশিক্ষা থেকে আলোর পথে আসবে। কঠিন অসুখের হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা আর পীরের দরগায় ধর্না দেবেনা। তখন আর করিমের বউ এর মত কাউকে অপারেশনের ভয়ে আত্মহত্যা করতে হবে না। লুকমান বা নিয়ামতের বউদের মত লাইলি, আকলিমা বা শাকিলাকে আর কথায় কথায় স্বামীর লাথি খেতে বা তালাক পেতে হবে না। এমনকি শাকিলার কারখানায় কাজ করে পয়সা রোজগারের সূত্র ধরে লেখক আফসার আমেদ, ধীরে ধীরে মেয়েদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার দিকটিকেও এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

**২) জনস্রোত, জলস্রোত**

এই প্রসঙ্গে লেখকের ‘জনস্রোত, জলস্রোত’ ছোটগল্পটি উল্লেখ্য। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘পরিচয়’ পত্রিকায়, ১৯৭৯ সালে। পরবর্তীতে এটি আফসার আমেদের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ ও ‘সেরা ৫০টি গল্প’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লেখকের ‘বসবাস’ উপন্যাসের মতই এই ছোটগল্পের কেন্দ্রে আছে, বন্যায় সর্বস্বান্ত সাধারণ মানুষের জীবন যন্ত্রণা। একটি উঁচু ছাদে আশ্রিত ক্ষুধার্ত, প্রাণসংশয়ে ভীত, বন্যাকবলিত মানুষের সুখস্বপ্ন মাটির ঘরের মতো একে একে ভেঙে পড়ে। এই দুর্যোগে তাদের সব চাওয়া-পাওয়া কেমন যেন উলট-পালট হয়ে যায়। প্রবল স্রোতের মুখে বেঁচে থাকার ন্যুনতম উপকরণ ‘হাড়িকুড়ি চাল ডাল’ না আনতে পারার বেদনা থেকেও, ফুলুর কাছে অনেক বেশি বেদনাদায়ক হয়ে উঠে, তার সন্তানের খাবার না আনতে পারার যন্ত্রণা। তাই সর্বস্ব হারিয়েও ফুলু মাতৃত্বের জায়গা থেকে খোকাকে পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে, স্বামীকে অনুযোগ করে- ‘কচির বাল্লিকের ডিবে, হাঁড়িটা আনলেনি। অ্যাঁ! কচি খাবে কী? তুমি কী লোক বল তো?’[৪৬] ঘুঁটে বিক্রি করে অনেক কষ্টে জমানো, হিমানির কৌটোতে রাখা সাতটি টাকা হারানোর বেদনাও ফুলুকে কাতর করে। বন্যার স্রোতে সর্বস্ব হারিয়েও নরু যখন খোকাকে বড় মানুষ করার স্বপ্ন দেখে, তখন ফুলু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে শুধু কামনা

করে, খোকার যেন এই দুর্যোগের মধ্যেও বেঁচে থাকে এবং ভবিষ্যতে বাবার মতো অন্তত মিস্ত্রি হয়।

তবে পরক্ষণেই খোকার আঙুল চোষা দেখে সে ভীত হয়ে ওঠে। কারণ মুসলিম সমাজের অনেকের মতো ফুলুও বিশ্বাস করে, ফেরেশতা রূপী নিষ্পাপ শিশুর 'আঙুল চোষা মানে তো আকাল'। তাই সে বানভাসী মানুষের মাঝে, নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়। খোকার কান্না তাকে আরও বেশি উদ্বিগ্ন করে। ক্ষুধার্ত মা ফুলুর বুকের দুধ স্বাভাবিক ভাবেই শুকিয়ে যায়। তবু সে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করেও ক্ষুধার্ত খোকার মুখে নিজের শুকনো বুক দিয়ে কান্না থামিয়ে রাখে। একসময় প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় সবকিছু জেনেও সে নুরুকে বলে বসে 'বড্ড খিদা লেগেছে'। অথচ এই দুর্যোগে জীবন বিপন্ন করে স্বামীকে খাদ্যের সন্ধানে পাঠাতেও সে নারাজ –'না না না। মোর পাণ্ডুলের জন্যি তোমাকে বানে ভাসাব? হায় আল্লা! মেয়েদের জেবন একটা জেবন।'[৪৭] এখানে ফুলু তার আজন্মলালিত সংস্কারে বিশ্বাসী একটি সামান্য নারী হয়ে ওঠে। যে নারী স্বামী বা সন্তানের জন্য সমস্ত কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু নিজের জন্য স্বামীকে কোন বিপদে ফেলতে চায় না। বাড়ি পড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় ফুলু ধীরে ধীরে যেন নিজের অনুভূতিও হারিয়ে ফেলতে থাকে। এই চরম সংকটে নুরুর আশ্বাসেও তার কান্না থামে না। সেই মুহূর্তের একমাত্র প্রয়োজন, ক্ষুধার অন্নের অভাবে তাদের কথা বলার সূত্রও একসময় হারিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে বন্যার জল কমে। নুরুর সাঁতার দিয়ে রুটি নিয়ে আসায়, ফুলুর ক্ষুধার যন্ত্রণা কমে। স্বাভাবিকভাবেই ফুলু তার অনুভূতি ফিরে পায়। তাই গৃহস্থ থকে ভিখারিনীতে পরিণত হওয়ায় যন্ত্রণায় কাতর ফুলু কেঁদে বলে 'ও গো আমাদের কী হল গো'। এই আর্তনাদ অবশ্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্বান্ত যে কোন গৃহস্থ রমণীর।

তবে একথা সত্য, এই বন্যার মধ্যেও ফুলুর স্বামী ও সন্তান তার সঙ্গে আছে। জল সরে যাওয়ার পরে, আবার তারা এক নতুন গৃহস্থ সুখী জীবন পাবে। কিন্তু স্বামীসঙ্গ হারিয়ে, নববিবাহিতা 'শোকরজানের কান্না থামছে না'। বানভাসি মানুষের ভিড়ে চোখে ছানিপড়া বৃদ্ধার অস্পষ্ট দৃষ্টিতে বন্যার ভয়ংকরতা ধরা পড়ে নি বলেই সে বারবার বাড়ি ফেরার আবদার করে চলে। আবার এই দুর্যোগে সামান্য একমুঠো গমও যে কতো মুল্যবান, তা মাজলি বোঝে। তাই

বড়সতীন সবুরনের মায়ের পোষা মুরগীর, সেই সামান্য গম খাওয়াকে কেন্দ্র করে দুই সতীনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাঁধে। পরক্ষণেই বন্যার জলে মাথা গোঁজার খোপটুকু হারিয়ে, একই বেদনায় আহত দুই সতীন, সমস্ত অভিমান চোখের জলে মুছে, গলা জড়িয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়।

তবে সবুরনের মা এই জনস্রোতের মাঝে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে। সে-ই প্রথম পুরুষসমাজের দিকে আঙুল তুলে বলতে পেরেছে 'তোরা মরদরা থাকতে মোরা কচি ছেলে বুকে নিয়ে মরে যাব?' নিজের ক্ষুধার চেয়েও তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে, চারদিন ধরে ক্ষুধার্ত শিশুদের মুখে, একমুঠো খাবার তুলে দিতে না পারার অসহায়তা। আবার রুটির প্যাকেটে তার ও সন্তানদের ক্ষুধার যন্ত্রণা কমে গেলেই, এই সর্বস্বান্ত রমণী তার পরিবারের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায়, সমস্ত শত্রুতা ভুলে মাজলিকে সঙ্গে নেয়। এই সমস্ত অশিক্ষিত, দরিদ্র রমণীর, এই চরম সংকট থেকে মুক্তি পেতে সমস্ত ইগো সরিয়ে পরস্পরের সহযোগিতা গ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। যেখানে শিক্ষিত সমাজ যুগযুগ ধরে কোন বিবাদকে বয়ে নিয়ে চলে, সেখানে কিন্তু অশিক্ষিত নারীসমাজ যত সহজে তুমুল ঝগড়া করতে পারে, তেমনি আবার আবেগিমনে সহজেই সবকিছু ভুলে এক হয়ে উঠতে পারে, লেখক এই সহজ সত্যই সবুরনের মা ও মাজলির মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন।

তবে একথা সত্য যে, বেঁচে থাকার এই সংগ্রামের মধ্যেও কাসেম, জিকরিয়া, বিলাস বকস প্রমুখ পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্টে নারীর প্রতি কোন সম্মানজনক, সহানুভূতিশীল ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই তারা বুড়ি, সবুরনের মা ও শোকরজানের যন্ত্রণাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু নুরু সেদিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। এই দুর্যোগের মধ্যেও সে ফুলুর চোখের জল মুছিয়ে, পাশে থাকার আশ্বাস দেয়, ক্ষুধার্ত স্ত্রীর জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিতে চায়, নতুন করে ফুলুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। ফলে এই জনস্রোতের অন্যান্য নারীর তুলনায় ফুলুর জীবনসংগ্রাম যে অনেকটাই সহজ হবে একথা বলায় বাহুল্য। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এখানে এই সত্যের ইংগিত দিয়েছেন। কিন্তু সমাজে কাসেম, জিকরিয়া প্রমুখ পুরুষের সংখ্যায় সিংহভাগ। এই ধরণের পুরুষের জন্যই নারীকে তালাক পেতে হয়, সতীনের সঙ্গে সংসার করতে হয়। আবার অনেকের কপালে জোটে শুধুমাত্র উপেক্ষা ও অবহেলা। মূলত

একজন পুরুষের ভালোবাসা এবং সহানুভূতিশীল মানসিকতাই পারে, একজন নারীর সংসারজীবনের নিরাপত্তা রক্ষার মধ্য দিয়ে একটি পরিপূর্ণ সমাজজীবন গড়ে তুলতে।

**অসমবিবাহ প্রসঙ্গঃ**

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের অস্বাভাবিক ব্যবধানকে সাধারণত অসমবিবাহ বলে মনে করা হয়। এই ব্যবধান অনেকসময় কুঁড়ি-পঁচিশ বছরের মতো হতে পারে, আবার তা ছাড়িয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছিও হতে পারে। মুসলিম সমাজে অনেক বিপত্নীক পুরুষই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কমবয়সী অসহায় ও দরিদ্র নারীদের, পুনর্বিবাহের জন্য নির্বাচন করে থাকে। অনেকসময় মাতৃহীন সন্তানদের লালনপালনের কথা মনে রেখে, কোনো কোনো মাঝবয়সী বিপত্নীক সাংসারিক প্রয়োজনের নামে বিয়ে করে, আবার কোনো বিপত্নীক বৃদ্ধ নিজের বার্ধক্য জীবনের, নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা থেকে মুক্তির জন্যও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে থাকে। কোনো কোনো বিত্তশালী পুরুষ একাধিক স্ত্রীলাভের জন্য অনধিক চারটি বিয়ে করে থাকে। আবার অনেক পুরুষ, সন্তানের জন্য বা পুত্রসন্তান লাভের জন্য স্ত্রীর বর্তমানে বা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে নিয়ে আসার প্রয়োজনেও একাধিক বিয়ে করে থাকে। তবে সবক্ষেত্রেই তাদের পছন্দ অল্পবয়সী রমণী, যাদের মধ্যে অধিকাংশই নিঃসন্তান অকালবিধবা। তাছাড়াও কোনো অল্পবয়সী তালাকপ্রাপ্ত রমণী ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অনাথ কিশোরীর অসহায়তার সুযোগও তারা নিয়ে থাকে। এমনকি কোনো বিপত্নীক পুরুষের চারিত্রিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে, অনেকসময় বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা নিজের কিশোরী কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করে, যেখানে পাত্রের অধিক বয়স তাদের তেমনভাবে প্রভাবিত করে না। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে এই সমাজসত্যকে তুলে ধরে ধরেছেন এবং এই অসমবিবাহের ফলে উদ্ভূত নারীজীবনের বৈচিত্র্যময় সমস্যা ও সংকটের বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়েছেন।

## ১) বসবাস

'বসবাস' উপন্যাসের স্বল্পপরিসরের মধ্যে, অসমবিবাহের ফলে উদ্ভূত নারীজীবনের সংকটকে লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সাধারণত দেখা যায়, পশ্চাদপদ নিম্নবর্গীয় অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে সচেতনতা, অপুষ্টি এবং চিকিৎসার অভাবের পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত সন্তানলাভের জন্য, প্রায়ই সন্তানের জন্মদানের সময় বা অন্য কোন অসুখে মায়েরা অকালে মৃত্যুবরণ করে। এক্ষেত্রে মাতৃহারা সন্তানদের কথা ভেবে অবিবাহিত অল্পবয়সী শ্যালিকার সঙ্গে, বয়সে প্রায় দ্বিগুণ-তিনগুন বড় জামাইদার বিয়ের প্রথা মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত। এরফলে মাতৃহারা সন্তানেরা তাদের স্নেহময়ী মাসিমাকে মা-রূপে পেয়ে বেঁচে যায়। কিন্তু এই অবোধ সন্তানদের রক্ষার্থে একটি উঠতি বয়সের নারীর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এরই বাস্তবায়ন দেখিয়েছেন লেখক 'বসবাস' উপন্যাসের মতিন মাস্টারের বারান্দায় আশ্রিতা সালমার জীবন-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, 'অসুখে বড়বোন মারা যাওয়ায় বড় বোনাই-এর সঙ্গে সালমার বিয়ে হয়। বোনের চার ছেলেমেয়ের মা এখন সে। এখনো আইবুড়োর গন্ধ গা থেকে মুছে যায়নি। বড়বোনের দুধের খোকা কোলে নিয়ে নিয়ে হাতে বুকে বেদনা। মা-বাপ-ভাই-বোন আছে এখানে। বোনাই-এর সঙ্গে বিয়ে হওয়া সোয়ামীও আছে। কোলে দুধের খোকা ছাড়া দুই খুকি এক খোকা ঝালাপালা করে মারছে। সাজানো একটা মা সে। কান্না পায়। বুকটা হু হু করে উঠছে। নিজের নাড়ি ছিঁড়ে বেরল না অথচ মা সে। ছেলেপিলে ভরা পুরনো হয়ে যাওয়া এক সংসারে এসেছে।'[৪৮] দোজবরে বোনাই স্বামীর সংস্পর্শ সালমার মনে সুখানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণার উদ্রেক করে। তবুও সমস্ত কষ্ট সহ্য করে সে ধীরেধীরে জননী হয়ে উঠতে থাকে। জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে এক ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনযাপনে বাধ্য হয় সে।

## ২) আদিম

আফসার আমেদের একটি অন্যতম আলোচিত ছোটগল্প হল 'আদিম'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'শারদীয় পরিচয়' পত্রিকায়, ১৯৮১ সালে। পরবর্তীতে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' ও 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয় এই ছোটগল্পটি। ইসলাম ধর্মের শেষনবী হজরত

মহম্মদের(সাঃ) সুন্নত পালনের সূত্র ধরে, একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষ অনায়াসে একাধিক বিবাহ করতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, কোন কোন মুসলিম পুরুষ তার স্ত্রীর মৃত্যুর তিন-চার মাসের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলে। এক্ষেত্রে কেউ কেউ বয়সের তোয়াক্কা না করে, একেবারেই অল্পবয়সী মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে। সেই নববিবাহিতা তার প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের থেকেও অনেকসময় ছোট হয়। এরফলে কোন দরিদ্র, অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেলেও, বৃদ্ধ স্বামী ও সোমত্ত বয়সের সতীনপুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে, একই সংসারে জীবন অতিবাহিত করার বিড়ম্বনা সয়ে যেতে হয় সেই অল্পবয়সী নববিবাহিতাকে। 'আদিম' ছোটগল্পের সাবেরার মধ্য দিয়ে লেখক নারীজীবনের এই চরম বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। একরাতের অন্ধকারে বাবার বয়সী ইজ্জত আলিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় সে। একটি মাত্র রাতের ব্যবধানে সাবেরা, তার থেকে বড় তিনটি সন্তানের জননী হয়ে ওঠে। স্বামীর সংসারে তার সবথেকে বিড়ম্বনার কারণ হল সপত্নী পুত্র কায়েম, যে কিনা আবার তারই বাল্যসখী হাফেজার স্বামী। অন্যান্য মেয়ের মত সাবেরাও একটি সুন্দর ও স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সেই সুখস্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হয় সে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্যে, বৃদ্ধ স্বামীর আহ্বানে তাই বিড়ম্বিত ও অপ্রস্তুত হয়ে 'সাবেরা এতোটুকু হয়ে যায়' এবং ভয়ে ও অস্বস্তিতে ঘামতে থাকে। তার এই প্রতিকূল জীবনের একমাত্র আনন্দ বাল্যসখী হাফেজার সান্নিধ্যে থাকা। যদিও এর মধ্যেও একটা অসম্পূর্ণতা আছে, 'হাফেজার মুখ পেলে যেন সাবেরা আর কিছু চায় না। আসলে দুজনে একবিন্দুতে মিলিত হলেও কোথায় যেন বিচ্যুতি ঘটে কখনো-সখনো। তখন কি আর কষ্ট পায় না সাবেরা? একবার সই সই খেলা, ফের শাশুড়ি বউয়ের সম্পর্ক। এমন ছলনা সহ্য হয়? কী ঝামেলাই যে ফেলেছে। ভেবেছিল হাফেজার কাছে দুটো মনের কথা বলে জান ঠান্ডা করবে। দ্বিগুন জ্বলে। তারপর হাসি ঠাট্টায় সব ভুলে যায়।'[৪৯]

তাছাড়া সাবেরার এই যন্ত্রণাকে আরও বেশি ঘনীভূত করে হাফেজার ঠাট্টার ধরণ। কায়েমের উপস্থিতিতে সাবেরার ঘোমটায় আত্মগোপন করার অসহায় চেষ্টাকে, হাফেজা ঠাট্টার মধ্য দিয়ে উপভোগ করে। ছেলের সামনে এই ঘোমটা দেওয়ার যুক্তি তুলে সে সাবেরাকে বিব্রত করে। সাবেরা নববধূরূপে সাজ-সজ্জার আনন্দ উপভোগেও বিব্রতবোধ করে। কারণ

নববধূ হলেও, একজন যুবক ছেলের মায়ের টিপ বা কাজল পরার একটা লজ্জা আছে তার। হাফেজা কিন্তু সাবেরার এই মানসিক সংকট ধরতে পারে না। কায়েমের কৌতূহলী দৃষ্টিতেও সাবেরা অপ্রস্তুত হয়। কারণ কায়েমকে সে সন্তান রূপে নয়, পরপুরুষ রূপে দেখে এবং চমকে ওঠে। আর এই সংকট থেকে মুক্তি পেতেই সে নিজেকে বারবার ঘোমটার মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। তবে সাবেরা ও হাফেজার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে ইজ্জত ও কায়েম খুশি হলেও প্রতিবেশিনী রশিদের মা তাদের সম্পর্কের সত্যতা সম্পর্কে সচেতন করে। কিন্তু আনুনানি তাদের এই মধুর সম্পর্ক দেখে খুশি হয়। সাবেরার প্রশংসা করে। তার নিজের সময়কালে শাশুড়ি-বউ এর সম্পর্কের ভয়াবহতা উল্লেখ করে, সে বলে 'যা যা তোদের আজকেলের বউদের এক কথা। মোর বয়সকালের শউর-শাউড়ির পাল্লায় পড়তে তাহলে বুঝতে। একটু বে-কন্টোল চললে বুকে শিল চাপা দিয়ে ফেলে রাখতো। হ্যাঁ হ্যাঁ আজে খাঁয়ের বেটিকে তো জানোনি—মোকে কম জ্বাইলেছে মোর শাউড়ি!'[৫০]

তবে দারিদ্র ও অভাবে বেড়ে ওঠা সাবেরার মন ইজ্জতের সংসারে নতুন শাড়ি, সায়া ও প্রসাধনী পেয়ে  সাময়িক ভাবে আনন্দিত। যদিও তার বাল্যসখীর স্বামীই যে তার ছেলে, এই যন্ত্রণাও তাকে কম তাড়িত করে না। তার এই যন্ত্রণা আরও জ্বালাময় হয়ে ওঠে, রাতের অন্ধকারে দিকভ্রমে সে যখন তার অজান্তে ছেলে কায়েমের শয্যাসঙ্গী হওয়ার অপরাধবোধে দগ্ধ হয়। একই ঘটনা ইজ্জত আলির সঙ্গে পুত্রবধূ হফেজার সঙ্গেও ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় কায়েম আরও বেশি দগ্ধ হতে থাকে। কিন্তু লেখক এই ঘটনায় তাদের সমস্ত অপরাধের দায় থেকে মুক্তি দিয়ে, সেই নিরেট অন্ধকার ও মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকেই দোষারোপ করে বলেছেন, 'কারো কোনো দোষ নেই। আসলে এই বসবাসই আদিম গুহা। আকাঙ্ক্ষা এখানে বদ্ধ হয়ে আছে।'[৫১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুসলিম সমাজে কোন বেশি বয়সের বিধবার সঙ্গে, কোন অবিবাহিত, তুলনায় কমবয়সী পুরুষের বিবাহও কিন্তু সুন্নত। হজরত মহাম্মদ(সাঃ) এর প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা(রাঃ) ছিলেন একজন বিধবা। উপরন্তু তিনি বয়সেও নবীজির তুলনায় বেশ বড় ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, মুসলিমসমাজ এই সুন্নত পালনে একেবারেই উদাসীন। বরং পরিবারের সদস্যরা যেমন এর বিরোধিতা করে, তেমনি সমাজের কাছেও তা প্রশংসনীয়

নয়। তাই এই ছোটগল্পে বয়সে ছোট কয়েমকে, বিধবা মোসলেমা স্বামীরূপে পেতে ব্যর্থ হয়। দুজনের একই সঙ্গে পথ চলার স্বপ্নকে কায়েমের বাবা-মা নষ্ট করে দেয়। একজন বিধবা তার পছন্দ মত জীবনসঙ্গী পেতে ব্যর্থ হয়, এই সমাজেরই পরোক্ষ হস্তক্ষেপে। এই ব্যর্থতা থেকেই কায়েম ও মোসলেমা শেষপর্যন্ত প্রেমে কেঁদে চলে। একজন বিধবা তার স্বস্থিত জীবনের স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত হয়ে, সাবেরার মতই কোন এক দোজবরে-তেজবরে বৃদ্ধের সঙ্গে বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার অপেক্ষাই থাকতে সে বাধ্য হয়। কায়েমের জীবন থেকে মোসলেমাকে পুরোপুরি মুছে ফেলার জন্যই, রাতারাতি ষড়যন্ত্র করে হাফেজার সঙ্গে কায়েমের বিয়ে দেয় ইজ্জত আলির পরিবারবর্গ। এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ নিজেদের স্বার্থপূরণে ধর্মের সুন্নত পালনে উৎসাহী হলেও, নারীর বেলায় তারা সেই সুন্নত পালনকে সমালোচনা করে।

হাফেজা তার বাল্যসখীকে শাশুড়ি রূপে পেয়ে খুশি হলেও, ইজ্জত আলির দুই মেয়ে হাসিনা ও কাশেনা বাবার এই বিয়ে মেনে নিতে পারে নি। স্বাভাবিকভাবেই তারা মায়ের জায়গা অন্য কাউকে দিতে নারাজ। তাছাড়া বয়স্ক বাবার এই বিয়েতে তারা লজ্জিত ও মর্মাহত। তাই 'দু-বোন হাসিনা ও কাশেনা লোক মারফত জানিয়েছে বাপের ভিটেতে আর যাবে না। আর গেলেও কি সৎমা ভাত দেবে? ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত। বাপের বাড়ি মা আছে যে যাবে? ইনিয়ে বিনিয়ে সাতকাহন বলে পাঠিয়েছে।'[৫২] সাধারণত মায়ের মৃত্যুর পর যে বিবাহিত মেয়েদের প্রতি বাবা ও ভায়ের অবহেলা বেড়ে যায়, লেখক এই সমাজসত্যকেই এখানে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে সাবেরাকে পেয়ে নিঃসঙ্গ হাফেজা জীবনের এক আনন্দময় খেলায় মেতে ওঠে। দুই সখী বিগত মধুর স্মৃতিচারণায়, মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় ফেলে আসা আনন্দময় খুনসুটির জগতে।

মূলত আফসার আমেদ মোসলেমা, হাফেজা ও সাবেরা এই তিনজন নারীর বয়সকে উনিশ-বিশের কোঠায় রেখেছেন। তাদের শারীরিক গঠনও প্রায় একইরকম। যৌনতার দিক থেকে এই তিনজন সমবয়সী নারী, রাতের অন্ধকারে কায়েমের মত পুরুষের কাছে একই শারীরিক আবেদন সৃষ্টি করে। তাই অল্পবয়সী বিমাতাকে কায়েম অন্ধকারে স্ত্রী হাফেজা বলে ভুল করে বসে। তাছাড়া সে আবার হাফেজার শরীরের গন্ধে যেন মোসলেমাকে খুঁজে পায়।

শুধুমাত্র মুখ বা ঠোঁটে থাকা তিল বা জুড়ুলের অবস্থান তাদেরকে একে অপরের থেকে আলাদা করে। তাই প্রেমহীন, মনহীন ও সম্পর্কহীন অন্ধকারময় আদিম প্রবৃত্তির জগতে সব সমবয়সী নারীই, পুরুষের কাছে শুধু একটি শরীর হয়ে ওঠে মাত্র। আদিম মানুষের মতোই তারা রাতের অন্ধকারে যৌনক্ষুধার তাড়নায় যেকোনো একটি নারীশরীরকেই খুঁজে পেতে চায়।

এই জায়গা থেকেই, ইজ্জত আলি তার স্ত্রী বেঁচে থাকাকালীনই আর একটি নারীশরীরকে পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় বিবাহে উৎসাহিত হয়েছিল। কিন্তু পুত্রবধূ হাফেজার কথাপ্রসঙ্গে উঠে আসে যে, তার শাশুড়ির আধিপত্য ও দাপটের জন্যই ইজ্জতের সেই স্বপ্ন অপূর্ণ ছিল। তাই স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই ইজ্জত কন্যার বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে। আর এই সমাজের নারীরাই ইজ্জতের এই অসমবিবাহকে সমর্থন করে। এক্ষেত্রে কায়েমের বড়চাচির মনে দুঃখ হলেও, আনুনানি ও রশিদের মা, ইজ্জতের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। মূলত তারা দিনের পর দিন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বশ্যতা স্বীকার করতে করতে, পুরুষের সুখ-দুঃখকেই প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত মনে করে। পাশাপাশি নারীর চাওয়া-পাওয়া ও ব্যথা-বেদনাকে, স্বাভাবিকভাবেই তারা অবহেলা বা উপেক্ষা করে। এই সমস্ত নারীরা তাদের দুর্ভাগ্যকে, ভাগ্য বা নিয়তি বলে মেনে নেয়। স্বামীর পদতলেই নারীজীবনের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে, নিজেরাই আনন্দে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। শিক্ষা ও সচেতনতাই পারে তাদের প্রকৃত মানুষরূপে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করতে। এই ছোটগল্পে লেখক আফসার আমেদ নারীর জীবনের অসহায়তাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

### ৩) সমুদ্রের নিলয়

মুসলিম নারীর অনাকাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য জীবনযাপনের এক অপূর্ব আলেখ্য হল আফসার আমেদের 'সমুদ্রের নিলয়' ছোটগল্পটি। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'শারদীয় পরিচয়' পত্রিকায়, ১৯৮৮ সালে। পরবর্তীকালে এটি আফসার আমেদের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'সমুদ্রের নিলয়' মূলত আলেয়ার বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনি, 'বাপ-মা মরে যাওয়া আলেয়া চাচির সংসারে থাকত। ছোটবেলা থেকেই এর-বাড়ি ওর-বাড়িতে ঢেঁকিতে আগানে-বাগানে খেটে নিজের পেট চালাত। গহর আলির কুমড়োবাড়িতে এসে আটকে যায়।

গহর আলি কত সহজ স্বচ্ছন্দে তাকে অধিকৃত করে। আর এই এখানে গহরের আলেয়াকে প্রয়োজনও ছিল। আলেয়া জড়িয়ে যায় গহরের সংসারে। দুই সন্তানের জননী হয়েছে।'[৫৩]

প্রত্যেক মেয়েরই বিবাহিত জীবন নিয়ে নিজস্ব একটা স্বপ্ন থাকে। আলেয়াও তার খালাতো ভাই গাজিকেই একসময় নিজের জীবনসঙ্গী রূপে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু গাজি তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও, কোলকাতায় কাজে গিয়ে প্রায় চার থকে ছয় মাস পর্যন্ত ভুলে থাকে। গাজির এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফাঁকেই পঞ্চাশ উত্তীর্ণ গহর আলি, চৌদ্দ বছরের অনাথ আলেয়াকে বিয়ে করে। এই অসম বিয়েতে শুধুমাত্র যে আলেয়ার স্বপ্নভঙ্গ হয় তা নয়, গহরের স্ত্রীর স্বীকৃতি পেতেও তাকে যথেষ্ট অপমানিত হতে হয়। বিয়ের রাতেই গহরের প্রথম স্ত্রী লালমন, নববধূ আলেয়াকে ঝাঁটাপেটা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। অসহায় আলেয়া সেই রাতে চাচির বাড়ি আশ্রয় নেয়। নিজের দুর্ভাগ্য ও স্বপ্ন ভাঙার যন্ত্রণার বুকফাটা আর্তনাদে সে সেখানাকার আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে। পরদিন সকালে গহর তাকে নিজের সংসারে নিয়ে এলে, সে বড়বুবু লালমনের সমস্ত কর্তৃত্ব ও ইচ্ছের কাছে, অবিচলিত ভাবে, বিনাবাক্যব্যয়ে নিজেকে সমর্পণ করে। তাই প্রথম দিকে লালমন তার প্রতি প্রতিহিংসার মনোভাব পোষণ করলেও, সংসারের প্রয়োজনে ও নিজের স্বার্থেই কর্মদক্ষ ও বিনম্র আলেয়াকে মেনে নেয়। কারণ, 'তার চৌদ্দটা ছেলেমেয়ে। একা এত ছেলেমেয়ে আর এই সংসার চালাতে প্রাণপাত করতে হত বড়বুবুকে। আলেয়া এসে অনেক সুসার হয়েছে। এত ছেলেপুলেদের সামলানো, চাষবাসের নানা ঝক্কি ঝামেলা। তার পরেও আছে স্বামীর অবসাদে বিষাদে অবসরে বিশ্রামে ফরমাস খাটা, সেবায় লাগা। আলেয়া এলে চারদিকটা বেশ সামলে নেয়া যায়।'[৫৪]

গহরের চার বছরের কর্মব্যস্ত সংসারজীবনে, দুই সন্তানের জননী আলেয়ার, সন্তানদুটোর সঙ্গেও অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর অবকাশ মেলে না। লালমনের সন্তানদের সঙ্গেই তারা বড় হয়। তবে তার এই নিরানন্দ জীবনে, মাঝে মাঝে কথাবলার সঙ্গী হয় তার সতীনকন্যা মাসুরা। যদিও মাসুরার 'ছোট মা' সম্বোধনে আলেয়ার হৃদয় কেঁপে ওঠে। তবে তার দেহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমক লাগে, যখন কোনো ব্যাপারী বা জেলে, গহর আলির মেয়ে বলে তাকে সম্বোধন করে এবং পরক্ষণেই এই ভুল শুধরে গহরের 'মেয়া-বউ'কে তারা কৌতূহলের দৃষ্টিতে বারবার ঘুরে ঘুরে দেখে। দিনের আলোয় পঞ্চাশ-উর্ধ্ব গহরের সুস্পষ্ট শারীরিক গঠনও

আলেয়াকে বিচলিত করে, 'এই অবয়বটা চোখে পড়লে কেমন ধ্বক করে ওঠে আলেয়ার ভেতরে। একজন প্রবীণ পুরুষ। বাপ যদি বেঁচে থাকত, তার থেকেও বয়সে বড় হবে গহর। এই প্রবীণতা তাকে অধিকৃত করেছে। তার বিরাটত্বের কাছে সে এতই ক্ষুদ্র যে সারাক্ষণই অধিকৃত থেকে যায় আলেয়া। সমর্পণে ভেঙে থাকে।'[৫৫] তাই রাতের অন্ধকারে গহরের বাহুতে আত্মসমর্পণে সে বাধ্য হলেও, দিনের আলোয় গহরের দাম্পত্যে সে লজ্জিত, কুণ্ঠিত, ভিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। এই সংকট থেকে অবশ্য তাকে একভাবে রক্ষা করে লালমনের সপত্নীঈর্ষা জনিত ব্যবস্থাপনা। গহর লালমনের ব্যবস্থাপনা ও ভয়ে রাতের অন্ধকার ছাড়া, দিনের আলোয় আলেয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্যে যাওয়ার সাহস পায় না। এই আপাতবঞ্চনার মধ্যেই আলেয়ার মুক্তি।

তবে নারীজীবনের আর এক চরম সত্যকে লেখক স্পর্শ করেছেন আলেয়ার মধ্য দিয়ে। যেখানে আঠারবছরের আলেয়াও মাঝে মাঝে গহর আলির বয়সের প্রবীণতা পায়। তাই সে একজন পরিণত জননীর মতো বয়সে বড় সাজুকে বাবা-মার সঙ্গে সৎ ব্যবহারের উপদেশ দেয়। এক্ষেত্রে সপত্নী পুত্রের সঙ্গে তার ব্যব্যহার একেবারেই মানবিক। সে পুত্রবধূ নাদিরাকেও সহ্য করার উপদেশ দিয়ে, তাদের সোনার সংসার গড়ে ওঠার কামনা করে। নিজের জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া ভুলে যেতে, গহরের অধিকৃত আলেয়া অবিরাম কাজের মধ্যেই এক নিশ্চিত জীবন খোঁজার চেষ্টায় থাকে। তবু সে তার এই বিবর্ণ জীবনের অন্তরালে এক রঙিন কল্পনা ও স্বপ্নমাখা রূপকথা লালন করে। তাই তার স্বপ্নের প্রেমিকপুরুষ গাজিকে শুধু চোখের দেখার আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়। কিন্তু তার এই গোপন রূপকথার জগতে একসময় মাসুরা চলে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। তারই চোখের সামনে তার রূপকথার নায়ক গাজি, তারই সৎমেয়ে মাসুরাকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার চেষ্টাই সফল হয়। ফলে তার এই রূপকথার জগতও নষ্ট হয়ে যায়, তার রূপকথার রঙিন স্বপ্ন, চোখের অবিরাম লবণাক্ত ধারায় বিবর্ণ হতে থাকে।

গহর আলির প্রথম স্ত্রী লালমন নিজের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। সে আলেয়াকে সতীন রূপে শেষপর্যন্ত মেনে নিলেও, সংসার ও স্বামীর প্রতি কর্তৃত্ব একচুল ছাড়ে নি। এমনকি আলেয়ার সঙ্গে গহরের দাম্পত্য-আলাপের সময়সীমাও লালমনই নির্ধারণ করে, তাই 'রাতে গহরের এ-ঘর থেকে অ-ঘরে যাওয়ার হক আছে। বড়বুবু তাতে বাদ সাধে না।

কিন্তু দিনমানে মাগ ভাতারের আলাপচারিতায় আপত্তি আছে।'[৫৬] সাধারণত দেখা যায় যে, দ্বিতীয় স্ত্রীর আগমনে সংসারে প্রথম স্ত্রী তার আধিপত্য থেকে শুরু করে, স্বামীর ভালোবাসা পর্যন্ত সবই হারিয়ে ফেলে। উপরন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী যদি অল্পবয়সী সুন্দরী রমণী হয়, তাহলে তো কথাই নেই। স্বামীপুরুষ তখন প্রথম স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকায় না। সেদিক থেকে লালমন একটি ব্যতিক্রমী রমণী। বরং সে-ই আলেয়াকে একটি সামান্য কাজের মেয়ের মর্যাদাটুকুই দিয়েছে। তাই আলেয়ার সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু লালমনের হাত থেকেই আসে। তার কর্তৃত্ববোধ অত্যন্ত প্রখর। এমনকি পুত্র সাজু ও পুত্রবধূ নাদিরা তার শাসন মানে নি বলেই তাদের মেরে, বাড়ি থেকে বের করে। একজন অত্যাচারী শাশুড়ির মতো নাদিরাকে সে খাওয়া পরারও কষ্ট দিয়েছে। যেখানে আলেয়া বিমাতা হয়েও সাজু ও নাদিরার সঙ্গে এক সুন্দর সম্পর্ক স্থাপন করে, সেখানে লালমন নিজের সন্তানের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে, তাদের সমস্তকিছু থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে। সমাজজীবনে বহুসন্তানের জননীদের মধ্যে, কেউ কেউ অনেকসময় বিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, লালমনের মধ্য দিয়ে লেখক এই সমাজ সত্যই তুলে ধরেছেন। অতিরিক্ত অধিকার সচেতনতায় তারা অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অনেক সময় অন্য নারীর জীবনযন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে।

এই ছোটগল্পের নাদিরা একটি আবেগপ্রবণ রমণী। তাই যেমন সে খুব সহজেই কেঁদে ফেলে, ভালোবাসায় ভরিয়ে তোলে তেমনি আবার রেগে গেলে মুখরাও হয়ে ওঠে। তাই সে আলেয়াকে যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি লালমনের সঙ্গে প্রয়োজনে পাল্লা দিয়ে ঝগড়া করে। সংসারের সমস্ত কাজে পারদর্শী নাদিরা গান শুনতে ভালোবাসে, আবার কুড়ালে ডাঁপও পড়াতে পারে। প্রকৃত স্ত্রীর অধিকার খাটিয়ে স্বামীকে নানা কাজে আদেশ ও উপদেশ দেওয়ার অধিকার ভোগ করে সে। লালমনের সঙ্গে ঝগড়া হলেও, ননদ মাসুরার সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সমস্ত কিছুর মাঝেও শাশুড়ির অত্যাচারের স্মৃতিচারণায় সে নিজে কাঁদে ও আলেয়াকেও অশ্রুসিক্ত করে তোলে। তবে তার প্রতি সাজুর ভালোবাসা এবং সহানুভূতি, তার বিগত জীবনের বেদনাকে ভুলিয়ে দিয়ে এক সুখী দাম্পত্যজীবন গড়ে তোলায় সহায়ক হয়।

আবার মাসুরার মধ্য দিয়ে লেখক একজন কিশোরীর কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকপুরুষকে কেন্দ্র করে সাধারণ নারী-জীবনের আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশিত। আলেয়া মনে মনে জ্বালা অনুভব করেও

কিন্তু গাজির প্রতি মাসুরার অদম্য আকর্ষণকে সহানুভূতির চোখে দেখে, 'মাসুরা নেচে উঠেছে গাজির প্রতি। মাসুরার কম বয়স। ঘুরে ঘুরে রেডিও বাজাচ্ছে। হাতে ঘড়ি। গায়ে জামা, পরনে প্যান্ট। 'সিনেমা আর্টিস্ট'দের মত চুল ছাঁটা'। একজন কিশোরীর জীবনে এই প্রেমিক পুরুষই একান্ত কাম্য। তাই মাসুরা তার বয়সের দোষে, খুব সহজেই গাজির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে সরল স্বভাবের মাসুরা বিমাতা আলেয়াকে যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি বৌদি নাদিরার সঙ্গেও তার ভালোবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক। তাই মায়ের অবর্তমানে সে নাদিরাকে অনেককিছুই গোপনে দিয়ে আসে। সে নিজের ভাইবোনদেরও পরম স্নেহে ও যত্নে আগলে রাখে। সেক্ষেত্রে সহজ, সরল, মিষ্টি স্বভাবের মাসুরার জীবনে কপট প্রেমিক গাজির আগমন, ভুক্তভোগী আলেয়াকে শঙ্কিতও করে। মূলত লেখক মাসুরার জীবনের মধ্য দিয়ে, আলেয়ার বিবাহপূর্ব জীবনের ধারাকে সুস্পষ্ট করেছেন।

'সমুদ্রের নিলয়' ছোটগল্পের লালমন বা নাদিরার জীবনে সমস্যার মধ্যেও বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত নয়। গহরের দ্বিতীয় বিবাহে লালমন অপমানিত ও সাময়িকভাবে নিজের মর্যাদা হারালেও, সংসার ও স্বামীর প্রতি তার আধিপত্য বজায় থাকে সমানভাবে। নাদিরা জীবনসংগ্রামে সাজুকে পাশে পায়। শুধুমাত্র ভাগ্যবিড়ম্বিত আলেয়ার জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির সমস্ত পথ রুদ্ধ করে রাখে গহরের মত বহুগামী পুরুষেরা। অবশ্য 'সিন্ড্রেলা'র মত অনাথিনী কেবলমাত্র অবাস্তব রূপকথার কাহিনীতেই রাজকুমারকে পায়। কিন্তু বাস্তবের আলেয়ার মত অনাথ বা দরিদ্র কিশোরীর জীবনে, গহরের মত কোনো আধবুড়ো বিবাহিত পুরুষ বা কোনো বিপত্নীক বৃদ্ধই আসে। নারীজীবনের এই বিপর্যয়ের ইতিহাস, মুসলিম সমাজে সচরাচর রচিত হতেই থাকে। এক্ষেত্রে তারা আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করলেও, নিজের সমস্ত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ থেকে বিচ্যুত হয়ে এক বিড়ম্বিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

## আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের ভাষারীতি

আফসার আমেদ তাঁর এই সময়কালের কথাসাহিত্যে মূলত গ্রামীণ মুসলিম জনজীবনের এক কঠিন ও কঠোর বাস্তবতাকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। একথা সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আশি শতাংশ মুসলিম জনসাধারণ গ্রামে বসবাস করে আর তাদের অধিকাংশ কৃষিকাজ ও

দিনমজুরের সঙ্গে যুক্ত। অনেকে আবার ভ্যান বা রিক্সা টানে, আবার কেউ কেউ ছোটখাট ব্যবসাও করে। এই অশিক্ষিত, অসহায়, পশ্চাদপদ ও দরিদ্র ধর্মভীরু জনসাধারণের বেশিরভাগ শিক্ষাঙ্গন, আধুনিক চিকিৎসা, ধ্যানধারণা ও জীবনযাত্রা থেকে অনেকটাই দূরবর্তী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা, দারিদ্র্য, অভাব, অশিক্ষার পাশাপাশি তারা সামাজিক ও ধর্মনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের  শাসন ও শোষণের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বেঁচে থাকে। ভদ্রলোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাছেও তারা ব্রাত্য। এই সমাজেরই একজন হিসেবে আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে এই প্রান্তিক জনজীবনকেই বিষয়বস্তু রূপে বেছে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব নেন। এই সমাজে নারীর অবস্থান আরও বেশি সংকটজনক। ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষার অভাবে তারা সমাজে প্রচলিত নানান কুসংস্কারকে অনেকসময় ধর্মবিধান বলে মনে করে। তালাক, বহুবিবাহ ও নিকাহ হালালার নামে নারীর উপর অমানবিক নির্যাতন নেমে আসে। ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যে ও মোল্লাতন্ত্রের প্রভাবে পদে পদে নারীর নিরাপত্তা, স্বপ্ন ও জীবন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এই সমস্যাসঙ্কুল সমাজবাস্তবতাকে তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

আর লেখকের এই সমাজবাস্তবতা আরও বেশি বর্ণময় রূপ লাভ করে, তাদের নিজস্ব ভাষারীতির ব্যবহারে। যে ভাষারীতি কাব্যিক চমৎকারিত্বে অপরূপ। পাশাপাশি এই সমাজের সার্বিক পরিচয়দানে লেখক তাদের লোকায়ত নিজস্ব ভাষারীতির বাক্যরূপ, শব্দরূপ, ধ্বনিরূপ ও উচ্চারণভঙ্গীকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেছেন। তাদের উচ্চারিত বেশ কিছু লোকজ ও সাম্প্রদায়িক শব্দ ভদ্রলোক সংস্কৃতি ও বাংলা অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি, ফারসি, বাংলা ও লোকজ শব্দমিশ্রিত এই ভাষারীতিতে গ্রামীণ অশিক্ষিত, অনভিজাত মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির এক অন্তরঙ্গ রূপের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। একটি সমাজের এই বর্ণ-গন্ধ-রূপময় শেকড়ের ভাষারীতির অনেকটাই ভদ্রসংস্কৃতির কাছে অপরিচিত হলেও, লেখকের উপন্যাসিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই একটি সাহিত্যের পরিপূর্ণ রস আস্বাদনে একজন সচেতন পাঠকের দায়িত্ব হল, এই জনসমাজের ভাষাকে চিনে নেওয়া, বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষারীতিকে বুঝে নেওয়া এবং সেই জনসমাজের নিজস্বতাকে খুঁজে নেওয়া। এই জনসমাজেরই একজন প্রতিনিধিরূপে রজব

মল্লিকের উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ‘তালাক দিবি তবে মাগকে নিয়ে ঘর করবি কেন রা শোরের বাচ্চা,...আল্লা গজব দিয়ে দিবেনি’(ঘরগেরস্তি)। বন্যা বিধ্বস্ত কৃষকের একজন রূপে শহিদের উক্তি, ‘শালা গতর কি মাগনা পেয়েচু—চ্যাষ করব, লদির বান এসে ভেসিয়ে লিয়ে যাবে—জমি বেচে দুবো—ঘর ভিটে বেচে দুবো—কে লিবে দ্যাক গে যা’( বসবাস)। এই ভাষারীতি একজন অসহায়, অশিক্ষিত কৃষকের প্রাণের বেদনা ও আক্ষেপকে আরও বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। আবার স্বামীর পরকীয়ার আহত নিশারের মায়ের আর্তনাদ তার নিজস্ব লোকজ ভাষারীতিতে অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, ‘মোর কলজে ছ্যাঁদা করল সাজেদের শালি। ওগো কাল মরদটা নাকি ডাইনির ফুসমন্তরে সিনিমা লিয়ে গেছল। ভাতার ছেড়ে এয়েছে, মরদ পায় নি, লাফ কেটে মোর বুড়ো মরদকে ধরেচে’(স্বপ্নসম্ভাষ)। ‘আত্মপরিচয়’ উপন্যাসে শিক্ষিত মালেকা, শায়রা, কামাল প্রভৃতির ভাষারীতির সঙ্গে ভদ্রলোকসংস্কৃতির কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে এই উপন্যাসেই আবার অশিক্ষিতা মনবোধ অপারেশনকে বলে ‘অপাসশান’। তাছাড়া বাকুল, আধলা, তেলাই, উসরা, বাসতেল, মুটা, জাড়, ল্যাকা, কুথাকে প্রভৃতি অসংখ্য অনাভিধানিক লোকজ শব্দের ব্যবহারে, আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে বর্ণিত সমাজবাস্তবতার শিকড়কে স্পর্শ করেছেন। অনুরূপভাবে এই সময়কালে রচিত তাঁর ‘জনস্রোত,জলস্রোত’ থেকে শুরু করে ‘আর্তি’ ছোটগল্পেও এই ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন লেখক নিপুণতার সঙ্গে। মোর, মোদের, তুমার, তুদের প্রভৃতি সর্বনাম এবং পাবেনি, উঠবেনি, যেওনি, খাবেনি, করেচিস, দিলুনি, এসতেচিনি প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহারে লেখক সেই সমাজের নিজস্ব ভাষারীতিকেই অনুসরণ করেছেন। আবার ‘অপ্রেম অমরণ’, ‘কুড়ি বছর’ প্রভৃতি ছোটগল্পে তিনি অমুসলিম জনসমাজের জীবনালেখ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে, তাদের উপযোগী কোলকাতার চলিত ভদ্রসংস্কৃতির ভাষারীতিকেই অনুসরণ করেছেন। আবার তাঁর ‘পাথর পাথর’ ও ‘শীতজাগর’ ছোটগল্পে বস্তিবাসীদের ভাষারীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এইভাবেই লেখক আফসার আমেদ বিয়য়নির্বাচন থেকে শুরু করে, অভিনব ভাষারীতির ব্যবহারে তাঁর কথাসাহিত্যকে এক অনন্যসাধারণ মাত্রাদানে সক্ষম হয়েছেন এবং বাংলা কথাসাহিত্যের জগতকে করেছেন বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

## উৎসনির্দেশ:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, চিত্রাঙ্গদা পৃষ্ঠা - ১৬৪

২. কলকাতা ২৪*৭ , ১৭ আগস্ট -২০১৭, ১-১০ পি এম

৩. মুস্বানাফ ইবনে আবী শাইবাহ, ৫-ম খন্ড, পৃষ্ঠা -২৯৪

৪. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র (১)*, দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা নং -২০

৫. আফসার আমেদ, *স্বপ্নসম্ভাষ*, দে'জ পাবলিশিং, সুভাষচন্দ্র দে, কলকাতা-৭৩, ১৯৯১ ,পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭

৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৩

৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৬৫

৮. আফসার আমেদ, *সানু আলির নিজের জমি*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-০৭৩, জানুয়ারী,১৯৮৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৯-৭০

৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৪৫

১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৮

১১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১০৯

১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ১৩০

১৩. আফসার আমেদ, *আত্মপরিচয়*, সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিট,কলকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা –৩৯

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৫৬

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৪-৩৫

১৬. *গাধা*, আফসারআমেদসংখ্যা, সম্পাদক- মলয় সরকার, সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিট,কলকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা –২৩৪

১৭. আফসার আমেদ, *ঘরগেরস্তি,* স্বরলিপি , কলকাতা-৯, ১৯৮২ পৃষ্ঠা নং ১১৭

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১০১

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৪৩

২০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৭

২১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৪

২২. আফসার আমেদ, *আত্মপরিচয়,* সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিট,কলকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯০, পৃষ্ঠা সংখ্যা –১৯-২০

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১০৯

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৯২

২৫. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, জিন্নত বেগমের বিরহমিলন,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৫

২৬. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, গোনাহ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২১

২৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা –২৫

২৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৩

২৯. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প, গামছা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৬০

৩০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৬২

৩১. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, হাড়,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৬৫

৩২. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প, ডিপ টিউবওয়েলের দাম কত?,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৭৪

৩৩. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, জিন্নত বেগমের বিরহমিলন,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৭

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৪১

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩০-৩১

৩৭. আফসার আমেদ, *আফসার আমেদের ছোটগল্প, জিন্নত বেগমের দিবসরজনী,* প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ১৩, ১৯৯২, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৭

৩৮. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প, বিরহ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৯২

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৯৭

৪০. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, আর্তি,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১১০

৪১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১১৭

৪২. আফসার আমেদ, *বসবাস,* তৃষ্ণা খাঁন, বাকশিল্প, ১৭-সি তেলিপাড়া লেন, কলকাতা—৭০০০৩১, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা –২১-২২

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা –৫৫

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা –১৪৬-১৪৭

৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা –১৪০

৪৬. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, জনস্রোত, জলস্রোত,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১১

৪৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা –১৬

৪৮. আফসার আমেদ, *বসবাস,* তৃষ্ণা খাঁন, বাকশিল্প, ১৭-সি তেলিপাড়া লেন, কলকাতা—৭০০০৩১, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা –৪৭

৪৯. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, আদিম,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৫৬

৫০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৫৩

৫১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৫৮

৫২. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৪৩

৫৩. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প, সমুদ্রের নিলয়,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৯৮

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৯৭-৯৮

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১০০

৫৬. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১০২

# তৃতীয় অধ্যায়ঃ

# আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন(১৯৯১-২০০০)

বিংশ শতকের শেষভাগে (১৯৯০-২০০০) বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও চাকরির ক্ষেত্রে এক বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করে, যেখানে নারী-পুরুষের অধিকারগত ও অবস্থানগত পার্থক্যের সীমারেখা কমে আসে, সেখানে মুসলিম সমাজের চিত্র অনেকটাই আলাদা। সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সমাজের পুরুষের সংখ্যা সরকারী চাকরিক্ষেত্রে খুবই সামান্য। অন্যদিকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে মুসলিম নারীর এই অবস্থান প্রায় শূন্য বললেই চলে। তবে আশার কথা, এইসময় অন্দরমহল ছেড়ে অনেক মুসলিম নারীই শিক্ষাঙ্গনে যায়। শহর ও মফঃস্বলের মেয়েরা অবশ্য এ বিষয়ে অনেকটাই এগিয়ে। কিন্তু কিছু কিছু গ্রামগঞ্জে মেয়েদের এই শিক্ষালাভের চিত্রটি ভিন্নতর। এখানে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত কোনো কোনো পরিবারে, মেয়েরাও স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজ পর্যন্ত যাওয়া শুরু করে। এমনকি খুব সামান্য হলেও, কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা পেলেও, চাকরিক্ষেত্রে প্রবেশের স্বাধীনতা তারা কিন্তু তখনও পায় নি। তবে গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারই এই সময় ছেলেদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তারা তখনও উদাসীন। তারা আরবি শিক্ষার জন্য মেয়েদের মক্তব বা মাদ্রাসায় যাওয়ার অনুমতি দিলেও, বিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যাপারে অনীহা দেখায়। এক্ষেত্রে অবশ্য নিত্যদিনের অভাবও একটি বড় কারণ। আর যদিও বা কাছাকাছি কোনো প্রাইমারি বা হাইস্কুলে তারা মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য পাঠায়, তবু সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালীনই, তাদের বিয়ের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, আর এখানেই তাদের লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে।

এই শতকের শেষভাগে শহরাঞ্চলের মুসলিম মেয়েরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলেও, চাকরি করার ক্ষেত্রে তাদের জীবনে তখনও পর্যন্ত একটি সামাজিক বাধার উপস্থিতি লক্ষ্য করা

যায়। কারণ মধ্যবিত্ত তথা উচ্চবিত্ত পরিবারে মেয়েদের চাকরিক্ষেত্রে প্রবেশ করাকে এই সমাজ সম্মানের চোখে দেখতো না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমাজ স্ত্রীর উপার্জনকে অপমান বলে মনে করতো। ফলে মুসলিম নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে পরাধীনই থেকে যায়। আর এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে তাদের অনেকের জীবন, এই দশকেও তালাক ও বহুবিবাহের মতো ধর্মাশ্রয়ী প্রথায় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বৈচিত্র্যময় সমাজজীবনের নানান ঘাত-প্রতিঘাত ও অবস্থানগত প্রতিক্রিয়াকে লেখক আফসার আমেদ, তাঁর কথাসাহিত্যে সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন। পাশাপাশি এই পর্বে লেখকের কিস্‌সা সিরিজের একটি সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়, যার অভিনব কথনতত্ত্ব পাঠককে এক অনাস্বাদিত জগতে নিয়ে যায়।

আফসার আমেদের লেখা ১৯৮০-১৯৯০সালের অন্তর্বর্তী সময়ে প্রকাশিত কথাসাহিত্যের কেন্দ্রভূমিতে মূলত পশ্চিমবঙ্গের পশ্চাদপদ, নিম্নবর্গীয়, দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসমাজই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তী ১৯৯১-২০০০সালের মধ্যবর্তী সময়ের লেখায় একই সঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে অমুসলিম জনসমাজ ও তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনের ধারা। শুধু তাই নয়, এই পর্বে নিম্নবর্গীয় জনসমাজের পাশাপাশি, তাঁর সাহিত্যে স্থান পায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত জনসমাজও। লেখকের নির্বাচিত কাহিনিধারা এই পর্বে এসে গ্রামীণ জনজীবনের পাশাপাশি অনেকটাই শহরকেন্দ্রিকও হয়ে উঠেছে। এই সময়কালের কথাসাহিত্যে নারী ধীরে ধীরে সবলা হতে থাকে। সে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মোল্লা বা মৌলবির বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সাহস দেখায়। তারা নিজেদের উপর, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে। এই দশ বছরের ব্যবধানে সমাজে আসা পরিবর্তনের প্রভাব আফসার আমেদ সচেতনভাবেই তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থানের তেমন কোনো পার্থক্য না ঘটলেও তার জীবনে একটা ক্ষীণ আলো আসার ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের এই পরিবর্তনের ধারা হয়তো তাদের একদিন স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সহযোগিতা করবে। লেখকের এই পর্বের উপন্যাসগুলি হল ‘খণ্ডবিখণ্ড’, ‘অন্তপুর’, ‘ধানজ্যোৎস্না’, ‘সঙ্গ নিঃসঙ্গ’, ‘ব্যথা খুঁজে আনা’, ‘বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা’, ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’, ‘দ্বিতীয় বিবি’ এবং ‘এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা’ এবং ছোটগল্পগুলোর মধ্যে

অন্যতম হল 'রক্তলজ্জা', 'পাণিগ্রহণ', 'হাসিনার পুরুষ', 'নোঙর', ' দুই নারী', 'সঙ্গ', 'দুই বোন', 'স্বামী প্রেমিকের কাছে পত্র', 'স্বামী স্ত্রীর নৈকট্যের ভিতর', 'পাগলের জবানবন্দি' প্রভৃতি।

**তালাক প্রসঙ্গঃ**

আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দেশে মুসলিম নারীরা কোনো লিখিত প্রমাণ ছাড়াই, শুধুমাত্র মৌখিক তিন তালাকের যূপকাষ্ঠে আজও সমানভাবে বলি হয়। কখন পণের দাবিতে, পছন্দ না হওয়ার অজুহাতে বা নিজের ভোগবাসনা পূরণের জন্য এই সমাজের কামুক, স্বার্থান্ধ ক্ষমতাশালী পুরুষেরা, ধর্মের আশ্রয়ে খুব সহজেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে। অনেকসময় সন্তানধারণে সক্ষম কিনা, সেই পরীক্ষা না করেই বন্ধ্যা অপবাদে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয় বা দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনে। এই যুক্তিহীন, অমানবিক আচরণের জন্য স্বামীকে সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্মগুরুর কাছে কোনোরকম জবাবদিহি করার প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগত শরিয়তি আইনের মধ্য থেকে, প্রশাসনের হাত থেকে সে একেবারেই মুক্ত। অথচ সমাজের এই ভুক্তভোগী, দুর্ভাগ্যপীড়িত ও পদতলে পিষ্ট নারীর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও সম্মান নিয়ে রক্ষণশীল মৌলবাদীরা কোনো কথা বলেন না। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ নারীর জীবনের এই চরম সংকটকে বারবার তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

**১) অন্তঃপুর**

তালাক প্রসঙ্গে আফসার আমেদের 'অন্তঃপুর' উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য। লেখকের যে সমস্ত উপন্যাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের দরিদ্র, খেটে খাওয়া শ্রমিক সমাজের একটি পরিপূর্ণ বাস্তবচিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল 'অন্তঃপুর'। এই উপন্যাসে বর্ণিত মুসলিম সমাজে নারীর নিজস্ব কোনো কর্মক্ষেত্র বা সম্বল না থাকায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সে এক নিশ্ছিদ্র পরাধীন জীবনযাপনে বাধ্য থাকে। তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, কোনো না কোনো ভাবে, কোনো না কোনো পুরুষের অধীনে, জীবন অতিবাহিত করে। তা সেই পুরুষ, স্বামীও হতে পারে অথবা ভাই বা সন্তানও হতে পারে। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত শাসন,

অত্যাচার ও নিয়ম মেনে চলায় তাদের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এর অন্যথায় জীবনে নেমে আসে তালাকের মতো কঠিন বিপর্যয়।

'অন্তঃপুর' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় তিনটি অংশে বিভক্ত হয়ে। এর প্রথম অংশ 'অন্তঃপুর' প্রকাশিত হয় 'শারদীয় শুভক্ষণ' পত্রিকায়, ১৯৯০ সালে। দ্বিতীয় অংশ 'আঙিনা' প্রকাশিত হয় 'শারদীয় যুবমানস' পত্রিকায়, ১৯৯২ সালে। আর এর তৃতীয় অংশ 'অন্তঃপুরিকা' একই সালে 'শারদীয় পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই তিনটি অংশ একত্রে 'অন্তঃপুর' নামে গ্রন্থাকারে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে মূলত মুসলিম সমাজের, দরিদ্র রাজমিস্ত্রিপাড়ার অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবনের সুখদুঃখের নানান চিত্রের বাস্তবায়ন ঘটেছে। যেখানে জাহিরার মতো নারীর জীবনে নেমে এসেছে তালাকের মতো মর্মান্তিক যন্ত্রণাও।

সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদের লেখায় গ্রামীণ ও অশিক্ষিত মুসলিম নারীর জীবনে যে সমস্ত সমস্যা ও সংকট বারবার এসেছে, জাহিরার জীবনে তার বেশিরভাগই বর্তমান। স্বামীর অত্যাচার থেকে শুরু করে সতীনযন্ত্রণা ও তালাকের মতো কঠিন বিপর্যয়ের শিকার সে। মিস্ত্রিবাড়ির বড়মেয়ে জাহিরা স্বামীর সংসার ও সন্তানদের ত্যাগ করে, প্রায় দুই বছর ধরে বাবার বাড়িতেই আশ্রিতা। সকলের স্নেহধন্য জাহিরা মাতাল, অত্যাচারী স্বামী মইবুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই সংসার ছাড়ে। অসহায় দরিদ্র জাহিরার পক্ষে তিনটি সন্তান লালন-পালন করা সম্ভব নয়, তাই সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের মইবুর সংসারেই রেখে আসে। কিন্তু মইবু জাহিরার অভিমান ভাঙিয়ে সংসারে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো চেষ্টা না করে, দ্বিতীয় বিবাহ করে। জাহিরা মইবুর দ্বিতীয় বিবাহকে মেনে নিতে পারে না। তাই প্রতিবাদস্বরূপ অত্যাচারী স্বামী ও সতীনের সংসারে ফিরে না যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়। একসময়ের সুন্দরী জাহিরা স্বামীর অনাদর, অবহেলা, অত্যাচার ও উপেক্ষায় এবং সন্তানদের ছেড়ে থাকার যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে ম্লান ও শ্রীহীন হতে থাকে। কিন্তু ছয়মাস আগে কুটুমভাই মাসুদের আগমনে তার জীবনে একটি পরিবর্তন আসে, সে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। পাতানো ছেলে মাসুদের দেখাশোনার দায়িত্ব, ফিরোজ বড়মেয়ে জাহিরাকে দেয়। এই দায়িত্ব পালনের মধ্যেই জাহিরার জীবনে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এক রাতের অন্ধকারে যখন মাসুদ নিজেই তার কাছে প্রেম নিবেদন করে, তখন জাহিরার মনের গোপন ভালোবাসা আরও বেশি ঘনীভূত হয়। মাসুদের প্রেম, তার সর্বহারা

জীবনে এক অন্তঃসলিলা নদীর মতই মধুর ছন্দে বয়ে যেতে থাকে, যা সে সকলের কাছে গোপন করে রাখায় প্রয়াসী, এমনকি মাসুদের কাছেও। তাই সে আপাতদৃষ্টিতে মাসুদকে প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিজের এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তের মানসিক যন্ত্রণায় একসময় সে অসুস্থ হয়ে যায়, তার জ্বর হয়। এই জ্বর তার মন ও শরীরকে দুর্বল করতে থাকে।

আফসার আমেদ জাহিরার নারীহৃদয়ের যন্ত্রণাময় দিকটিকে তুলে ধরেছেন মাসুদের সঙ্গে আসমার বিবাহের ব্যবস্থাপনায়। নিজের চোখের সামনে প্রেমিকের বিবাহের অনুষ্ঠান জাহিরাকে আরও বেশি দুর্বল করে। তবে মাসুদের প্রতি তার এই আন্তরিক দুর্বলতার কথা অন্য সকলের কাছে গোপন থাকলেও, বৃদ্ধা মরিয়মের কাছে তা গোপন থাকে নি। তার একান্ত গোপন হৃদয়াবেগ মরিয়ম ধরে ফেলায়, জাহিরা মনে মনে অশান্ত ও রুষ্ট হয়ে ওঠে। তার মনের ক্ষোভ ক্রমে ক্রমে পরিবারের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই দানা বাঁধে, 'এই মাসুদ আলির ভালমানুষি? কমবয়সী আসমাকে পেয়ে যাওয়ায় মাসুদের নীচতারই পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে চাওয়ার মন গড়ে উঠেছিল জাহিরার। বয়স তার এমন কিছুই হয়নি। এই বয়সে অনেক মেয়েদের বিয়ে হয়। সতীনের সংসার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে একটা ভাল পুরুষ সে আকাঙ্ক্ষা করে জীবন সাজাতে চেয়েছিল। জীবনের সাধ তার জেগে উঠেছিল। এটা তার স্বাধীনতার প্রশ্ন, তার স্বামী মইবুর সঙ্গে সংসার না করতে চাওয়া। তার ন্যায্য অধিকারের প্রশ্ন। বাবা মা চাচা চাচি কারুরই এ কথা মনে হয়নি। মাসুদ আলি কি মানুষ? মেয়েদের মন বোঝে না?'[১] জাহিরা একজন অশিক্ষিত নারী হয়েও, এখানে একজন অধিকারসচেতন আধুনিক নারীর প্রতিনিধিত্ব করে।

জাহিরা স্বার্থপর নয় বলেই, বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে, অন্যত্র সংসার পাতার যে প্রস্তাব মাসুদ দিয়েছিল, তাতে সে রাজি হতে পারে না। সমাজ সংস্কার, পরিবারের মান-সম্মান, ভীরুতা এবং আসমার প্রতি মায়াবশতই সে মাসুদের প্রস্তাব নাকচ করে। মাসুদের ভালোবাসাকে সকলের অলক্ষ্যে বুকের মধ্যে লালন করে বেঁচে থাকাকেই সে জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করে। তাই সে মাসুদ ও আসমার বিয়ের আচার অনুষ্ঠানে বুকের মধ্যে কান্না চেপে রেখে, হাসিমুখে অংশগ্রহণ করে। চোখের সামনে প্রেমিকপুরুষের বিয়ে দেখাটা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক, তা সহজেই অনুমান করা যায়। জাহিরা তবু নিজের মধ্যে বেদনা গোপন করে

রাখার অদম্য চেষ্টা করে চলে। কিন্তু বিয়ের রাতে মাসুদ নববধূ আসমাকে অপেক্ষায় রেখে, যখন জাহিরার সান্নিধ্যে আসে, তখন তার শারীরিক ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা আবার নতুন করে জেগে ওঠে। জীবনের আকাঙ্ক্ষা, জ্বালা-যন্ত্রণা ও মাসুদের সঙ্গে গোপনপ্রেম বজায় রাখার খবর কিন্তু মরিয়মের কাছে গোপন রাখতে পারে না জাহিরা। তাই সে মনে মনে মরিয়মের মৃত্যু কামনা করে এবং বাবার বাড়ি ত্যাগ করে, সকলের অলক্ষ্যে অত্যাচারী মইবুর সংসারেই ফিরে যায়। কারণ এই বাড়িতে 'মরিয়মের চোখ তাকে সারাক্ষণ অনুসরণ করবে। মেয়ে হয়ে আর এক মেয়ের শত্রু সে। এক্ষেত্রে মরিয়মকে ক্ষমা করবার কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পায়নি জাহিরা। সান্ত্বনা তার দরকারও নেই। সেই স্বামীর ঘরেই ফিরে এসেছে। দাদির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে ও বাড়ি যাবেনা। এ কঠিন সংকল্প।'[২] পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি অনুগত মরিয়ম দাদি শুধুমাত্র জাহিরাকে সান্ত্বনাই দিতে পারে। একজন প্রবীণা রমণীর মতো কর্তৃত্ব ফলিয়ে, জাহিরাকে সমর্থন করার মতো উদারতা বা সাহস কোনোটাই তার নেই। তাই জাহিরা মনে মনে দাদির মৃত্যুকামনা করে সতীনের সংসারেই ফিরে যায়।

একজন নারীর কাছে জীবনযন্ত্রণার থেকেও বড় হয়ে ওঠে তার আত্মমর্যাদাবোধ। এই জায়গা থেকেই তার কঠিন সংকল্প রক্ষার্থে জাহিরাকে, মইবুর সংসারে অনেক বেশি শাস্তি পেতে হয়। প্রেমিকপুরুষ মাসুদকে শুধু চোখে দেখার সুযোগও সে হারায়, যা তার জীবনে অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক। শুধুমাত্র একটু আশ্রয়ের জন্য স্বেচ্ছায় সে সমস্ত অপমান, অবহেলা, অনাদর ও সতীনযন্ত্রণা মাথায় নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত জীবন নির্বাচন করে। কারণ তার মতো দরিদ্র ও সহায়সম্বলহীন নারীর আর কিছু করার থাকে না। ইতিমধ্যে তার বড় ছেলে আজম তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। দুই মেয়ে সাহানারা ও জাহানারারও তার প্রতি টান কমে যায়। একসময় তীব্র অভিমানে, স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করার অপরাধে, শাশুড়ির ভালোবাসা ও স্নেহ থেকেও সে আজ বঞ্চিত। অন্যদিকে মইবুর মাতলামি ও শয়তানিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাওয়ায়, দিনের বেলা দ্বিতীয় স্ত্রী হাসিনার দাম্পত্যে থাকলেও, রাতের অন্ধকারে মইবুর নিরুচ্চার, ভালোবাসাহীন শারীরিক চাহিদাও তাকে মেটাতে হয়। সতীনের সংসারে জাহিরা তাই শুধুমাত্র এক বেতনহীন কাজের লোক হয়েই থাকতে পারে না, মইবুর আশ্রয়ে তাকে যৌননির্যাতনও সহ্য করতে হয়।

তবে জাহিরাকে প্রথম দিকে কোন সতীন জ্বালা পেতে হয়নি। হাসিনা প্রথম প্রথম তার মনে সতীনজ্বালা উদ্রেক করলেও, শান্ত ও স্নিগ্ধ স্বভাবের হাসিনাকে একসময় সে ভালোবেসে ফেলে। অল্পবয়সী গর্ভবতী হাসিনার উপর মইবুর নিষ্ঠুর অমানবিক অত্যাচার জাহিরার মনকে আরও বেশি দুর্বল করে তোলে। সে প্রতিহিংসা ভুলে হাসিনাকে ভালোবাসতে শুরু করে। মাতাল মইবুর অত্যাচারে কাহিল হাসিনার খেয়াল রাখে, ক্ষতস্থানে 'কানছেঁড়া' পাতার রস লাগিয়ে দেয়, প্রসবযন্ত্রনায় কাতর হাসিনার যত্ন করে। তার অবর্তমানে হাসিনা যে তার সন্তানদের খেয়াল রেখেছিল, এই বোধ থেকেও জাহিরা মনে মনে হাসিনাকে আপন করে নেয়। তাছাড়া স্বামী বা এই সংসারের প্রতি তার অন্য কোন চাওয়াপাওয়া বা আকর্ষণ না থাকায়, আরও সহজ হয়। দাদির মৃত্যুর পরই সে, এই যন্ত্রণাময় আশ্রয় ত্যাগ করে মিস্ত্রিবাড়ি ফিরে যাবে। মূলত প্রাচীন ধ্যানধারণার ধারক দাদির প্রতি নিষ্ঠুর মনোভাব পোষণ করার মধ্য দিয়ে যেন সে, সমাজে প্রচলিত নারীজীবনের চিরাচিরিত বঞ্চনারই ধ্বংস কামনা করেছে। তাই মৃত্যু পথযাত্রী দাদির, শেষ ইচ্ছা পূরণের সংবাদবাহী রাহাতকেও সে চরম নিষ্ঠুরতায় ফিরিয়ে দিয়েছে

লেখক জাহিরার মধ্য দিয়ে একজন অসহায় নারীর বাসবসম্মত মানসিক পরিবর্তনকে ছুঁয়েছেন। জাহিরা নিজের গ্রামের মেয়ে মর্জিনার কাছে যখন দাদির মৃত্যুসংবাদ ও মাসুদের মিস্ত্রিবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সংবাদ শোনে তখন তার মনোভাব বদলে যায়। সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এতদিন মনে মনে যে দাদির সে মৃত্যু কামনা করেছিল, আজ সেই দাদির মৃত্যুসংবাদে সে মর্মাহত হয়। তাছাড়া মাসুদের চলে যাওয়ার সংবাদেও সে আহত হয়। মাসুদবিহীন মিস্ত্রিবাড়ির প্রতি তার কোনো আকর্ষণ না থাকায়, সে মিস্ত্রিবাড়ি ফিরে যাওয়ার সংকল্পও ত্যাগ করে। বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে তাই সে একটি নতুন সংকল্প গ্রহণ করে। স্বামী ও শাশুড়ির অন্তরঙ্গ হয়ে, মইবুর সংসারে স্বাধিকার ফিরে পাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। মইবুকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার চেষ্টায় সে কখনো কখনো উচ্চস্বরে কথা বলে, অকারণে মেয়েদের মারধোর করে। মাসুদকে হারিয়ে, জাহিরা তার বিবাহের পনের বছর পর, এই প্রথম মইবুর প্রতি নতুন করে ভালোবাসার বাসনা জাগিয়ে তোলে। মইবুর ভালোবাসা বা ঘৃণাকে আশ্রয় করে সে মইবুর সংসারে বাঁচতে চায়। কিন্তু হাসিনার বয়সের কাছে হেরে যায়। তার এই অধিকার ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় জাহিরা, হাসিনার মনেও সতীন-প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলে। যতদিন সে মইবুর

সংসারে শুধুমাত্র সাংসারিক দায়িত্বপালনে ব্রতী ছিল, ততদিন হাসিনা তার মধ্যে কোনো বিপদ দেখতে পায় নি। কিন্তু তার মইবুকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার চেষ্টা বা স্ত্রীর অধিকার পাওয়ার চেষ্টায় হাসিনার মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তাই হাসিনার মনের বিষবাস্পে জাহিরার সংসারজীবন পুড়ে যায়, কোনো অপরাধ না করেই তাকে তালাক পেতে হয়।

মূলত জীবনের সমস্ত স্বপ্ন যখন কোনো নারী হারিয়ে ফেলে, তখন দুর্ভাগ্যপীড়িত দাম্পত্য জীবনকেই মেনে নিতে বাধ্য হয়। এতদসত্ত্বেও বারবার জাহিরারা জীবনের নিষ্ঠুরতার কাছে হেরে যায়। তাই সে যখন সমস্ত উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করেও, মইবুর জীবন ও সংসারে নিজের স্থায়ী ঠিকানা গড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তখন আকস্মিকভাবে তাকে, মইবু তালাক দিয়ে দেয়। সময়ের আগে বাড়ির চাল শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্ষিপ্ত মইবু উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং এই ব্যাপারে সকলের সামনে, বড়বউ জাহিরাকেই সে দায়ী করে, বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে। সকলের সম্মুখে অপমানিত জাহিরাও উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীর অধিকার চেয়ে বসে। বদমেজাজি, নিষ্ঠুর মইবু, জাহিরার এই 'চোপরা' সহ্য করতে পারে নি। তাই সকলের সামনে তালাক দিয়ে জাহিরার জীবনকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। জাহিরা তার সংসার জীবনের সমস্ত সংগ্রাম, অপমান, অনাদর, অবহেলা ও উপেক্ষা থেকে মুক্তি পেয়ে, একমাথা উকুন ও জট নিয়ে মিস্ত্রিবাড়ি ফিরে যায়। বাবার আশ্রয়ে ও মায়ের ভালোবাসায় তার জীবনের চলার পথ অনেকটাই সরল হয়ে যায়। এদিক থেকে বলা যায়, শেষপর্যন্ত তালাক তার জীবনে ইতিবাচক হয়ে ওঠে। যদিও সে জীবনের প্রকৃত অর্থ হারিয়ে, একজন আশ্রিতা রূপেই বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়। গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজে জাহিরার মত ভাগ্যহত নারীর সন্ধান খুব সহজেই পাওয়া যায়। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে, এই দিককে পরিস্ফুট করে তোলেন।

**২) ধানজ্যোৎস্না**

আফসার আমেদের অন্যতম উপন্যাস 'ধানজ্যোৎস্না'র মধ্যেও তালাক প্রসঙ্গ, মুসলিম নারীর জীবনে এক চরম সংকটময় পরিস্থিতি রচনা করেছে। ভারতীয় মুসলিম সমাজের অনেকেই কাজের সূত্রে সুদূর আরবদেশে যাত্রা করেন। ফলে অনেকেরই আর্থিক ও সামাজিক

অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের মাঝেও অনেক নারীর জীবন, সেই চিরাচরিত শরিয়তের বিধি-বিধান ও সমাজে প্রচলিত সংস্কারের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। তালাক, বহুবিবাহ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানে তার জীবন ক্ষত-বিক্ষত হতেই থাকে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া না করেই, এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষের সঙ্গে তার জীবন জুড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও আকুলতা, দ্বিতীয় স্বামীর দাম্পত্যেও তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে, তাড়িত করে আবার কখন কখন পুরনো স্মৃতি মধুর সংগীত রূপে তার প্রাণে দোলা দিয়ে যায়। সখিনার এই দ্বন্দ্বজড়িত দাম্পত্য জীবনের কাহিনি হল 'ধানজ্যোৎস্না'।

আফসার আমেদের 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় **১৯৯২** সালে, 'শারদীয় প্রতিক্ষণ' পত্রিকায়। **১৯৯৩** সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন 'আমার ভুবন' নামে একটি কাহিনিচিত্র নির্মাণ করেছেন। লেখক আফসার আমেদ তাঁর এই উপন্যাসের নামানুসারেই তাঁর বাগনানের বাড়িটির নাম রেখেছেন 'ধানজ্যোৎস্না'।

'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাসটি লেখকের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই উপন্যাসে তিনি মুসলিম নারীজীবনের এক চরম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন সখিনার দোলাচলতার মধ্য দিয়ে। বর্তমান স্বামী মেহেরের চৌদ্দবছরের দাম্পত্যজীবনেও সখিনা তার পূর্বস্বামী নুরকে ভুলতে পারে না, নুরের ভালবাসা সে অত্যন্ত গোপনে আজও বহন করে চলে। এমনকি সে অনেকসময় মেহেরের অস্তিত্বের সঙ্গে নুরকে এক করে ফেলে। মাত্র দেড় বিঘা জমির মালিক মেহেরের সংসারে অবশ্য দারিদ্র্যের পীড়ন থাকলেও, ভালোবাসা ও স্বপ্নদেখার আনন্দে তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সখিনা প্রথমসন্তান শাজাহানকে গর্ভে ধারণ করার সময় থেকেই ভালোবাসা ও আনুগত্যে মেহেরকে পরিতৃপ্ত করে তোলে। এই ভালোবাসাকে ধরে রাখার আকুলতা থেকেই হয়তো তিন সন্তানের মধ্যে, শাজাহানের প্রতি তার একটু বেশিই দুর্বলতা। অন্যান্য সন্তানের তুলনায় শাজাহানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে সখিনার একটা নিজস্ব চাওয়া-পাওয়া থাকে। শাজাহানের প্রতি সখিনার এই স্নেহপ্রবন আকুলতায় মেহের মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়। এইসমস্ত কিছুর মাঝে, আজও তিন সন্তানের জননী সখিনার জীবনে, নুরের প্রতি এক গোপন ভালোবাসা কুহক তৈরি করে। এই কুহক ও বিভ্রান্তি থেকে সখিনা মুক্তি পায় না, মুক্তি চায়ও

না। তাই 'মেহেরকে ভালবাসার নরম মুহূর্তে ঢুকে পড়ে নুর। নুরকে কাছে পেয়ে ভালবাসছে এই বিভ্রমের ভেতর মেহেরকে কাছে পেয়ে ভালবেসে তার দশা একই হয়। সংসারের হাতে ধরা দেওয়ার নারী, এই আত্মসমর্পণের দশার ভেতর তাকে সুখী হতে হয়। এটা মেহের জানতে পারে না। মেহেরকে জানানোর উপায়ও তার থাকে না।'[৩] সখিনা জানে, নুরের প্রতি তার ভালোবাসার কথা মেহের জানলে, তার সংসার-জীবনে এক অনাসৃষ্টি ঘটবে। তাছাড়া সে মনে মনে বিশ্বাস করে, 'মেহেরকে নুর বলে ভালবাসলে, মেহেরই ভালবাসা পায় বলে মেহেরের কোনো ক্ষতি হয় না। মেহেরের বিবি ও প্রেমিকা হয়েই থাকে সখিনা। আসলে সখিনা মেহেরের বিবি ও প্রেমিকা হয়েই থাকে। আর মেহেরকে প্রাণপণ ধরে রাখার ভেতর নুরকে হারানোর পূর্বভয় কাজ করে। মেহেরকে হারানোর ভয় যেন নুরকে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা।'[৪]

জীবনের এই সংকট থেকেই সখিনা মেহেরের প্রতি তার দাম্পত্য-প্রেমকে সযত্নে রক্ষা করে চলে। মেহেরের অনুপস্থিতিতে সে স্বামীকে হারানোর দুর্ভাবনায় ভীত ও পীড়িত হয়। সাবেক স্বামী নুরকে মনে মনে ভালবাসলেও মেহেরই তার সব। নুর তার জীবনে বিভ্রম তৈরি করলেও বাস্তবতার প্রতি সজাগ সখিনার সতর্কতা থাকে, 'কারণ সে জানে, মেহেরকে নিয়েই তার জীবন। নুরকে ছেড়ে আসা যেমন দুর্ঘটনা তেমনি নুরের কাছে ফিরে যাওয়াও হবে এক দুর্ঘটনা। মেহেরের কাছে তাই তার চরম আত্মসমর্পণ থাকে। নুরকে নিয়ে এই বিভ্রম বাদ দিলে সমস্ত সময়ই মেহেরকে ভালবেসে থাকতে চায়। সেটাই তার জীবন, মানে।'[৫] এই আত্মসমর্পণের জায়গা থেকেই সখিনা সংসারের প্রয়োজনে মেহেরকে এককথায় তার বাবার দেওয়া কানের মাকরি, ব্রোঞ্জের চারগাছা চুড়ি ও রূপোর পায়জোড়া প্রভৃতি গয়না দিয়ে দেয়। কিন্তু একটি সোনার নথ সে কিছুতেই দিতে চায় না। মেহেরের জেদের কাছে নথের টানাটা দিতে বাধ্য হলেও, বেশ কিছুদিন মন খারাপ থাকে সখিনার। কারণ নুরের দেওয়া একমাত্র প্রেমের চিহ্ন নথটি, সখিনা নুরের প্রতি গোপন ভালোবাসার মতই পরম আকুলতাই ধরে রাখতে চায়।

প্রেমিক স্বামীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত সুখস্মৃতি কোনো নারীর পক্ষেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই সখিনা বারবার নুরের স্মৃতি লালন করে। বিয়ের চারমাসের মাথায় নুর, সখিনার শাশুড়ি ও ভাসুরের কাছে গোপন করে নথটি গড়িয়ে দেয়। নুরের সাধ পূরণের জন্য সেই রাতে

সখিনা নথটি পরে। এই নথ পরার সময়, নুর আলির সপ্রেম সহযোগিতা ও যত্নের স্মৃতি আজও তার প্রাণে দোলা দেয়। তালাকনামায় অন্যান্য সমস্ত গয়নার উল্লেখ থাকলেও, তাদের প্রেমের গোপনতার চিহ্ন, নথটির প্রসঙ্গ গোপন থাকে। মেহেরের চৌদ্দবছরের সংসারজীবনে সখিনা সমস্ত কিছু উজাড় করে দিলেও, নুরের ভালোবাসার চিহ্ন এই নথটির প্রতি তার একান্ত মধুর স্মৃতিমেদুরতা থাকে। তার এই একান্ত স্মৃতিমেদুর জগতে মেহেরের কোন স্থান নেই। তাই মেহের যখন সখিনাকে নথটি পরার কথা বলে, তখন সখিনা শিহরিত হয়। সে মনে করে, নথের ব্যাপারে কোনো কথা বলার অধিকার মেহেরের নেই। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সখিনাকে স্বামীর সাধের কাছে বন্দিনী হতে হয়। সাবেক স্বামীর ভালোবাসার চিহ্ন নথটি, দ্বিতীয় স্বামী মেহেরের কাছে পড়ার যন্ত্রণায় দীর্ণ হয় সখিনা। অথচ এই যন্ত্রণাকে মেহেরের কাছে ছদ্মলজ্জা দিয়ে গোপন করতে সে বাধ্য হয়। মেহেরের বুকে মুখ লুকিয়ে ভালোবাসা জানানোর ভঙ্গিতে, নুরের জন্য মন খারাপের অভিব্যক্তি গোপন করে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব চাওয়া-পাওয়ার কোনো মূল্যই নেয়। শুধুমাত্র একজন নারী হওয়ার জন্যই সখিনা, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা উপলব্ধির প্রকাশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ ‘মেহের তার দ্বিতীয় স্বামী। এক পুরুষের হাত থেকে বদল হয়ে আর-এক পুরুষের হাতে পড়ার সত্য ও সত্যের মর্ম এই মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারে বলে সখিনার মুখে কোনো ভাষা নেই। আগের স্বামীর সাধের হাতে যেমন পড়েছিল, আজও এই স্বামীর হাতে পড়েছে। ভাষার অধিকারী এই দুটি পরুষ, ভাষার উপর তার কোনো অধিকার নেই।’[৬] তাই পুরুষের ইচ্ছে পূরণের জন্যই, সমস্ত বেদনা মনের মধ্যে লুকিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ‘নথটা বের করে পাশ ফিরে বসে সখিনা। মেহেরের মুখোমুখি। একই মানুষ দুটি পুরুষের একই সাধ মেটাচ্ছে। হাতে নথটা নিয়ে পাশ ফিরে মেহেরের মুখোমুখি সখিনাকে তাই বসতে হয়। এই নথটা নুরের দেওয়া। তাই তার মনে হচ্ছে, মেহেরের সামনে নথটা পরতে বসে তার কলঙ্ক হচ্ছে। কিন্তু তাকে বসতে হয় হাসিমুখে। চোখ বুজে আসছে তার।’[৭] এতকিছুর মধ্যেও রহমতের দেনা শোধের জন্য যখন মেহের এই নথটি নেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে, তখন সখিনার মনে শেষ আঘাত লাগে। শেষপর্যন্ত হাজার কষ্টেও নথটি মেহেরের হাতে তুলে দিতে সে বাধ্য হয়, অন্য আর এক পুরুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তবে তা বিক্রির জন্য

নয়, বন্ধক দেওয়ার জন্য। ফসল ওঠার পরেই যেন মেহের তার নথটি ছাড়িয়ে আনে। সখিনা তার এই অধিকার ও ইচ্ছাকে শেষপর্যন্ত বজায় রাখে।

সখিনা যে একজন পতিব্রতা স্ত্রীর মতোই, সুখেদুঃখে সবসময় মেহেরের পাশে থাকে, আফসার আমেদ এই সত্যও জানিয়েছেন। দরিদ্র কৃষকস্বামী মেহেরের, রহমতের কাছে দেনা করে দেড় বিঘার জমিতে উচ্চফলনশীল ধান রোপণের অসহায়তার কথা বোঝে সখিনা। তাই সে রহমতের অবৈধ ও অসামাজিক আচরণ মেনে নিতে বাধ্য হয়। কারণ এর প্রতিবাদে রহমত, দেনার দায়ে মেহেরকে পঞ্চায়েতে টেনে নিয়ে যেতে পারে। পঞ্চায়েতের অনুষঙ্গে সখিনার জীবনের ভয়ঙ্কর স্মৃতি তাকে তাড়িত করে। তার বাবা ও ভাসুরের ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ ও স্বার্থপরতার জন্যই এই পঞ্চায়েতে নুরের সঙ্গে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। তার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে নিছক কনে বদলের অজুহাতে। ফলে সখিনা বিনা অপরাধে তার ভালোবাসার পুরুষকে হারায়। মেহেরের সংসারে শুধুমাত্র কিছু দেনার অজুহাতে, তার নারীজীবনে রহমত আবার এক সংকট তৈরি করে। আত্মসম্মান রক্ষার্থে সে নিজে বারবার মেহেরকে দেনা শোধের কথা বলে। তাই রহমত ও পঞ্চায়েতের হাত থেকে বাঁচার জন্য সখিনা মেহেরের হাতে সাময়িকভাবে নথটি তুলে দেয়।

একজন তালাকপ্রাপ্ত নারীর দ্বিতীয় বিবাহিতজীবনে, প্রাক্তন স্বামীর আগমনে কতটা সংকট নেমে আসতে পারে, আফসার আমেদ এই সমাজসত্যকে এখানে রূপায়িত করেছেন। আবার সেই সাবেক স্বামী যদি প্রথমপ্রেম হয়, তাহলে এই সংকট যে দ্বিগুণ হবে, তা বলায় বাহুল্য। তাই সখিনার জীবনের সংকট অনেক বেশি ঘনীভূত হয়, চৌদ্দবছর পর নুরের তার কাছে ক্ষমা চায়তে আসার ঘটনায়। চৌদ্দবছরের মধ্যে সখিনা রাস্তায় নুরের আরও দুবার দেখা পায় আকস্মিকভাবে। বারবার নানা লোকের ভীড়ে নুরকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় সে বিচলিত হয়। কিন্তু দীর্ঘ চৌদ্দবছর পর মেহেরের বাড়ির উঠোনে এসে নুরের ক্ষমা প্রার্থনা ও তার পরিচিত কণ্ঠস্বরে সখিনার প্রচণ্ড কান্না পায়। নুরের সঙ্গে মাত্র আড়াই বছরের একটি সুখী দাম্পত্যজীবন ছিল তার। ভাসুর ও বাবার সংঘর্ষের মাঝে পড়ে, এক অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় সখিনা জ্ঞান হারায়। ছাড়পত্রের প্রথম দিকে বাপের বাড়ি সখিনা খুব কান্নাকাটি করলেও, মেহেরের সংসারে সে আর কাঁদে নি।

কারণ সমাজের অন্যান্য নারীর মত সেও জানে, এক স্বামীর সংসারে এসে, অন্য স্বামীর জন্য কাঁদা অন্যায় ও অসামাজিক। এমনকি পূর্বস্বামী নুরের তার বাড়িতে আসাও অসামাজিক ও নিন্দনীয়। তাই সখিনা নিজেকে ঘোমটায় আড়াল করে রাখে। কুটুম্বিতার দিক থেকে, খালাতো ভাই মেহেরের বাড়ি আসার অধিকার নুরের আছে। কিন্তু সখিনার প্রতি তার কোনো সামাজিক অধিকার নেই। তাই সখিনা নুরের প্রতি ভালোবাসাকে যেমন মেহেরের কাছে গোপন করে, তেমনি এই ভালোবাসাকে নুরের কাছে গোপন করারও প্রতিজ্ঞা করে। চৌদ্দবছর পরে নুরের ক্ষমাপ্রার্থনা সখিনার মর্যাদা বৃদ্ধি করলেও, বেশকিছু প্রশ্ন চৌদ্দবছর থেকেই তাকে তাড়িত করে চলেছে, 'নুরও তার খুব ভাল স্বামী ছিল। খুব ভালবাসত তাকে। স্বামীর যখন অল্প বয়স, মা বিধবা হয়। ভাসুরের হাতে স্বামী মানুষ। ভাসুরের কথার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস তখনো তার তৈরি হয়নি। কিন্তু বড়ভাইয়ের এত অনুগত হল কেন? একটুও প্রতিবাদ করল না? চোদ্দ বছর ধরে সখিনার সেটাই সওয়াল। সেই অপরাধে অপরাধী বলেই গতকাল নুর চোদ্দ বছর পর ক্ষমা চাইতে এসেছিল। কেঁপে উঠেছিল সখিনা। চোদ্দ বছর পর ক্ষমা প্রসঙ্গটাই সখিনার কাছে ছিল অবান্তর।'[৮]

প্রাক্তন স্বামীর প্রতি গোপন ভালোবাসা সখিনাকে আরও সংকটের সম্মুখীন করে, যখন নুর মেহেরের বাড়িতে আসে। মেহেরের স্ত্রী সখিনা পূর্বস্বামী নুরের সামনে মুখ খুলে দাঁড়াতে পারেনি, সামাজিকতার জায়গা থেকে। কিন্তু মেহেরের স্ত্রী সখিনার এই ব্যবহারে, নুরের প্রেমিকা সখিনা মনে মনে মর্মাহত হয়। কারণ 'নুরকে সে এখনো ভালবাসে, তার এই মনের গোপন কথা কারো কোনো ক্ষতি করে না বলে সে মনে নিয়েই থাকে। অপ্রকাশ রাখে, সংসার নষ্ট হতে দেয় না। তার এই মনের কথা মেহেকে (মেহেরকে) জানতে দেবে না কোনোদিন। নুরকেও জানতে দেয়নি। গতকাল কতদিন পর দুজনের দেখা হল, কিন্তু দুজনে মুখের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলল না।'[৯] অথচ নুরের আগমনে সখিনার জীবনের ছন্দ বিঘ্নিত হয়। এতে খুশি হলেও, মনে মনে সে অশান্ত ও অস্থির হয়ে ওঠে। মেহেরের সংসারে থেকে নুরের জন্য এই অস্থিরতা একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে, সখিনা নিজেই প্রথম দিকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করে। তাই রান্নাঘরের খড়ের চালে আগুন লাগানোর অপরাধে, মেহেরের নির্মম কঞ্চির আঘাতে 'সখিনা চুপ হয়ে গেছে। মানুষটা তার ওপর খেপে যাওয়ায়

যেন শান্ত হয় সে। মেহের যাতে তাকে মারে খুব বাসনা হয়েছিল। হয়তো আগুনটা চালার উপর তুলে দিয়েছিল সেই কারণেই। কাঁদতে পারে না। কাঁদা তার অন্যায় হবে। কেমন শান্ত হয়ে পড়ে সে। কেমন স্নিগ্ধ হয়ে পড়ে। শান্ত হওয়ার তার দরকার ছিল, দরকার ছিল স্নিগ্ধ হওয়ার। মেহেরের সংসারে অস্থির হওয়ার শাস্তি সে চেয়ে নেয়। কেউ না জানলেও, কাউকে না বললেও, কাউকে বুঝতে না দিলেও, সে তো নিজেই জানে মেহেরের সংসারে থেকেও মেহেরকে ভালবেসেও এখনো সে নুরকে ভালবাসে। এমন দশা হয়েছে তার। মেহেরের মার খেয়ে সে শান্ত হয়। মেহেরের বুকে মুখ ডুবিয়ে দিতে তার ইচ্ছে হয়।'[১০]

লেখক এখানে নারীমনের গভীরে লালিত ভালোবাসার এক অনন্যরূপ বর্ণনা করেছেন। ভালোবাসার শক্তিতে স্নিগ্ধ সখিনা তার অন্তরের উদারতায়, এক পরম সত্য উপলব্ধি করে। একজন অশিক্ষিত রমণীর মনের মধ্যে ভালোবাসা এক ব্যাপক অর্থ নিয়ে ধরা দেয়। ধর্ম ও সমাজের কাছে এই ব্যাপকতার কোনো মূল্য না থাকলেও আফসার আমেদ সখিনার মধ্য দিয়ে, মানব মনের এই গহীন সত্যকে তুলে ধরে পক্ষান্তরে এই সমাজ ও ধর্মের কাছে, কিছু মানবিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন, 'শুধু মেহেরের হয়ে থাকতে পারছেনা কেন সখিনা? কেন সাবেক স্বামীর ভালবাসার হাতে ছটফট করে সখিনা? মন তুলে নিতে গিয়েও পারে না সে ভালবাসা থেকে। ভালবাসা গানের মতো, সে সহসাই কণ্ঠে চলে আসে। তাকে গাইলে সুখ, গুনগুনালে সুখ। তারপর মনে হয়, সে কি তাহলে মেহেরকে ভালবাসে না? কেন ভালবাসবে না? স্বামীকে ভালবাসার পর আর কাউকে কি সে ভালবাসতে পারবে না?'[১১] তার পরই সখিনার এক গভীর উপলব্ধি 'নুরকে ভালবাসার পর তো মেহেরকে ভালবেসেছে। ভালবাসাকে এমন ব্যাপকতাই পায় সখিনা। তার এই মুহূর্তে উন্মীলন ঘটে। তার জীবনে দুই স্বামী হওয়ার কারণে তার ভালবাসা এক ব্যাপকতা পেয়েছে। তার কোনো পাপ নেই। এই ভাবনা এলে বড় শান্তি পায় সখিনা। তাছাড়া জীবনযাপনে মেহেরকেই ভালবাসার ব্যবহার দেয় সে। মিথ্যেই সে নিজেকে অপরাধী করছিল। নুরকে ভালবাসবে না কেন? দোষ কোথায়? নুর তো একদিন তার স্বামী ছিল, অপর কেউ তো নয়।'[১২]

সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতিবাদে সখিনা এখানে একজন আধুনিক মানুষ। জীবনের প্রথমপ্রেম তার আগের স্বামী নুর। আড়াই বছরের প্রেমপূর্ণ দাম্পত্যজীবনে নুর তাকে

কখনো কোনো দুঃখ বা কষ্ট দেয় নি। বরং মা ও ভাইয়ের কাছে গোপন করে সখিনাকে নথ গড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে ভাইয়ের অন্নে পালিত নুরের অসহায়তাও সখিনা বোঝে। তাই মেহেরকে ভালোবেসেও নুরকে ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজ বা ধর্মের তার মনকে শাসন করার অধিকার নেই। নুরের প্রতি তার এই গোপন ভালবাসায়, কারও কোনো ক্ষতিও নেই। যা কিছু দ্বন্দ্ব বা সংকট সবই তার। তবে তার এই অশান্তি ও অস্থিরতা বাড়ার আর একটি কারণ হল আরব ফেরত নুরের বড়লোক হয়ে ওঠা। আরবে পাঁচ বছর থেকে নুর অনেক টাকা নিয়ে আসে। তাতে তার সামাজিক মর্যাদা ও গুরত্ব অনেকটাই বেড়ে যায়। অনেকেই আজ নুরের প্রসঙ্গে নানারকম আলোচনা করে। কিন্তু সখিনার, প্রাক্তন স্বামী নুরের প্রসঙ্গে কোনো কথা বলার সামাজিক অধিকার নেই। ভালোবাসার মানুষ সম্পর্কে কথা না বলতে পারার যন্ত্রণায় পীড়িত সখিনা, মনে মনে ঈর্ষাকাতর হয়।

তবে স্ত্রীর এই সংকট কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মেহেরের ভুমিকা অনস্বীকার্য। সহজ সরল মেহেরের, বড়লোক খালাতোভাই নুরের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার মানসিকতাই সে খুশি হয়ে ওঠে। কারণ এই আত্মীয়তার মধ্য দিয়ে তার ভালোবাসার মানুষকে দেখার ও নিজেকে দেখাবার সাধপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নুরের বাড়িতে তার নুরকে দেখার সাধ পূরণ হলেও, নিজেকে দেখাবার সাধ তার অপূর্ণই থেকে যায়। নুরের সামনে এলেই এক অস্বাভাবিক লজ্জায় আক্রান্ত হয়ে, নিজেকে লুকোবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই চেষ্টায় কখনো তার মেঝেতে মাথা ঠুকে যায়, কখনো জাঁতিতে আঙুল কাটে আবার কখনো চৌকি থেকে পড়ে হাত ভাঙে। নুরের পছন্দের, বেশি দোক্তা ও চুন দিয়ে মোটা করে বানানো পান ভুল করে মেহেরকে দিয়ে সখিনা তার সংকট আরও বাড়িয়ে তোলে। মেহের উপলব্ধি করে পূর্বস্বামী নুরের প্রতি সখিনার চেতন-অবচেতন মনে লালিত দুর্বলতাকে। মনে মনে কষ্ট পেলেও সখিনার সমব্যথী মেহের, তাকে নুরের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। শেষপর্যন্ত মেহের তাকে এই সংকট থেকে রক্ষা করে। নুরের বাড়ি থেকে ফিরে মেহেরের ভালোবাসা ও যত্নে কয়েকদিনের মধ্যেই সখিনার হাত সেরে ওঠে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়। সংসার সামলানোর পাশাপাশি, অন্যের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে বিয়ের গীত গাওয়া থেকে শুরু করে নবজাত সন্তান ও মাকে যত্ন করা, সমস্তই সে স্বাভাবিক নিয়মে করে চলে। শুধু তাই নয়, সরল সাধাসিধে ভালোমানুষ মেহেরকে

ভালোবেসে সখিনাও একসময় তার শ্রমসঙ্গী হয়ে ওঠে। অবচেতন মনে নুরের পছন্দের মোটা পান মেহেরকে দিলেও, মেহের এই ব্যাপারে স্ত্রীকে আক্রমণ না করে, বরং সখিনার এই দ্বন্দ্ব বা সংকট কাটাতে সহযোগিতা করে। আহত হয়েও একসময়ের স্বামী নুরের প্রতি সখিনার এই গোপন ভালোবাসাকে মেনে নিয়ে মেহের পক্ষান্তরে সম্পূর্ণরূপে সখিনাকে লাভ করে। তাই জ্যোৎস্না রাত্রিতে সন্তানসম্ভবা সখিনা তাদের উঠোনে ধানপাহারা দিতে ভালবাসা ও স্বপ্নে রাত জাগে। আর সখিনার এই রাত্রি জাগরণ 'একজন মানুষকে, তার আগের স্বামীকে ভুলতে না পারার ব্যর্থতা তাকে যে নিদ্রা দিচ্ছে না তা নয়, সে ভালবাসায় জাগছে, সোহাগে জাগছে, ফসল আগলাতে জাগছে।'[১৩]

মূলত 'ধানজ্যোৎস্না' সখিনার মত তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম নারীর, দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে এক দ্বন্দ্বময় জীবনের কাহিনি। তবে মা-রূপে সখিনার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। সন্তানদের প্রতি তার ভালোবাসা ও যত্ন অন্যান্য মায়ের মতো স্বাভাবিক হলেও শাজাহানের প্রতি তার আন্তরিক টান খানিকটা ভিন্নধর্মী। শাজাহানকে শিক্ষিত করে তোলায় সে খুব আগ্রহী। তাদের মতো দরিদ্রের সংসারে ছেলের লেখাপড়ার জন্য খরচ করার মানসিকতা সাধারণত দেখা যায় না। সেদিক থেকে সখিনা একটু ব্যতিক্রমী। তার এই ব্যতিক্রমী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, খাঁচায় পুরে পাখি পোষার সখের মধ্যেও। ভিডিও দেখা, রেডিও শোনা, গান শোনা প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও সে একটি ভিন্নধর্মী জীবন-যাপনে প্রয়াসী। একজন গ্রামীণ সাধারণ মুসলিম নারীর মতো সে যেমন উঠোনে ন্যাতা দিতে পারে, পুকুরের পাড়ে পায়খানার গন্ধে গালাগাল দেওয়ার কথা বলতে পারে, তেমনি আবার এক স্বামীর সংসারে থেকেও অন্য স্বামীর ভালোবাসা লালন করার মানসিকতায়, সে একজন আধুনিক ও অসাধারণ নারী হয়ে ওঠে। অবশ্য একথাও সত্য যে, মেহেরের মতো একজন সহজ, সরল ও উদার প্রেমিকস্বামীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, সখিনার জীবনের সমস্ত সংকট ও দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে সহযোগিতা করেছে। সখিনার গহন মনে আগের স্বামীর উপস্থিতিকে মেনে নিয়ে, মেহের সখিনার প্রকৃত জীবনসঙ্গী হয়ে উঠেছে। তাকে মোটা পান দেওয়ার মধ্য দিয়ে, নুরের প্রতি সখিনার অবচেতন ভালোবাসার খোঁজ পেয়েও মেহের সখিনার ভুলকে ক্ষমা করে। প্রকৃতপক্ষে মেহেরের মতো এই অসাধারণ, উদার ও ক্ষমাসুন্দর মানসিকতার পুরুষসমাজই পারে সখিনার মতো নারীদের সমস্ত সংকট ও দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করে

এক সুন্দর সাংসারিক জীবন উপহার দিতে। স্বামীর সোহাগ, সন্তান, ধান ও জ্যোৎস্নায় একজন নারীজীবনকে এক মায়াময় সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলতে।

## ৩) বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা

আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে, শারদীয় কালান্তর পত্রিকায়। এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। আমাদের দেশে প্রচলিত মৌখিক তিন তালাক নারীর জীবনকে কতটা ভয়াবহ করে তুলতে পারে, তারই রূপরেখা লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজ-জীবনের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও জনশ্রুতির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত, জাহানের মতো নারীর জীবনের মর্মান্তিক আত্মিক সংকটের ইতিহাস এই উপন্যাসের মূল আখ্যান। যেখানে একের পর এক তালাক পাওয়ার ফলে, মাত্র কুড়িবছর বয়সী জাহানের জীবনে আসা পরপর চারজন পুরুষ তার শরীরকে ছিঁড়ে খেয়েছে। পাশাপাশি তার স্বপ্ন, মন এবং অস্তিত্বকে বারবার হত্যা করেছে।

অবাস্তব কিস্‌সার অন্তরালে লেখক উক্ত উপন্যাসে তালাকপ্রাপ্ত জাহানের জীবনযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মুসলিম নারীজীবনের এক বাস্তবসম্মত সত্যকে তুলে ধরেছেন। শরিয়তের নামে কতশত মুসলিম নারীর জীবন বিপর্যস্ত হয়, সমাজসচেতন লেখক সহানুভুতির সঙ্গে তার বর্ণনা করে সমাজ তথা ধর্মের কাছে প্রশ্ন করেছেন বারবার। এই উপন্যাসে, জাহানের প্রথম স্বামী ছোটোমিঞা নাসিম মুশল্লি যুবক, 'তার চেহেরা খুব সরেস। লম্বা ছিপছিপে। টিকালো নাক। গায়ের রং ধবধবে ফরসা। মুখে কাঁচা চাপ দাড়ি। পৌরুষ আর সৌন্দর্য মাখানো কোঁকড়ানো চুল।'[১৪] বাল্যকাল থেকেই সে খুব শান্তশিষ্ট ও নরম স্বভাবের ছেলে। সে তার ব্লাউজের দোকান, হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস এবং ধর্মকর্ম নিয়েই নিজস্ব জগতে থাকতে ভালোবাসে। 'আল্লা ও রসূল তার ধ্যানজ্ঞান।'[১৫] বাল্যকাল থেকেই সে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পাশাপাশি নিয়মিত কোরান পাঠ করে। সিনেমা, গান, ঠাট্টা-তামাশা প্রভৃতির হাতছানি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মূলত আল্লার নির্দেশিত পথে জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুপরবর্তী বেহেস্তের জীবনই তার একমাত্র কাম্য। তাই প্রতি পদক্ষেপে নাসিম পাপ-পুণ্য, পবিত্র-অপবিত্র, বৈধ-অবৈধের

হিসেব করে পথ চলে। এমনকি স্ত্রীর সান্নিধ্যে থাকার মধ্যেও সে ধর্মের একটি অবশ্য কর্তব্য পালন রূপে দেখে। তাই তিন বছরের দাম্পত্যজীবনে সুন্দরী ও পূর্ণযৌবনবতী জাহানের সপ্রেম অবস্থান, তার জীবনকে ঐহিক এবং ধর্মনৈতিকভাবে পরিপূর্ণ করেছে। তাই জাহানকে ছাড়া নাসিমের একটি রাতও চলে না।

মান-অভিমান দাম্পত্য জীবনের একটি বড় অঙ্গ। কোনো সমাজ বা ধর্মই নারীকে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের অধিকার দেয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বারবার নারী এই নির্যাতনের শিকার হয়। অথচ নারীর, এর বিরুদ্ধে তোলা যেকোনো পদক্ষেপই তাকে আরও বেশি বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। অনেকসময় তার জীবনে নেমে আসে তালাকের মত মর্মান্তিক শাস্তি। এই উপন্যাসেও সাতদিন আগে রাগ করে, বাপের বাড়ি সজনেতলা চলে যাওয়ায় বিপর্যস্ত হয় জাহানের দাম্পত্যজীবন। পুকুরের জলে সাঁতার কাটার সময় জাহান তার পরনের শাড়িটি হারিয়ে ফেলায়, বাধ্য হয়ে ভেজা সায়া ও ব্লাউজ পরেই পাড়ে উঠে আসে-এই দৃশ্য অন্য কোন পুরুষের চোখে না পড়লেও, দোতলা থেকে দেখে ফেলে ধর্মপ্রাণ নাসিম। জাহানের এই অসম্পূর্ণ পোশাকে উঠে আসার মতো ইসলামবিরোধী কাজ, মুশল্লি নাসিমের সহ্য হয় নি। তাই সেদিন রাতে অপরাধী জাহানকে সে 'চড় মারার সময় শুয়োরের বাচ্চি বলেছিল।'[১৬] শুধু তাই নয়, চড় খাওয়ার পর অভিমানী জাহান তার ভালোবাসাই সাড়া না দেওয়ায়, সে জাহানকে লাথিও মারে। এই অভিমানেই ফাল্গুনের শেষ রাতে কাউকে না জানিয়েই জাহান শ্বশুর বাড়ি চকমধু ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। জাহানকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হলেও, মারহাট্টা শ্বশুরের ভয়ে সে জাহানকে ফেরানো থেকে বিরত থাকে। তার আর একটি ভয়, তার মত ধর্মপ্রাণ মুশুল্লির, স্ত্রীকে গালমন্দের কথা সর্বসমক্ষে চলে আসা। তাছাড়া কয়েকদিনের মধ্যেই অভিমান ভুলে, নিশ্চয়ই জাহান ফিরে আসবে, সেই আশায় ও অপেক্ষায় থাকে নাসিম। অন্যদিকে জাহান অপেক্ষা করে চুড়িওয়ালার। নাসিমের হাতের আঘাতে দেওয়ালে মাথা ঠোকার সময়, তার দুহাতের চুড়ি ভেঙ্গে যায়। তাই স্বামী আসার আগেই স্বামীসোহাগী জাহানের চুড়ি পরা খুব দরকার, বলে অন্যান্য মুসলিম নারীর মতো সেও বিশ্বাসী। অবশ্য নাসিমের উপর তার, আর কোন রাগ থাকে না। নাসিম এলেই সে সসম্মানে চকমধু ফিরে আসবে। স্বামীকে না বলে আসায় সেও মনে মনে নিজেকে অপরাধী ভাবে। নিজের উদ্যোগে শ্বশুর বাড়ি ফিরে যেতেও সে

লজ্জা পায়। চৌদ্দদিন কেটে যায় জাহানের চুড়িওয়ালার অপেক্ষায় আর নাসিমের জাহানের অপেক্ষায়। জাহানের অপেক্ষারত নাসিমের জীবনে আসার চেষ্টা করে তার যুবতীদাদি হুসনে আরা। সে প্রায়ই হোমিওপ্যাথি ওষুধ নেওয়ার অজুহাতে নাসিমের ঘরে এসে হাজির হয়। কিন্তু ধর্মপ্রাণ, সংযমী নাসিম বারবার তার আহ্বানকে উপেক্ষা করে, স্ত্রী জাহানের প্রেমের শক্তিতে এবং ধর্মবিশ্বাসের জায়গা থেকে।

সমাজে বিভিন্ন মানুষের মূল্যবোধহীন অমানবিক আচরণ অনেক সময় নারীর জীবনের সমস্যাকে ঘনীভূত করে। নাসিমের রূপসী বিবি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সৌভাগ্যসুখ, বেকার যুবক গাজিকে ঈর্ষাকাতর করেছিল। মিনিভিডিওর অ্যানাউন্সার গাজির মিথ্যে প্রচারের দোষে, মিথ্যা কথাকে কিংবদন্তী করে তোলার ক্ষমতা ছিল। যখন জাহানের বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার কথা শোনে, তখনই পরশ্রীকাতর গাজি তার মস্তিষ্কপ্রসূত একটি মিথ্যে প্রচার করে যে, দুজন সাক্ষীর সামনে নাসিম তার বিবিকে তালাক দেয় আর সেই সময় নাসিমদের বাড়ির পেয়ারাগাছে বসে থাকা হলুদ পাখিটি তালাকের কথায়, জাহানের দুঃখে প্রাণত্যাগ করে গাছের নিচে পড়ে যায়। গাজি তার এই মিথ্যে কিস্‌সাটি প্রথম শোনায় বাজারে বসে থাকা কানা বেগুনওয়ালাকে। বেগুনওয়ালা শোনায় পাশে বসা চুড়িওয়ালাকে। সে বউ-বেটিদের চুড়ি পরানোর সময় তালাকের খবরটি শোনাতে থাকে। ক্রমে বাজারশুদ্ধ লোকের কাছে একটি মিথ্যে তালাকের সংবাদ সত্যি হয়ে পৌঁছে যায়। চকমধু বাজারের মুদির দোকানদার নাসিমের বড়দা হাসিম ও মেজদা খদ্দেরদের কাছ থেকে শোনে। শোনে 'ব্লাউজ কর্নার'এ বসে নাসিমও। তালাকের কথায় বিস্মিত ও অবিশ্বাসী নাসিম অবশ্য হলুদ পাখির সঙ্গে জাহানের হৃদ্যতার কথা জানে। মিষ্টি কণ্ঠের বিরল হলুদপাখিকে নিয়ে জাহান খুব সুখী হয়ে উঠত। খুব খুশি মনে সে হলুদ পাখির খাবারের ব্যবস্থা করত। কিন্তু তালাক ও হলুদ পাখির মৃত্যুর প্রসঙ্গ নাসিমকে বিভ্রান্ত করে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা তো স্বপ্নেও ভাবেনি।

মুসলিম সমাজের সধবা রমণীগণ কাচের চুড়িকে স্বামী সোহাগের প্রতীক বলে মনে করে। তবে তালাকপ্রাপ্ত বউ-বিটির কাছেও কাচের চুড়ির বিশেষ মূল্য বর্তমান। তাই চুড়ি পরিয়ে আবার অন্য পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশে চুড়িওয়ালা পৌঁছে যায় জাহানের নিকট সজনেতলা গ্রামে। অল্পবয়সী শৌখিন মেয়েমানুষ, সদ্যতালাকপ্রাপ্ত জাহানকে

চুড়ি পরাতে পরাতে চুড়িওয়ালা প্রেমার্ত হয়ে পড়ে। স্বামী আসার আগেই চুড়িওয়ালার আগমনে জাহান কিন্তু খুশি। স্বামী সোহাগের প্রতীক এই চুড়ি পরানোর সময়ই চুড়িওয়ালা জাহানকে মর্মান্তিক তালাকের খবর দেয় 'ছোটোমিঞা তোমাকে তালাক দিয়াছে হলুদ পাখি শুনে প্রাণত্যাগ করেছে।'[১৭] আকস্মিক তালাকের সংবাদ জাহানকে আকুল করে নাসিমকে হারানোর বেদনায়, পাশাপাশি অন্য স্বামীর হাতে চলে যাওয়ার ভাবনায়। এইসময় তার মনে হয়, পাখি তার তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী।

তবে আফসার আমেদের লেখায় শুধুমাত্র তালাকপ্রাপ্ত নারীর যন্ত্রণায় নয়, শরিয়তি আইনের হাতে বন্দী পুরুষের যন্ত্রণাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন সহানুভূতির সঙ্গে। জাহানের মত নাসিমও এক অদ্ভুত কষ্টের সম্মুখীন হয়। সে জানে, টানা তিনবার তালাক বললেই স্ত্রী-বিচ্ছেদ হয়, যা সে একবারও বলে নি। সে বারবার প্রচারিত মিথ্যে তালাকের বিরোধিতা করলেও সকলেই তার কথা অবিশ্বাস করে। 'নিকাহ হালালাহ'র নামে মওলানা আজমত থেকে শুরু করে কাসেম মিঞা, যখন জাহানকে শারীরিকভাবে ভোগের বাসনা নাসিমের কাছে প্রকাশ করে, তখন সে ধর্মপত্নী জাহান সম্পর্কে এইসমস্ত নোংরা প্রস্তাবেরও তীব্র প্রতিবাদ করে। অথচ তার এই প্রতিবাদকে সমাজ পাগলামি বলে উপহাস করে। সকলের ধারণা, স্ত্রী জাহানকে হারানোর বেদনায় নাসিম পাগল হয়ে গেছে। কেবলমাত্র হুসনে আরা প্রকৃত সত্যটাকে বোঝে। সে তার অপরূপ যৌবনের পসরা নিয়ে বারবার নাসিমের যৌনবাসনা জাগানোর চেষ্টা করে এবং সমাজের প্রতিকূলতাই তাকে সহানুভূতি জানিয়ে যায়।

সাধারণত দেখা যায়, মুসলিম সমাজে তালাকপ্রাপ্ত নারীর দুর্ভাগ্যের কথা অতিদ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। জাহানকে তালাক দেওয়ার ঘটনা এবং তা শুনে হলুদ পাখির মৃত্যুর জনশ্রুতি চকমধু ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায়ও প্রচারিত হয়। জনশ্রুতির হলুদ পাখিটির অধিকারী নির্বাচন করা হয় লটারির মাধ্যমে। আর মৃত হলুদ পাখিটি লটারিতে লাভ করে চুড়িওয়ালা। পাখিটিকে সে একটি বোয়ামে সুন্দরবনের তিন সের খাঁটি মধুর মধ্যে রাখে। 'তিনসের মানে পোয়াবারো', চুড়িওয়ালার কপালও পোয়াবারো হয়ে ওঠে। গ্রামান্তর থেকে মেয়েরা কিস্‌সার হলুদ পাখি দেখতে আসে এবং চুড়ি পরে যায়। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই চুড়িওয়ালার অবস্থার পরিবর্তন হয়। তার ব্যবসার উন্নতি ঘটে। সে পাকাবাড়ি তোলে আর সেই

বাড়িতে নিয়ে আসে গল্প বলায় পারদর্শী বিধবা নানিকে, নানা ধরণের কিস্‌সা ও কাহিনি শোনার জন্য।

গ্রামীণ দরিদ্র সমাজে সাধারণত পাত্রের রূপ নয়, তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বেশি গুরুত্ব পায় পাত্রীপক্ষের নিকট। তাই যে চুড়িওয়ালার একেবারেই শ্রীহীন 'বদখদ চেহেরা। চোখে ট্যারা। খুব তাড়াতাড়ি কথা বলতে গেলে তোতলায়। মৃগী রোগ আছে। গলা বকের মতো। গরম ফ্যানে পুড়ে গিয়েছিল ছোটবেলায়; পেটে পুড়ে যাওয়ার তেলালো দাগ আছে।'[১৮] তার উপর ময়লা পোশাক এবং সরষের তেলে জবজবে মাথা। তা সত্ত্বেও কাঁচাপয়সার মালিক, চুড়িওয়ালার গ্রামে এখন বেশ কদর। বিয়ের বাজারেও তার বেশ চাহিদা। চুড়িওয়ালা কিন্তু জাহান বিবির প্রেমাসক্ত। যেহেতু তালাকপ্রাপ্ত নারী নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করে পুনর্বিবাহের অধিকার পায়, তাই অপেক্ষা করে চুড়িওয়ালা, অপেক্ষা করে জাহানের বাবাও 'কেননা তালাক পাওয়া মেয়েটি ঘরে বসে থাকবে না, তার নিশ্চয় বিয়ে হবে। তার তালাকের খবরের ভেতর ছিল এই অনিবার্যতা। নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে গেলেই তাকে অন্য পুরুষের হাতে গিয়ে পড়তে হবে ... একটা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ শুধু। মনহীন, যেন লীলার লীলাবতী নয়, খেলার খেলনা।'[১৯]

শেষপর্যন্ত নাসিমের স্ত্রী থাকা অবস্থায়, বিস্তর পয়সার মালিক, কুৎসিত চুড়িওয়ালার সঙ্গেই জাহানের নিকাহ হয়। নিকাহ দিতে আসা মৌলবিও মনে মনে জাহানকে কামনা করে। কেননা নারীলোলুপ পুরুষেরা মনে করে, তালাকপ্রাপ্ত নারীকে কামনা করার একটা সমাজসিদ্ধ অধিকার তাদের আছে। তাই চুড়িওয়ালার বিবি জাহানকে কামনা করে কানা বেগুনওয়ালাও। সে মনে মনে ফন্দি আঁটে বোয়ামের হলুদ পাখির পাশাপাশি জাহানকে হাতানোর। আপাতদৃষ্টিতে চুড়িওয়ালার স্ত্রী, জাহান মনের সুখে চুড়ি ভাঙে, চুড়ি ভেঙে উল্লসিত হয়, কড়া হাতে স্বামীকে শাসন করে কিন্তু গভীর রাতে মৃত পাখিটির দিকে তাকিয়ে সে কাঁদতে থাকে। অবশ্য তার এই মানসিক যন্ত্রণার কথা পাখি ছাড়া আর একজন জানে, সে কানা বেগুনওয়ালা। জাহানের রূপের টানে এবং হলুদ পাখিটি চুরির উদ্দেশ্য্ সে রোজ রাতে এসে হাজির হয় চুড়িওয়ালার বাড়ির জানালায়।

জাহানের মতো সুন্দরী রমণীর জীবনেও তালাকের মতো নিষ্ঠুর আঘাত বারবার নেমে আসার মধ্যে এই সমাজে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তাই চুড়িওয়ালার সংসারেও শেষপর্যন্ত স্থান পায় নি জাহান। জাহানের আগমনে চুড়িওয়ালার জীবন ও কারবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই অজুহাতে চুড়িওয়ালা একটানা তিনবার 'তালাক তালাক তালাক' বলে জাহানকে তালাক দেয়। সদ্যতালাকপ্রাপ্ত জাহান রাতের অন্ধকারে মৃত পাখিটিকে মাথার কাছে রেখে বেদনায়, নিরাপত্তাহীনতায়, আবার অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার ভাবনায় চোখের জলে বালিশ ভেজায়, 'এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে চলে যাবার দুঃখ। কিন্তু না গিয়েও কোন উপায় নেই। আবার এক পুরুষের সংসারে যেতে হবে তাকে। আবার অন্য এক পুরুষকে ভালোবাসতে হবে। তার বিছানার সঙ্গী হতে হবে। পুরুষের চাওয়ার মধ্যে ধরা দেবে শুধু। এক জায়গায় স্থির থাকা যাচ্ছে না। সে যেন খেলনার মতো। কারুর ভালো লাগলে খেলে, তারপর ফেলে দেয়। অন্য একজন আবার খেলে। সে খেলার প্রয়োজনের খেলনা। লীলার লীলাবতী নয়।'[২০]

যে সমাজের চোখে নারী খেলনার মতো, সেই সমাজের পুরুষের, ইচ্ছেমত খেলার অধিকার যেন জন্মগত। শরিয়তকে হাতিয়ার করে তারা এই অধিকার নানাভাবে ভোগ করে। তাই কান্নার মাঝেই জাহান দেখতে পায় জানালার পাশে থাকা কানা বেগুনওয়ালাকে। যে বাজারে মিষ্টি মিষ্টি কথায় জাহানকে ভোলানোর চেষ্টা করত। সেই বেগুনওয়ালার বোয়ামের ঢাকনা খুলে পাখিটিকে চুরি করে পালানোর মধ্যেই, জাহান তার ভাগ্যলিপি প্রত্যক্ষ করে। সেও পেছনে পেছনে কানা বেগুনওয়ালার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। এমনকি বেগুনওয়ালার হাতে চটকানো মৃত পাখিটির অস্তিত্বহীনতায় নিজের মর্মান্তিক পরিণতির পূর্বাভাষও অনুভব করে সে। যেখানে কানা বেগুনওয়ালার হাতে সম্পূর্ণভাবে মৃত্যু ঘটে জাহানের অস্তিত্বের, সম্মানের ও নারীত্বের। কারণ একসময়ের চোর, কানা বেগুনওয়ালার সঙ্গেই তার বিবাহ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এইসময় জাহানের মনে হয়, 'তার যা একটার পর একটা নিকা হচ্ছে, তাতে গ্রাম জুড়ে সকলেরই বিবি হয়ে যেতে পারে।'[২১] জাহানের এই বিবাহ সম্পন্ন করে মৌলবি আজমত, যে তাকে পাওয়ার জন্য 'অষ্টপ্রহর লোভার্ত' হৃদয়ে চেষ্টা চালিয়ে যায়।

তৃতীয় বিবাহে জাহানের জীবনের সমস্যা ও সংকট আরও যন্ত্রণাময় হয়, 'কানা বেগুনওয়ালা বেগুন বাগানের মধ্যে তার নতুন বিবিকে ধর্ষণ করে। এই ধর্ষণের মধ্যে আইনগত সমর্থন আছে। সেহেতু জাহান অত্যন্ত পীড়িত ব্যথিত হয়েও কোন বাধা দিতে পারল না।'[২২] কানা বেগুনওয়ালা জাহানের ইচ্ছে পূরণের জন্য যখন মৌলবির সাজে সজ্জিত হয়, তখন দুই ঘণ্টা ধরে তাকে তালাচাবিতে বন্দিনী করে রাখে। অথচ প্রকৃত অর্থে এই পরাধীনতার মধ্যেই যেন জাহান স্বাধীন হয়। এই দুই ঘন্টা সে মানসিক ও শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কারণ এইসময়ে সে বেগুনওয়ালা ও মৌলবির কামনা ও লালসার হাত থেকে মুক্তি পায়। নিজের যন্ত্রণাময় জীবনের ব্যথায় অশ্রু ঝরানোর সুযোগ পায় সে। আর সেই অশ্রুসিক্ত পথেই গিয়ে হাজির হয় ভালবাসার মানুষ নাসিমের ঘরের দরজায়। নাসিমকে দেখে তার মনে সাধ জাগে, নাসিম তাকে তালাক না দিয়ে যদি একজন পরিপূর্ণ পাগল হয়ে যেত, তাতেও হয়ত নাসিমের সংসারেই তার জীবন আনন্দে, কৌতুকে, সুখে ও শান্তিতে ভরে উঠত। কমপক্ষে তাকে এমনভাবে এক স্বামী ছেড়ে অন্য স্বামীর ঘরে ঘরে ধর্ষিত হতে হত না।

'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসে নাসিম, জাহানকে ভালোবেসে হুসনে আরার সমস্ত আকর্ষণকে প্রত্যাখ্যান করে। নিজের ভালবাসার মানুষকে নারকীয় জীবন যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের তেমন কোন চেষ্টায় করে না। অবশ্য কিস্‌সার কাহিনিতে বন্দী নাসিমের একার পক্ষে কিছু করারও থাকে না। কিস্‌সার জনশ্রুতির অনিবার্যতার কাছে সে একেবারেই অসহায়। তাই সমাজের সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে, সে পাগল অপবাদের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে। দিনের পর দিন জাহানের অপেক্ষা করে, কিন্তু তার মান ভাঙানোর, সম্মান বাঁচানোর কোন চেষ্টায় সে করে না। এক অলৌকিক অবাস্তবতায় নিজের মানসিক শান্তি খোঁজায় সে ঐকান্তিক। স্ত্রীর মান, সম্মান, আব্রু রক্ষা করাও যে স্বামীর ধর্ম, সেই বোধ থেকে সমাজ ও প্রচলিত ধর্মাচারের চাপে, সরে আসে নাসিম। তাই নানি যখন বলেন, 'কীভাবে তার বিবিকে ছিঁড়ে খায় চুড়িওয়ালা, কানা বেগুনওয়ালা আর আজমত ইমাম? বিয়ে করা বিবি অন্যের ভোগে যায় কী করে? দুজন নিকা করে ছিঁড়ে খায়, অন্যজন ইমাম না নিকা করে ছিঁড়ে খেতে যায়।'[২৩] তখন নাসিম নিজের অসহায়তায় অশ্রু বিসর্জন করে। জাহানকে তালাক না দেওয়ার কথা সে চিৎকার করে বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। বরং তার

এই চিৎকারকে সমাজ পাগলের প্রলাপ বলে ঘোষণা করে। কারণ 'ধর্মের মধ্যে এতো বেশি অধর্ম ঢুকে আছে যে, মিথ্যে ঢুকে আছে যে তার পক্ষে এই প্রতিবাদ করা অর্থহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু ধর্মের বিশ্বাস কিছুতেই সে ত্যাগ করেনা, তাতেই তার পরিতৃপ্তি।'[২৪] অথচ "তারই ধর্ম দিয়ে সে জাহানকে তালাক দিয়েছে, এমনটা প্রচলিত; তারই ধর্ম দিয়ে তাকে মারে লোকজন। তাকে পাগল বানায়। তার ধর্মপত্নী একেক জনের বিবি হয়ে যায়।'[২৫]

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, আফসার আমেদ তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসে ধর্মের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অধর্মের শিকার জাহান বিবির মধ্য দিয়ে যে অসংখ্য মুসলিম নারীর জীবনের যন্ত্রণাময় ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয়। লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের মত আবুল বাশারের 'সিমার', 'নাস্তিক', 'এক টুকরো চিঠি' প্রভৃতি রচনার মধ্যেও ধর্মের দোহাই দিয়ে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত মুসলিম নারীর মর্মান্তিক জীবন যন্ত্রণার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মূলত ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজে প্রচলিত আচরণগত ধর্ম যেভাবে পদে পদে মনুষ্যত্বকে আঘাত হেনেছে, তালাকের নামে নারীকে চরম আঘাত করে চলেছে, 'নিকা হালালা'র নামে ধর্ষণ করেছে, তারই ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলেছেন আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে। এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। মূলত শিক্ষার আলো, যুক্তি, মানবিকতা, সর্বোপরি ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যায় পারে সমাজে প্রচলিত অধর্মকে ঠেকিয়ে কলুষমুক্ত সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে। যে সমাজ হয়ে উঠবে তালাকমুক্ত, বধূনির্যাতনমুক্ত, পণপ্রথাবিরোধী মানবিক এবং স্বর্গীয় সুখে সমৃদ্ধ।

### ৪) কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক

আফসার আমেদের 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় প্রতিক্ষণ পত্রিকায় ১৯৯৫ সালে। এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৯৬ সালে। এই উপন্যাসের মধ্যেও সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এমন একটি মুসলমান সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন, যেখানে প্রকাশিত হয় বোরখার অন্তরালে অবৈধ প্রেমাকাংখা, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের ধর্মের আশ্রয়ে নারীলোলুপ মানসিকতা এবং

পরস্ত্রীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পুরুষদের যৌন আকাংখার বাস্তবতা। সমাজ তথা জীবনকে সচল, সুন্দর ও সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বয়সে দুজন নর-নারীর এক সামাজিক ও ধর্মীর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নামই বিবাহ। এক্ষেত্রে প্রত্যেক নারীর আকাঙ্ক্ষা হল স্বামীর ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ভরসা, শ্রদ্ধায় নিজেকে আলোকিত করে সংসারজীবনকে স্বর্গীয় সুখে পরিপূর্ণ করে তোলা। কিন্তু এই উপন্যাসের রেহানা প্রথম দুটো বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ভরসা ও শ্রদ্ধার পরিবর্তে পেয়েছে, অত্যাচারী ও ধর্ষক স্বামীদের কাছ থেকে, শারীরিক নির্যাতন ও তালাক। স্বাভাবিকভাবেই তালাকপ্রাপ্ত রেহানাকে তৃতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়।

রেহানা তার এই তৃতীয় বিয়েতে প্রথম, নিজের মতো করে বাঁচার একটা সুযোগ পায়, শ্বশুরবাড়িতে এসে সে একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়। তার জীবনের এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ, রেহানার তৃতীয় স্বামী একজন পাগল। বর যে পাগল, তা বিয়ের আসরে বরযাত্রীদের নিপুণতায় কেউ ধরতে পারেনি। অনেক রাতে নতুন বৌয়ের ঘরে যাবে না বলে যখন কালাম চীৎকার করে, তখন রেহেনা জানতে পারে, তার তৃতীয় স্বামী পাগল। আগের দুটো বিবাহিত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় রেহানা পাগল স্বামী পেয়ে খুব খুশি। কারণ 'পাগলদের সাথে শুতে হবে না, এমনকী স্বামীর সাথে শুতে হবে না, এটা বুঝে নিয়ে খিল এঁটে ঘোমটা খসিয়ে চিৎ হয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল রেহানা। বাতি কমিয়ে ফেলেছিল ঘরের ভেতরের। বেশ নরম আলোর বিছানায় স্বামীবিহীন শুতে ভালো লাগছিল রেহানার। কেননা দুই স্বামীর সঙ্গে এতোদিন শুয়ে শুয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল।'[২৬] অবশ্য রেহানার ননদাই পাগল শালার নতুন বউয়ের ঘরে প্রবেশ করার সুযোগে ছিল, এই বুঝতে পেরেই রেহেনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা রকম সতর্কতা অবলম্বন করে। তবে এই ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত যে, তার পাগল স্বামীই তাকে কামার্ত ননদাই-এর হাত থেকে রক্ষা করবে। পাগল যেমন নিজে বউয়ের ঘরে যেতে নারাজ, তেমনি অন্য কোনো পুরুষের ক্ষেত্রেও তার চরম আপত্তি।

রেহেনার শ্বশুরবাড়িতে, সঙ্গে আসে তার বারো বছরের বোন মোমেনা। মোমেনার কিন্তু পাগল জামাইদা একেবারেই অপছন্দ। তাই সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায় রেহানার বাপের বাড়ি ঝিকিরা গ্রামে। রেহানার বাবা আবিদ আলি সবকিছু শুনে সোজা দোতলায় উঠে মেয়েকে বলে, 'ঠগ জোচ্চরদের বাড়িতে আর এক মুহূর্ত নয়, চল মা রেহানা।'[২৭] কিন্তু যখন সে স্বামী

পরিতৃপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে বলে 'আমার পাগল স্বামী আমার ভালো' তখন আবিদ আলি অত্যন্ত অবাক হয়ে ভাবেন, পাগল কী দিয়ে রেহানাকে এক রাতেই পরিতৃপ্ত করেছে, যার জন্য সে বাবাকে অপমানিত করে বাবার অবাধ্য হয়। পরিষ্কার ভাষায় বলে, 'আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে আব্বা'। প্রথম দুজন স্বামীর তুলনায় পাগল কামালই তাকে দিয়েছে জীবনে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা। কারণ রেহানার 'প্রথম স্বামী দ্বিতীয় স্বামী দুজনেই বদমেজাজী ও মারহাট্টা। প্রথম জনের কাছে তালাক খায়। দ্বিতীয় জনের কাছেও তালাক খায়। নতুন কোনো কথা নেই; দুজনেই মারতে মারতে তালাক দেয়।'[২৮]

অন্যদিকে তৃতীয় স্বামী পাগল কালাম রেহানাকে শুধুমাত্র শারীরিক নিরাপত্তা নয়, দিয়েছে মানসিক স্বাধীনতা ও জীবনে আনন্দে থাকার সুযোগও, 'একমাত্র পাগল বিয়ে করেই এমন স্নান করার আনন্দ তার হাতের মুঠোয় প্রথম এসেছে। শাশুড়ি ননদ দেখে যায়, কিছু বলবার সুযোগই নেয় তাদের। আগের দুই স্বামীর ঘর করার পর এই প্রথম বিশ্বাস খুঁজে পেল; স্বাধীনতা হাতিয়ে নিল।'[২৯] তাছাড়া রেহানার ননদ, স্বামীর আচরণে বিরক্ত হয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে বলেই সে নিজের শরীর ও মনের বিশ্রামে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছে। আর এই অবকাশে রেহানা তার সেই কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকপুরুষ, সুদর্শন যুবককে সে পেয়েছে। প্রথম স্বামীর ঘরে যাওয়ার সময়ই এই সুদর্শন যুবককে দেখে রেহানা প্রথম প্রেমার্ত হয়, যখন যুবকটি তার উড়ে যাওয়া লাল ওড়নাটি কুড়িয়ে দৌড়াতে থাকে নববধূ রেহানার সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। আগের তুই স্বামীর সংসারে থাকার সময়ও এই যুবকের কথা রেহানার খুব মনে পড়তো। কিন্তু তাদের অমানবিক নিষ্ঠুর ধর্ষকামী আচরণের মধ্যে কোথাও সে তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিককে খুঁজে পায় নি। কিন্তু এই পাগল স্বামীর ঘরে এসেই সে তার জীবনের প্রথম প্রেমিক পুরুষের সন্ধান পায় এবং তার প্রেমে বিভোর হয়ে থাকার সুযোগ ও সময় সে অনায়াসে লাভ করে। মনে মনে পাঁচিলের গা ঘেঁষে থাকা গন্ধরাজ ফুলের গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ইচ্ছে ও কল্পনার মেলবন্ধনে ফুলের ছোঁয়ায় সে সুরভিত হয়ে ওঠে। বারান্দার প্রান্তে এসে ফুলের দিকে ঝুঁকে সে কখনো যুবককে দেখে, আবার কখনো নিজেকে দেখাবার প্রস্তুতি নেয়। তার প্রেম নিবেদনের প্রতীক কাজললতা যুবকের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়, যুবক রেহানার দিকে তাকায়। চোখাচোখি হওয়ার পর যুবক পুনরায় কাজললতা রেহানার আঁচলে ছোঁড়ে। সে যুবকটিকে ইশারায় গন্ধরাজ

ফুল নেওয়ার কথা জানায়। যুবকটি সিঁড়ির ফোকর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ফুল দেয় তাকে। ফলে রেহানা তার প্রেমিকের স্পর্শানুভূতি পাওয়ার সুযোগ পায়। এই সুযোগ পাগল স্বামীই পক্ষান্তরে তাকে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে রেহানা ফুলটি বাতাসে পায়। যুবকের হাত থেকে ফুল নেওয়ার বাস্তবতা তৈরি করে সে ভাবে যে, সত্যি সত্যি যেন যুবকটির সঙ্গে প্রেম করল, 'এবং সেই আনন্দিতের ভরা পরিতৃপ্ততায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোপায় ফুল গোঁজে রেহানা। তাকে ঘিরে ফুলের গন্ধ আতত হয়। ফুলের গন্ধের ভেতর তার থাকা হয়ে গেছে। নিজেও সে সুরভি পায়। সে হেঁটে বেড়ালে ফুলের গন্ধ তার যাবার পথে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে।'[৩০]

এই ফুলের গন্ধ প্রথম পায় রেহানার শাশুড়ি। ক্রমে ফুলের গন্ধ তার শ্বশুর ও পাগল স্বামী কামালও পায়। ফুলটি সে খোপায় গুঁজে গোপন করে, সাবধানে থাকে যেন তার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ না করে। কারণ ফুলটি মূলত কিছু ফুল, কিছু প্রেম ও স্বাধীনতার সম্মিলন। আর রেহানা এই স্বাধীনতা পেয়েছে, শুধুমাত্র স্বামী পাগল বলেই। স্বামীর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভয় থেকে সে একেবারেই মুক্ত। ইচ্ছেমতো সবজায়গা সে যেতে পারে, অবকাশ পায় সুদর্শন যুবকটিকে প্রেমে সম্মোহিত করে তোলার। আগের দুটো স্বামী ও বর্তমান পাগল স্বামীর প্রেম থেকে বঞ্চিত রেহানার জীবনে তার কাঙ্ক্ষিত প্রেম বাস্তব হয়ে ওঠে। আর এই প্রেমের বাস্তবতার অনুকূল পরিবেশ সে পেয়েছে পাগল স্বামীর জন্যই। যে কালাম বউকে শারীরিক নির্যাতন করে অভ্যস্ত, পাগল হওয়ার, সে-ই উল্টে রেহানাকে দেখে লজ্জা ও ভয় পায়। তাছাড়া রেহেনার, শাশুড়িকে 'দেখে মনে হয় খুব বউ জ্বালানি। কিন্তু রেহানাকে জ্বালাবার সুযোগ তার হাতে নেই। কেননা ছেলে পাগল হওয়ায় চমৎকার ভিজে বেড়াল হয়ে গেছে। একটু কৌতুক করবে না কি শাশুড়ির সঙ্গে? থাক। চোখের ইশারায় খাবারটা নামিয়ে রাখতে নির্দেশ জানায় রেহানা। খাবার রেখে শাশুড়ি চলে যায়।'[৩১]

অবশ্য রেহানার জীবনের এই পরিতৃপ্তি, স্বাধীনতা ও কাঙ্ক্ষিত যুবকের প্রেম-কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকার পথে, বাধা হয়ে দাঁড়ায় কালামের সুস্থতা। শাশুড়ির কড়া চোখ বলে যায়, তার আগামী জীবনের নির্মমতা ও  পরাধীনতার কথা। এমনকি সুদর্শন যুবকের কাছ থেকে ফুল নেওয়ার সময়ও রেহানা 'খানিকটা কেঁপে ওঠে। ত্রাসে পেছনে ফিরে দেখে কেউ লক্ষ

করছে কিনা। এই দিনে, যে দিনে তার পাগল স্বামীটা ভালো হয়ে গেছে দারুণ দুর্দিনে। দারুণ পরাধীনতার ভেতর।’[৩২] সুস্থ স্বামীর পদশব্দের মধ্যে সে খুঁজে পায়, তার আগের দুই স্বামীর দাপটকে। বিবি ব্যবহারে অভ্যস্ত কালাম দুর্বৃত্তের মতো ঘরে ঢুকে বলে, ‘এই যে তুই এখনো এখানে?’ ...তুমি পটের বিবি নাকি? ঘরে বসে থাকো? বেহেড চললে একেবারে কেটে ফেলবো।’[৩৩] রেহানা জানে তার শরীরের প্রতি একমাত্র কালামেরই অধিকার। তাই খোঁপায় গোঁজা গন্ধরাজ ফুলের গন্ধ পেয়ে, ফুলের খোঁজে কালাম তার শরীরের সর্বত্র স্পর্শ করে আইনি অধিকারে। ফুল খুঁজে পেতে ব্যর্থ বদমেজাজি কালাম, লাথি মারে, ‘রেহানা লাথি খেয়ে বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। পাছায় একটু ব্যথা হয়। সামান্য সময় মেঝেয় পড়ে থেকে আগের দুই স্বামীর ব্যবহারের সঙ্গে এই ব্যবহারকে মিলিয়ে নেয়। তারপর মাথায় ঘোমটা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তাকে আর প্রয়োজন নেই কালামের। বিছানা থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে রান্নাঘরে।’[৩৪]

মূলত পাগল স্বামীর কাছেই রেহানা জীবনের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও কাঙ্ক্ষিত পুরুষের প্রেমে মগ্ন থাকার পাশাপাশি, শাশুড়ি-ননদের কাছে খোঁটা না থাকার সুযোগ পেয়েছিল বলেই মানসিক ও শারীরিকভাবে সুন্দর ও সুসজ্জিত হয়ে উঠেছিল। আফসার আমেদ অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে একথায় বলতে চেয়েছেন যে, পুরুষসমাজ নারীকে সুন্দর ও সুরভিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে নিজের জীবন এবং সংসারকে স্বর্গীয় আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে। তাই রেহানার স্বামীরা তার শরীরকে ভোগ করতে সমর্থ হলেও, তারা বঞ্চিত হয়, তার সুন্দর সুরভিত মনের সান্নিধ্য থেকে, দাম্পত্যজীবনের স্বর্গীয় প্রেমমাধুর্য থেকে। নারীর শরীরকে ভোগ করা, শারীরিক ও মানসিকভাবে তাকে নির্যাতন করা, তার সমস্ত চাওয়া-পাওয়া ও স্বপ্ন দেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং ইচ্ছামতো তালাক দেওয়ার মধ্যে যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই পরাজয় লুকিয়ে আছে, আফসার আমেদ এই সমাজসত্যকেই তাঁর কিস্‌সায় তুলে ধরেছেন। তাই কালাম যখন হিংস্র শিকারির ন্যায় বিবির সুন্দর মন তথা স্বাধীনতা রূপ ফুলের গন্ধে মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন স্ত্রীরূপ শিকার এবং তার শরীরকে নাগালের মধ্যে পেলেও, একজন সুন্দর জীবনসঙ্গিনী পেতে সে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় জীবনের পরিপূর্ণতার স্বাদ থেকে, জীবনে বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ আনন্দ থেকে। কারণ পুরুষস্বামী তখন শুধুমাত্র একটি প্রাণহীন নারী

শরীর ছাড়া আর কিছুই পায় না, 'শুধু ফুলটার প্রতিই তার গোপনতা ছিল। শরীর ছিল তেমনি কালামের হাতের কাছে প্রতিরোধহীন, শবের মতো। নড়ালে নড়ে, পাশ ফেরালে পাশ ফেরে।'[৩৫]

এই উপন্যাসে লেখক আমাদের দেখিয়েছেন, নারীর শরীর ও যৌনতা সম্পর্কে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, চোর, খোঁড়া, মৌলবি সহ প্রায় সমস্ত পুরুষসমাজই একই মানসিকতা পোষণ করে। বিবির পিছু নেওয়া চল্লিশ লোকই এর প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেন—'নারীকে পুরুষ ভোগের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত পথেই আজ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করেছে, বিকৃত করেছে, তাকে বিষয় সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বদ্ধ করেছে।'[৩৬] তাই নারীর শরীর এবং যৌনতাকে কেন্দ্র করে একজন চোরের সঙ্গে প্রধানশিক্ষকের বন্ধুত্ব হয়ে যায়, মৌলবি তার ধর্মশিক্ষা ভুলে, গামছায় দাড়ি ঢেকে চল্লিশজন লোকের দলে মিশে যায়। আর নবীন মৌলবির শিক্ষাগুরু নিজাম মৌলবি, অঞ্চলপ্রধান প্রমুখ গন্যমান্য ব্যক্তিগণ জাকিরের অনৈতিক অধঃপতনকে না দেখার ভান করে। সকলেই গ্রামের মোড়লের কথা সমর্থন করে, 'এর সঠিক ও প্রয়োজনীয় কারণ অনুসন্ধান করে দেখলে নিশ্চয়ই প্রমাণ করা যেতে পারে নবীন মৌলবি নির্দোষ। মৌলবি প্রকাশ্যে অবৈধ কিছু করেছে, এটা তো আগে কখনো ঘটে নি। এটা ভেবেই অনুসন্ধান চালানো উচিত।'[৩৭] এই সমাজ মৌলবিকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য যে সভার আয়োজন করে, ধর্মরক্ষার নামে সেই সভার প্রেসিডেন্ট, অশালীন কথায় উত্তেজনাপূর্ণ মজার প্রসঙ্গ তুলে সভাটিকে কমোদ্দীপক করে তোলার চেষ্টা করে। অথচ সভায় উপস্থিত কোনো পুরুষই এই নীতিহীন আনন্দ উপভোগে ইতস্তত করে না। সভার শেষে স্থির হয়, নবীন মৌলবিকে পাপমুক্ত করার জন্য কালাম, রেহানা বিবিকে তালাক দেবে। কারণ জাকিরের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে, রক্ষণশীল মৌলবাদী সমাজ ধর্মরক্ষা করবে। এই ধরণের অমানবিক গোঁড়া মুসলিম সমাজে, রেহানার নিজস্ব চাওয়াপাওয়া বা মতামতের কোনো গুরুত্ব না থাকায় স্বাভাবিক। তাই জাকির যে তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিক পুরুষ নয়, এই কথায় সভা কোনো প্রতিক্রিয়া জানানোর প্রয়োজন বোধ করে না।

স্বাভাবিকভাবেই তালাকের পর প্রেমিকপুরুষের সঙ্গে রেহেনার ঘর বাঁধার আকুতিকে, সভা উপেক্ষা করে। তারা জোরের সঙ্গে বলে, 'তা হবে না, একমাত্র নবীন মৌলবিকেই

ভালবাসতে হবে।'[৩৮] অর্থাৎ নারীর শরীরের পাশাপাশি তার মানসিক চাহিদা, স্বাধীনতা ও ভালবাসার প্রতিও পুরুষসমাজ নিজের আধিপত্য বজায় রাখায় বিশ্বাসী। তাই 'একজন কমবয়সী যুবতি এই কয় বছরে তিনজন অত্যাচারী স্বামীর হাত বদলের ভেতর যে বেদনা কাতরতা'[৩৯] প্রকাশ পায় তার খবর কেউ রাখে না। বরং দিনের পর দিন এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, নিজের স্বার্থে ধর্ম ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নারীর যন্ত্রণাকে আরও বৃদ্ধি করে। এই যন্ত্রণায় রেহানা এক নির্দয় প্রতিবাদী রমণী হয়ে ওঠে। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার কাঙ্ক্ষিত প্রেম, প্রেমের লালন ও ফুল নেওয়ার নিজস্বতা থেকে সে এক বিন্দুও সরে আসবে না। সে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অমানবিক নিষ্ঠুর পুরুষকে শরীর ও হাতছানি দিয়ে আহবান জানাতে বাধ্য হলেও, ফুলের গোপনীয়তা রক্ষা ও আন্তরিক প্রত্যাখ্যানের জায়গায় সে অবিচল। তাই একটু একটু করে সে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হয় এবং ঘৃণায় তার মুখে থুতু জমতে থাকে। স্বভাবতই 'দ্বিধাহীন ক্ষমাহীন হবে তার আসন্ন এই ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান জানানো।'[৪০] পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি রেহেনার এই প্রতিবাদ অত্যন্ত অভিনব। পুরুষ জোর করে শুধুমাত্র তার শরীরের অধিকার পেতে পারে, তার মন ও সুরভিত মাধুর্যকে নয়। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ, তালাকপ্রাপ্ত নারীর জীবনসংকটের পাশাপাশি পাগল স্বামী ও বোরখা সম্পর্কিত মিথকে ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করেন এই উপন্যাসে, যা লেখকের অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

### ৫) নোঙর

আফসার আমেদের যে সমস্ত ছোটগল্পে তালাক প্রসঙ্গ এসেছে, তার মধ্য অন্যতম 'নোঙর' (১৯৯২ সাল, 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকা)। মুসলিম সমাজের কোনো কোনো তালাকপ্রাপ্ত নারীর জীবন, অনেক সময় স্রোতের টানে এক সংসার থেকে আর এক সংসারে ভেসে যেতে বাধ্য হয়। যেভাবে কাজি মহালের প্রথম তিনজন বউ, শুধুমাত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারার অপরাধে ভেসে যায়, হালিম কাজি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাদের তালাক দেয়। কারণ তাদের কোনো সন্তান 'যেহেতু জান্মায়নি। ফলে তাদের বিদেয় করেছে শাশুড়ি, মায়ে ব্যাটায় এককাট্টা হয়ে তাদের তাড়িয়েছে। এক বউ রেখে আর এক বউ আনার ঝক্কি অনেক। একটাকে বিদেয়

করে আর একটাকে আনলে, আগেরটার মুখের ভাত দিয়ে পরেরটাকে পোষা যাবে। এমন বুদ্ধি না খাটালে চার বউয়ের ভাত জোগাতে হালিম কাজি ফতুর হয়ে যেত।'[৪১] তাছাড়া এই মহালে নিজেদের নোঙর তৈরির কোনো চেষ্টা বা আত্মবিশ্বাস হালিমের প্রাক্তন তিনজন স্ত্রী খুঁজে পায় নি। চতুর্থ স্ত্রী রিজিয়া তাদের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা জানে। বিয়ের তিনমাসের মধ্যেও রিজিয়া তার শাশুড়িকে সন্তান আসার কোনো সুসংবাদ শোনাতে পারে নি। তার শাশুড়ি তাকে আরও তিনমাস সময় দেয়। এই তিনমাসের মধ্যে যদি সে হালিম কাজিকে সুসংবাদ দিতে পারে, তবেই তার রক্ষা, নইলে অন্যদের মতো তাকেও তালাক পেতে হবে। কিন্তু রিজিয়া হালিমের পূর্ব-স্ত্রীদের তুলনায় ভিন্ন মানসিকতা তথা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে নানারকম পরিকল্পনা ও নিজস্বতা দিয়ে, শেষপর্যন্ত সমস্ত প্রতিকূলতা ও ভয়কে জয় করে, কাজি মহালে নিজের নোঙর তৈরির পথ খুঁজে নেয়।

আমরা জানি, যখন কোনো নারীর জীবনে, কারণে-অকারণে অতর্কিতে তিন তালাকের মতো বিপর্যয় নেমে আসে, তখন তার কিছু করার থাকে না। জাহান, রেহানা, জাহিরার জীবনে এই তালাক প্রতিরোধ করার কোনো সময় বা সুযোগ আসে নি। 'নোঙর' ছোটোগল্পে হালিম কাজির তালাকপ্রাপ্ত প্রাক্তন স্ত্রীদের জীবনে এই সময় বা সুযোগ হয়তো ছিল, তবু তারাও কিছু করতে পারেনি। হালিম কাজির চতুর্থ স্ত্রী রিজিয়া, তার জীবনে নেমে আসা অনিবার্য তালাকের প্রতিরোধ করার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়। তার বিবাহিত জীবনের তিনমাস অতিবাহিত, আর তিনমাসের মধ্যে সে সন্তানের সুসংবাদ দিতে অক্ষম হলে, হালিমের অন্য তিনজন স্ত্রীর মত, তাকেও স্রোতের টানে ভেসে যেতে হবে। জীবনের এই সংকটের কাছে রিজিয়া হেরে যেতে চায় না। তাই সে জীবনের এই প্রতিকূলতাকে জয় করে, কাজিমহলে স্থায়ী বসবাসের ও চৌদ্দবছর ধরে জমানো চৌদ্দটি আচারের বোয়েমের অধিকার পাওয়ার পরিকল্পনা করে।

লেখক শাশুড়ি ও বধূর চিরাচরিত সম্পর্কের টানাপোড়েন ও তিক্ততাকে নির্দেশ করেছেন চৌদ্দটি আচারের বোয়েমের মধ্যে। এখানে ধরা আছে হালিম কাজির প্রাক্তন তিন স্ত্রীর উপর, চৌদ্দবছর ধরে হয়ে আসা নানান বঞ্চনা, গঞ্জনা ও অত্যাচারের ইতিহাস। এই সমস্ত বোয়েম রিজিয়ার কাছে তার খণ্ডাশ, জাঁহাবাজ শাশুড়ির দোর্দণ্ডপ্রতাপকেই প্রকাশ করে। যে প্রতাপের কাছে কোনো বউ শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারেনি। কিন্তু রিজিয়া এই

প্রতাপের কাছে আপাত নিরীহ, বিমর্ষ ও স্থবির আচরণের অন্তরালে, সতর্ক মনের দৃষ্টিতে নোঙর খোঁজে। 'সে সতর্কতার ভেতর একটা ষড়যন্ত্রের ইচ্ছেকে সে লালন করতে পারে।'[৪২] শাশুড়ির তিনঘণ্টার অনুপস্থিতিতে, সে যখন শাশুড়ির চোখে চোখ রাখার সাহস খুঁজে পায়, তখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে "বিড়বিড়িয়ে বলে, 'ঝাঁটা মেরে মাগির বিষ ঝেড়ে দেব। কার সঙ্গে লাগতে এসেছে?'[৪৩] এমনকি যখন বুঝতে পারে, হালিম সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম তখন তার মাথায় এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনাও আসে। এইসময় কোনো পরপুরুষের অবৈধ সঙ্গ লাভের মধ্য দিয়ে, সন্তান লাভের অভিনব ভাবনা তাকে পেয়ে বসে। আর অবৈধ উপায়ে নোঙর তৈরির এই ভাবনার জন্যই তার চুলের ডগা ও স্তনের বোঁটায় ব্যথা হয়। এই ভাবনার জোরেই রিজিয়া তার জীবনের বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার শক্তি ও সাহস খুঁজে পায়। শাশুড়ির বন্দিত্বের মধ্যেও সে শিহরণ ও ভয়কে গোপন করে, নিজস্বতা ধরে রাখে।

যে নারী তিল তিল করে নিজের হাতে সংসার ও সন্তানকে গড়ে তলে, সে তার সংসারে অন্য কোনো নারীর আধিপত্য মেনে নিতে পারে না। তাই রিজিয়ার জীবনের এই নিজস্বতা ও সাহস, তার শাশুড়ির একেবারেই সহ্য হয় না। তাই তার সমস্ত পরিকল্পনা ও নিজস্বতাকে নষ্ট করতে, শাশুড়ি এক অলৌকিক জিনের মিথ্যে গল্পের আশ্রয় নেয়। মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক জিন, হুরি ও পরির যে কিস্‌সা প্রচলিত আছে, তা এই সমাজের অনেকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকে। তাই বাড়িতে ভয়ংকর জিনের উপস্থিতির কথা শুনে রিজিয়া তার দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা ভুলে যায়। এমনকি শাশুড়ির সহায়ক জিনের উপস্থিতির ভয়ে, সে ধীরে ধীরে তার অর্জিত নিজস্বতা, সাহস ও জেদ হারিয়ে ফেলতে থাকে। তাকে 'আবার গ্রাস করে ফেলেছে শাশুড়ি। নিজস্ব নোঙর ধরতে চায়, ধরতে পারে না। শাশুড়ির পায়ের কাছে কেঁচো হয়ে উঠে।'[৪৪]

আপাতদৃষ্টিতে রিজিয়া তার সমস্ত প্রতিবাদ ও বিরোধিতার মনোভাব হারিয়ে শিরদাঁড়াহীন কেঁচো হয়ে উঠলেও সে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে না। কাজি মহালে নোঙর তৈরির হাল সে কিছুতেই ছাড়ে না। তাই নিজের বিবাহিত জীবনকে সুরক্ষিত করার জন্য সে, অন্য একভাবে চেষ্টা করে। সে জানে, সন্তান ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের দৃঢ় বন্ধন, দাম্পত্যজীবনকে সুরক্ষিত করতে পারে। তাই সে হালিম কাজির সঙ্গে প্রেম ও ভাব-

ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। কিন্তু প্রেমহীন দাম্পত্যের প্রতিভূ হালিমের মতো পুরুষের জীবনে স্ত্রীর প্রতি প্রেম, ভালোবাসার কোনো জায়গা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তার মতো হৃদয়হীন স্বামীর পক্ষে শুধুমাত্র সন্তানের জন্য, অন্য তিনজন স্ত্রীকে ত্যাগ করা এতো সহজ হয়। এমনকি রিজিয়ার প্রতিও তার কোনোরূপ প্রেমের বন্ধন দেখা যায় না। তাই মিলনের মাঝেও, দাম্পত্যপ্রেমের সমস্ত মাধুর্য থেকে নির্বাসিত হয়ে 'সে শুধু স্বামীর দুহাতের মধ্যে দলা পাকিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় রিজিয়া সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করে, তার কোনো নোঙর নেই। সঙ্গমের ভেতর সে একজন বেশ্যা হয়ে উঠে। নিজের আবেগের ভেতর থেকে দুহাতের বেষ্টনিতে বুকে বুক চেপে ধরতে পারে না হালিম কাজিকে, রিজিয়া।'[৪৫] এমনকি সঙ্গমের সময়টুকু ছাড়া রিজিয়াকে, বিছানায় প্রায় স্বামীহীন হয়ে থাকতে হয়। অনুভূতিহীন, হৃদয়হীন হালিমের মনে প্রেমের উন্মেষ ঘটানো তাই রিজিয়ার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

সাধারণত বিংশশতকেও দেখা যায়, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আকাশছোঁয়া হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের অশিক্ষিত মুসলিম সমাজ, নানান কিস্‌সা ও অলৌকিক জিনের ভয়মিশ্রিত আতঙ্কে আক্রান্ত। রিজিয়া এই সমাজেরই একজন। তাই ক্রমে ক্রমে সমস্ত পরিকল্পনা, চেষ্টা ও নিজস্ব ভাবনা হারিয়ে, জিনের অলৌকিক শক্তির ভয়ে, সে শাশুড়ি ও স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে। আইয়ুব নবীর পতিব্রতা স্ত্রী রহিমার কথা এবং অত্যাচারী স্বামী জোবেদের স্ত্রী রমিশার কিংবদন্তীর কথায়, তার এই আনুগত্য আরও বেশি ঘনীভূত হয়। তার জীবন থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত চিন্তাশক্তি, গান, দোলনা, নীলাকাশ ও সুন্দর বাতাস হারিয়ে যাওয়ায়, সে একটি প্রাণহীন শবদেহে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত রিজিয়ার মতো নিজস্বতায় উজ্জ্বল নারীরাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। এই সমাজে গর্ভসঞ্চারে অক্ষম পুরুষের, অক্ষমতার দায়ভারও নারীকেই বহন করতে হয়। এর প্রতিবাদেই রিজিয়া পরকীয়ায় জড়িয়ে গর্ভসঞ্চারের দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করে। এমনকি জাঁহাবাজ শাশুড়িকে শায়েস্তার কথাও সে ভাবে। তার এই পরিকল্পনা ও ভাবনার মধ্যেই, সে সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এক প্রাণশক্তিতে ভরপুর ব্যতিক্রমী নারীকে খুঁজে পায়। আজন্ম লালিত এক অলৌকিক জিনশক্তির সংবাদে সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার সমস্ত শক্তি হারিয়ে, হালিমের অন্যান্য প্রাক্তন

স্ত্রীদের মতোই এক নিষ্প্রাণ, যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো শাশুড়ির হাতের বাধ্য ও অনুগত পুতুল হয়ে ওঠে।

আফসার আমেদ রিজিয়ার মধ্য দিয়ে নারীর উত্তরণ দেখিয়েছেন। তাই রিজিয়া যখন উপলব্ধি করে যে, শাশুড়ির তাকে যে পোষা জিনের সংবাদে মৃতপ্রায় পুতুল করে তুলেছে, প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। অলৌকিক শক্তির অধিকারী যে জিন শাশুড়ির শারীরিক কষ্ট দূর করতে পারে না, চরম বিপদ থেকে শাশুড়িকে রক্ষা করতে পারে না, সে নিশ্চয়ই রিজিয়ারও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর শাশুড়ির চোখে ভয় ও হতাশা দেখে, রিজিয়া তার শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর সাহস খুঁজে পায়। শাশুড়ির সাজানো মিথ্যে পোষাজিনের গল্পের অন্তঃসারশূন্যতা ধরে ফেলে সে। স্বামী ও শাশুড়ির সমস্ত ভয়, বঞ্চনা ও অপমান জয় করার নিজস্ব জীবনীশক্তিতে সে ভাস্বর হয়ে ওঠে। কাজি মহালে নোঙর তৈরির মধ্য দিয়ে, চৌদ্দটি বোয়েমের অধিকার লাভের পথ সে মনে মনে খুঁজে পায়।

প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলিম সমাজে কন্যাসন্তান জন্মদানের অপরাধে বা সন্তান জন্মদানের অক্ষমতার অপরাধে অনেক নারীর জীবনে, বিনা অপরাধে বিবাহবিচ্ছেদের মর্মান্তিক শাস্তি নেমে আসে অতর্কিতে। এক্ষেত্রে সমাজ তথা পরিবার সন্তানধারণে নারীর অক্ষমতা বা সক্ষমতার পরীক্ষা না করেই 'বাঁজা' অপবাদে, তাকে সংসার ত্যাগে বাধ্য করে। হালিম কাজির চারজন স্ত্রীই সন্তানধারণে অক্ষম, একথা সত্য হতে পারে না- হালিম, তার মা বা সমাজ কেউ সহজে এই প্রশ্ন তোলেনা। কিন্তু রিজিয়ার মতো নারীরা অনেকসময় এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে নিজের মতো করে। যদিও রিজিয়ার সংসারে নোঙর তৈরির পরিকল্পনা ন্যায়সংগত নয়, তবুও তার উপর ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ, তার মতো অশিক্ষিত, অসহায়, বন্দিনী নারী নোঙর তৈরির এই বিকল্প পথের কথায় ভাবে। এইপ্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে বাংলাদেশের লেখিকা সেলিনা হোসেনের 'মতিজানের মেয়েরা' ছোটগল্পের কথা। লেখক আফসার আমেদ তাঁর 'ঘরগেরস্তি' উপন্যাসেও এক অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজে সংঘটিত, এই একই সমস্যা ও তার সমাধানের একটা রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সমাজে শিক্ষা, সচেতনতা, ভালোবাসা ও মানবিকতাই পারে এই সমস্ত ব্যাধিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্মূল করে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে।

**বহুবিবাহ প্রসঙ্গঃ**

প্রকৃতপক্ষে ইসলামধর্মে নারীকে অনেক বেশি সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় মুসলিম সমাজে, শরিয়তের আশ্রয়ে তালাক ও বহুবিবাহের নামে বারবার নারীর এই সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। অনেকের ধারণা, কোরান সবসময়ই পুরুষদের চারটি বিয়ে করার অনুমোদন দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে, একটি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, বিধবা ও অনাথদের উন্নত ও নিরাপদ জীবনের স্বার্থে, কোরানের চতুর্থ অধ্যায় সুরা 'নিসা'র ২-য় অংশে বহুবিবাহের উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে একজন মুসলমান তার সামর্থ্য অনুযায়ী চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে। পাশাপাশি ধর্মগ্রন্থে একথা বলেও সাবধান করা হয় যে, যদি কোনো মুসলমান মনে করে, তার পক্ষে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমান আচরণ ও ন্যায়বিচার করা সম্ভব নয়, তবে সে যেন একটিই বিয়ে করে। মুসলিম ধর্মগ্রন্থগুলো যেহেতু আরবি ভাষায় লেখা, তাই আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে, বিদেশি ভাষায় নির্দেশিত ধর্মের প্রকৃত বিধি-বিধান জানা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তারা সবসময় মোল্লা ও মৌলবিদের নির্দেশিত পথই অনুসরণ করে। অথচ এদেশের সিংহভাগ মোল্লা ও মৌলবি অক্ষর চিনে চিনে কোরান পাঠে সক্ষম হলেও, তারা আরবি ভাষার প্রকৃত অর্থ প্রায় বোঝে না। ফলে ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ সম্পর্কিত একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত হয়। যার ফলে বিপর্যস্ত হয় মুসলিম নারীর দাম্পত্য জীবন।

ইসলাম ধর্মে বহুবিবাহের অনুমোদন এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে সমান মর্যাদা, অধিকার ও ভালোবাসা দেওয়ার যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম, তা বাস্তবে মেনে চলা হয় না। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেমন দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ের জন্য, প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজনবোধ করে না, তেমনি স্ত্রীর প্রাপ্য সমান মর্যাদা, সম্মান ও ভালবাসা থেকে তাদের বঞ্চিত করে। ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে, একজন স্বামী একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কোনো স্ত্রীর জীবন ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেও, অন্য স্ত্রীদের কপালে জোটে কেবলমাত্র উপেক্ষা ও অবহেলা। আবার অনেক বিত্তশালী পরিবারে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে স্বামীকে খুশি করার এক অমানবিক প্রতিযোগিতাও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে দেখা যায়, সমাজে বিত্তশালী কামুক, বহুগামী পুরুষেরাই বহুবিবাহে আসক্ত হয়ে থাকে। তবে বংশরক্ষার নামে অনেকসময় নিম্নবিত্ত

পরিবারেও বহুবিবাহ দেখা যায়। এক্ষেত্রে তারা অনেকসময় একেবারে অল্পবয়সী কিশোরীকে বিবাহ করায় আগ্রহ প্রকাশ করে। তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, অসহায় কমবয়সী নারীদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। একজন বাবার বয়সী পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন-যাপন যে সেই কিশোরীর পক্ষে কতোটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে, সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার দরিদ্র, পশ্চাদপদ, নিম্নবর্গীয় মুসলিম সমাজের অনেক পুরুষই স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে কাজের সন্ধানে শহরে যায় এবং কিছুদিন পর প্রথম স্ত্রী-সন্তানদের ভুলে গিয়ে শহরে বা ভিন্ন রাজ্যে দ্বিতীয় সংসার পাতে। ফলে সেই প্রথম স্ত্রী সন্তানদের মানুষ করে তুলতে কখনো লোকের বাড়ি কাজ করে, কখনো আবার ভিক্ষে করে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজে প্রচলিত এই ব্যাধি বহু নারীর প্রানসংশয় ঘটায়। ভারতবর্ষে শরিয়তি আইনের দোহায় দিয়ে এই সমস্ত কামুক, বহুগামী পুরুষসমাজ নির্বিঘ্নে নিজেদের লালসা পূরণে সক্ষম হয়। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটোগল্পে, বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে মুসলিম নারীর জীবনের যে সমস্যা ও সংকট দেখা যায়, তার এক বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন।

আমরা জেনেছি, পৃথিবীর অনেক মুসলিম রাষ্ট্রেই বহুবিবাহ সম্পর্কে একটি সময়োপযোগী পরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মধ্যে তুরস্ক অন্যতম। সেখানে ১০০ জন মানুষের মধ্যে প্রায় ৯৯ জনই মুসলিম ধর্মাবলম্বী। অথচ সেখানে বিবাহ ও তালাককে কেন্দ্র করে শরিয়তি আইনের কিছু কিছু পরিবর্তনের পাশাপাশি বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্থান সরকারও বহুবিবাহ বন্ধের জন্য আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের অন্যথায় জেল ও জরিমানার মতো শাস্তি হয় সেখানে। মিশরেও এই ব্যাপারে ইতিবাচক আইন প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে, আজও ব্যক্তিগত শরিয়তি আইনের নামে মুসলিম নারীসমাজ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে নানাভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে চলেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ভারতের যে পথচলা শুরু হয়, তাতে দেশের শাসকদল 'অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল' এর দোহাই দিয়ে, মুসলিম নারীর নিরাপত্তা ও প্রগতিশীলতার তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। ফলে ধর্মের নামে মুসলিম মেয়েরা আজ পর্যন্ত এই 'অল ইন্ডিয়া পার্সোনাল ল' বোর্ডের দ্বারা কোনো না কোনোভাবে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হয়ে আসছে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু পারিবারিক আইনে সংখ্যাগুরু মহিলাদের

অধিকারের ব্যাপারে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হলেও, মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার এই অসঙ্গতি ও অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ বারবার সরব হলেও, রক্ষণশীল মৌলবাদী ও রাজনৈতিক স্বার্থপরতার কাছে তারা পরাজিত হয়। প্রগতিশীল মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি, আফসার আমেদের বিভিন্ন প্রবন্ধগ্রন্থ ও কথাসাহিত্যে এই মনোভাব প্রকাশিত।

### ১) অন্তঃপুর

আফসার আমেদের 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে, মইবুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, প্রথম স্ত্রী জাহিরা যখন বাবার বাড়ি চলে যায়, তখন মইবু বহুবিবাহের সুযোগ গ্রহণ করে। অত্যন্ত দরিদ্র মা-বাবার কন্যাসন্তান হাসিনাকে সে বিয়ে করে। শুধুমাত্র খাওয়া পরার জন্যই আধবুড়ো, মাতাল, অত্যাচারী, তিন সন্তানের জনক মইবুর দ্বিতীয় স্ত্রী হতে সে বাধ্য হয়। অল্পবয়সী হাসিনা, মইবুর সংসারে এসে সমস্ত প্রতিকূলতাকে মেনে নেয়। সে জাহিরার অবর্তমানে, সতীনের তিন সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে। হঠাৎ করে তাদের সংসারে জাহিরার প্রত্যাগমন, হাসিনাকে তার দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত করে তোলে। কিন্তু মইবুর প্রতি জাহিরার নিরাসক্ত আচরণ তাকে সাময়িকভাবে স্বস্তি দেয়। নিরাসক্ত মনে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে জাহিরা, একসময় হাসিনার স্নেহময়ি বড়বুবু হয়ে ওঠে। মা-বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায়, গর্ভবতী অবস্থায় সে পরম নিশ্চিন্তে সতীনের কাছে আত্মসমর্পণ করে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ নিরীহ, মুখচোরা হাসিনা, সতীনের আগমনে বরং একটা আশ্রয় খুঁজে পায়। ধীরে ধীরে হাসিনার মনে সতীনবিদ্বেষের জন্ম হয়। মইবুকে জীবনে পুনরায় ফিরে পাওয়ার চেষ্টায়, জাহিরা তার মনকে আরও বিষিয়ে তোলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ও সন্তানের ভালো-মন্দ সে বুঝতে শেখে। স্বামী ও সংসারের অধিকার নিয়ে বড়বুবু জাহিরার সঙ্গে সরাসরি সংগ্রাম করাও তার স্বভাব নয়। তাই সে ঠাণ্ডামাথায় নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। সে প্রতিবেশি জয়নালের মায়ের কাছে গোপনে মাস খোরাকি থেকে দশ কেজি চাল বিক্রি করে। সেই পয়সা দিয়ে সে তার খোকার রূপোর পদক কেনার ব্যবস্থা করে। আর চাল আগাম শেষ হওয়ার দায় বর্তায় জাহিরার উপর। তাই বসে বসে 'চাল ধ্বংস করার অপরাধে'

মইবু জাহিরাকে তালাক দেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য চাতুরী ও শারীরিক আবেদনে হাসিনা জয়ী হয়। এতে কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কোনো ক্ষতি হয় না। শুধুমাত্র একজন নারী, আর একজন নারীর জীবন থেকে তার স্বামী, সন্তান, সংসার, স্বপ্ন তথা সর্বস্ব কেড়ে নেয়।

## ২) দ্বিতীয় বিবি

আফসার আমেদের 'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে, শারদীয় 'যুবমানস' পত্রিকায়। ১৯৯৭ সালে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। লেখক 'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসে দরিদ্র কৃষক শোভান আলির দ্বিতীয় বিবাহকে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক অশান্তি, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও দাম্পত্যজীবনের জটিলতার সৃষ্টি হয়, তারই এক বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেন। তিন বছরের বিবাহিত জীবনেও, কিসমত শোভানকে সন্তানসুখ দিতে পারে না। তাই কিসমতের প্রেমের মগ্নতার মধ্যেই, শোভান ধর্মীয় বিধি মেনে দ্বিতীয় বিবি হামিদাকে ঘরে আনে। প্রথম স্ত্রী কিসমতের অনুমতি না নিয়েই, গোপনে এই বিয়ে করার অপরাধে অপরাধী শোভান। তাই সে  কিসমতকে খুশি করার জন্য নববধূ হামিদাকে অবহেলা করে। কিসমতের শাসনে হামিদাকে অবহেলা করে নিজে কষ্ট পায়, হামিদাকেও কষ্ট দেয়। অন্যদিকে কিসমতও স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত দ্বিতীয় বিবাহে কষ্ট পায়, মনে মনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। কিসমতের এই ক্ষোভ দ্বিতীয় বিবি হামিদার কাঙ্ক্ষিত দাম্পত্যজীবনের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দেয়। ফলে সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষায়, একই দাম্পত্যে তিনজন নরনারীর জীবন কোনো না কোনোভাবে বেদনাহত হয়। আফসার আমেদের 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসে নিজাম ও দীপার জীবনে সন্তানহীনতার সংকট কাটিয়ে ওঠার পদ্ধতি আধুনিক ও মানবিক। শহুরে, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ব্যাঙ্ককর্মচারী নিজাম, দীপার জীবনের সন্তান হারানোর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে একটি অনাথ শিশুকে দত্তক নেওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত, দরিদ্র, পিছিয়েপড়া সমাজের কৃষক শোভানের এই আধুনিক জীবনদর্শন না থাকায় স্বাভাবিক। তাই তার সমাজের অন্যান্য নিঃসন্তান পুরুষের মতো শোভানও সন্তানসুখ কামনায় দ্বিতীয় বিবাহ করে। ধর্ম ও সমাজ শোভানের এই বিবাহকে মান্যতা দেয়। মুসলিম সমাজে বহুবিবাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, এই সমাজের দরিদ্র পুরুষেরা অর্থনৈতিক কারণে সাধারণত একটিই বিবাহ করে।

আধুনিক শিক্ষায় অশিক্ষিত কিছু বড়লোক জমিদারবাড়িতে এই প্রথার অবাধ প্রচলন দেখা যায়। তবে দরিদ্র মুসলিম সমাজে প্রথম স্ত্রী গর্ভধারণে অক্ষম হলে, অনেকসময় সন্তানলাভের জন্য বহুবিবাহের প্রথাও বহুল প্রচলিত। এই সূত্রেই বিধবা হামিদা দ্বিতীয় বিবিরূপে শোভান ও কিসমতের দাম্পত্যের মাঝে এসে পড়ে অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই।

উপন্যাসে দেখা যায়, হামিদার প্রথম স্বামী বিয়ের মাত্র আটমাসের মাথায় সাপের দংশনে প্রাণ হারায়। অল্পবয়সী বিধবা হামিদা জীবনের এই চরম বিপর্যয় একসময় কাটিয়ে ওঠে। জীবনকে ভালবেসে আবার নতুন করে বাঁচার চেষ্টায় সে জরির কাজ শেখে। এই কাজে মাসে প্রায় দেড়শো টাকা রোজগার করে হামিদা। নিজের রোজগারের পরিতৃপ্ততা, মনের মতো সাজসজ্জা, স্বপ্নকল্পনা ও হাসি-তামাসার মাঝে হামিদার জীবনে একজন পুরুষের অভাব ছাড়া, অন্য কোন অভাব ছিল না। তাই শুধুমাত্র পুরুষ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দোজবর শোভানকে সে বিয়ে করে। কারণ হামিদা জানে, তার মতো বিধবাদের কোন অবিবাহিত যুবাপুরুষ বিয়ে করবে না। ইসলাম ধর্মে বিধবাবিবাহের বিধান থাকলেও, একজন বিধবার মনের মতো পুরুষলাভের স্বপ্ন বাস্তবে কিন্তু সমাজের রীতিবিরুদ্ধ। তাই বিয়েতে শোভানের প্রথম স্ত্রীর মত আছে জেনে, সতীনের সঙ্গে ঘর করতে প্রস্তুত হয় হামিদা। শোভান বিয়ের প্রথম রাতে তার সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষ হয়ে, এক নতুন আনন্দময় জীবনের স্বপ্নে পরিতৃপ্ত করে তোলে। তাই নতুন সংসার ও দাম্পত্যজীবনের অনেক রঙিন স্বপ্ন নিয়ে, হামিদা শোভানের হাত ধরে কাঁটাপুকুর ছেড়ে শোভানের ভিটেতে আসে।

সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, দ্বিতীয় বিবাহিত জীবনে নারী সুখী হতে পারে না। শোভানের ভিটেতে আসার পরে হামিদারও নতুন সংসার জীবনের রঙিন স্বপ্ন অনেকটা বর্ণহীন হয়ে ওঠে। সে অনুভব করে শোভানের সঙ্গে প্রথম স্ত্রী কিসমতের নিবিড় ভালোবাসা ও সংসারে তার নিশ্ছিদ্র আধিপত্যের দাপট। কিসমতের ভালোবাসার বন্ধন ও আধিপত্য ছিন্ন করে শোভান একবারও হামিদার কাছে আসার সাহস পায় নি। তাছাড়া কিসমতকে লুকিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শোভান নতুনবউ হামিদাকে উপেক্ষা করে, সারাক্ষণ কিসমতকে খুশি করাতেই ব্যস্ত থাকে। অন্ধকারে শোভান হামিদাকে, কিসমত ভেবে যখন এই বিয়ের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলে, 'তুই আমার সব। নতুন বউ

বাচ্চা দেবে বলে বিয়ে করেছি। তোর কাছে আসবো না তো কার কাছে যাবো?’[৪৬] প্রথম রাতে স্বামীর এই নিষ্ঠুর অপমানে অভিমানী হামিদা নিজের ঘরে শুয়ে খিল আঁটে এই আশায় যে, একসময় শোভান তার ঘরে আসবে। অথচ সুন্দর মনের মানুষ হামিদা নিজেই ‘বড়বুবু’ কিসমতের প্রতি সহানুভূতিতে, নিজে পুরুষহীন থেকে, শোভানকে কিসমতের ঘরে যেতে বলে। আর নিজে অশ্রুজলকে সঙ্গী করে একটি নতুন সকালের স্বপ্নে একাকী রাত্রিযাপন করে, যা নববধূর পক্ষে মোটেই আনন্দদায়ক নয়। শোভান একটিবারের জন্যও হামিদার সঙ্গে কথা বলার সম্পর্ক তৈরি না করেই, যখন লাঙল নিয়ে জমিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন হমিদা নিজেই অভিমান সরিয়ে, অসহায় চোখে স্বামীর সান্নিধ্যের জন্য কাতরতা প্রকাশ করে। শোভান তার এই কাতরতা দূর না করে, তাকে কিসমতের ভরসা দিয়ে চলে যায়। অপরিচিত পরিবেশ ও প্রতিবেশে, নতুন সংসারে, স্বামীসুখবঞ্চিত অসহায় হামিদা জীবনে আনন্দলাভের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে শোভানকে দেখতে থাকে, ‘তার নতুন স্বামী চলে যাচ্ছে, খেতে কাজ করতে। এমন চলে যাওয়াটা সে চায়নি। চুপি চুপি সকাল সকাল উঠে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। কাছে কাছে থাকতে চেয়েছিল সে। শোভান চলে যেতে নিরাশ্রম মনে হয় তার। কাল রাতে তার নতুন স্বামী তার কাছে আসবে, এই আশা দরজায় খিল এঁটে প্রকাশ করতে চেয়েছিল সে। হয়তো তার স্বামী দরজায় ঘা দিয়ে খিল খুলতে বাধ্য করাবে। সেই বাধ্যতায় যাবার কতই না বাসনা ছিল হামিদার। অথচ সারা রাত একা বিছানায় কেঁদে কেঁদে বিনিদ্র কেটেছে তার। পুরুষ মানেই নিষ্ঠুর। একজন পুরুষ তাকে বিয়ে করবার পর কাঁদিয়ে বিধবা করে চলে যায়। আর একজন পুরুষ বিয়ে করে এনে সতীনের সংসারে অবহেলা করে। সে জানতো সতীনের সংসারে আসছে। কিন্তু এমন মন নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি চলবে, জানতো না। বিধবা বলেই সতীনের সংসারে আসার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিল।’[৪৭]

সাধারণত কোনো নারীই স্বামীর জীবনে অন্য কোনো নারীর অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না। তাই কিসমত ক্রন্দনরতা হামিদার পিঠে হাত রাখলেও, তার বিষ নজরে তাকিয়ে থাকার অর্থ হামিদা বোঝে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কিসমতের কাছে আরও বেশি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। কিসমত এই বিয়ের জন্য অন্যায় ভাবে হামিদাকেই দোষারোপ করে, বারবার তার মৃত্যুকামনা করে। নতুন সংসারজীবনের প্রথমদিনেই হামিদা ভালোবাসা ও মর্যাদার পরিবর্তে,

শুধু অপমান ও অবহেলা লাভ করে। এমনকি সতীন তাকে বাটি ছুঁড়ে মারে পর্যন্ত। এই অপমানকর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হামিদা মনে মনে আত্মজর্জর হয়েও, কিসমতের সঙ্গে কোনোরূপ অন্যায় আচরণ বা নিজের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন করে না। শান্তিকামী সুন্দর মনের মানুষ হামিদা বরং উল্টোটাই করে। সে কিসমতকে আশ্বস্ত করে, একই স্বামীর সংসারে দুজনে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার প্রস্তাব দিয়ে বলে, 'এ সংসারে তো তুমি একা, একটেরে ঘর, একটা সাথী পেলে বুবু। ক্ষমাঘেন্না করে মানিয়ে নাও, আর কি করব বুবু, নিজের বিয়ে কি নিজে ঠিক করতে পারি।'[৪৮]

সমাজসচেতন লেখক এখানে হামিদার মধ্য দিয়ে সংসারে দ্বিতীয় স্ত্রীর অবস্থানকে সুস্পষ্ট করেছেন। যেখানে স্বামীর সঙ্গসুখ বঞ্চিত হামিদা বুঝতে পারে যে, সতীনের সংসারে আনন্দে থাকা যায় না। কিসমতের শাসনে ভীত শোভান, কিসমতের শয্যাসঙ্গী হয়ে, ক্রমাগত তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে যায়। দ্বিতীয় স্বামী শোভানের সংসারে এসেও দিনের পর দিন পুরুষহীন শয্যায় হামিদা আগের স্বামীর সঙ্গসুখের স্মৃতিতে তাড়িত হয়। পাশের ঘরে শোভান যখন কিসমতের সঙ্গে রাত্রিযাপন করে, তখন নতুনবউ হামিদা একাকী, যন্ত্রণাময় বিনিদ্র রাত্রিযাপনে বাধ্য হয়। একদিনের জন্যও সে নতুন সংসারে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির সুযোগ পায় নি, স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি। সংসার ও স্বামীকে কিসমত নিশ্ছিদ্র প্রহরায় বেঁধে রাখে। কিন্তু কিসমতের মত স্বামী ও সংসারের প্রতি তারও আইনত অধিকার আছে। তবে আত্মমর্যাদাশীল হামিদা নিজের অধিকারের প্রশ্নে সরব হতে পারে না। যেহেতু নিজের অধিকারের দাবীকে হামিদা জোর গলায় প্রকাশ করে না, তাই শোভানও হামিদার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত রাত্রিযাপনের সুযোগ তৈরি করে না। স্বামীর এই অপ্রেম আচরণের কান্না ও যন্ত্রণা সে গোপন করে স্বামী ও সতীনের কাছে। নীরবে কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর, মনে মনে নিজের অধিকার পাওয়ার সংকল্প করে। এই মুখচোরা মেয়েটি শারীরিক আকর্ষণে নানাভাবে স্বামীসঙ্গ লাভের পরিকল্পনা করে। কিন্তু কিসমত তার সমস্ত পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হামিদার মন ধীরে ধীরে অস্থির, ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাই কিসমত তাকে তরকারী রান্নার কাজে ব্যস্ত রেখে সাপ খেলা দেখতে গেলে, হামিদা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সে রান্নার কাজ অসমাপ্ত রেখেই উনুনে জল ঢেলে দিয়ে, শোভানকে নিভৃতে

পাওয়ার জন্য বরোজে প্রবেশ করে। বরোজে শোভানের আদর ও সোহাগের মধ্যে বিয়ের বারোদিন ধরে অবহেলা ও প্রত্যাখ্যানে একদিকে যেমন হামিদা কেঁদে ফেলে, তেমনি কিসমতের শাসনে ভীত ও কাপুরুষ শোভানকে তার চড় মারতে ইচ্ছে করে। আবার শোভানের সব ঠিক হয়ে যাওয়ার আশ্বাসে তার শোভানকে ক্ষমা করারও ইচ্ছে জাগে।

তবে শেষপর্যন্ত সমাজের আর পাঁচজন নারীর মতো হামিদা স্বামীর সব অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তাই আত্মসমর্পণে উন্মুখ হামিদাকে যখন বরোজ থেকে চলে যেতে বলে, তখন হামিদা শোভানের যুক্তিহীন নিষ্ঠুর আদেশকে অমান্য করে। একভাবে সে শোভান ও কিসমতের কাছে নিজের প্রাপ্য অধিকারের দাবীকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। তখন শুধুমাত্র কিসমতকে খুশি রাখার জন্য, হামিদাকে বঞ্চিত করে, কষ্ট দিয়ে শোভান একজন অপরাধীর মতো, নিজেই বরোজ ত্যাগ করে। স্বামীর এই অপ্রেম অন্যায় আচরণে হামিদা একদিকে যেমন মনে প্রানে ব্যথিত হয়, তেমনি বরোজের মধ্যে শোভানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি করে, কিসমতের অনুগত শোভানকে বিপদে ফেলে মনে মনে খুশিও হয়। পাশাপাশি সে এইভাবে কিসমতের কাছে, শোভানের স্ত্রীরূপে নিজের পরিচয়ও প্রতিষ্ঠা করে। হামিদার পরিকল্পনা অনেকটা সফল হয়, যখন কিসমত তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত দেখে ফেলে। কিন্তু শোভানের জীবনে কিসমতের অনিবার্যতা ও আধিপত্য আবারও হামিদাকে ব্যর্থ করে দেয়। কিসমতকে শান্ত ও সুস্থ করার জন্য শোভান যখন তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা দেখিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতে বলে, তখন স্বামীর প্রত্যাখ্যানের চরম আঘাতে, অভিমানী হামিদা দরজায় খিল এঁটে নিজের অভিমান প্রকাশ করলেও, সে অশ্রুসিক্ত মনে শোভানের অপেক্ষায় থাকে। কিসমতের অসন্তুষ্টির জন্য, শোভান তার মান ভাঙাতে আসার সাহস পায় না। এক্ষেত্রে শোভান প্রকৃতপক্ষে এক স্ত্রীকে খুশি রাখতে, অন্যস্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ করে। এই বোধ থেকেই কিসমতকে বোঝাতে ব্যর্থ শোভান, প্রতিবেশী নাদিরের মা সাজেদা বিবির শরণাপন্ন হয়। শেষপর্যন্ত সাজেদার কথায় কিসমত সামাজিক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সমাজের চোখে নিজের অবস্থান ঠিক রাখার জন্যই হামিদাকে ছদ্ম সহানুভূতি দেখিয়ে মান ভাঙায়।

সমাজে হামিদার মতো সুন্দর মনের মানুষেরা সবসময় অন্যের উপর ভরসা করে, সতীনের সংসারেও মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাই হামিদা কিসমতের রণনীতি বুঝতে না

পেরে কিসমতকে ভালোবেসে ফেলে আর সহজ সরল মনে বিশ্বাস করে, সতীনের মান্যতা ও বোঝাপড়ায়, একই স্বামীর সংসারে বসবাস করার স্বপ্ন দেখে। যেখানে শোভানের সোহাগ ও পরিশ্রমে তাদের মুখের ভাত, পরনের কাপড় ও সাজসজ্জার সমস্ত উপকরণ থেকে শুরু করে জীবনের চাওয়া পাওয়ার মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাকবে না। হামিদা কিসমতের ভালোমানুষি ব্যবহারে সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়ে, মনে মনে পরিশ্রম ক্লান্ত শোভানকে ভালোবাসা ও সেবায় পরিতৃপ্ত করার আয়োজন করে। তাই হাস্যচপল হামিদা বিগত কয়েকদিনের দুঃখ, যন্ত্রনা, অবহেলা, অপমান, বঞ্চনা ও কান্না ভুলে, আগত জীবনের আনন্দ ও হাসিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু রাতের গভীর অন্ধকারে হামিদার জীবনের এই প্রানোচ্ছ্বল হাসি অচিরেই থেমে যায়, সে মাতাল, বেসামাল শোভানকে দেখে ভয় পায়। তাই যেখানে সুস্থ স্বাভাবিক শোভানকে পাওয়ায় জন্য সে মরিয়া, সেখানে মাতাল শোভানের ভালবাসার স্বর 'নতুন বউ' ডাকের মধ্যে একটা মোহনীয় মাধুর্য খুঁজে পেলেও, সেই ডাকে সাড়া দেওয়ার কোনো আন্তরিক অনুভূতি তথা মনের জোর সে খুঁজে পায় না। বরং 'এখন লোকটাকে প্রত্যাখ্যানে সে যথেষ্ট সুগঠিত ও বিকশিত হয়ে উঠতে চায়। পুরুষকে আকর্ষণ করার মোহিনী হাসির চেয়ে তার এই প্রত্যাখ্যানের ইচ্ছে তাকে বেশি আনন্দিত করে। সে যে কাছে যাচ্ছে না, এটা তার বেশি ভাল লাগছে। এমন একটা জায়গায় নিজেকে নিজে খুঁজে পাবার উপলব্ধি আর কোনোদিন পায়নি সে। লোকটা হাত ধরতে এলে সরিয়ে দেবে হাত, সরিয়ে নেবে নিজেকে। ঘৃণা আর প্রত্যাখ্যান তার জীবন হয়ে উঠবে।'[৪৯]

মূলত যে স্বামী বিয়ের প্রায় বারোদিন পর হামিদার প্রাপ্য অধিকার দিতে ও প্রেমসম্ভাষণ জানাতে মদের আশ্রয় নেয়, সেই ভীরু কাপুরুষ স্বামীকে হামিদা চায় না। যদিও সে এই সুযোগ নিয়ে, কিসমতের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে প্রতিশোধ নিতে পারতো। আর এইভাবে কিসমতকৃত সমস্ত অপমান, অসম্মান ও আঘাতের যোগ্য জবাব দিয়ে, বোঝাতে পারতো শোভানের প্রতি তারও সামাজিক ও আইনি অধিকারের ন্যায্যতাকে। কিন্তু তা না করায় নিষ্ক্রিয় হামিদা, কিসমতের চোখে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সে মাতাল শোভানের প্রতি সমস্ত অনাগ্রহ দেখিয়ে একদিকে যেমন কিসমতকে আশ্চর্য করেছে, তেমনি স্বামীকে একান্ত করে পাওয়ার সুযোগ প্রত্যাখ্যান করার চারিত্রিক বিশিষ্টতায় ভেতরে ভেতরে সতীনকে রাগান্বিত করে তুলেছে।

হামিদার কাছে পরাজিত হওয়ার মানসিক সংকটে অপমানিত কিসমত, আচমকা হামিদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'চুল ধরে প্রবল টান মারে। তারপর চৌকাঠ থেকে নামিয়ে উঠোনে ফেলে দেয় হামিদাকে। এলোপাথাড়ি কয়েকবার লাথি চালায়। তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় হামিদার মুখের সামনে।'[৫০] ঘটনার আকস্মিকতায় অপ্রস্তুত হামিদা অনেকটা বিভ্রান্ত হয়। তার স্বপ্নসাধ ও বিশ্বাস মিথ্যে হয়ে যায় এবং অন্যান্য অন্ধকার রাতের মতোই ধারাবাহিক একাকীত্বে রাত্রিযাপন করে, 'আর তার সতীন স্বামী আছে ঘরের ভেতর। পূর্বদিনের ঘটনারই এটা অনুবর্তন, অন্য রকম কিছু নয়। সে স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে একা পড়ে আছে। তাঁর স্বামী ও সতীন তাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, এ তার বেদনা ও বঞ্চনার যাপন।'[৫১]

সেই সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে হামিদাকে অনেক বেশি সাহসী রূপে লেখক দেখিয়েছেন। সে স্বামীর ভীরুতায় অট্টহাস্য করার ক্ষমতা রাখে। তাই ঘটনার সত্যতা না জেনেই, শুধুমাত্র হামিদার ঘরে রাত কাটানোর অপরাধে এবং ভয়ে শোভান যখন অস্থির হয়ে, কিসমতকে খুঁজে বেড়ায় তখন এই অস্বাভাবিক ঘটনায় হামিদার প্রচণ্ড হাসি পায়। কোনো একজন মনের দোসর পেলে হামিদা এই হাস্যকর ঘটনায় প্রাণের হাসি হাসতে পারতো, যে কাঙ্ক্ষিত হাসির মূল্যে সে শোভানের বিচ্ছেদ পেতেও প্রস্তুত। কিন্তু দোসরহীন যন্ত্রণাময় জীবনে হামিদার দমফাটা হাসির উৎসমুখ শুকিয়ে যায়। জীবনের নির্মল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে সেও শোভানের দৃষ্টিকে অবজ্ঞা করে, শোভানকে অসমর্থন করে। অশিক্ষিত হয়েও আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জ্বল হামিদা, পুরুষস্বামীর এই হাস্যকর পৌরুষহীনতাকে ঘৃণার সঙ্গে অবজ্ঞা ও ধিক্কার জানিয়ে মনে মনে বলে, 'তাছাড়া তোমার সঙ্গে এমন কী সম্পর্ক যে তুমি আমার দিকে তাকালে আমাকে তাকাতে হবে? তাছাড়া তুমি যে উদ্দ্যেশে আমার দিকে তাকাচ্ছ, সে তো কিসমতের প্রতি প্রেমের আবেগের ভেতর দিয়ে। সেখানে তোমাকে আমি সহযোগিতা করতে পারি না। তাছাড়া তুমি বিকারগ্রস্ত হয়ে আমাকে চাও, সুস্থ সজীব জীবনে কিসমতকেই পেতে ভালবাসো, তোমার সঙ্গে এ হেন দৃষ্টি বিনিময় প্রত্যাখ্যান করছি। তোমাকে চিনে নিয়েছি, জেনে নিয়েছি।'[৫২] কারণ নিজের প্রাপ্য সম্মান, ভালবাসা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, 'এমন ভালবাসার লুকোচুরিতে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে না হামিদার, শোভান একা এ খেলা খেলতে চাইলে, হামিদা যোগ দিচ্ছে না বলে লুকোচুরিও হচ্ছে না। বৈধ ভালবাসার অধিকার, এমন অবৈধতার মোড়ক

নিয়ে লুকোচুরি খেলতে যাবে, তা হবে অসম্মানজনক, অপমানকর। কেমন নিরাসক্ত বিস্বাদ পেয়ে বসেছে আজ হামিদাকে। কিছুতেই শোভানের প্রতি সদয় ও প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারছে না। বিষণ্ণতা আর ঘুচছেই না, কিছুতেই।'[৫৩]

লেখক হামিদার মধ্য দিয়ে এক স্বতন্ত্র এক নারীকে অঙ্কন করেছেন। যে নিজস্ব ভাবনায় ও মর্যাদাবোধে আর পাঁচজন নারী থেকে আলাদা। তাই সে শোভানকে ছাড়াই নিজেকে নিয়ে বাঁচার আয়োজন করে। একসময় যে শোভানকে একান্তে না পাওয়ার যন্ত্রণায় বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছে, সে আজ কিসমতের অনুপস্থিতিতে  সন্ত্রস্ত হয়। কারণ কিসমতের শাসনাধীন লোকটি, কিসমতের অবর্তমানে তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করবে। আর যে স্বামীকে সে আজ মন-প্রান দিয়ে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে যেকোনো সম্পর্কে যাওয়া তার পক্ষে চরম  বেদনাদায়ক ও অপমানকর। অথচ কলমা পড়ে বিয়ে করা স্বামীর কাছে সে অনিচ্ছা সত্যেও নীরবে ও শান্তভাবে বিছানায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। একজন ঘৃণ্য পুরুষের কাছে এই আত্মসমর্পণে, হামিদা তার দাম্পত্যজীবনে, প্রথম ধর্ষণের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা লাভ করে। কারণ সামাজিক বিধানে স্বামীর কাছে ধর্ষিতা হামিদাদের আর্তনাদশূন্য ও প্রতিরোধহীন হয়ে থাকতে হয়। এক্ষেত্রে অবিরল অশ্রুধারাই তার এই অসহায় নারীজীবনের একমাত্র আশ্রয় হয়ে ওঠে। জীবন থেকে তার হাসি, স্বপ্ন, সাজসজ্জা ও বাঁচার ইচ্ছে হারিয়ে যায়। স্বামীকে একান্ত করে না পাওয়ার ব্যর্থতায় আজ, সে নিজেই শোভানকে সবসময় এক নিরুত্তাপ উপেক্ষা, ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করে এড়িয়ে যায়।

অবশ্য হামিদার এই নিরুত্তাপ উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি শোভানকে আক্রান্ত করে। বিশেষ করে চাষে ক্ষতিগ্রস্ত শোভানের সংকটকালে যখন অভিমানী হামিদা দূরে সরে থাকে। কারণ যে স্বামী, তার জীবনে সঙ্গসুখ দিতে পারে না, সে ও সেই স্বামীর দুঃখের সঙ্গী হতে চায় না। অথচ দিনের পর দিন শোভান হামিদাকে স্ত্রীর ভালবাসা ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করলেও, তার কঠিন সময়ে হামিদার এই দূরে সরে থাকায়, পৌরুষে আঘাত পায়। তাই বাহ্যিক আচরণে হামিদাকে অবহেলা করলেও মনে মনে হামিদার প্রতি যে অনুভূতি বহন করে শোভান, এই আঘাতে হামিদার প্রতি তার সেই অনুভূতিও কমে আসে। সেও মনে মনে হামিদাকে অবহেলা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই কিসমতের অবর্তমানেও

শোভান আর হামিদার কাছে আসে না। এই দুজনের পরস্পরের প্রতি অনাগ্রহে কিসমত যেমন অবাক হয়, তেমনি আবার স্বস্তিও পায়। কম বয়সী, সুন্দরী হামিদা যত বেশি স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকে, ততই সে কিসমতের নৈকট্য ও যত্ন পায়। কিসমত তাকে অকারণে খাটিয়ে মারে না, ইচ্ছেমত প্রতিবেশীদের সঙ্গে সে গল্প করতে পারে। তাছাড়া শোভানের প্রতি তার সমস্ত আগ্রহ ও চাওয়া-পাওয়া হারিয়ে যাওয়ায়, কিসমত তার নামে মিথ্যে অপবাদে শোভানের মন বিষিয়ে তুললেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। বরং কিসমতের তাকে নিয়ে এই দুশ্চিন্তা ও শোভানকে তার কাছ থেকে দূরে রাখার নিরর্থক চেষ্টা দেখে হামিদার হাসি পায়। এমনিতেই এই কাপুরুষ ঘৃণ্য লোকটির প্রতি তার কোন লোভ নেই। বরং শোভানের সান্নিধ্যে তার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়।

সাধারণত দরিদ্র মুসলিম পরিবারে নতুনবউ ঘরে এনে, পুরনো বউদের চরম অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখে পুরুষসমাজ। কিন্তু হামিদার ক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা ঘটে। তাছাড়া অন্যান্য নারীর মতো সে সতীনবিদ্বেষী নয়, বরং কিসমতের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে চায়। কিন্তু কিসমত হামিদাকে মেনে না নিয়ে, বারবার অপমানিত ও বঞ্চিত করে, স্বামীকে হামিদার কাছ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে। হামিদা অন্যান্য গ্রামীণ ও অশিক্ষিত বধূর থেকে আলাদা, সে তার প্রাপ্য অধিকার বা সম্মান জোর করে আদায় করাকে অসম্মান ও অপমান মনে করে। অভিমানী হামিদা ধীরে ধীরে জীবনবিমুখ হয়ে ওঠে। তবে জীবনে বেঁচে থাকার ও সাজসজ্জার প্রতি তার আগ্রহ যে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় নি, তার প্রমাণ মেলে আঙ্গুরাভাবির আগমনে। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে আঙ্গুরাভাবি তাকে নতুনসজ্জায় সাজাতে পারতো না। তবে একথাও ঠিক, এই সাজসজ্জা সে শোভানকে দেখাতে চায় না। কারণ আজ সে মন ও শরীর সব কিছু দিয়েই শোভানকে প্রত্যাখ্যান করে, ঘৃণা করে। তার সাজানো শরীরের প্রতি শোভানের লোভার্ত দৃষ্টি পড়ার বিপদ চায় না সে। তাইতো এই সাজসজ্জা নিয়ে তৃষ্ণার্ত শোভানকে জল দিতে সে অস্বস্তিবোধ করে।

প্রকৃতপক্ষে শোভানের সমস্ত প্রয়োজন কিসমত নিজে পূরণ করে, সেখানে হামিদার প্রবেশের কোনো অধিকার নেই। তাই সে এই সাজসজ্জা নিয়ে কিসমতের এক্তিয়ারে প্রবেশ করতে চায় না। কিসমতের হাতে কাদামাটি থাকায় হামিদাকে এই অস্বস্তিকর বিপদের সম্মুখীন

হতে হয়। কারণ কিসমতের তিনবছরের বিবাহিত সম্পর্কের জোরে যে স্বামী তাকে এতো অবজ্ঞা, অবহেলা ও সম্পর্কহীনতার যন্ত্রণা দেয়, সেই স্বামীর প্রতি তার কোনো ভালবাসা, দায়িত্ব, কর্তব্য ও সহানুভূতি থাকতে পারে না। তাই কিসমতের অসুস্থতার সময়ও সে ক্ষুধার্ত শোভানের জন্য কোনো ব্যবস্থা না করে, নিজের মতো থাকে। এক স্ত্রীকে খুশি রাখার জন্য, অন্য স্ত্রীকে সমস্ত অধিকার ও মর্যাদা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে যে ভীরু, কাপুরুষ স্বামী, তার কোনো দায়িত্ব সে নেবে না।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দেখা যায়, স্বামী নিজে দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনে অবহেলা করলেও, স্ত্রীকে অকারণে অবজ্ঞা ও অবহেলা করলেও, স্ত্রীর দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনে কোনোরকম অবহেলা বা স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করার মতো দুঃসাহসিক জেদ সে সহ্য করে না। তাই ক্ষুব্ধ শোভান হামিদাকে, গোরুকে মারার পাচনবাড়ি দিয়ে ক্রমাগত মারতে মারতে ভিটেছাড়া করে। অথচ হামিদা স্বামীর সংসারে প্রায় দুইমাস ধরে চলতে থাকা, শত অবহেলা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও বাবা-মার বাড়ি যেতে চায় নি, শুধুমাত্র মেয়ের সংসার না হওয়ার যন্ত্রণা থেকে বাবামাকে মুক্ত রাখার জন্য এবং তার বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা সকলের কাছে প্রকাশ হওয়ার ভয়ে। এমনকি শোভানের বাড়িতে বেড়াতে আসা বাবা বা ভাইয়ের কাছেও সে তার দুঃখজর্জর জীবনের সব যন্ত্রণা গোপন রাখে। কারণ শোভানকে প্রত্যাখ্যান করার জয়কে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে এবং গাছ, পাখি ও আকাশ দেখে নিজের মতো করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল হামিদা। শেষপর্যন্ত হামিদার এই সামান্য চাওয়াটুকুও পূরণ হয় না। প্রেমহীন, নিষ্ঠুর স্বামীর অমানবিক অত্যাচারে হামিদাকে শেষপর্যন্ত ভিটেছাড়া হতে হয়। মূলত বাংলার দরিদ্র, মুসলিম পরিবারে এইরকম অনেক হামিদার জীবনই সতীনের সংসারে এক যন্ত্রণাময় অনিশ্চয়তার শিকার হয়, যা সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদের লেখনীতে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তিনবছরের বিবাহিত জীবনেও কিসমত শোভানকে সন্তান দিতে না পারার অক্ষমতা ও অসহায়তার জন্যই, স্বামীকে মাঝে মাঝে দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলে। কিন্তু এটা কিসমতের মনের কথা নয়, দ্বিতীয় বিবি হামিদার আগমনে তা প্রমাণিত হয়। মনে মনে ক্ষুব্ধ কিসমত তাই প্রথমে শোভানের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রাখে। যখন বুঝতে পারে, তার অনুগত শোভান, তাকে

দুঃখ দিতে বা নারাজ করতে চায় না, তখন সে কড়া ব্যবস্থাপনা ও শাসনে শোভানকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। হামিদার সঙ্গে নিভৃত যাপনের কোনো সুযোগই সে তাদের দেয় না। কিসমতের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করার অপরাধবোধে ও সংসারে শান্তি বজায় রাখতে শোভান কিসমতের শাসন মেনে, বিয়ের প্রথম রাত থেকেই নতুন বউ হামিদাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে। শুধু তাই নয়, প্রতি পদে পদে কিসমত, হামিদার ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে তাকে অপমান করে, গালমন্দ করে এমনকি তার দিকে লক্ষ্য করে বাটি ছুঁড়ে মারে। এই বিয়ের জন্য সে শোভানকে নয়, বরং অন্যায়ভাবে হামিদার রূপ ও যৌবনকেই দায়ী করে। তার নিশ্ছিদ্র প্রহরার মাঝেও বরোজে স্বামীর বাহুডোরে যখন হামিদাকে দেখে, তখন সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। চরম অস্থিরতায় নিজের যত্নের কুমড়ো গাছকে আঘাতে আঘাতে নষ্ট করে, নিজেকে আঘাত করে এবং শোভানকেও আক্রমণ করে, 'ও মাগীকে বিয়ে করে এনেছ, ওর সনেই থাক। আমি জান দুবো তুমার পায়ে, মরে দেখাব তোমাকে।'[৫৪] এইভাবেই কিসমত শোভানকে ভয় দেখিয়ে, হামিদার কাছ থেকে দূরে রাখে।

প্রকৃতপক্ষে শোভানের দ্বিতীয় বউ হামিদার অধিকার, রূপ, কচিবয়স প্রভৃতিকে কিসমত অস্বীকার করতে পারে না। তাই শোভানের প্রতি আধিপত্য ও সংসারে তার দাপট থাকা সত্ত্বেও মনে মনে অসহায় কিসমত ভীত হয়ে ওঠে। স্বামীকে যেকোনো মূল্যে নিজের কাছে বেঁধে রাখায় সে বদ্ধপরিকর। হামিদার ব্যাপারে তাই সে ক্ষমাহীন, নিষ্ঠুর ও একরোখা। সতীনের ব্যাপারে সে শোভানের কোনো কথায় শুনতে রাজী নয়। প্রতিবেশী সাজেদা যখন হামেদার ন্যায়সঙ্গত অধিকারের ব্যাপারে কিসমতকে সচেতন করে, পাপ পুণ্যের হিসেব করতে বলে, তখন অধিকারসচেতন কিসমত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বলে, 'মোরা মেয়ে মদ্দ ওর হক মানিনি চাচি, দু বিঘে জমির ধান আর বরোজের রুজগার নিয়ে মোদের চলে, মোরা দুখের ভাত সুখ করে খাই। যাদের উতি ধানে পুতি আছে তারা দুটো বউ কি চারটে বউ পালতে পারবে--- মোদের এ ঝামেলা কেন চাচি? মোর হাতের লাগানো গাছ, মোর হাতে হালগরু খায়, মোর উঠুনে মুই ঝ্যাঁটা দিই ন্যাতা দিই, গোবর কাড়ি ঘুঁটে দিই, মোর চুলো মোর বাতা কাঁথাকানি, পানের ডাবর বাটা জাতি শিলনোড়া, সেখানে ঘরভিটেতে আর একজন এসে কেন ভাগ বসাবে। মুই এসব মেনে নোবনি। মাগীটা উসব জানতো নি? কেন উসব জেনেও

লোকটাকে ভাতার ধরল? মোদের মতো সংসারে একটা মাগ থাকতে থাকতে আর একটা মাগ কে পুষেছে দেখাও দিকি? মরে গেলে না হয় বে করে আনতো!'[৫৫] কিসমতের এই জিজ্ঞাসা এই সমাজের সেই সমস্ত নারীর, যাদের স্বামী সতীন নিয়ে আসে তাদের অমতে। এই জিজ্ঞাসা আধুনিক নারীসমাজের, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে। গর্ভে সন্তান না আসায়, কিসমতের কোনো অপরাধ নেই। অথচ তার সযত্নে গড়ে তোলা সংসারে হামিদা আসে সতীন হয়ে, তা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সংসারের খরচ বাঁচাতে যে নারী কেরোসিন বাঁচিয়ে অন্ধকারে থাকে, ক্ষুধার্ত স্বামী না জেনে হাড়ির সব ভাত খেয়ে নিলে, নিজে না খেয়ে থাকে, সেই স্বামী ও সংসারের ভাগ সে কিছুতেই দেবে না। কিন্তু কিসমত নিজের এই মনোভাব গোপন রেখেই সামাজিক হওয়ার চেষ্টা করে। সমাজের সহানুভূতি পেতে সে এক বিশেষ রণনীতিকে আশ্রয় করে। তাই হামিদার মান ভাঙ্গিয়ে খাওয়ানোর প্রতি আন্তরিক হয়, হামিদার বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করে।

তবে একথা সত্য, শোভানের প্রতি তার ভালবাসা অত্যন্ত গভীর। তাই সে মাতাল শোভানের অসহায়তায় কষ্ট পায়। শোভানের সঙ্গে তিন বছরের সুধাসিক্ত জীবনযাপনই তার এই কষ্টের কারণ। মাতাল অবস্থায় শোভান যখন তাকে উপেক্ষা দেখিয়ে, প্রেমার্ত স্বরে 'নতুন বউ' কে কাছে পাওয়ার আকুলতা জানায়, তখন কিসমতের লোকটাকে বিশ্বাসঘাতক, নারীখাদক ও বেইমান বলে মনে হয়। হামিদার প্রতি শোভানের অবদমিত আকর্ষণ বুঝতে পেরে, শোভানকে তার মিথ্যুক, আততায়ী ও নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। সে শোভানের দ্বিতীয় বিয়ের কোন ভালো দিক খুঁজে পায় না। কিন্তু সে একথাও মনে করে যে, রাতের সমস্ত কালিমা মুছে গেলে, শোভান আবার তাকেই চায়বে। অন্যদিকে হামিদা যখন বারবার শোভানের সান্নিধ্য লাভের সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করে, কিসমতকে জায়গা ছেড়ে দিতে চায়, তখন আবার হামিদার এই আপস ও দয়ায় কিসমত অপমানিত বোধ করে। তাই সে দয়া নয়, জোর করে হামিদাকে লাথি মেরে সরিয়ে নিজের জায়গা দখল করে নেয়। পরদিন আবার নিজের অন্যায় আচরণের জন্য হামিদার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাও করে।

মা-বাবা ও ভাই-ভাবির প্রতি কিসমতের একটি সহজাত আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়। নিঃসন্তান হওয়ার জন্যই হয়তো তার এই অটুট আন্তরিকতা। তাই ভাই-বউ এর জিনে ধরার

খবরে সে ছুটে যায় ভায়ের বাড়ি। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গেও ভালো ব্যবহার করে। কেবলমাত্র হামিদার প্রতিই সে নিষ্ঠুর ও অমানবিক। হামিদাকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। স্বামীর কাছ থেকে হামিদাকে দূরে রাখার সমস্ত ব্যবস্থাপনায় সে নিখুঁত। কখনো শোভানকে কথার ফাঁদে আটকে রাখে, কখনো হামিদাকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখে, আবার কখনো তাদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টিও রাখে। আবার নানা রকম মিথ্যে অপবাদে, শোভানের মনকে হামিদার প্রতি বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করে। শোভানের সমস্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন সে নিজের এক্তিয়ারে রাখে, সেখানে হামিদার কোনো অধিকার নেই। শোভানের হামিদার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেও কিসমত, শোভানকে হামিদার কাছে যেতে নিষেধ করে। এক্ষেত্রে সে তার স্বামীর অসহায়তার সঙ্গী হতে পারে না। কারণ শোভানের এই অসহায়তার জন্য কিসমত নিজেই দায়ী। তবে সে কিন্তু আবার সহানুভূতিশীল মন নিয়ে চাষের ক্ষতিতে বেদনাহত শোভানের মানসিক সংকটের সঙ্গী হয় একজন প্রকৃত সহধর্মিণীর মতোই। এই সহানুভূতির জায়গা থেকে সে শোভানের আরও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, দাম্পত্যের পরিতৃপ্তিতে স্বামীকে মুগ্ধ করে। এমনকি সংসারের সমস্ত কাজে সে শোভানের দোসর হয়ে, অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এতো কিছুর মধ্যেও কিসমতের জীবনে এক অসহায়তা তৈরি হয়। হামিদার কাছে শোভানকে হারানোর ভয় তাকে সবসময় তাড়া করে। তাই হামিদা শোভানের কাছ থেকে যত দূরে থাকে, ততই কিসমত স্বস্তি পায়, সে ততই হামিদাকে ভালো ব্যবহার দেয়। যদিও বুকের ভেতরে দুঃখ ও বিষ লুকিয়ে, কিসমত সবসময় মুখে হাসি রেখে চাতুর্যের সঙ্গে শোভানের কাছ থেকে হামিদাকে দূরে রাখার পরিকল্পনা করে, যেন কিছুতেই তার স্বামী সতীনের পক্ষে না যায়। কারণ তার 'এটা মনে থাকে, স্বামী হিসেবে শোভান শুধু তার নয়, তাদের। সেই সব মুহূর্তে এই সব যন্ত্রণা কম বেদনাদায়ক নয়। অস্তিত্বের সমস্ত অনুভূতি নড়ে ওঠে, নড়ে ওঠে সংসারের সযত্ন স্পর্শমাখা হাড়ি পাতিল তৈজস চুলো চাকি ঘরের ভিত পর্যন্ত। তার কখনও মনে হয় না, শোভানকে হারিয়ে ফেলে সে। চলে যেতে দেবে সে হামিদার কাছে? শোভানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ কথা কখনও তার মাথায় ঠাঁই পায় না। ঠাঁই দেবার সাহস নেই তার।'[৫৬] এমনকি চরম জ্বরবিকারের মধ্যেও শোভানকে হারানোর ভয়ে সে অস্থির হয়ে পড়ে। তার এই আকুলতাকে অস্বীকার করে শোভান এক মুহূর্তের জন্যও হামিদার কাছে আসার

অবকাশ পায় না। এই সময় শোভানের আন্তরিক সেবা ও আশ্বাসে তৃপ্ত কিসমত কৃতজ্ঞতায় অশ্রুপাত করে। শেষপর্যন্ত কিসমত বুদ্ধিবলে, দাপট দেখিয়ে হামিদাকে ভিটেছাড়া করতে সমর্থ হয়। সংসারে তার রণনীতির জয় হয়। এক্ষেত্রে সে একজন আধুনিক নারীর মতোই, একভাবে সমাজ ও ধর্মের বিরোধিতা করে নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্য। অন্যদিকে সে আবার হামিদাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অন্যায় করে, হামিদার জীবনের সমস্ত আনন্দ, স্বপ্ন ও নিরাপত্তাকে নষ্ট করে। আবার সে স্বামী শোভানের ভাবনাচিন্তার জগতকে স্পর্শ করেও নিজেই তার অসহায়তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই আপাত জয়ের মধ্যেও সন্তান ধারণে অক্ষম কিসমতকে, সতীনের কাছে প্রেমিকস্বামীকে হারিয়ে ফেলার ভয় সারা জীবনই তাড়া করে যাবে, এই সমাজসত্যই আফসার আমেদ দ্বিতীয় বিবি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন বাস্তবোচিত দক্ষতার সঙ্গে।

'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসের সাজেদা বিবি এই সমাজেরই একজন প্রতিনিধি। তবে সাধারণত দেখা যায়, প্রতিবেশীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যখন যার সঙ্গে কথা বলে, তখন ন্যায় অন্যায়ের পরোয়া না করে সামনে থাকা মানুষটির মন জুগিয়ে কথা বলে। সেদিক থেকে সাজেদা বিবি অন্যান্যদের থেকে আলাদা। সে কিসমতকে, হামিদার প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য দায়ী করে, পাপ পুণ্যের ব্যাপারে সচেতন করে বলে, 'আল্লা যে তোর খাতায় গুনা লিখবে মেয়ে, লিকে করা বিবি, তার কাছে মরদ না গেলেই আল্লা গুনা লিখবে। লিকে করে এনেছে, ওরও তোর মতন হক হয়ে গেল।'[৫৭] প্রতিবেশীর দায়বদ্ধতা থেকেই সে শোভানের কথায় কিসমতকে নানাদিক থেকে বোঝায়, হামিদার ক্ষতি হলে তাদের হাতকড়া পড়ে জেলে যেতে হবে বলে সাবধান করে। স্বামীর বিয়ে করা সতীনের সঙ্গে মানিয়ে চলার পরামর্শ দেয়। এমনকি বিনা দোষে হামিদাকে ঘর থেকে তাড়ানোর মতো অন্যায়েরও সে অসংকোচে প্রতিবাদ করে, 'ও বউ, তুই কিন্তু অন্যায় বলচিস। নিজের স্বামী ধরে রাখতে পারলি না—এখন বলছিস সোয়ামীর বিয়ে করা নতুন বউকে ঝ্যাঁটা মেরে তাড়াবি? লাফ কেটে কেন গেল মিনসেটা, বিয়ে করতে? তখন তুই কী করছিলি? এখন তাকে মেরে তাড়াবি কেন?'[৫৮] এইভাবে সাজেদা বিবি একদিকে যেমন প্রতিবেশীর দায়িত্ব পালন করে, অন্যদিকে মুসলিম সমাজের একজন মানুষ

রূপে ধর্মীয় বিধান ও পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে। সর্বোপরি কিসমতের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে একজন সামাজিক মানুষরূপে সাজেদা বিবি বিশিষ্টতা লাভ করে।

আঙ্গুরা ভাবীর জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে লেখক এই সমাজের পারিবারিক বিবাদের পাশাপাশি তাদের সম্প্রীতির বাস্তবচিত্রকে উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। বউদির সঙ্গে দেওরের মধুর সম্পর্ক জমি জায়গাকে কেন্দ্র করে যখন তিক্ত ও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠার বাস্তবতাকে লেখক এখানে প্রকাশ করেন। শোভানের মায়ের আঙ্গুরা ভাবির হাতের খাবার শোভানকে খেতে নিষেধ করার মধ্যেও এই বাস্তবতা বিদ্যমান। কারণ এই সমাজে জমিকে কেন্দ্র করে জ্ঞ্যাতিদের লড়াই, ঝগড়া ও অমানবিক ষড়যন্ত্রের নানান ইতিহাস আজও লক্ষ্য করা যায়। তাই এতোদিনের মমতাময়ী ভাবীও, বিবাদের রেষারেষিতে শোভানের খাবারে বিষ মেশাতে পারে, শোভানের মায়ের এই আশংকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার গ্রামের এই সহজ, সরল, অশিক্ষিত মানুষ খুব সহজেই সব বিবাদ ভুলে, বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এক হয়ে যায়। তাই শোভানের বিয়ের সময় আঙ্গুরা ভাবী সমস্ত বিবাদ ভুলে যায়। শোভানের শুভাকাঙ্ক্ষী আঙ্গুরা ভাবীও, শোভানকে সন্তানসুখে সুখী দেখতে চায়। তাই হামিদাকে নিজের হাতে সাজায়, শোভানের প্রতি হামিদার ভালবাসা অনুকূল করার চেষ্টা করে। হামিদাকে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত্ন করে, স্বামীর প্রতি জোর খাটানোর পরামর্শ দেয়, একজন পরমাত্মীয়ের মতো। শোভানের সংসারে শান্তি ও পরিপূর্ণতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তার এই প্রচেষ্টা সাজেদা বিবির পরিপূরক হয়ে ওঠে। এদের একজন হামিদাকে, অন্যজন কিসমতকে সুপরামর্শ দানে প্রকৃত আত্মীয়তার পরিচয় তুলে ধরে।

মূলত সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ 'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসে কিসমত ও হামিদার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ, অশিক্ষিত, দরিদ্র সমাজের নারীর জীবনসংকটের এক অতিপরিচিত বাস্তব চিত্র বর্ণনা করেছেন। দুজনেই অধিকারসচেতন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও প্রতিবাদী নারী হয়েও, পরিস্থিতি ও অবস্থার বিপাকে তারা এক যন্ত্রণাময় জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে। ধর্মীয় বিধানে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ স্বীকৃত হলেও, পারিবারিক জীবনে তা অনেকসময় তিনজন নরনারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ঘাতপ্রতিঘাত, চরম মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রেমিকস্বামীকে সম্পূর্ণ ভাবে না পাওয়ার যন্ত্রণা, দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তাহীনতা তথা অধিকারের নানান প্রশ্নে

জীবনগুলো বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। মান-অভিমান, প্রেম-অপ্রেম, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অমানবিক নিষ্ঠুরতায় অভিমানী, মুখচোরা, শান্তিপ্রিয়, সুন্দর মনের হামিদারা ধীরে ধীরে জীবনের সহজাত হাসি, স্বপ্ন ও বেঁচে থাকার আনন্দ হারাতে থাকে। নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে, তারা একসময় জীবনবিমুখ হয়ে যায়। তাছাড়া ধর্মীয় বিধানে হামিদাদের মতো বিধবার পুনর্বিবাহের সুযোগ থাকলেও, সমাজে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের প্রয়োজনরূপে সংসারে আসে, প্রেমিকা রূপে নয়। কখনো বহুগামী পুরুষের লালসার প্রয়োজনে, কখনো বিপত্নীক পুরুষের সন্তানদের প্রয়োজনে আবার কখনো শোভানের মতো পুরুষের সন্তানের কামনায়। ফলে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, তারা অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়, কখনো বা সতীনের অত্যাচারে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়, অনুভূতিপ্রবণ কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ নারীজীবনের এই সংকটকে নিপুণতার সঙ্গে 'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন।

### ৩) বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা

লেখকের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসেও বহুবিবাহ প্রসঙ্গ এসেছে। কানা বেগুনওয়ালার দ্বিতীয় স্ত্রী জাহানের আশ্রয় হয় বেগুনবাগানে। কারণ বাড়িতে থাকে কানা বেগুনওয়ালার প্রথম স্ত্রী। দুজন স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এড়ানোর জন্যই কানা বেগুনওয়ালা, নতুন বিবি জাহানকে বেগুনবাগানে ঘর তুলে দেয়। এখানে জাহান তার আইনসিদ্ধ স্বামীর কাছে নীরবে ধর্ষিত হয়। সে একরকম জাহানকে বন্দিনী করে রাখে। আবার আজমত মৌলবি জাহানকে পাওয়ার আশায়, এই বেগুনবাগানেই কানা বেগুনওয়ালার সাজে এসে তাকে প্রেম নিবেদন করে। পাশাপাশি জাহানকে সে কুমন্ত্রণা দেয় কানা বেগুনয়ালার সঙ্গে খারাপ আচরণ করার। যেন কানা বেগুনওয়ালা জাহানের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তালাক দিয়ে দেয়। ফলস্বরূপ মৌলবির পক্ষেও জাহানকে দ্বিতীয় বিবি রূপে পাওয়া সম্ভব হয়। একাধিক বিবি পেতে উৎসাহী আজমত যখন তার 'আধবুড়ি, বহু ব্যবহারে পুরনো ঘুমন্ত বউয়ের দিকে' তাকায়, তখন তার নিজের জন্য খুব দুঃখ হয়। কারণ তার আশেপাশের সমস্ত মৌলবি ও ইমামের বিবির সংখ্যা একাধিক। কিন্তু বহুবিবাহের একান্ত ইচ্ছে মনের মধ্যে লালন

করেও, বিবির সতর্কতার জন্য মাঝবয়সী ইমাম আজমত শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহে সফল হতে পারে না। মূলত ইমামের বিবি, কামার্ত স্বামীর প্রহরায় সারাক্ষণ অতিষ্ঠ হয়ে থাকে, বিঘ্নিত হয় তার স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ আজমতের মত ইমামের মধ্য দিয়ে, বহুবিবাহে আসক্ত মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

## ৪) এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা

আফসার আমেদের 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'শারদীয় আজকের সংবাদ দর্পণ' পত্রিকায় ১৯৯৭ সালে, 'বশীকরণ কিস্‌সা' নামে। পরের বছর ১৯৯৮ সালে এটি 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে বহুবিবাহে জর্জরিত মুসলিম নারীর জীবনের নানান টানাপোড়েনের পাশাপাশি, এই সমাজের একজন অকালবিধবার জীবনতৃষ্ণা ও তার কাঙ্ক্ষিত পুনর্বিবাহের এক সুস্পষ্ট রূপরেখা লেখক সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই সমাজের দরিদ্র, পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত ও অসহায় মানুষ আধুনিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে, যেকোন সংকট ও অসুখ-বিসুখের জন্য, মুসিবত ও মুশকিল আসানের জন্য অন্ধভাবে ধর্মাশ্রয়ী ভণ্ড, নারীলোলুপ মালু খাঁ মৌলবির মতো কামেল লোককে বিশ্বাস করে। আর চতুর, কেরামতিওয়ালা মালু খাঁর মতো মানুষেরা, ধর্মের আশ্রয়ে এই সহজ, সরল মানুষের অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে, মোটা টাকা উপার্জন করে, নিজের লালসা পূরণের জন্য একের পর এক নারীকে বিবাহ করে, তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে। ইসলামধর্মের সুন্নত পালনের নামে সে চার নম্বর বিবির কথা বলে, তাই তার অন্যান্য স্ত্রীদের এই ব্যাপারে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার থাকে না। কারণ 'তাদের স্বামী শরিয়ত মোতাবেকেই আর একটা বিয়ে খায়েশ করেছে, তাতে ধর্মবিরুদ্ধ কোনো কিছু নেই। তাতে স্বামী দুশ্চরিত্র, অসৎ হয়ে উঠবে না। বরং খাঁটি মুসলমান হয়ে উঠবে। চারটি বিয়ে সুন্নত। তবুও বিবিরা হৃদয়ে ব্যথা পাবে। প্রথম বিয়ের পর দ্বিতীয় বিবি আনার সময় ব্যথা পেয়েছিল প্রথম বিবি। তৃতীয় বিবি আনার সময় প্রথম বিবিও দুঃখ পেয়েছিল, দ্বিতীয় বিবি দুঃখ পেয়েছিল আরও অনেক বেশি। এখন বেশি দুঃখ পাবে বদরুননেশা, ওরফে খাঁদি।'[৫৯]

কারণ মালুর তৃতীয় স্ত্রী বদরুননেশা দেখেছে, তাকে বিয়ে করার পর, তার আগের দুই সতীনের প্রতি স্বামীর নিরলস উপেক্ষা ও অবহেলা। চারনম্বর বিবি ঘরে এলে, অন্য দুই সতীনের মতো সেও আমরণ স্বামীর অবহেলা ও উপেক্ষা পাবে, এই সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহ নেই। তখন নতুন বউয়ের প্রতিই মালুর সমস্ত আকর্ষণ ও খাতির থাকবে, একথা খাঁদি তার অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছে। চারটি বিয়ে করে মালুর মতো পুরুষেরা ইসলাম ধর্মের সুন্নত পালন করলেও, প্রত্যেক স্ত্রীকে সমান সম্মান, ভালোবাসা, অধিকার দেওয়ার সুন্নত কেউই মেনে চলে না। মালুর এই অন্যায়, আমানবিক কাজের জন্য তারা কোনো প্রতিবাদ বা প্রশ্ন করতে পারে না। তাদের এই অধিকারের প্রশ্নে সমাজ বা ধর্ম নীরব ভূমিকা পালন করে। তাই সব কিছু জেনেও তারা মালুর চতুর্থ বিবির সাধ পূরণে বাধা দিতে পারে না, কারণ মালুর এই সাধ সমাজ বা ধর্মবিরোধী নয়। মালুকে সন্দেহ করে, ভাঁড়নাচের ছোকরার কাটা আঁচলের টুকরো বাড়িতে খোঁজার মতো দুঃসাহস দেখায় মালুর তিনবিবি। কারণ একজন পুরুষের প্রতি অন্য পুরুষের আকর্ষণ একেবারেই সমাজ ও ধর্মবিরোধী। মালুর বীরুদ্ধে গিয়ে, তার অবর্তমানে তিনবিবির আঁচলের টুকরো খোঁজার দুঃসাহসিক অভিযানে, চতুর মালু, 'বুঝতে পারল, ছোকরাতে তাদের আপত্তি, ধর্মবিরুদ্ধ বলে তাদের এই আপত্তি। না হলে এই তিন বিবি তো তার কাছে কেঁচো। প্রথম বিবি আবিদা তেইশ বছর, দ্বিতীয় বিবি জোহরা চোদ্দো বছর, আর তৃতীয় বিবি বদরুন সাত বছর তার সংসারে টুঁ শব্দ না করে আছে। শান্ত, অনুগত হয়েই আছে, কোনোরকম কেউ বিদ্রোহ করেনি, বিদ্রোহের কোনো বীজও উপ্ত হয়নি। তার একটা বড় কারণ কেরামতিওয়ালা লোকের স্ত্রী তারা, কথামত না চললে কুকুর বেড়াল বানিয়ে রাখা লোকটার পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়। বরং তারা ধর্ম মানত। একটার পর আর একটা বিয়ে করেছে যখন, তখন ধর্মের কথা মেনে নীরব থেকেছে। এখন বোধহয় ছোকরার আঁচলের টুকরো এসবের মধ্যে অনাচার-অধর্ম দেখে বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে।'[৬০] বিদ্রোহী বিবিদের জব্দ করতেই মালু চতুর্থ বিবির খায়েশ প্রকাশ করে বদরুনের কাছে।

লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে তিনবিবির এই সক্রিয়তা ও বিদ্রোহ, মালুর চতুর্থ বিবি ঘরে নিয়ে আসার ঘোষণায় অঙ্কুরেই নষ্ট হয়। এইভাবে কখনো মালুর কেরামতির ভয়ে, আবার কখনো ধর্মের বিধানে তারা স্বামীর আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য থাকে। স্বামীর চতুর্থ বিয়ের সাধের

কথায় আবেদা, জোহরা ও বদরুনের জীবনের কান্না একই সূত্রে গাঁথা পড়ে। তাদের জীবনের যন্ত্রণা, বঞ্চনা ও সংকট একই রকম, তাই বাটিতে ধরা তিনবিবির অশ্রুজলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। স্বামীর অবহেলা ও উপেক্ষা মেনে নিয়েই পরস্পরের সান্নিধ্যে তারা বাঁচে। জীবনের প্রয়োজনে, সন্তানদের প্রয়োজনে এবং মালুর কেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরির জন্য তারা বাঁচে। অনেকসময় কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে, জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে তারা সমবেত হাসিতে ভরে ওঠে। যদিও তাদের এই ক্ষণিকের হাসিতেও মালুর আপত্তি পরিলক্ষিত হয়। তবুও আবেদা, জোহরা ও বদরুন জীবনে একইরকম বঞ্চনার জ্বালায়, পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতিশীল সঙ্গী রূপে বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন খুঁজে নেয় নিজেদের সান্নিধ্যে, কাজের নিবিড়তায়।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, মালু খাঁ মৌলবি তাবিজ, তদ্বির ও কেরামতির মধ্য দিয়ে পাঁচগ্রামের মানুষকে নানাভাবে সুস্থ করে তোলে, বিভিন্ন সংকট থেকে তাদের রক্ষা করে। ধর্মের আশ্রয়ে তার এই কাজের সুখ্যাতি, মালুকে শুধুমাত্র ধর্মনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা নয়, আর্থিক দিক থেকেও স্বচ্ছল করে। সাধারণভাবে দেখা যায়, মুসলিম সমাজের কোনো কোনো কামার্ত ব্যক্তি, উপার্জন বৃদ্ধির দরুন একাধিক বিবাহ করে থাকে, ধর্মের সুন্নত পালনের নামে। ধর্মভীরু, কামেল মালু খাঁ মৌলবিও এই ধরণেরই একজন নারীলোলুপ, কামার্ত ব্যক্তি। তাই কোনো অসহায় বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত নারীকে আশ্রয় দেওয়ার মতো মানবিকতার জন্য নয়, সে ধর্মের আশ্রয়ে এইসব অসহায় নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, নিজের কামনা চরিতার্থের জন্যই শধুমাত্র একাধিক নারীকে বিবাহ করে। মূলত জনমানসে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত ধারণা, সংস্কার, কুসংস্কার, আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক ভীতিকে কাজে লাগিয়ে সে তার স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে। এক্ষেত্রে মালু নিখুঁত কেরামতি, কৌশল ও চাতুরীতে নিজের কৃত সমস্ত অন্যায়, অপকর্ম, ভণ্ডামি, জুয়াচুরি ও নারীলোলুপ মানসিকতাকে জনসাধারণের চোখে গোপন রাখতে সমর্থ হয়। বরং দিনের পর দিন তার কাজের খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, পসার ও উপার্জন বেড়েই চলে। তিনবিবি ও তাদের অনেকগুলো সন্তানের ভরণপোষণের পরেও মালুর হাতে যেমন উত্তরোত্তর টাকা জমতে থাকে, তেমনি চার নম্বর বিবি না পাওয়ার যন্ত্রণায়, তার কাতরতা, বিষণ্ণতা ও অস্থিরতাও বাড়তে থাকে। তাই চতুর্থ নারীকে পাওয়ার কামনায় অস্থির মালু, অন্যান্য বিবিদের

যেভাবে বশ করে, সেই একই পদ্ধতিতে তার কাছে সংকটমুক্তির জন্য আসা অসহায় বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীর মাঝে, তার কাঙ্ক্ষিত নিখুঁত, সুন্দরী, যুবতি স্ত্রীর সন্ধান করে চলে নিরলসভাবেই। তবে রাতের অন্ধকারে 'খাঁদি' বদরুনকে ভালো করে পরীক্ষা না করে নির্বাচন করার দুঃখ মালুকে তাড়িত করে মাঝে মাঝেই। এই সূত্রেই গরিবউল্লার বিধবা যুবতি কন্যা, সুন্দরী রওশনেশা, কৌশলী মালুর চতুর্থ বিবি হওয়ার সম্ভাবনায় যেতে বাধ্য হয়।

প্রকৃতপক্ষে নিজের পুনর্বিবাহের ইচ্ছে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওশনেশা বাবার প্রচারের বিরুদ্ধে গিয়ে, তারিকের জন্য দেওয়া যুবতিলাইনে দাঁড়াতে একরকম বাধ্য হয়। তাতে তার কৃপণ বাবা গরিবউল্লা বিপদে পড়ে। সে বিধবা মেয়ের 'খায়েশ' কম করার ওষুধ এর ব্যবস্থা করার জন্য যখন মালুর শরণাপন্ন হয় তখনই নিখুঁত সুন্দরী বিবির সুযোগসন্ধানী মালু, রওশনেশার সৌন্দর্যের সম্যক পরিচয় লাভ করে এবং তাকে হস্তগত করার ফন্দি করে। এক্ষেত্রে কৌশলী মালু ধর্মের আশ্রয়ে নিজের অভিলাষ চরিতার্থের জন্য রওশনেশার সাক্ষাৎ কামনা করে। ধর্মের আলোচনার নামে, মালুর আগমনের কথায়, রওশনেশা দুটো ফলাফলের দিক থেকে নিজেকে প্রস্তুত করে। প্রথমত বাবার প্রত্যাশা অনুযায়ী তার বিবাহের কামনা কমে গেলেও তার মঙ্গল। কারণ এই কামনাবাসনায় জর্জরিত হয়ে তাকে আর নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রাত্রি, মর্মান্তিক কষ্টে যাপন করতে হবে না।

অন্যদিকে তার মতো সুন্দরী বিধবা যুবতি যখন বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, তখন তার পক্ষে নারীলোলুপ মালু খাঁ মৌলবির বশ হওয়া ছাড়াও আর কোনো উপায় থাকে না। তাই সে এই সমাজেরই একজন অতিসাধারণ, অসহায় নারীরূপে মালুর ফাঁদে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় এবং নিজে মালুর সমস্ত কৌশল জেনে বুঝেও 'আনুগত্যের এক লজ্জা ও ছেনালি দেখিয়ে গেছে।'[৬১] তবে এই আত্মসমর্পণের বাধ্যতায় রওশনেশা, সুন্দর ও অবিবাহিত যুবক তারিককে প্রত্যাখ্যান করার যন্ত্রণায় মনে মনে তাড়িত হতে থাকে। তবু সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মের ধ্বজাধারী, টাকওয়ালা, আধবুড়ো, তেজবরে মালুর প্রতি কোনো অসহযোগিতা বা বিরুদ্ধতা না দেখিয়ে 'শেষ পর্যন্ত সে যে তার কাছে বশ হয়েছে, সেটা পর্যন্ত ধীর স্থির নম্র শান্ত হয়ে বুঝিয়েছে। কিন্তু সে রওশনেশা যতীযুবতি, খানিকটা সময়ের জন্য এ কথা ভাববে না কেন, যে

মৌলবি লোভী, নারীখাদক, শয়তান দুশ্চরিত্র, শঠ কপট, রূপজ লোভের শিকার হয়েছে মৌলবির। ভাবলে তার কোনো দোষ হবে না।'[৬২]

রওশনেশার ধর্মীয় জ্ঞান যে যথেষ্ট গভীর, মালু খাঁর সঙ্গে ধর্মীর আলোচনায় তা পরিস্ফুট। পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষার অভাবে, পুরুষসমাজ নিজের স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে নানাভাবে নারীকে শোষণ করে। তার মধ্যে আবার মালু খাঁর মতো চতুর ও ভণ্ড পুরুষেরা ধর্মের আশ্রয়ে নানা কৌশলে সহজ, সরল মানুষকে ঠকিয়ে নিজের লালসা চরিতার্থ করে। রওশনেশার বাবা থেকে শুরু করে পাঁচগ্রামের জনসমাজের কাছে মালুর সমস্ত অন্যায়, ধর্মবিরোধী আচরণ, মিথ্যে ভণ্ডামি ধর্মের প্রলেপে ঢাকা পড়ে। ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান থাকায়, রওশনেশা মালুর ধর্মের ভান ধরে ফেলে। মালু যেহেতু একজন বিধবাকে যৌন উত্তেজক কথা ও সুচতুর বুদ্ধিমত্তায় উত্যক্ত করে অসম্মান করার অন্যায় কাজ ধর্মের আশ্রয়ে করে, তাই সমস্ত জেনেও রওশনেশা জনসমর্থনের পথে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি মালুর হাতের স্পর্শে তার এক ধরণের 'ঠাণ্ডা ঘিনঘিনে অনুভূতি হাতের উপর এসে' পড়লেও, সেই অনুভূতির অসন্তোষ জানানোর ইচ্ছেকেও রওশনেশা নিরুপায়ভাবে দমন করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে রওশনেশার এই আত্মসমর্পণের বাধ্যতায় মালু খাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের সুখ্যাতি জনসমাজে আরও বেশি করে প্রচারিত হয়, পাশাপাশি বাড়ে তার পসার ও আর্থিক স্বচ্ছলতা। শুধুমাত্র রওশনেশাসহ মালুর অন্য তিনবিবি এক নিরানন্দময় জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

উপন্যাসের কাহিনি অংশে দেখা যায়, তারিক যে কোনো পুরুষে আসক্ত নয়, এটা প্রমাণের জন্যই তার বড়লোক বাবা, ছেলের পাত্রী নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে। এইরকম একজন আকর্ষণীয় পাত্রের জন্য যুবতিদের লাইন পড়ার মতো সামাজিক সত্যকে লেখক সচেতনতার সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া যুবতি-লাইনে উপস্থিত নারীসমাজের বর্ণনায়, তাদের একটি বাস্তবসম্মত প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। তাদের সমবেত কান্নার মধ্য দিয়ে, নারীজীবনের বঞ্চনার হাহাকারকে লেখক স্পর্শ করেছেন আর সমবেত হাসির মধ্য দিয়ে, কান্নার মাঝেও তাদের জীবনে বেঁচে থাকার রসদের প্রতি লেখক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। এই উপন্যাসে লেখক নারীর আঁচল কাটার অনুসঙ্গের বাস্তবোচিত ব্যাখ্যা ও মালুর প্রথম স্ত্রী

আবিদার অলৌকিক ভুতে ধরার ব্যাখ্যা দিয়ে, দুর্বল ও অসহায় নারীজীবনের এক অন্ধকার জীবনের প্রতি আলোকপাত করেছেন। সহায়সম্বলহীন, অসহায় বৃদ্ধা মায়মুনার মিষ্টি খাওয়ার লালসা মেটানোর প্রচেষ্টার মধ্যেও লেখক সমাজের এক চরম সত্যকে রূপায়িত করেছেন। আধবুড়ো, কুৎসিত, রাতকাণা রাজ্জাক মিঞার তরুণী স্ত্রীর, অল্পবয়সী ছোঁড়ার প্রতি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নারীজীবন তথা সমাজের আর এক সত্যকে ব্যঞ্জনাময় করে। এইসমস্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক মুসলিম দরিদ্র ও পশ্চাদপদ সমাজের বাস্তবতাকে, এক অভিনব পদ্ধতিতে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কিস্‌সায় প্রকাশ করেছেন।

### ৫) দুই বোন

আফসার আমেদ উপন্যাসের মতো ছোটগল্পেও বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে, মুসলিম নারীর জীবনে উদ্ভূত সংকট ও সমস্যার একটা শিল্পসম্মত রূপ তুলে ধরেন। তাঁর ‘দুই বোন’ ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় ‘আজকাল পত্রিকায় ১৯৯৪ সালে। পরবর্তীতে এটি লেখকের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলিম সমাজের এমন অনেক পুরুষ আছেন, যারা ইসলাম ধর্মের মুল আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ না করে, শুধুমাত্র বাহ্যিক পোশাক ও টুপিতে মুশল্লি সাজে, শুধুমাত্র নিজের স্বার্থপূরণ ও সমাজে মান্যতা লাভের জন্য। লেখকের ‘সঙ্গ’ ছোটগল্পের মতিনের মতো ‘দুই বোন’ ছোটগল্পের ইয়ারু কেতাব কোরান পড়ে মুসল্লি হয়ে উঠলেও, স্বার্থপূরণের জায়গা থেকে তারা দুজনেই ইসলামের মূল আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট। তাই ইয়ারু একজন মুসল্লি হয়েও, স্ত্রীকে অবহেলা করে, নিজের রূপজ মোহকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর অল্পবয়সী বোনকে বিয়ে করার পরিকল্পনা ফাঁদে। ইয়ারুর স্ত্রী তহমিনা নিজের সংসারে একজন দাসীর থেকেও নিম্নমানের জীবনযাপনে বাধ্য থাকে। সারাক্ষণ স্বামীর সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠতার দাপটে ভয়গ্রস্ত তহমিনা সংসারে নিজস্বতা হারিয়ে, একজন প্রাণহীন পুতুলের মতো পড়ে থাকে। তাই তার থেকে পঁচিশ বছরের ছোট বোন আর্জিনাকে, ইয়ারুর বিয়ে করার অর্থাৎ তার সতীন করার অন্যায় প্রস্তাবের, সে কোনো প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত পায় না। তাছাড়া সম্পদশালী ইয়ারুর সামাজিক ও ধর্মনৈতিক প্রতিষ্ঠায় মুগ্ধ তহমিনার বাবাও এই অন্যায় প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। এক্ষেত্রে তহমিনার গরিব বাবা, এক

মেয়ের বিয়ের খরচ বাঁচানোর পাশাপাশি, আর এক মেয়ের জীবনের নিরাপত্তার কথায় স্বস্তি পায় যে, নিজের বোন সতীন হয়ে এলে, তহমিনার জীবন তথা সংসারে তুলনামূলকভাবে শান্তি বজায় থাকবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইসলাম ধর্মে কোনো একজন পুরুষ দুই বোনকে কখনই একসঙ্গে বিয়ে করতে পারে না। এই বিষয়টি কুরআন শরীফে সুরা নিসার(সুরা নম্বর ৪) ২৩ এবং ২৪ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। কিন্তু যদি এক বোনের মৃত্যু হয় বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তবেই অন্য বোনকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার বিধান দেয় ইসলাম। অথচ লেখক আলোচ্য গল্পের মতো তাঁর 'হিরে ও ভিখারিনী সুন্দরী রমণী কিস্‌সা' উপন্যাসেও একই পুরুষের, একইসঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করার প্রসঙ্গ এনেছেন। যদিও এই গল্পের মতো উক্ত উপন্যাসেও দুই বোনকে একই সঙ্গে বিয়ে করার পরিকল্পনাটি শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নি। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ছোটবোনকে বিয়ে করার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

ইয়ারুর আকস্মিক মানসিক বিপর্যয় ঘটায়, বোনকে সতীন করার মানসিক যন্ত্রণা থেকে তহমিনা সাময়িকভাবে রক্ষা পায়। উপরন্তু, এর ফলে সে নিজের হারিয়ে যাওয়া সমস্ত সুখ, স্বপ্ন, সাধ ফিরে পায়। স্বামীর মানসিক বিপর্যয়ের ফলে, প্রতি মুহূর্তের দাসত্বের হাত থেকেও সে মুক্তি লাভ করে। চার বিঘের আলুক্ষেতের সমস্ত ফসল নষ্ট হওয়ার শোকেই ইয়ারু পুরোপুরি পাগল না হলেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পাশাপাশি মুশল্লির সাজ, টুপিও ও পিরান ত্যাগ করে এক অতি সাধারণ 'ল্যাল্যাভোলা' মানুষ হয়ে ওঠে। ইয়ারুর রাশভারী ব্যক্তিত্ব ও চাতুর্য হারিয়ে 'বাড়ির পরিবেশটাই বদলে যায়। তহমিনা হয়ে ওঠে এ বাড়ির কর্ত্রী। তার হাতেই জমিজিরেত, আগান-বাগান, মুনিষ-মজুর, টাকা-পয়সা সব কিছুই। তহমিনার ব্যক্তিত্ব খুলে যায়। প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তহমিনা। খুব জোরে হেসে উঠতে পারে, মুশুল্লিকে ভয় নেই। ইচ্ছেমত আগানে-বাগানে যেতে পারে। পাড়াপড়শির বাড়ি যেতে পারে। নিজের ইচ্ছেমত কেনাকাটা করতে পারে। আহা, কত সাধ গোপন রাখত সে। প্রাণোচ্ছল জীবনের স্রোতে ভাসছে সে। মুশুল্লিকে আর ভয় করে না। বরং উদ্ভট দশা দেখে হিঃ হিঃ করে হাসে, মুশুল্লিকে বকাঝকা করে, দাবড়ানি দেয় বরং। ইচ্ছেমত চুল বাঁধে, শাড়ি পরে। নিজের বাসনাগুলো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।'[৬৩]

লেখক আফসার আমেদ আলোচ্য গল্পে, প্রত্যেক নারীর মধ্যে সুপ্ত প্রতিভাকে দেখিয়েছেন। যে প্রতিভা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শাসনে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। এমনকি এই শাসন ও শোষণে সে জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বাড়ির কর্ত্রী তহমিনা তার এই স্বাধীন ও আনন্দময় জীবনকে আরও বেশি উপভোগ করার জন্যই ছোটবোন আর্জিনাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। যে স্বাধীন জীবনের প্রকৃত আনন্দ সে পাগল স্বামীর কাছে পেয়েছে, তা দুইবোনের সান্নিধ্যে আরও উপভোগ্য করে তুলতে চায়। একসময় এই দুইবোন সমবেতভাবে ইয়ারুর সংসারে এক ভয়ংকর দাসত্ব ও সন্ত্রাসের মধ্যে জীবন কাটিয়েছিল। আজ সেই একই সংসারে নিজস্বতায় বিকশিত তহমিনা, এতদিনের অবদমিত সাধ ও আহ্লাদ পূরণে তৎপর হয়। জীবনে বেঁচে থাকার সমস্ত আনন্দ সে পায় স্বামীর মানসিক বিপর্যয়ে। সুস্থ অবস্থায় ইয়ারুর সংসারে সে জীবনের কোনো অর্থই খুঁজে পায় নি। এই একই প্রেক্ষাপট আমরা লেখকের ‘কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক’ উপন্যাসের রেহানার জীবনেও দেখতে পায়।

অন্যদিকে দুলাভাই ইয়ারুর মানসিক ভারসাম্য হারানোতে সুন্দরী কিশোরী আর্জিনাও এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে অনেকটাই মুক্তি লাভ করে। যদিও সদ্য ঘুম থেকে জাগ্রত আর্জিনা, ইয়ারুকে স্বামী রূপে গ্রহণ করার বাধ্যতায়, কিছুক্ষণের জন্য হলেও সন্ত্রস্ত হয়। কারণ নিজের সমস্ত কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে হত্যা করে, নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে, মুশুল্লি, বড়লোক, মাঝবয়সী জামাইদাকে বিয়ে করে, দিদির সতীন হয়ে উঠার দুঃস্বপ্ন তাকে তাড়িত করে চলে। এক্ষেত্রে তার গরীব বাবাও বিয়ের খরচ বাঁচানোর জন্য ইয়ারুর প্রস্তাবকে সমর্থন করে। তাছাড়া তার বাবা মনে করে, দুই বোনে সতীন হলে, বড় মেয়ে তাহমিনার জীবনেও অশান্তি কম হবে। এই বিবাহে বাধা দেওয়ার সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহমিনার থাকলেও, দিনের পর দিন স্বামীর অন্যায় অত্যাচার ও বঞ্চনায়, সে তার অধিকারবোধ ও প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলে। তাই নিজের থেকে পঁচিশ বছরের ছোট বোন আর্জিনাকে সতীনরূপে মেনে নেওয়া ছাড়া তার অন্য কোন উপায় ছিল না। অত্যাচারী ইয়ারুর হাত থেকে আর্জিনাকে রক্ষা করার চেষ্টা বা সাহস কোনোটাই সে করে উঠতে পারে নি। কিন্তু হঠাৎ

ইয়ারুর মানসিক ভারসাম্যহীনতায়, এই চরম সংকটময় পরিস্থিতি থেকে আর্জিনার মতো তহমিনার জীবনেও ভয়মুক্ত এক সুন্দর হাসি ধরা দেয়।

সাধারণত স্বামীর এই অস্বাভাবিক অবস্থায় একজন স্ত্রী তার জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু তহমিনার জীবনে ঠিক উল্টোটায় দেখা যায়। ইয়ারুর মানসিক বিপর্যয়ে কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হলেও, এইসময় দুই বোন যেন জীবনের প্রকৃত ছন্দ ফিরে পায়। মাঝে মাঝে তারা ইয়ারুকে নিয়ে তামাশাও করে। ‘এতকিছু সত্ত্বেও, লোকটাকে বাগে পেয়েছে, এক প্রতিশোধস্পৃহার মত লাগে তাদের। ভয় নেই, দুর্ভাবনা নেই। এই পেয়েছি। এবারে! কিছুটা দয়া ও করুণা করার মত তাকায়। যেহেতু মানুষ। সে করুনা ওরা বানায় না, এমনি এমনি এসে যায়।’[৬৪] কারণ পুরুষের শত অবমাননা ও অত্যাচারের মাঝেও নারী তার মানবিক গুণাবলী বিস্মৃত হয় না। দুই বোন ইয়ারুর নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে এক আনন্দঘন স্বাধীন জীবনযাপনের তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। তারা জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়। নিজের মত করে বাঁচার আনন্দে তারা অনেকসময় ইয়ারুর অস্তিত্বও ভুলে যায়, ‘এমনকি ইয়ারুর প্রতি তাদের তামাশা ও তুচ্ছতার নগণ্য মজাও তারা হারিয়ে ফেলে। দুজনের এই থাকা যেন জীবনের অন্য মাধুর্য। বাঁচার এ এক গাম্ভীর্যও বটে। বাইরের ধুলোমাখা বাতাস ও মেঘমেদুরতা হয়তো থাকে।’[৬৫] কিন্তু নিজের নিরাপদ অন্দরমহলে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সুবাদে, তারা বাইরের এই ছোটখাটো প্রতিকূলতাকে জয় করার শক্তিও ইতিমধ্যে অর্জন করে ফেলে। লেখক আফসার আমেদ এই ছোটগল্পে নারীজীবনের এই চরম সত্যকেই তুলে ধরেছেন। বাড়ির পুরুষেরা যদি নারীকে সবরকম সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে, তাহলে বাইরের প্রতিকূল পরিবেশকে সে সহজেই জয় করে নিতে পারে। কিন্তু বাঙালি মুসলিম সমাজের নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির পুরুষদের দ্বারাই সবথেকে বেশি অত্যাচারিত ও বঞ্চিত হয়। ক্রমাগত শক্তিপ্রয়োগ ও বঞ্চনা তাকে ভেতর থেকে এতোটাই দুর্বল করে তোলে যে, নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সাহসটুকুও সে হারিয়ে ফেলে। নিজের মত করে বাঁচার অধিকার ও স্বপ্ন হারিয়ে, চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে। আধুনিক শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মুসলিম নারীসমাজ, তার ধর্মীয়, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই, সমাজে তথা পরিবারে

নানাভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হয়। ধর্মের আড়ালে থেকে ইয়ারুর মতো অর্থশালী, নারীলোভী পুরুষেরা বারবার নারীর পাশাপাশি ধর্মকেও অবমাননা করার সুযোগ খুঁজে নেয়।

### ৬) পাগলের জবানবন্দি

শুধুমাত্র নিম্নবিত্ত বা উচ্চবিত্ত মুসলিম সমাজেই নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও চাকরিজীবী মুসলিম সমাজেও কোনো কোনো নরনারী, নিজের স্বার্থে ইসলামধর্ম অনুমোদিত বহুবিবাহের সুযোগ গ্রহণ করে। আফসার আমেদের 'পাগলের জবানবন্দি' ছোটগল্পটিতে এই সমাজসত্যই উঠে আসে। এই ছোটগল্প প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয়া 'প্রতিদিন' পত্রিকায়, ১৯৯৬ সালে। পরবর্তীকালে এটি লেখকের 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বহুবিবাহের প্রসঙ্গে এক শিক্ষিত, চাকরিজীবী মুসলিম পরিবারের পুত্রবধূ সালমার দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তার অভাবকেই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। প্রাইমারি স্কুলের মাষ্টার আনিসকে, চাকরিসূত্রেই মালদার বাড়ি ছেড়ে কোলকাতায় থাকতে হয়। দুই সন্তানের জননী সালমা শুধুমাত্র জীবিকার প্রয়োজনে স্বামীর এই দূরে থাকাকে মেনে নেয়। প্রতিদিনকার নিঃসঙ্গতা ও বিরহব্যথাকে সে স্বামীর অপেক্ষার আনন্দে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ছুটির দিনে স্বামীর বাড়ি ফেরার আনন্দে ও আবেগে, তার বিরহকাতর জীবনের সমস্ত অপূর্ণ সাধ পূরণের আকাঙ্ক্ষায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। এইরকমই এক গ্রীষ্মের ছুটিতে আনিসের বাড়ি ফেরার আনন্দে মাতোয়ারা সালমার হৃদয়, মন ও প্রাণের আবেগের কথা প্রকাশিত হয়েছে এই ছোটগল্পে। সে নতুন শাড়ি, টিপ ও প্রসাধনীতে নিজেকে স্বামীর জন্য সাজিয়ে তোলে নানাভাবে। তিনবছরের ছেলে নয়নকে নিয়ে আনিস গ্রামের রাস্তা, মাঠ, ঘাট, মন্দির প্রান্তরে বেড়াতে বেরোলে, সালমার কাজ করতে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু আনিসকে সবসময় নিজের সান্নিধ্যে পাওয়ায় আকুলতাও সে গোপন করতে পারে না। আনিসের সঙ্গে নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্য মরিয়া সালমা, সন্তানদের ঘুমানোর অপেক্ষায় থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এতদিনের বিরহযন্ত্রনায় সে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়েছে। তাই স্বামীর প্রতি নিবিড় ভালবাসায় সে তার পরিপূর্ণ রূপ, যৌবন ও মন নিয়ে আত্মসমর্পণের জন্য উন্মুখ। তাই স্বামীকে কাছে পেয়ে 'বেশ প্রেমার্ত পরিতৃপ্তিতে চনমনে দেখায় সালমাকে। অদ্ভুত লজ্জামিশ্রিত হাসে। তাতেই বুঝি আরও খেপে যায় আনিস, ব্লাউজের হুক একটা একটা করে

খোলার পরিবর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে টান মেরে খুলতে যায়। সেই অপ্রেম নিষ্ঠুরতার সামনে পড়ে এক মুহূর্তে অবিশ্বাসের চোখে আনিসকে দেখল সালমা। আনিস যেন অসুস্থ, এমনভাবে সালমাকে পেতে চাইছে।'[৬৬] এমনকি আনিসের এই অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিবাদ করায় সালমাকে চড় খেতে হয়, একমুহূর্তে সালমা তার কাঙ্ক্ষিত স্বর্গসুখ থেকে ব্যথিত চিত্তে চ্যুত হয়।

এইভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর অস্তিত্বকে নানাভাবে আক্রমণ করে। অথচ লেখক সালমার মধ্য দিয়ে সেইসমস্ত নারীর যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন, যারা স্বামীকে কেন্দ্র করেই জীবনের সমস্ত স্বপ্ন রচনা করে। তাই এতো অবমাননার পরেও স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাসে সালমা মনে মনে আনিসের অপেক্ষা করে। দেখা যায় এই অপরাধের জন্য আনিস, সালমার মান ভাঙাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করেই ঘুমিয়ে পড়ে। সালমা তার স্বামীর ভালোবাসার মধ্যে একটা অসঙ্গতি অনুভব করে। যদিও এই অসঙ্গতির প্রকৃত কারণ সে জানে না। সে জানে না, তার স্বামীর জীবনে ইতিমধ্যে অন্য এক নারীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যে স্বামীর প্রতি সে সরল বিশ্বাস ও নিবিড় প্রেমে আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক, সে অন্য নারী, খালেদার ভাবনায় আকুল। একসময়ের আকর্ষণীয় নারী খালেদার হাতছানিতে ও নানান টানাপোড়নে আনিস, সালমাকে দাম্পত্যের সহজ সূত্রে বাঁধতে বারবার ব্যর্থ হয়। নিজের প্রেমময়ী স্ত্রীকে উপেক্ষা করা, নিজের সুখের সংসারে অশান্তি ডেকে আনা, স্ত্রীর সহজ বিশ্বাসে আঘাত করে দূরে সরে থাকা পাগলামিরই নামান্তর। আর আনিসের এই পাগলামির প্রতি সালমা নিজের অজান্তেই বারবার অঙ্গুলিনির্দেশ করে। সালমার এই সত্যপ্রকাশে আনিস ভয়ংকর অস্বস্তি অনুভব করে। এমনকি 'ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত উন্মত্ত হয়ে উঠছে সে। সেটা সে জানতে দেয় না। বরং সে দুই হাত দিয়ে সালমাকে আদর করতে থাকে। আবার ওই দুই হাতের দশ আঙুল সালমার নরম গলাটার কাছে এসে নিশপিশ করে। তার আঙুলগুলো চাইছে, শ্বাসরোধ করে সালমাকে মেরে ফেলতে। সেই দুরভিসন্ধির শ্বাসরোধ ঘটানোর মুদ্রা আসলে আদর ফুটিয়ে চলে সালমার বুকে পিঠে ঘাড়ে গলায়, শ্বাসনালিতে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্পর্শআনুভূতির চারপাশে ও কেন্দ্রে। একবার মনে হয় আনিসের, তাকে সালমা 'পাগল' বলল বলেই, খুন করার মুদ্রায় সালমাকে ভালোবাসছে।'[৬৭] প্রকৃতপক্ষে আনিস এই বাহ্যিক ভালোবাসার অন্তরালে তার দাম্পত্য প্রেমকেই খুন করার পাগলামোতে আক্রান্ত। ইসলাম ধর্মের বহুবিবাহের সুযোগ নিয়ে সে খালেদাকে বিয়ে

করে, তার সঙ্গে কোলকাতার ফ্ল্যাটে, আনন্দে থাকার সিদ্ধান্তে বদ্ধপরিকর। সালমার জীবনের বিরহব্যথা, নিঃসঙ্গতা ও বঞ্চনার কথা ভেবেও, আনিস নিজের স্বার্থকেই মান্যতা দিতে বেশি আগ্রহী। এইসূত্রেই সালমার জীবনে এক অন্ধকার অধ্যায়ের পূর্বাভাস অনুভব করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষিত পুরুষস্বামীর অন্ধকার মনের প্রেমহীন নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ও লোভই সালমাদের মতো নারীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলায় যথেষ্ট।

মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে খালেদার অবস্থান অন্যান্য নারীর তুলনায় একেবারেই স্বতন্ত্র। খালেদা একজন স্বাধীন ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী রমণী। বাবার অকালমৃত্যুতে, বাবার চাকরিটা সে লাভ করে। তারপর সাংসারিক সমস্ত দায়িত্ব পালনে সে তার জীবনের মূল্যবান সময় হারিয়ে ফেলতে থাকে। চার বোনকে উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দেওয়ায় পাশাপাশি মায়ের দায়িত্বও সে সুন্দরভাবে পালন করে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর খালেদা একেবারেই একা হয়ে পড়ে। তার নিঃসঙ্গ জীবনে নতুন করে বাঁচার ও সংসার পাতার ইচ্ছে দেখা দেয়। একজন বিয়াল্লিশ বছরের রমণীর পক্ষে মনের মতো পাত্র খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। এহেন পরিস্থিতিতে, এক বৃষ্টিস্নাত দিনে কোলকাতায়, ছেলেবেলার পরিচিত আনিসের সঙ্গে তার দেখা হয়। তাদের এই আকস্মিক সাক্ষাত একদিন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। একসময় খালেদা নিজেই আনিসকে নিজের জীবনে আহ্বান জানায়। কারণ 'এই সময়ে সদ্য কলকাতা বদলি হয়েছে খালেদা। এখানেই একরকম থিতু হওয়া যাবে। সরকারি ফ্লাট নিয়েছে। আর কোনও ঝামেলা নেই তার। এখন যদি কেউ তাকে কুড়িটা বছর ফিরিয়ে দেয়, তার চেয়ে সুখী আর কিছুতে হবে না সে।'[৬৮] এক্ষেত্রে খালেদা একজন শিক্ষিত নারী হয়েও আনিসের স্ত্রী সালমার জীবনের বিপর্যয়ের কথা একবারও ভেবে দেখেনা। বরং আনিসকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দে থাকার স্বপ্ন দেখিয়ে, নিজের সুখের জন্য সালমার দাম্পত্যজীবনকে এক সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

খালেদা তার জীবনের মূল্যবান সময়ে পরিবারের পাশে থেকে যে মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সবকিছু জেনেও একজন নারী হয়ে, আর এক নারী সালমার দাম্পত্যজীবনে তার ঢুকে পড়া মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। বরং আনিসের পরিবার থেকে দূরে থাকার অসহায়তা এবং ইসলাম ধর্মে বিধিবদ্ধ বহুবিবাহের একটা সুযোগ নিতে চায় খালেদা। পৃথিবীতে সকলেরই সুখে ও আনন্দে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। কিন্তু সেই সুখ

যেন অন্য কারও অসুখের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, এই বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত ও সভ্য সমাজকে অত্যন্ত সচেতন থাকা জরুরী। অবশ্য আনিসের মতো স্বার্থপর, সুবিধাবাদী পুরুষের কাছে খালেদাও পরিপূর্ণ সুখ পেতে পারে না। কারণ খালেদার বিয়ে করা ও সন্তানলাভের স্বপ্নে আনিসের আপত্তির কথা তুলে ধরেন লেখক। আনিসের মতো পুরুষেরা শুধুমাত্র নিজের সুখের জন্য এক রমণী থেকে আর এক রমণীকে প্রয়োজনে গ্রহণ করতে পারে, আবার ত্যাগও করতে পারে। শিক্ষিত সমাজেও নারীরা এইভাবেই পুরুষের অমানবিক স্বার্থপরতায় নানাভাবে আজও বঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে চলেছে। যে পুরুষকে সে নিজের জীবনসর্বস্ব করে তোলে, তার দ্বারাই অনেকসময় তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, মর্যাদার হানি ঘটে এবং চরম সংকটের সম্মুখীন হয় তার দাম্পত্যজীবন, আলোচ্য ছোটগল্পে লেখক এই বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন।

**বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গঃ**

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করে এসেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে আরও অনেক প্রগতিশীল মানুষ। ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংক আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। ১৮৫৬ সালে অনেকের বিরোধিতার মধ্যেও হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইন প্রচলিত হয়। অনেক অল্পবয়সী বিধবা সুস্থ ও মানুষের মতো বেঁচে থাকার একটা আইনি বৈধতালাভ করে। যদিও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ অবাধে এই আইনকে মান্যতা দেয় নি। অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই আইন, বর্তমান সমাজে কিছুটা জায়গা করে নিলেও, অনেক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষও বিধবা-বিবাহকে তেমন সম্মানের দৃষ্টিতে আজও দেখে না। ধীরে ধীরে বেশকিছু মহামানবের ছায়াতলে, সংখ্যাগুরু নারীরা শিক্ষার আলো পেতে শুরু করে। নিজের ও সমাজের ভেতরের সমস্ত অন্ধকার দূর করায় প্রয়াসী কিছু কিছু হিন্দু-নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করে। ফলে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় তাদের জীবন-দর্শন, মনন ও চিন্তন। যদিও তাদের এই পথচলা সহজ ছিল না। তবু এই সমস্ত শিক্ষিত নারীসমাজ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বহু কুপ্রথার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করার পাশাপাশি তারা নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার জন্য সোচ্চার হয়। অন্যদিকে মুসলিম ধর্মের প্রাণপুরুষ হজরত মহাম্মদ( সাঃ),

আজ থেকে প্রায় পনেরোশো বছর আগেই বয়সে বড় একজন বিধবারমণীকে স্ত্রীর মর্যাদায় ভূষিত করার মধ্য দিয়ে, বিধবা বিবাহকে ধর্মনৈতিক দিক থেকে বৈধতা দান করেন। মুসলিম সমাজে তাই বিধবা বিবাহ প্রচলিত। তবে একথা সত্য যে, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, একজন মুসলিম বিধবার পক্ষে কাঙ্ক্ষিত ও উপযুক্ত স্বামী লাভের ক্ষেত্রে সামাজিক দিক থেকে একটি বাধা দেখা দেয় সবসময়। আফসার আমেদ মুসলিম বিধবা নারীর জীবনের এই সংকটকে তাঁর বিভিন্ন কথাসাহিত্যে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

### ১) দ্বিতীয় বিবি

আফসার আমেদের 'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসের অল্পবয়সী বিধবা রমণী হামিদার পুনর্বিবাহিত, বর্ণহীন জীবনের নানান সমস্যা ও সংকট আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। যেখানে হামিদার দ্বিতীয় স্বামী নিঃসন্তান শোভান, প্রথম স্ত্রী কিসমতের অনুমতি ছাড়াই হামিদাকে বিবাহ করে। হামিদার প্রথম স্বামী বিয়ের মাত্র আটমাসের মাথায় সাপের দংশনে প্রাণ হারায়। অল্পবয়সী বিধবা হামিদা, জীবনের এই চরম বিপর্যয়কে এক সময় কাটিয়ে ওঠে। জীবনকে ভালবেসে আবার নতুন করে বাঁচার চেষ্টায় সে জরির কাজ শেখে। এই কাজে মাসে প্রায় দেড়শো টাকা রোজগার করে হামিদা। নিজের রোজগারের পরিতৃপ্ততা, মনের মতো সাজসজ্জা, স্বপ্নকল্পনা ও হাসি তামাসার মাঝে হামিদার জীবনে, শুধুমাত্র একজন পুরুষের অভাব অনুভূত হয়। তাই শুধুমাত্র পুরুষ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দোজবর শোভানকে হামিদা বিয়ে করে। কারণ হামিদা জানে, তার মতো বিধবাদের কোন অবিবাহিত যুবাপুরুষ বিয়ে করবে না। ইসলাম ধর্মে বিধবাবিবাহের বিধান থাকলেও, একজন বিধবার মনের মতো পুরুষলাভের স্বপ্নপূরণে সামাজিক বাধা দেখা যায়। একজন বিধবার পক্ষে কোনো আকর্ষণীয়, অবিবাহিত যুবককে স্বামীরূপে পাওয়ার অধিকার যেন সমাজের রীতিবিরুদ্ধ। তাই বিয়েতে শোভানের প্রথম স্ত্রীর মত আছে জেনে, সতীনের সঙ্গে ঘর করতে প্রস্তুত হয় হামিদা। শোভান বিয়ের প্রথম রাতে হামিদার সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষ হয়ে, এক নতুন আনন্দময় জীবনের স্বপ্নে আত্মতৃপ্ত করে তোলে। তাই নতুন সংসার ও দাম্পত্যজীবনের অনেক রঙিন স্বপ্ন নিয়ে, হামিদা শোভানের হাত ধরে কাঁটাপুকুর ছেড়ে শোভানের ভিটেতে আসে। যদিও শোভানের ভিটেতে

আসার পরে, শোভানের প্রথম স্ত্রীর আধিপত্যে, হামিদার নতুন সংসার জীবনের রঙিন স্বপ্ন কীভাবে বর্ণহীন হয়ে ওঠে, তা আমরা দেখেছি।

## ২) এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা

'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' উপন্যাসের মধ্যেও লেখক অল্পবয়সী বিধবা রওশনেশার কাঙ্ক্ষিত পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে নানান সমস্যার বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়েছেন। গরিবউল্লার সুন্দরী কন্যা 'রওশনেশা বিয়ের সাড়ে পাঁচ মাস পর বিধবা হয়। তার বাড়িতে তিন বছর কাটিয়ে দিল নিরুচ্চারভাবে। বিধবা হয়ে ফিরে আসার পর বেশ মন দিয়ে ধর্মের নানা কিতাব পড়তে লাগল। অনেক ধর্মের জ্ঞান সঞ্চয় করতে লাগল। তার সেই দুঃখের সময়ে ধর্ম তার এক আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। স্বামীর মৃত আত্মার শান্তির জন্য রোজ ভোরে ও সন্ধ্যাকালে কোরান তেলায়ত করত। বেশ কয়েক মাস ধরে তাকে তার স্বামীর শোক এভাবে ধর্মের বন্ধনের মধ্যে প্রবলভাবে বেঁধে রেখেছিল। বলা যেতে পারে, তাতে তার স্বেচ্ছা-আত্মসমর্পণ ছিল। মেয়ের এই দুর্বল মুহূর্ত ও দুঃখসময়ের সুযোগ নিয়ে এক দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবার জন্য রটিয়ে দেয়, মেয়ে তার ধর্মকর্ম নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে, দ্বিতীয়বার আর কারুর বিবি হবে না।'[৬৯] স্বামীর শোকের পাশাপাশি এই মহত্ব, আদর্শনিষ্ঠা ও পবিত্রতার প্রকাশে, রওশনেশা প্রথমদিকে গর্ববোধ করে, সে তার এই সামাজিক প্রতিষ্ঠায় মনে মনে আনন্দিত হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই রওশনেশার ভুল ভাঙে। স্বামীশোকের তীব্রতা কমে যাওয়ার পর, বৈচিত্র্যহীন-নিরানন্দময় দুঃসহ বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণায় ক্রমে সে মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। আর পাঁচজন অতি সাধারণ বিধবা মুসলিম নারীর মতই সে দ্বিতীয় সংসার ও পুরুষসঙ্গীলাভের কামনাবাসনায় জর্জরিত হয়। তার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার বাবা গরিবউল্লার ষড়যন্ত্রমূলক প্রচার। যদিও ইসলাম ধর্মে বিধবা যুবতি মেয়েকে পুনর্বিবাহে উৎসাহ দেওয়া বাবা-মার সুন্নত(অবশ্য কর্তব্য)। মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ের খরচ বাঁচানোর জন্যই কৃপণ গরিবউল্লার এই বিপরীতধর্মী প্রচার। তাছাড়া গরিবউল্লার বৃদ্ধা মায়ের দেখাশোনার জন্যও রওশনেশার বিকল্প কেউ ছিল না। গরিবউল্লার এই সামাজিক প্রচারের জন্য, কোনো পুরুষই বিধবা আর রওশনেশার পাণিপ্রার্থী হয়ে আসে না।

হাসিনার অন্যান্য শ্রমসঙ্গী কাশ্মীরা, রত্না ও ফতিমাও কিন্তু হাসিনার মনের এই বিরহের খবর জানতে পারে না। কারণ হাসিনা, পুনরায় সংসার করার সাধের কথা কাউকে জানতে দেয়নি। আবার বাগনানের রিক্সাস্ট্যান্ডের বিপত্নীক রিক্সাওয়ালা সালাম, হাসিনার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ হয়েও, হাসিনার মনের এই দুর্বলতার খোঁজ পায়না। কারণ রিক্সাওয়ালা, ভ্যানরিক্সাওয়ালা, ফলওয়ালা, চালওয়ালা প্রত্যেকের মতই সালামের সঙ্গেও তার হাসিখুশির সম্পর্ক। তাই হয়তো সালাম আলাদা ভাবে বুঝতে পারেনা, তার প্রতি হাসিনার মনের গহীনে লুকোনো প্রেমাবেগকে। হাসিনার মনের এই প্রেমকাতরতা আরও বৃদ্ধি পায়, প্রায় দশ-বারদিন সালামকে দেখতে না পাওয়ার ঘটনায়। সালামের রেখে যাওয়া পুঁটুলিকে স্পর্শ করে যেন হাসিনা গভীর রাতে সালামকে পাশে পায়। এমনকি মাঝে মাঝে সে 'সুবলের দিকে তাকিয়ে সালামের প্রতি আকুল হয়।'[৭৭]

আফসার আমেদ বিধবা হাসিনার একান্ত জীবনতৃষ্ণাকে নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বাস্তবসম্মত রূপে। যেখানে কখনো কখনো সে 'সুবলের বুকের উপর চিৎ হয়ে মাথা রেখে, সুবলের মুখ ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে দেখতে চায়। সুবলকে দেখতে চায়। সে জানে, সুবল সালাম নয়। সালামও সুবল নয়। কাসেমও সালাম হতে পারেনি।'[৭৮] অর্থাৎ তার মন যেকোনো পুরুষকে নয়, সালামকেই একান্ত আপন করে পেতে চায়। তাছাড়া সুবলের নিজস্ব একটি সংসার আছে। তাই বিপত্নীক, সঙ্গীহীন সালামের মতো সুবলের প্রতি তার তেমন কোনো টান নেই। এহেন কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, সালামের বিয়ের খবরে তাই হাসিনার মন ভালো থাকে না। আর মনের এই গোপন ব্যথা ভোলার জন্যই সে অন্যান্য রিক্সাওয়ালা কুদ্দুস, হানিফ, নারান, ফিরোজ এবং নন্দ প্রভৃতি পুরুষের সঙ্গে হাস্যবিনিময়ে মেতে উঠতে চায়। কুদ্দুসের গানের সঙ্গে গলা মেলায় 'বেদের মেয়ে জোসনা আমায় কথা দিয়েছে'। আর এইভাবে হাসিনা 'ওদের সঙ্গে হাসি মস্করা করতে করতেই বেদনা দাঁতে পেষে। মকদুম এসে আঁচল ধরে ইয়ার্কি করে টানলে হাসিনা, 'ঘুরে ঘুরে নাচ' ভঙ্গিতে একপাক নাচলে একপাক শাড়ি খুলে গেলেও, পাকে পাকে বেদনা জড়িয়ে থাকে। তার হাসির ভেতর মিশে থাকে বেদনা, তার চটুলতার ভেতর, তার কৌতুকে, গুনগুন দু-কলি গান গাওয়ার ভেতর।'[৭৯]

তার পুনর্বিবাহের ইচ্ছেকেই মূলত সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেবে। কিন্তু তার বাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকার বুড়ো বা আধবুড়োরা প্রত্যেকেই রওশনেশার কাকা বা মামা সম্পর্কের। দাদু বা ঠাকুরদার মতো কোনো ঠাট্টার সম্পর্কের পুরুষের অভাবে, তার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। অথচ তার এই ইচ্ছের কথা প্রচার করা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে রওশনেশার জীবনে। এইজন্যই সে তারিককে মনেপ্রাণে প্রত্যাখ্যান করেও, শুধুমাত্র সমাজিকভাবে নিজের কামনার প্রচারের জন্যই, তারিকের কন্যা নির্বাচনের যুবতিলাইনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার অপরূপ রূপে মুগ্ধ তারিক, স্বাভাবিকভাবে তাকেই নির্বাচন করে। কিন্তু নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য বরাবরের মতোই সে বাধ্য হয়ে সেদিনও, কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকপুরুষকে জোর করে প্রত্যাখ্যান করে।

লেখক রওশনেশার এই দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তৎকালীন উঠতি ও অহংকারী বড়লোকদের আমানবিক আচরণকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অমানবিক সমাজচিত্র কতটা বাস্তবসম্মত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তারিকের বাবার আচরণে। তারিকের কন্যা নির্বাচনের লাইনে রওশনেশার মতো একজন বিধবার দাঁড়ানোর আস্পর্ধা তার সহ্য হয় নি, তাই সে গরিবউল্লাকে শাসায়, ‘ব্যাপারটা কী, মেয়েকে আমার ছেলের কন্যা নির্বাচনের লাইনে পাঠাবার দুঃসাহস হল কী করে তোমার? মেয়েটা আতপ, তা সত্ত্বেও সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিলে? অথচ তুমিই তো প্রচার করেছিলে, মেয়ে তোমার বিয়ে করতে চায় না, ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে। এখন বড়লোকের বাড়ির বউ হবে বলে লোভ সামলাতে পারলে না? ওই মেয়ে কত কুলক্ষণা সে তো তুমিও জান। বিয়ে দেবার সাড়ে পাঁচমাসের মধ্যে স্বামীকে খেয়েছে। আর সেই মেয়েকে আমার পুত্র নির্বাচন করেই ফেলেছিল, জান তুমি? নির্বাচনের সামান্য ত্রুটি হওয়ার জন্য বেঁচে গেছে। না হলে একরকম নির্বাচন করেই ফেলেছিল। জনসমর্থনের চাপে তার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে বাধ্য হতাম। অবশ্য রাতারাতি কেটে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে লাশ লোপাট করতাম।’[৭২] এই সমাজসত্যের কথা ভেবেই রওশনেশা বারবার তারিককে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হলেও, একজন বিধবা কখনোই নিজের বয়সের উপযুক্ত অবিবাহিত পুরুষকে স্বামীরূপে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। এই সমাজের একজন প্রতিনিধিরূপে রওশনেশার বাবা গরিবউল্লা নিজেও মালু খাঁর নিকট একথা

স্বীকার করেছে, 'ভেবে দেখুন, মেয়ে আমার হাজার সুন্দরী অপ্সরী হোক, কোনো বড়লোকের অবিবাহিত ছেলে কি একজন বিধবাকে বিয়ে করতে পারে?'[৭৩]

তাই অসহায়, অনন্যোপায় রওশনেশা, পুনর্বিবাহের ইচ্ছে সামাজিকভাবে প্রচারিত করার জন্যই যুবতি লাইনে দাঁড়ানোয় বাধ্য হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি গরিবউল্লা এক্ষেত্রেও নিজের স্বার্থে, মেয়ের জীবনের প্রশ্নে প্রতিকূল আচরণ করে। বিধবা রওশনেশার কামনাবাসনা কমে গেলে, গরিবউল্লাকে একদিকে যেমন বিয়ের খরচ বহন করতে হবে না, অন্যদিকে বৃদ্ধাদাদির দেখাশোনাও রওশনেশা নির্বিঘ্নে করে যাবে। তাই বিয়ের খরচ বাঁচাতে, রওশনেশার কৃপণ বাবা বিধবা মেয়ের 'খায়েশ' কম করার ওষুধের ব্যবস্থা করার জন্যই মালুর শরণাপন্ন হয়। চার নম্বর নিখুঁত সুন্দরী বিবির সুযোগসন্ধানী মালু, রওশনেশার সৌন্দর্যের সম্যক পরিচয় লাভ করে এবং তাকে হস্তগত করার ফন্দি করে। এক্ষেত্রে কৌশলী মালু ধর্মের আশ্রয়ে নিজের অভিলাষ চরিতার্থের জন্য রওশনেশার সাক্ষাৎ কামনা করেছে। ধর্মের আলোচনার নামে, মালুর আগমনের কথায়, রওশনেশা দুটো ফলাফলের দিক থেকে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। প্রথমত বাবার প্রত্যাশা অনুযায়ী তার বিবাহের কামনা কমে গেলেও তার মঙ্গল। কারণ এই কামনাবাসনায় জর্জরিত হয়ে তাকে আর নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রাত্রি, মর্মান্তিক কষ্টে যাপন করতে হবেনা।

অন্যদিকে তার মতো অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা যখন বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, তখন তার পক্ষে নারীলোলুপ মালু খাঁ মৌলবির বশ হওয়া ছাড়াও আর কোনো উপায় থাকে না। তাই সে এই সমাজের একজন অতিসাধারণ, অসহায় নারীরূপে মালুর ফাঁদে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে এবং নিজে মালুর সমস্ত কৌশল জেনে বুঝেও 'আনুগত্যের এক লজ্জা ও ছেনালি দেখিয়ে গেছে।'[৭৪] তবে এই আত্মসমর্পণের বাধ্যতায় রওশনেশা, সুন্দর ও অবিবাহিত যুবক তারিককে প্রত্যাখ্যান করার যন্ত্রণায় মনে মনে তাড়িত হতে থাকে। তবু সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মের ধ্বজাধারী, টাকওয়ালা, আধবুড়ো, তেজবরে মালুর প্রতি কোনো অসহযোগিতা বা বিরুদ্ধতা না দেখিয়ে 'শেষ পর্যন্ত সে যে তার কাছে বশ হয়েছে, সেটা পর্যন্ত ধীর স্থির নম্র শান্ত হয়ে বুঝিয়েছে। কিন্তু সে রওশনেশা যতীযুবতি, খানিকটা সময়ের জন্য এ কথা ভাববে না কেন, যে মৌলবি লোভী, নারীখাদক, শয়তান দুশ্চরিত্র, শঠ কপট, রূপজ লোভের শিকার

হয়েছে মৌলবির। ভাবলে তার কোনো দোষ হবে না।'[৭৫] রওশনেশার ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতায় মালুর সমস্ত চালাকি ও ভণ্ডামি ধরা পড়ে খুব সহজেই। কিন্তু মালু যেহেতু একজন বিধবাকে যৌন উত্তেজক কথায়, উত্যক্ত করে অসম্মান করার অন্যায় কাজটি ধর্মের আশ্রয়ে করেছে, তাই রওশনেশার আর কিছু করার থাকে না। মালুর সমস্ত অন্যায় আচরণের কথা জেনেও রওশনেশা, জনসমর্থনের পথে যেতে বাধ্য হয়। এমনকি মালুর হাতের স্পর্শে তার এক ধরণের 'ঠাণ্ডা ঘিনঘিনে অনুভূতি হাতের উপর এসে' পড়লে, সেই অনুভূতির অসন্তোষ জানানোর ইচ্ছেকে রওশনেশা নিরুপায়ভাবে দমন করতে বাধ্য হয়। কারণ সে যতবড়ই সুন্দরী ও জ্ঞানের অধিকারী হোক না কেন, তার মতো একজন বিধবার জীবনে তারিকের মতো আকর্ষণীয় যুবক নয়, আধবুড়ো, তেজবরে, টেকো মালুর মতো স্বামীই সমাজ নির্ধারিত।

আফসার আমেদ উপরিউক্ত কথাসাহিত্যে, একজন নিঃসন্তান অল্পবয়সী মুসলিম বিধবার পুনর্বিবাহের নানান সমস্যা ও সংকটের পাশাপাশি একজন অল্পবয়সী মুসলিম বিধবা যদি এক বা একাধিক সন্তানের জননী হয়, তবে তার বৈধব্য জীবন বা পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা ও সংকটকেও রূপায়িত করেছেন। সাধারণত নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজে এর প্রচলন খুব একটা দেখা যায় না। এক্ষেত্রে সেই বিধবার যদি কোনো সন্তান থাকে, তবে সন্তানকে নিয়ে সে সারাজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা মেনে নেয়। আবার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার, সম্পত্তির হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কথা ভেবে, যদি কোনো উপযুক্ত দেবর থাকে, তবে তার সঙ্গে বিধবা বউদির বিয়ে দিয়ে, ঘরের বউ ঘরে রাখার একটা ব্যবস্থা করে থাকে। অনেকসময় সম্পদশালী বিধবা সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে, দ্বিতীয় সংসার করে না। অন্যদিকে নিম্নবিত্ত সমাজে বেশিরভাগ মুসলিম বিধবা, সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে দ্বিতীয় সংসারের কথা ভাবে না। তাছাড়া এক বা একাধিক সন্তানের বিধবা জননীর পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে এই সমাজে একটা প্রতিকূলতাও দেখা যায়। আফসার আমেদের 'হাসিনার পুরুষ' ছোটগল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

### ৩) হাসিনার পুরুষ

'হাসিনার পুরুষ' ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় 'আজকাল' পত্রিকায় ১৯৯১ সালে। পরবর্তীতে এটি লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ছোটগল্পে দরিদ্রা, সহায়সম্বলহীনা, বিধবা হাসিনা, নিজের ও সন্তানদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে চালের ব্যবসা শুরু করে। এই চালের ব্যবসা, সে তার মৃত স্বামী কাসেমের সূত্রেই খুঁজে পায়। তিনবছর আগে কাসেম চালের বস্তা ট্রেনে তুলে দিয়ে, চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে কাটা পড়ে। স্বামীকে অকালে হারিয়ে, বাধ্য হয়ে হাসিনা অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে আসে সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে। সারাদিন এই ব্যবসা সামলাতে হাসিনা এতটাই ব্যস্ত থাকে যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও সে নিয়মিত নামাজ পড়তে পারে না, পর্দাপ্রথা মেনে চলতে পারে না। কাজের সূত্রে বোরখা পড়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাকে অনেকসময় পরপুরুষের সান্নিধ্যে থাকতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে হাসি-তামাসা বা জীবিকার প্রয়োজনে তার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠলেও, নিঃসঙ্গ রাতে নিজস্ব একান্ত পুরুষের অভাববোধে সে আক্রান্ত হয়।

নিঃসঙ্গ জীবনের এই গোপন মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকতেই হাসিনা বহু পুরুষের সঙ্গে হাসি ঠাট্টার সম্পর্ক গড়ে তোলে। হোটেলের মালিক সামন্তদার সঙ্গে 'চোখাচোখি হাসে'। পানওয়ালা আকরমের দোকানে গেঞ্জিকোম্পানির বিজ্ঞাপনের নাটক শোনে। পরপুরুষদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'বেদের মেয়ে জোসনা' সিনেমার গান গায়। আমির খানের সিনেমা দেখার সাধ জানায় আকরামকে। আবার তার শ্রমসঙ্গী সুবলও একজন পুরুষ। কাজের সূত্রে সুবল তার প্রয়োজনের একান্ত সঙ্গী, প্রয়োজনে তারা একে অপরের অপেক্ষায় থাকে। একে অপরের মাথায় বোঝা তুলে দেয়, পরস্পরের মাল পাহাড়া দেয়। এমনকি সে সুবলের পাশে বসে ঘামাচি পর্যন্ত মেরে দেয়, 'অথচ সুবল তার একান্ত জীবনের কেউ নয়। প্রেমিক নয়, নিজস্ব পুরুষ নয়। তার পুরুষের গৃহ নেই। সুবলের জন্য তার বিরহ হয় না, পুরুষের জন্য তার বিরহ হয়। তাহলে কি সুবল পুরুষ নয়? অন্যের পুরুষ। তার মনের কাছে পুরুষ হয়ে নিবেদন করেনি কখনও সুবল। সুবল তার ঘরের দোরে গ্রহ নক্ষত্র ছায়াপথের পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়াতে চায়নি।'[৭৬]

হাসিনার অন্যান্য শ্রমসঙ্গী কাশ্মীরা, রত্না ও ফতিমাও কিন্তু হাসিনার মনের এই বিরহের খবর জানতে পারে না। কারণ হাসিনা, পুনরায় সংসার করার সাধের কথা কাউকে জানতে দেয়নি। আবার বাগনানের রিক্সাস্ট্যান্ডের বিপত্নীক রিক্সাওয়ালা সালাম, হাসিনার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ হয়েও, হাসিনার মনের এই দুর্বলতার খোঁজ পায়না। কারণ রিক্সাওয়ালা, ভ্যানরিক্সাওয়ালা, ফলওয়ালা, চালওয়ালা প্রত্যেকের মতই সালামের সঙ্গেও তার হাসিখুশির সম্পর্ক। তাই হয়তো সালাম আলাদা ভাবে বুঝতে পারেনা, তার প্রতি হাসিনার মনের গহীনে লুকোনো প্রেমাবেগকে। হাসিনার মনের এই প্রেমকাতরতা আরও বৃদ্ধি পায়, প্রায় দশ-বারদিন সালামকে দেখতে না পাওয়ার ঘটনায়। সালামের রেখে যাওয়া পুঁটুলিকে স্পর্শ করে যেন হাসিনা গভীর রাতে সালামকে পাশে পায়। এমনকি মাঝে মাঝে সে ‘সুবলের দিকে তাকিয়ে সালামের প্রতি আকুল হয়।’[৭৭]

আফসার আমেদ বিধবা হাসিনার একান্ত জীবনতৃষ্ণাকে নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বাস্তবসম্মত রূপে। যেখানে কখনো কখনো সে ‘সুবলের বুকের উপর চিৎ হয়ে মাথা রেখে, সুবলের মুখ ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে দেখতে চায়। সুবলকে দেখতে চায়। সে জানে, সুবল সালাম নয়। সালামও সুবল নয়। কাসেমও সালাম হতে পারেনি।’[৭৮] অর্থাৎ তার মন যেকোনো পুরুষকে নয়, সালামকেই একান্ত আপন করে পেতে চায়। তাছাড়া সুবলের নিজস্ব একটি সংসার আছে। তাই বিপত্নীক, সঙ্গিহীন সালামের মতো সুবলের প্রতি তার তেমন কোনো টান নেই। এহেন কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, সালামের বিয়ের খবরে তাই হাসিনার মন ভালো থাকে না। আর মনের এই গোপন ব্যথা ভোলার জন্যই সে অন্যান্য রিক্সাওয়ালা কুদ্দুস, হানিফ, নারান, ফিরোজ এবং নন্দ প্রভৃতি পুরুষের সঙ্গে হাস্যবিনিময়ে মেতে উঠতে চায়। কুদ্দুসের গানের সঙ্গে গলা মেলায় ‘বেদের মেয়ে জোসনা আমায় কথা দিয়েছে’। আর এইভাবে হাসিনা ‘ওদের সঙ্গে হাসি মস্করা করতে করতেই বেদনা দাঁতে পেষে। মকদুম এসে আঁচল ধরে ইয়ার্কি করে টানলে হাসিনা, ‘ঘুরে ঘুরে নাচ’ ভঙ্গিতে একপাক নাচলে একপাক শাড়ি খুলে গেলেও, পাকে পাকে বেদনা জড়িয়ে থাকে। তার হাসির ভেতর মিশে থাকে বেদনা, তার চটুলতার ভেতর, তার কৌতুকে, গুনগুন দু-কলি গান গাওয়ার ভেতর।’[৭৯]

এতো সঙ্গী ও ব্যস্ততার মাঝেও নারী তার একান্ত পুরুষকে পেতে চায়, আফসার আমেদ নারীজীবনের এই প্রেমতৃষ্ণা ও সংকটকে বারবার তাঁর কথাসাহিত্যে দেখিয়েছেন। তাই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেও হাসিনার বিক্ষিপ্ত মনের প্রেক্ষিতকে লেখক তুলে ধরেছেন। প্রথম প্রথম স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুজনিত মর্মান্তিক যন্ত্রণা ও কান্নায় সে যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা ভুলতে থাকে। এমনকি স্বামীর মুখচ্ছবি ভুলে যাওয়ার নির্মম কৌতুকে সে মাঝে মাঝে নিজেই কষ্ট অনুভব করে। নিত্যনতুন চুড়ি পড়ার সখ ছিল তার, স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হাসিনার আর সেই সাধের চুড়িও পড়া হয় না। তাছাড়া সে জানে, নিত্যদিনের চালের বস্তার ঘষ্টানিতে সব কাঁচের চুড়ি এমনিতেই ভেঙ্গে যায়। এতো সংগ্রামের মধ্যেও কিন্তু হাসিনার মনের সজীবতা হারিয়ে যায় না। তাই বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ে অনেক মানুষের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে, স্বজনহারা হাসিনা কাতর ও অশান্ত হয়। আকস্মিক মৃত্যুযন্ত্রণা কতটা মর্মান্তিক হতে পারে, এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হাসিনাকে সংবেদনশীল করে তোলে। এইসময় সে তার চা খাওয়ার ইচ্ছে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। তিনবছর আগের একটি যন্ত্রণাময় স্মৃতি তার হৃদয়ে পাক দিতে থাকে। দুটো শিশুসন্তানকে মাত্র দশবছর বয়সি বোনের ভরসায় রেখে, চালের ব্যবসা করতে আসার মতো দুর্ভাগ্য তার জীবনে নেমে আসে। এইসমস্ত মানসিক চিন্তাভাবনা, তাকে মাঝে মাঝে খুব দুর্বল করে ফেলে। এই অবসাদগ্রস্ত জীবন থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেতেই হাসিনা সুবলের কাছে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আবদার করে। অবশ্য সন্ধ্যের মধ্যে ঘরে ফেরার ব্যাকুলতাও প্রকাশ করে, দুই সন্তানের জননী হাসিনা। পুরুষের সান্নিধ্য কাম্য হলেও, মা হাসিনা শুধুমাত্র তার সন্তানদের জন্যই, সময়মতো প্রতিরাতে সেই পুরুষহীন, আনন্দহীন ঘরেই ফেরে, 'কেমন শ্লথ হাঁটে হাসিনা। নিজের শরীর নিজেরই ভার লাগে। টেনে নিয়ে যেতে হয় যেন।'[৮০] পাশাপাশি সকালের এলিয়ে পড়া ভাত, একা একা খাওয়ার বাধ্যতায় সে আরও বেদনাহত হয়।

অবশ্য তখন হাসিনার মনে পড়ে যায়, অনেক সাধ করে কেনা পাকা আমের কথা। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হাসিনার সব সাধ বা সংকল্প পূরণ হওয়া সম্ভব নয় বটে, যে সাধ সে পূরণ করতে পারবে, তার পরিপূর্ণ আনন্দ পেতে সে অভিলাষী। তাই সাধ করে কেনা পাকা আমের স্বাদ সে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে, পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে তার রসনার শরীর পরিপূর্ণরূপে।

মূলত তার জীবনে একান্ত পুরুষের অভাবে, তার শরীর ও মন অতৃপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমলব্ধ অর্থের বিনিমিয়ে অন্তত রসনাকে পরিতৃপ্ত করবে সাধ্যমতো, মনের মতো খাবার খেয়ে। তার জীবনের এই আনন্দ থেকে, তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবেনা।

সাধারণত বাঙালি মুসলিম সমাজে একজন বিপত্নীক পুরুষের(বয়স্ক হলেও) বিবাহের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে যেমন সমাজের সকলে যত্নশীল ও উদ্যোগী হয়, একজন মুসলিম বিধবার (কমবয়সী হলেও) ব্যাপারে কিন্তু তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে না। বরং বিধবার বিবাহ সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় হয়ে উঠে। একজন বিপত্নীক পুরুষের মতো, একজন বিধবা নারীর নিঃসঙ্গ জীবনেও যে একান্ত আপন কোনো পুরুষসঙ্গীর প্রয়োজন, সেকথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভাবে না। যদিও ইসলাম ধর্মে একজন অসহায় বিধবাকে বিয়ে করা একটি সুন্নত পালন করা। যা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। তাই ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী, কমবয়সী বিধবাদের পুনর্বিবাহে উৎসাহ দান করা উচিত। অথচ এই ব্যাপারে আজও সমাজে সেভাবে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় না। এক্ষেত্রে যদি সেই বিধবার কোনো সন্তান থাকে, তাহলে সমাজ তার বিয়ের এক প্রতিকূল সংবাদ প্রচার করে। ফলে হাসিনার মতো কমবয়সী বিধবারা, একরকম বাধ্য হয়ে একাহাতে সন্তানদের বড় করে তোলায় ব্রতী হয়। অবশ্য কোনো পুরুষ যদিও একজন যুবতি বিধবাকে বিয়ে করতে রাজি হয়, তবে সে কিন্তু বিধবা নারীটির সন্তানদের কোনোরূপ দায়িত্ব নিতে চায় না। অথচ কতো মুসলিম নারীই বিপত্নীক পুরুষকে বিয়ে করে, আগের পক্ষের সন্তানদের লালন-পালন করে তার পরিসংখ্যান বলা কঠিন। অবশ্য সৎমায়ের অত্যাচারের কাহিনিও সমাজে বিরল নয়। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। তবে সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ ‘হাসিনার পুরুষ’ ছোটগল্পে যে সমাজ সত্যকে তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। সেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী পুরুষ উভয়েই এক বা একাধিক সন্তানের জননী হাসিনার মতো বিধবাদের, বিয়ের বাপ্যারে অনীহার কথা প্রচার করে থাকে। এই প্রচারের শিকার হয়ে হাসিনারা নিজের ইচ্ছে, সাধ ও আকাঙ্ক্ষার কথা লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারে না। এক্ষেত্রে তারা সমাজের এই প্রচারের হাতে সমর্পিত হতে বাধ্য হয়।

**অসমবিবাহ প্রসঙ্গঃ**

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের অস্বাভাবিক ব্যবধানকে সাধারণত অসমবিবাহ বলে মনে করা হয়। এই ব্যবধান অনেকসময় কুঁড়ি-পঁচিশ বছরের মতো হতে পারে, আবার তা ছাড়িয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছিও হতে পারে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে অসমবিবাহের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনেছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অনেকরকম পরিবর্তন হলেও, অসমবিবাহ কিন্তু নির্মূল হয়ে যায় নি। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ বিভিন্ন রচনার মধ্যে এই সমাজসত্যকে তুলে ধরে ধরেছেন এবং এই অসমবিবাহের ফলে উদ্ভূত নারীজীবনের বৈচিত্র্যময় সমস্যা ও সংকটের বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়েছেন।

**১) অন্তঃপুর**

আফসার আমেদের 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে অসমবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে একাধিকবার। যেহেতু মুসলিমসমাজে জ্ঞাতিবিবাহ প্রচলিত, তাই এই উপন্যাসের মিস্ত্রিবাড়ির মেয়ে আসমার সঙ্গেও তার সেজচাচার ছেলে সোহরাব কিংবা শহিদ, খালাতো ভাই আজম, ফুফাতো ভাই রহমত বা সাবিরের বিয়ের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তবে এদের মধ্য বিয়ের পাত্র রূপে, পনের বছরের আসমার প্রথম পছন্দ পিসতুতো ভাই সাবির। সিনেমা আর্টিস্টের মতো চুলছাঁটা, মোটর মেকানিক সাবিরের গান-বাজনার প্রতি আসক্তি, আসমাকে একটু বেশি আকর্ষণ করে। তাছাড়া অন্যান্য তুতো ভাইদের মধ্যে সাবিরই প্রথম আসমার কাছে প্রেম নিবেদন করে। সে-ই প্রথম আসমাকে প্রেমের চিঠি লেখে এবং চুম্বনের মধ্য দিয়ে কিশোরী আসমার মনে প্রেমের উন্মেষ ঘটায়। অবশ্য এক্ষেত্রে সাবিরের পরিবর্তে শহিদ, আজম বা রহমতের প্রচেষ্টাও একইভাবে আসমার মনে জায়গা করে নিতে পারতো। কারণ কিশোরী আসমার অপরিণত মনে সাবিরের প্রেম তেমন গভীর ভাবে দাগ কাটে নি। তাই বিয়ের পাত্র নির্বাচনে আসমার অপরিণত, লজ্জাশীলা মন দ্বিধাগ্রস্ত। অথচ আসমার মনের সমস্ত কল্পনা ও দ্বিধার ঊর্ধ্বে গিয়ে বাড়ির বড়ছেলে ফিরোজ, তার পাতানো ছেলে মাসুদের সঙ্গে আসমার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। চল্লিশ বছরের বিপত্নীক সরুছুতোর মাসুদ, আসমার চেয়ে প্রায় পঁচিশ বছরের বড়। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে, অকালে স্ত্রী-সন্তানকে হারিয়ে, ছয়মাস থেকে

মাসুদ পাতানো বাবা ফিরোজের সংসারের একজন সদস্য। মিস্ত্রিবাড়ির সকলের কাছে মাসুদ তার সুন্দর ব্যবহারে একসময় সকলের কুটুমভাই হয়ে ওঠে। মিস্ত্রিবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী আসমা তার পনের বছর বয়সেই বিয়ের জন্য নিজের মনকে তৈরি করলেও, কুটুমভাই মাসুদকে সে কখনো স্বামীরূপে কল্পনা করে নি। তাই ফিরোজের এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে আসমা ভেঙে পড়ে। সাবিরকে না পাওয়ার সম্ভাবনায়, সাবিরের প্রতি সে যেন একটু বেশি আকর্ষণ অনুভব করে।

তবে আফসার আমেদ এই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এক বয়স্কা রমণীর ভূমিকার এক বস্তবসম্মত পরিচয় দিয়েছেন, যেখানে বাড়ির সবচেয়ে বায়োজ্যেষ্ঠ রমণী, আসমার দাদি মরিয়ম 'গণিকালয়ের বয়স্কা মাসি'র মতো স্নেহ ও কথার চাতুরি দিয়ে আসমার মনকে ধীরে ধীরে মাসুদের দিকে ফেরাতে সচেষ্ট হয়। বৃদ্ধা মরিয়ম আসমা ও সাবিরের সম্পর্ককে মনে মনে সমর্থন করেও, এই সম্পর্কের প্রতিকূলতায় যেতে বাধ্য হয়। সমাজ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মরিয়ম, আসমার সহজ সরল মনকে এই বলে বোঝায়, 'মেয়েমানুষের জিন্দেগির আর কি দাম আছে রে আসমা বুন! কেউ দাম দেয় না। সে যা পায়, সেটাকেই শোকর করতে হয়। কথাটা বলে অদ্ভুত সম্মোহনে আসমার দিকে তাকিয়ে থাকে মরিয়ম।'[৮১] মরিয়মের সম্মোহনে আসমা ক্রমে মাসুদকে স্বামী রূপে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। মুসলিম ধর্মে বিয়ের সময় মেয়েদের মতামত বা অনুমতি নেওয়ার যে বিধান রয়েছে, তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিছক একটি আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাই নিজের ভালোবাসা ও পছন্দের পাত্র সাবিরকে ছেড়ে আসমাকেও নির্বাচিত পাত্র 'মাসুদকে বিয়ে করতেই হবে।...তার জন্য নির্ধারিত পুরুষের সঙ্গে বসবাস-সহবাস করে জীবন শেষ করে যেতে হবে। এর কোনো অলঙ্ঘন নেই।'[৮২] এই সমাজেরই একজন নারী হিসেবে আসমা এর কোনো বিরোধিতার চেষ্টাও করে নি। অবশ্য সমাজবাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আসমা সাবিরকে পাওয়ার চেষ্টা করলেও হয়তো আয়েসার মতো সফল হতে পারতো না। ফিরোজের বড় পুত্রবধূ আয়েসা প্রেমিকপুরুষ কালাম মাস্টারকে পাওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করেও শেষপর্যন্ত হেরে যায়। বাবার নির্বাচিত পাত্র আসাদকে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়েসা কালামকে ভুলে, আসাদের দুটি

সন্তানের জননী হয়। সাধারণত দরিদ্র মুসলিম মেয়েদের জীবন এই খাতেই বয়ে যেতে বাধ্য হয়।

মুসলিম সমাজে বাবার আদরের মেয়ে হলেও, বিয়ের বয়সের ব্যাপারে বা মেয়ের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তারা তেমন চিন্তিত নয়, বরং এই সমাজের পুরুষেরা মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সহমত পোষণ করে। আফসার আমেদ লিয়াকতের মধ্য দিয়ে, এই সমাজসত্যই রূপায়িত করেছেন। লিয়াকত মিস্ত্রির খুব আদরের মেয়ে আসমা। বিয়ের কিছুদিন আগেও নিজের হাতে মেয়েকে ভাত খাইয়েছে লিয়াকত। দাদি মরিয়ম আসমাকে খুব স্নেহ করে। সিনেমা দেখা, গান শোনা, বাজার ঘুরে ঘুরে শৌখিন জিনিস কেনায় আসমার খুব আগ্রহ। কিন্তু মিস্ত্রিপাড়ার মেয়ে আসমা বাবা বা দাদির আদরের পাত্রী হলেও সব ব্যাপারে তেমন স্বাধীনতা পায় না। তাই মাসুদকে বিয়ে করার মূল্যে সে বিয়ের আগে বেশ কিছু স্বাধীনতা আদায় করে নেয়। এই সময় সে বাবার কাছে চুড়ি, চুলের কাঁটা ও গার্ডার কেনার জন্য দশ-বিশ টাকা সহজেই আদায় করতে পারে, বাজারে এবং বাড়ির বাইরে সহজেই বেরোতে পারে। বিয়ের জন্য অনেকদিন আগের হিন্দু বান্ধবী মিতালিকে নিমন্ত্রণ করার বাসনাও তার পূরণ হয়। তবে এই সমস্ত কিছুর মাঝেও সাবিরকে না পাওয়ার জন্য আসমার মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে একসময় মাসুদ আলির শক্ত হাতেই সে সমর্পিত হয়।

একজন অল্পবয়সী মেয়ের যৌনজীবন নিয়ে যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব কাজ করে, সদ্যবিবাহিতা আসমার মধ্য দিয়ে আফসার আমেদ তার এক বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন। উপন্যাসমধ্যে ধরা পড়ে, বিয়ের পর একই ঘরে মাসুদের যৌনসঙ্গী হওয়ার অপেক্ষায় কিশোরী আসমার ভীত ও সংকুচিত রূপ। অথচ মাসুদের বিলম্বে নববিবাহিতা আসমার মনে উদ্বেগ বাড়ে, মাসুদের পছন্দের ব্যাপারে নানারকম ভাবনা আসে। আবার রাতের অন্ধকারে সে তার সমস্ত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে, অপরিণত শরীর ও মন নিয়ে মাসুদের কাছে সমর্পণ করে। নিজস্বতা ভুলে গিয়ে স্বামীর ইচ্ছের কাছে আত্মসমর্পণ করার শিক্ষা সে পেয়ে এসেছে ছেলেবেলা থেকেই। এই সমাজের অনেক মেয়ের মতো সেও অপরিণত বয়সেই, নিজের গর্ভে মাসুদের সন্তান ধারণ করে। একজন পরিণত স্ত্রীরূপে অল্পবয়সী ও সুন্দরী আসমা তার সুন্দর আচরণে মাসুদের জীবন ও মন পরিতৃপ্তি ও প্রসন্নতায় ভরিয়ে তোলে। ফলে জাহিরাকে না

পাওয়ার যন্ত্রণা মাসুদ ধীরে ধীরে ভুলতে থাকে। তবে একথাও সত্য, প্রায় পঁচিশ বছরের বড় মাসুদের দাম্পত্যে আসমার মনে কখনো কখনো যে অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয়নি তা নয়, তবে তা মাসুদের ভালোবাসা ও সুন্দর ব্যবহারের মুগ্ধতায় কাটিয়ে ওঠে। গর্ভবতী আসমা পছন্দমতো ও প্রয়োজনমতো খাবার পেয়ে স্বামীর প্রতি আরও অনুরক্ত হয়। দাদির মৃত্যুতে মাসুদ ক্ষুধার্ত আসমাকে বিস্কিট ও জল দিয়ে মুগ্ধ করে। মাসুদের প্রতি এই মুগ্ধতা ও ভালোবাসায় আসমা একসময় সাবিরকে ভুলে যায়। পরম নিশ্চিন্তে মাসুদের ফিরে পাওয়া ভিটেতে গিয়ে সে নতুন সংসার পাতে।

'অন্তঃপুর' উপন্যাসে কাঁচা বয়সের হাসিনাও চরম দারিদ্র্যের জন্য মাঝবয়সী, তিন সন্তানের জনক অত্যাচারী, মাতাল মইবুর দ্বিতীয় স্ত্রী হতে বাধ্য হয়। বিয়ের প্রথম দিকে সে এক কঠিন দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হলেও, একসময় মইবুর সন্তানের জননী নিজের সাংসারিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়। সতীন জাহিরাকে সে মইবুর জীবন থেকে দূর করতে সমর্থ হয় এবং ক্রমে ক্রমে মইবুর উপযুক্ত গৃহিণী রূপে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বয়সের ব্যবধানজনিত সবরকম সংকট কাটিয়ে, আসমা ও হাসিনা একসময় স্বাভাবিক দাম্পত্যে নিজেদের ভরিয়ে তোলে।

## ২) বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা

আফসার আমেদ তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসে ধর্মের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অধর্মের শিকার, তালাকপ্রাপ্ত জাহান বিবির মধ্য দিয়ে যে অসংখ্য মুসলিম নারীর আত্মিক সংকটের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয়। পাশাপাশি হুসনে আরা চরিত্রটির অবতারণা করে, অসম বিবাহের দরুন, নারীর জীবনের ভিন্ন এক সমস্যা ও সংকটের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। সত্তর বছরের বৃদ্ধ পেনশনভোগী আকবর দাদা, যুবতী স্ত্রী হুসনে আরাকে আর্থিক নিরাপত্তাদানে সক্ষম হলেও, তার শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণে একেবারেই অপারগ। তাই সে তার অপূরণীয় কামনা চরিতার্থের জন্য বারবার ছুটে যায়, জাহানের বিরহে কাতর যুবক নাসিমের কাছে। আর বারবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় তার সেই প্রেমহীন, নিরুত্তাপ সংসার

জীবনে। তার এই আকর্ষণহীণ নিরানন্দ সংসার জীবনের সংকট থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই।

## ৩) এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা

লেখকের 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' উপন্যাসের স্বল্পপরিসরে অসমবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে। এই উপন্যাসে আধবুড়ো, কুৎসিত, রাতকাণা রাজ্জাক মিঞার তরুণী স্ত্রীর, অল্পবয়সী ছোঁড়ার প্রতি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নারীজীবন তথা সমাজের আর এক সত্যকে ব্যঞ্জনাময় করে। বিড়ির ব্যবসায় রাজ্জাক মিঞা একসময় প্রচুর পয়সা রোজগার করে। রোজগার বাড়ার ফলে রাজ্জাক, এক অল্পবয়সী তরুণীকে বিবাহ করে। এই তরুণীও বারবার হুসনে আরার মতো বৃদ্ধ অপারগ, কুৎসিত স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে, নিজের মানসিক ও শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য, এক অল্পবয়সী তরুণ প্রেমিকের কাছে ছুটে আসে।

## ৪) দুই নারী

অসমবিবাহ প্রসঙ্গে নারীর জীবনে উদ্ভূত সমস্যা ও সংকটের কথায় আফসার আমেদের 'দুই নারী' ছোটগল্পটিও উল্লেখযোগ্য। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় 'কালান্তর' পত্রিকায় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। পরবর্তীতে 'দুই নারী' লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' ও 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'দুই নারী' মূলত নাসিরার জীবনের গল্প। যার বিবাহিত জীবন শুরু হয়েছিল চৌদ্দ বছর আগে। বয়সে প্রায় সতেরো বছরের বড়, দুই সন্তানের জনক এক বিপত্নীক মৌলানার সঙ্গে নাসিরা তার বিবাহিত জীবন শুরু করে। 'আর বিয়ে হবার পর থেকেই তাকে জননীর দায়িত্ব পালন করে আসতে হয়। স্বামীর আগের বউ মারা যায়। তার দুই ছেলে পায় এখানে এসে। তখন ওদের বয়স কমই ছিল। বড়োর ছয়, ছোটোর চার। ওদের দায়দায়িত্ব নাসিরাকেই নিতে হয়। ইমরান বড়ো ছোটো ইরফান।'[৮৩] ফলে নাসিরার নিজস্ব বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন, আবেগ, উচ্ছ্বলতা, সাধ-আহ্লাদ ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। তাছাড়া সেও ক্রমে দুটো সন্তানের জননী হয়। এইভাবে বিবাহিত জীবনের প্রথম থেকেই সন্তানদের দায়িত্ব পালনের

পাশাপাশি দেওরদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে যায়। সে এতদিন নিজের কথা ভাবার সময় পর্যন্ত পায় নি। 'সর্বোপরি মৌলানার সমস্ত দায়িত্ব পালন করে আসছে। স্বামীর শান্তি কীসে হয়, কীসে একটু আরাম পায়, সেবাযত্নে যেন ছারখার হয়ে যায় নাসিরা। একটু যদি নিজস্বতায় ফুটে উঠতে পারত তাহলে এমনটা হত না তার। যেন একটু স্বস্তিও নেই। সন্তানদের দিকে তাকিয়ে একটু কষ্ট মুছতে চায়।'[৮৪]

এই প্রসঙ্গে লেখকের 'দুই বোন' ছোটগল্পটিও উল্লেখ্য, যেখানে মাঝবয়সী জামাইদা ইয়ারুর বিবাহের প্রস্তাব, বারবার কিশোরী আর্জিনাকে মর্মান্তিক সংকটের সম্মুখীন করেছে। এইসমস্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক মুসলিম দরিদ্র ও পশ্চাদপদ সমাজের চরম সামাজিক সত্যকে, এক অভিনব পদ্ধতিতে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর ছোটোগল্প ও উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন।

**জ্ঞাতিবিবাহ প্রসঙ্গঃ**

**১) অন্তঃপুর**

মুসলিম সমাজে চাচাতো, ফুফাতো ও খালাতো ভাইবোনের মধ্যে যে বিবাহ হয়, তার মধ্যেও নারীজীবনে বিশেষ সংকট দেখা দেয়। আফসার আমেদের 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে জ্ঞাতিবিবাহের প্রসঙ্গ আছে। এখানে মূলত মুসলিম সমাজের দরিদ্র রাজমিস্ত্রিপাড়ার অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবনের সুখদুঃখের নানান চিত্রের বাস্তবায়ন ঘটেছে। এই মিস্ত্রিপাড়ার প্রায় সকলেই পরস্পরের আত্মীয়। অনেকক্ষেত্রেই এই আত্মীয়তা বিবাহসূত্রে বিকশিত হয় আরও নিবিড়ভাবে, কারণ তাদের মধ্যে 'চাচাতো খালাতো ফুপতো ভাই-বোনে বিয়ে হয়। নিজেদের মধ্যে বিয়ে হয়েছেও কত। আসমার দাদা মুক্তার বড়চাচার মেয়ে সঈদাকে বিয়ে করেছে। সঈদা কালো। অন্য কোনো ঘরে বিয়ে দিতে অসুবিধা হবে বলে ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। দাদাও রাজমিস্ত্রি। বড়চাচার কাছে কাজ করে। মেজচাচা ছোটফুফুর মেয়ে এনেছে, ছোটফুফু মেজচাচার মেয়ে নিয়েছে। বদলাবদলি বিয়ে হয়েছে। আসমারও এমন একটা বিয়ে হয়ে যাবে।'[৮৫]

উক্ত উপন্যাসে, মরিয়মের অন্তঃপুরে ফিরোজের মেয়ে সইদার বিয়ে হয়, চাচাতো ভাই লিয়াকতের সঙ্গে। এই জ্ঞাতি বিবাহের ভালোমন্দ দুটি প্রভাবই সইদার জীবনে দেখা যায়। যে বাড়িতে সে বড় হয় কন্যারূপে, সেই বাড়িতেই, সেই পরিবেশেই বধূরূপে থাকার একটা সংকট সে অনুভব করে। আবার মুক্তার তাকে স্ত্রীর ভালোবাসা ও মর্যাদা দিলেও, মাঝে মাঝেই বোনের মতো শাসন করে। তাছাড়া একই অন্তঃপুরে সইদার বাবা-মা ও ভাই থাকায়, মুক্তার সইদার উপর কোনো অপ্রীতিকর আচরণে যেতে ভয় পায়। অন্যদিকে সইদাও চাচা-চাচির সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির মতো কোন তিক্ত-মধুর সম্পর্কে যেতে ভয় পায়। বাবার বাড়ি গিয়ে নিজের মতো করে কিছুদিন থাকার স্বাধীনতাও সে সবসময় পায় না। শাশুড়ি সালেহা ও পুত্রবধূ সইদার মধ্যেও দুই রকমের সম্পর্কের একটা দ্বিধা তৈরি হয়। ফলে সইদা তার সংসারজীবনে একধরণের দ্বিধা নিয়ে চলতে বাধ্য হয়। আফসার আমেদের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 'অন্তঃপুর' উপন্যাসের মতো অন্য কোন সাহিত্যে মুসলিম সমাজজীবনের এই সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় মেলে না।

**পবিত্র কোরান প্রসঙ্গঃ**

**রক্তলজ্জা**

মুসলিম জনসাধারণের কাছে পরিত্র কোরানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা নিজের জীবনের বিনিময়ে কোরানের পবিত্রতা রক্ষায় বিশ্বাসী। তারা অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে সকাল-সন্ধ্যা কোরানপাঠ করে থাকে, পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে। যে সমস্ত মুসলিম নরনারী সুরেলা কণ্ঠে কোরান পাঠে দক্ষ, তারা সমাজে সম্মানীয়। যদিও আরবি ভাষায় রচিত কোরানের অর্থ তাদের অনেকেই বোঝে না, তাই কোরান নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা হয়তো তাদের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না, কিন্তু কোরানের পবিত্রতায় তাদের কোনো দ্বিধা নেই। তারা বিশ্বাস করে, কোরান হাতে নিয়ে মিথ্যা কথা বললে, মিথ্যাবাদীর উপর চরম শাস্তি নেমে আসে। আফসার আমেদের যে সমস্ত ছোটগল্পে বাঙালি মুসলিম জীবনের এই ধর্মীয় বিশ্বাস ও মুসলিম নারীজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল 'রক্তলজ্জা'।

আফসার আমেদের 'রক্তলজ্জা' ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায়। পরবর্তীতে এটি লেখকের 'শ্রেষ্ঠগল্প' এবং 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বলা যেতে পারে, 'রক্তলজ্জা' আফসার আমেদের একটি অসাধারণ জটিল মনস্তত্ত্বমূলক গল্প। যেখানে হাসানের অসৎ মানসিকতার পাশে লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন ফতেমার দৈনন্দিন সংসার জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সূচিকর্ম ও ধর্মবোধকে। স্বামীর সংসারে থেকেও প্রেমিককে কেন্দ্র করে একজন নারীর জীবনের প্রেম, ভালবাসা ও ভালোলাগার পাশাপাশি, অবদমিত যন্ত্রণা ও পবিত্র কোরানের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কাহিনি হল রক্তলজ্জা।

মাত্র ষোল বছর বয়সে ফতেমা শাকিলের স্ত্রী হয়ে আসে। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই সে দুই সন্তানের জননী হয়। সূচিকর্মে ও গৃহকর্মে নিপুণা ফতিমা জীবন তথা সংসারকে পরম যত্নে পরিপূর্ণ করে তোলে। শাকিলের অভাবহীন সংসারে ফতিমা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সখের জিনিস কেনার সাধও পূরণ করতে পারে অনায়াসে। এই সমস্ত সাধের পাশাপাশি ফতিমার দৈনন্দিন জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে নামাজ ও কোরান পাঠ। সে প্রতিদিন নিয়ম করে নামাজ পড়ে ও সুরেলা কণ্ঠে পবিত্র কোরান পাঠ করে। কিন্তু এই আপাত পরিপূর্ণতার মধ্যেই ফতেমার জীবনের একটা অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়, যখন সে চাচাতো দেবর হাসানকে বলে, 'আমার একটা কষ্টই ছিল। আমি যে রকম মানুষ চাইতাম, সে তুমি, তোমার মত।'[৮৬]

দীর্ঘ পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনেও স্বামী শাকিলের মধ্যে ফতেমা তার মনের মানুষকে খুঁজে পায় নি। ফতেমার এই অতৃপ্তির সুযোগে হাসান খুব সহজেই ফতেমার জীবনের কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকপুরুষ হয়ে ওঠে। যদিও এই অবৈধ সম্পর্কের কোন প্রভাব ফতেমার সংসার তথা দাম্পত্যজীবনে পড়ে নি। শাকিল সপ্তাহে একদিন কোলকাতা থেকে বাড়ি ফিরলে, ফতেমা একজন প্রকৃত স্ত্রীর মতোই প্রেমময় আচরণ করে। হাসান ফতেমার জীবনে যে প্রেমের জোয়ার বয়ে আনে, অন্যায় জেনেও ফতেমা এই জোয়ারে নিজের মন ও প্রাণকে ভরিয়ে তোলে। শাকিলের দাম্পত্যে থেকেও হাসানের গোপন প্রেমের আকর্ষণকে সে কিছুতেই রোধ করতে পারেনা। কারণ এই অবৈধ গোপন প্রেম 'বাঁচিয়ে রাখে তাকে। ঘুরে ফিরে হাসান তাকে জাগিয়ে রাখে, ঘুরে ফিরে হাসান তাকে ভরিয়ে রাখে। মন ভুল করে চাইলেও হাসানকেই চায়। যেহেতু ভুল নির্ভুল পাপ-পুণ্য এই ভেদ-রেখাটা মুছে দিয়েছে ফতিমা। তার নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার

চাপে সতই গুঁড়িয়ে গেছে।’[৮৭] ‘স্বপ্নের পুরুষ’ হাসানের প্রেমাবেগপূর্ণ আলাপনে, কণ্ঠমাধুর্যে, নাম সম্বোধনে, স্পর্শে ও চুম্বনের তীব্র স্বাদের আনন্দসুখে ফতিমার জীবন সজীবতায় ভরে ওঠে। তাই সে হাসানের অপেক্ষায় নিজেকে সবসময় প্রস্তুত ও সুসজ্জিত রাখে। এদিক থেকে ফতিমা সেই সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে নিঃসন্দেহে। রাতের অন্ধকারে স্বামীর অবর্তমানে, নিজের শোবার ঘরে ও ছাদে পরপুরুষ হাসানের সঙ্গে মিলিত হওয়া যে কতটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ, তা বলাই বাহুল্য। একজন স্বল্পশিক্ষিতা, ধর্মভীরু গ্রামীণ মুসলিম নারী হয়েও, অভিসারিকার মতোই সে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করার মানসিকতাই ভাস্বর।

আফসার আমেদ নারীজীবনের চিরন্তন সত্যকে বর্ণনা করেছেন ফতিমার জীবনের দোলাচলতা ও জীবনতৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে। দুই পুরুষই তার জীবনে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই দুইবছর আগে হাসান যখন সেলিমাকে বিয়ে করে, তখন ফতিমার জীবনে হাসানকে হারানোর আশঙ্কায় এক চরম মানসিক সংকট দেখা দিয়েছিল। কারণ স্বামী, সংসার ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকলেও, হাসানই তার জীবনের সর্বস্ব। তার সমস্ত আশঙ্কাকে দূর করে, হাসান বিয়ের পরও সমানভাবে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখে। তবে সেলিমাই হাসানের স্ত্রী, এই বেদনা থেকে সে, সেলিমার স্ত্রীসৌভাগ্যকে মনে মনে ঈর্ষা করে। যদিও নিজের স্বামী, সংসার ও সন্তানদের ছেড়ে সে কখনই হাসানের স্ত্রী হতে চায় না। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সারা জীবন ধরে হাসানের ভালোবাসায় নিজেকে ভরিয়ে রাখা। হাসানের এই গোপনপ্রেম বজায় রাখতেই ফতিমা তার ‘দাম্পত্য, সংসার, পাড়া-প্রতিবেশি, ধর্মকর্ম যথাযথ’ পালন করে সমান্তরালভাবে। স্বামী শাকিলের প্রতি সে স্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব খুব যত্নসহকারে পালন করে। শাকিলকে সে দাম্পত্যের সমস্ত সুখে পরিতৃপ্ত করে। সপ্তাহের শেষে শাকিলের বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করে। স্বামীর অসুস্থতা তাকে অস্থির ও চিন্তিত করে তোলে। অথচ অসুস্থ শাকিলের কপাল টিপে দেবার সময়ও, সে মনে মনে পাশের বাড়িতে, হাসানের উপস্থিতির আনন্দে আপ্লুত হয়। ফতিমার হাসিমুখের প্রতিক্রিয়ার সত্যতা শাকিল ধরতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে ফতিমা সমস্ত দায়িত্ব পালনের মধ্যেই তার গোপন প্রেমকে কৌশলে রক্ষা করে চলে। হাসানের জন্যই তার সমস্ত

সাজসজ্জাময় কর্মমুখর জীবনযাপন। হাসানের প্রতি তার এই তীব্র আত্মসমর্পণের মধ্যেও সে, হাসানকে হারানোর এক নিরাপত্তাহীন ভীতি ও সংশয়ে শঙ্কিত।

আল্লাহ ও কোরানে বিশ্বাসী ফতিমার এই সংশয়কে, চতুর ও নাস্তিক হাসান আল্লাহর কসম খেয়ে বারবার দূর করে দেয়। আত্মনিবেদনের তীব্রতায় ফতিমা, হাসানের এই ছলনা, চতুরতা, প্রতিহিংসা, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি বা ভণ্ডামি ধরতে পারে না। কারণ হাসানের কাছে সে শুধুমাত্র প্রেম কামনা করে। আর এই কামনা বাসনার তীব্রতায় একজন ধর্মভীরু রমণী হয়েও সে পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে গিয়ে ধর্মবিরোধী জেনায় (পরপুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন) লিপ্ত হয়। অথচ রিনার কাছে প্রত্যাখ্যাত হাসান যে শুধুমাত্র নারীকে পাওয়ার প্রতিহিংসায়, ফতিমার অধিকৃত শরীরকে ভোগ করার মধ্যে নিজের পৌরুষকে চরিতার্থ করায় অভিলাষী, এই সত্য ফতিমা ধরতে পারেনা। তাই ফতিমার কাঙ্ক্ষিত প্রেমপূর্ণ আলাপনে হাসান বিরক্ত হয়। অন্যদিকে ফতিমা এই প্রেমকে সময়ে অসময়ে আরও বেশি উপভোগ কারার জন্য হাসানকে চিঠি লিখতে বলে। হাসানের প্রেমের তীব্রতাই সে স্বামীর উপস্থিতির মধ্যেও হাসানকে দেখার জন্য, ছাদ থেকে কাপড় তোলার নামে প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধুমাত্র প্রেমিকপুরুষকে দেখার জন্য সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে, তরকারি পুড়িয়ে ফেলে। মনের মানুষকে পাশে বসিয়ে খাওয়ানোর সাধে ও স্বপ্নে সে ব্যাকুল হয়।

আফসার আমেদ দেখিয়েছেন হাসানের মতো নাস্তিক পুরুষের কাছে ফতিমার ভালোবাসার কোনো মূল্য থাকতে পারে না, তার ভালোবাসা নাস্তিকের ভালোবাসা। পৌরুষের অহংকারে সে অধিকৃত নারীকে যেকোনো মূল্যেই ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। তাই সে সকলের সন্দেহ দূর করতে, শাকিলের সঙ্গে গায়ের জোরে লড়াই করতে আসে। ফতিমা তার স্বামী ও প্রেমিকের এই হাতাহাতিতে শিউরে ওঠে। দুজনেই তার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাউকেই সে হারাতে চায় না। তাই এই দুর্ঘটনা রক্ষার অক্ষমতায় সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। স্বামীর পক্ষ থেকে সে একটি কথাও বলে না। এই লড়াইকে কেন্দ্র করে, ফতেমার মনের খবর সম্পর্কে অজ্ঞাত হাসান, ফতিমার মান ভাঙাতে রাত দুটোয় ঘুমন্ত স্ত্রীকে ছেড়ে, ফতেমার ঘরে আসে। কিন্তু হাসানের এই অভিসার মেজোবৌদি সখিনার কাছে গোপন থাকেনা। নাস্তিক, স্বার্থপর হাসান তখন সকলের কাছে সখিনাকে মিথ্যে প্রমান করতে পবিত্র কোরান স্পর্শ করে

মিথ্যে শপথ করে বলে, 'এই কোরান ছুঁয়ে বলছি, তোমরা ভেবেছ ফতিমার সঙ্গে আমার খারাপ সম্পর্ক আছে—নেই। আমি রাতে ওর কাছে যাইনি। এই কোরান ছুঁয়ে বলছি, যাইনি, যাইনি, যাইনি—তিন সত্যি।'[৮৮]

সংসার, সন্তান, স্বামী ও প্রেমিকের মতোই কোরান পাঠ করাও ফতিমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 'সে এই কোরান পাঠটাকে ভালোবাসে। কোরানের পবিত্রতা ও কোরান পাঠে পুণ্যলাভ এটা বিশ্বাস করে সে। আর এই সংসারের চৌহদ্দিতে তারও কিছু কৃতিত্ব প্রকাশের মাধ্যম আছে, এই কোরান পাঠের মধ্যে খুঁজে পায় সে। তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এই সুরেলা কণ্ঠস্বর ও পাঠের ভিতর তৈরি করে সে। দৈনন্দিনতার তথাকথিত অভ্যাস ও চর্যায় ঢুকে গিয়ে ফতিমা তার জীবনের পরমপ্রেমের গোপনতার আধার পায়। দৈনন্দিনের অভ্যাস ও চর্যাতেই তাকে সকলে দেখতে পায়। গোপনতার জীবনতৃষ্ণার সত্যে কারো কাছে ধরা পড়ে না ফতিমা।'[৮৯] সুতরাং ফতিমা নিজেই কোরানপাঠকে তার প্রেমের গোপনতার আধার রূপে ব্যবহার করলেও, সে কিন্তু কোরানের পবিত্রতায় পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, শুধুমাত্র সত্যিকে প্রতিষ্ঠা দিতেই মানুষ কোরান স্পর্শ করে শপথবাক্য পাঠ করে, তিনসত্যি করে। তাদের অবৈধ সম্পর্ককে গোপন করার জন্য হাসান যখন কোরান স্পর্শ করে মিথ্যে শপথ করে, তখনই হাসানের প্রতি তার মোহভঙ্গ হয়।

কোরানের প্রতি শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও পবিত্রতায় ফতিমা নিজের সঙ্গে নিজে সংগ্রাম করে হাসানকে ভুলে যেতে। অবশ্য ফতিমার অন্তর এই চেষ্টায় মর্মান্তিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়। হাসানের সঙ্গে অতিবাহিত মধুর স্মৃতি দ্বারা সে আক্রান্ত হয় বারবার। হাসানকে প্রাণপণ চেয়েও, কোরানের পবিত্রতায় আঘাতকারীকে সে কখনোই প্রেমিক রূপে মেনে নিতে পারেনা। তাই হাসানের স্মৃতিবিজড়িত উপস্থিতিকে ক্রমে ভয় পেতে শুরু করে। বাইরের ঝড় আর তার অন্তরের ঝড় এক হয়ে যায়। ঝড়ে আন্দোলিত ক্যালেন্ডারের এক-একটা মাস খুলে খুলে যেন সে তাদের পুরনো স্মৃতিকে রোমন্থন করে চলে। তবু সেই সুখস্মৃতিকে ভুলে যেতেই ফতিমা পবিত্র কোরানকে আশ্রয় করে। এতদিন যে হাসানের সুখস্মৃতি ও অপেক্ষায় সে নিজেকে সজীব ও সতেজ করে তুলতো, আজ সে হাসানের উপস্থিতিকে ভয় পায়। এই ভয়কে জয় করার জন্য, হাসানের উপস্থিতিকে মুছে ফেলার জন্য, জোর করে জানালা বন্ধ করতেই তার তর্জনী

রক্তাক্ত হয়। কিন্তু তার অন্তরের রক্তক্ষরণের কাছে তর্জনীর এই রক্তক্ষরণ অতি সামান্য। তাই এই রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা, সে বিন্দুমাত্র টেরও পায় না। অথচ সেই তর্জনী থেকে নির্গত রক্তের দাগ তার পিঠে, বুকে, শরীরে ও মুখে লাগে। তারপর আতঙ্কিত ফতিমা হাসানকে ভোলার জন্য, সেই রক্তাক্ত তর্জনী নিয়েই 'কোরান পাঠ করতে বসে। কোরানের পৃষ্ঠায় ডানদিক থেকে বাঁদিকে বর্ণমালার নীচে ডান তর্জনী বুলোয় ফতিমা।'[৯০]

লেখক হাসানের সুন্দরী বউ সেলিমার মধ্য দিয়ে, সেই সমাজের আর এক চরম সত্যকে রূপায়িত করেছেন। সেলিমা সম্পর্কে লেখকের উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'ভারি শান্ত স্বভাবের। যারা নিজস্ব ইচ্ছে খুঁজে পায় না, এমন স্বভাবের মেয়েরা, যারা ইচ্ছের অনাদর বোঝে না, তেমন মেয়ে সেলিমা। তার দুই বড় জা তাকে নানা কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। তার দুই ভাসুর ঘোমটার মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রাখে। সংসারে হাসানের বউহীনতায় সেলিমাকে বেশি সময় থাকতে হয়।'[৯১] গৃহকর্মে নিপুণা, সুন্দরী সেলিমা যথেষ্ট পণের বিনিময়ে সরকারি চাকরিরত পাত্র হাসানকে স্বামীরূপে লাভ করে। সংসারের কাজকর্মের পাশাপাশি নামাজ ও পবিত্র কোরানপাঠেও সে সমানভাবে মনোযোগী। কিন্তু সেলিমা সবসময় হাসানের দাম্পত্যে একটা ফাঁক অনুভব করে। সে যেন কখনোই ভাবে-অনুভবে স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে জীবনসঙ্গী হিসেবে পায় না। তাই মনে মনে স্বামীসোহাগী স্ত্রী না হতে পারার একটা মৃদু যন্ত্রণা সে বয়ে চলে। তার দাম্পত্য জীবনের এই অসম্পূর্ণতা মেনে নিয়েও, দুই সন্তানের জননী ফতিমার সঙ্গে হাসানের যে একটি সহাস্য সম্পর্ক আছে, তার যুক্তিসঙ্গত কারণ কিন্তু সেলিমা খুঁজে পায় না। কারণ ফতিমার স্বামী শাকিলের সঙ্গে হাসানদের একটা পারিবারিক দ্বন্দ্ব চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। তাই সখিনাভাবি যখন ফতিমার সঙ্গে হাসি বিনিময়ের জন্য হাসানকে প্রশ্ন করে, তখন সেলিমার মন বিক্ষিপ্ত হয়। ফতিমার সঙ্গে হাসানের অবৈধ সম্পর্কের সত্যাসত্যের প্রশ্নে সে চঞ্চল হয় মনে মনে। স্বামীকে আগলে রাখতে অন্য সব শান্ত স্বভাবের বউ এর মতো সেলিমাও যত্নশীল ও চক্ষুষ্মতী হতে থাকে। কিন্তু চতুর হাসান শাকিলের সঙ্গে ঝগড়া করার মধ্য দিয়ে, সেলিমার মনের সমস্ত সংশয় দূর করতে সক্ষম হয়। ভালোমানুষ সেলিমা স্বামীকে বিশ্বাস করে, জীবনে শান্তি খুঁজে পায়। এমনকি পরদিন সকালে, হাসান যখন তার গোপনপ্রেমের প্রত্যক্ষ সাক্ষী সখিনাভাবিকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য, সেলিমার হাত থেকে কেড়ে পবিত্র কোরানের

মিথ্যে শপথ করে, তখনও সে হাসানকে বিশ্বাস করে নিশ্চয়। কারণ কোরান হাতে নিয়ে যে কোন মানুষ মিথ্যে শপথ নিতে পারে, একথা ধর্মবিশ্বাসী সেলিমার স্বপ্নেরও অগোচর। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কে সেলিমার সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়ে যায়। তবে একথা সত্য যে, সেলিমার প্রতি হাসানের ভালোবাসা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। তাই কোরানের অবমাননাকারী হাসানকে, ফতেমার প্রত্যাখ্যান হয়তো সেলিমার দাম্পত্যজীবনকে ইতিবাচক করে তুলবে।

হাসানের মেজভাবি সখিনা প্রকৃতপক্ষে একান্নবর্তী পরিবারের একজন যোগ্য পুত্রবধূ। পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি তার সজাগ, সহৃদয় ও সতর্ক দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। হাসানের মতো ধূর্তও তাকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ফতেমার সঙ্গে হাসানের গোপনপ্রেমের ইতিহাস সখিনাই বারবার সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে, পরিবারের মঙ্গলের জন্য। যদিও নাস্তিক, মিথ্যেবাদী হাসান, সখিনার সব প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে, সকলের সরল ধর্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে, পবিত্র কোরানকে হাতিয়ার করে। শাকিল যদিও নিজেরই সম্পত্তিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, তবুও সখিনার প্রতিবাদ যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত। 'রক্তলজ্জা' ছোটগল্পে হাসানের মা ও তার বড়ভাবির স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই, তাই হয়তো লেখক তাদের স্বনামে উপস্থিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। আবার একান্নবর্তী পরিবারে বউদের আগমনে যে অনেক পরিবারে শাশুড়ির কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অনেকটা ক্ষুন্ন হয়, আফসার আমেদ হাসানের মায়ের মধ্য দিয়ে এই সমাজসত্যকেও তুলে ধরেছেন।

'রক্তলজ্জা' মূলত ফতিমার জীবনের কাহিনি। একজন মুসলিম নারী তার আজন্মলালিত ধর্মবিশ্বাস, ধর্মসংস্কার ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়, শেষপর্যন্ত প্রাণপ্রিয় প্রেমিকপুরুষকে ভুলে যাওয়ার চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যায় জেনেও যে গোপনপ্রেমকে সে দৈনন্দিনতার সমান্তরালে লালন করে, এমনকি এক্ষেত্রে সে নিজেও কোরানের নির্দেশ অমান্য করে। কিন্তু যে কোরানের প্রতি তার এতো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জড়িত, তার পবিত্রতা ভঙ্গকারী কখনই তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিক হতে পারে না। কোরানের পবিত্রতা ও তার ধর্মবিশ্বাসে আঘাতকারী হাসানকে সে কখনই তার জীবন তথা হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না। তাদের সম্পর্ক গোপন করতে হাসান যদি আরও বড় কোন মিথ্যার আশ্রয় নিত বা কাউকে খুন করতো,

তাতেও হাসানের প্রতি তার গোপনপ্রেম অটুট থাকতো। কিন্তু কোরানের পবিত্রতা ভঙ্গকারী হাসানকে ভুলে যাওয়ার চরম শাস্তি সে নিজেই নিজেকে দেয়। তাই হাসানকে ভুলে যেতেই সে তার সমস্ত প্রেমানুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, ভালোলাগা ও ভালোবাসাকে অবদমনের আপ্রাণ চেষ্টায় হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়। এইভাবেই শেষপর্যন্ত ফতেমার জীবনে জয়ী হয় তার আজন্মলালিত ধর্মবশ্বাস ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নিষ্ঠা।

**বোরখা প্রসঙ্গঃ**

আরব প্রভৃতি ইসলামিক রাষ্ট্রে, মুসলিম নারীর বোরখা পরিধান বাধ্যতামূলক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিম নারীদের মধ্যে বোরখা পরার প্রচলন খুবই কম। সাধারণত দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ পরিবারের মধ্যেই বোরখা পরার চল সীমাবদ্ধ। ফলে বৃহত্তর মুসলিম নারীসমাজের মধ্যে, যে কজন বোরখা পরিধান করে, বা বোরখা পরিধানে বাধ্য হয়, তাদের নিজেদের কাছে অনেক সময় এই পোশাকটি অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ তাঁর নানান রচনার মধ্যে এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ 'মুসলমান সমাজঃ নানাদিক' এ বলেছেন 'ইসলাম ধর্মে সামাজিক আচরণবিধি কঠোরতর। বাঙালি মুসলমানকে সেই কঠোর আচরণবিধি নিয়ে ততখানি থাকতে দেখা যায়নি। নিজস্ব জীবনধারার ভেতর এই অসহযোগ, তা অনেকটা আর্থ-সামাজিক কারণও বটে। অর্থনৈতিক কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে পর্দাপ্রথা সুরক্ষিত করা যায়নি। দরিদ্র বহু সংখ্যক মুসলমান নারীদের খেটে খেতে হয়।'[৯২] ফলে তাদের পক্ষে বোরখার সম্মান রক্ষা করা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাঙালি মুসলিম নারীর বেড়ে ওঠা, স্কুল কলেজে লেখাপড়া করা ও পোশাকপরিচ্ছদের সঙ্গে, সংখ্যাগুরু সমাজের নারীর জীবনাচরণের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ফলে তারা বোরখার ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়। তবে যদি কোনো মুসলিম নারী বিবাহসূত্রে মৌলবি পরিবারের একজন হয়, তবে কিন্তু তাকে বোরখায় অভ্যস্ত হতে হয়। আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি ও হলুদ পাখির কিস্‌সা', 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' উপন্যাস ও 'দুই নারী' ছোটগল্পটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

## ১) বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা

আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসের মুশুল্লি নাসিমের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী জাহান, বারবার এক পুরুষ ছেড়ে অন্য পুরুষের স্ত্রী হওয়ায় বাধ্য হলেও, কোনো মৌলবির স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারে সে চরম আপত্তি প্রকাশ করে। কারণ মৌলবির স্ত্রীদের সাধারণত ইসলামের কঠোর বিধিনিষেধ মেনে নামাজ পড়তে হয়, বোরখা পরতে হয়। বাঙালি মুসলিম সমাজের অল্পবয়সী মেয়েরা নামাজ ও বোরখা পড়ায় তেমন অভ্যস্ত নয়। জাহানও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ধর্মভীরু নাসিমের সংসারে তাকে এই ব্যাপারে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আবার বোরখাপরিহিতাদের স্বতন্ত্রভাবে চেনার উপায় থাকে না। তাই জাহানের বিরহে কাতর নাসিম, একসময় বোরখাপরিহিতা আজমত মৌলবির আধবুড়ি স্ত্রীকে, উনিশ বছরের জাহান ভুল করে। কারণ 'বোরখার মেয়েমানুষটা জাহানের গড়নের...বোরখাই নাসিমকে ফাঁসিয়েছ।'[৯৩] এই সংকট যেমন নাসিমের, তেমনি আজমতের বিবিরও। বোরখা পরিহিতা নারীর জীবনে এই সমস্যা যে অনেক বেশি, তা বলায় বাহুল্য।

## ২) কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক

আফসার আমেদ তাঁর 'কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' উপন্যাসে বোরখা প্রসঙ্গে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীর ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়ে, নারীর স্বাধীনতার প্রতীকরূপে বোরখাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার অসাধারণত্ব প্রশ্নাতীত। এই উপন্যাসের কালাম যখন সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন আবার সে তার দর্জির কাজ শুরু করে। এই সূত্রেই বাড়ির বাইরে বেরোনোর একটা সুযোগ পায় কালামের স্ত্রী রেহানা। রোজ দুপুরে সে কালাম দর্জির ভাত নিয়ে বাজারে যায়। যদিও সন্দেহবাতিক কালাম, বিবিকে অন্য কারো সঙ্গে হাসাহাসি বা কথা বলার কোনো স্বাধীনতা দেয় নি। রেহানাবিবির সুরত(চেহারা) যেন অন্য পুরুষেরা না দেখতে পায়, তাই সে ঘোমটা মাথায় বাজারে যায়। একদিন পাখির ডাকে আচমকা বিবির মাথার ঘোমটা বাজার ভর্তি লোকের সামনে খসে পড়ে, যা কালামকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে। কারণ 'পরপুরুষের চোখে কালামের বিবির মুখ প্রকাশ হওয়ায়, কালামের পক্ষে খুব মর্মান্তিক এবং

অপমানজনক এবং পৌরুষে ছ্যাঁকা লাগার যথেষ্ট কারণ থেকে যায়।'[৯৪] তাই আগের স্বামীদের মতো কালামের হাতেও রেহানা অত্যাচারিত হয়। আগের স্বামীরা তার কপালের যেখানে জাঁতি ছুঁড়ে মেরেছিল, সেখানেই কালাম তাকে কাজললতা ছুঁড়ে মারে। পুরনো ক্ষতস্থানে নতুন করে আবার রক্ত ঝরে। তার সঙ্গে কালাম তাকে একটি পুরনো কালোবোরখা দেয়। এরপর সে যখনই বাইরে বেরোবে, তাকে এই কালো বোরখাটি পরে বেরোতে হবে। অবশ্য এই কালোবোরখার মধ্যেই রেহানা তার নিজস্বতার গন্ধ খুঁজে পায়। কারণ 'বোরখার মধ্যে সকলকে সে দেখতে পাবে, অথচ তাকে কেউ দেখতে পাবে না!'[৯৫]

বোরখা নারীকে যে তার জীবনের সমস্ত আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশের একরকম স্বাধীনতাও দেয়, আফসার আমেদের এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে অভিনব ও যুক্তিসঙ্গত। লেখকের কথায়, রেহানা আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশের পাশাপাশি, বোরখার ভেতরে কাঙ্ক্ষিত প্রেমকে লালন করারও অনেক সুযোগ পায়। সুদর্শন যুবক, চাচাতো দেওর বদিউরের হাত থেকে ফুল নেওয়ার গোপনতাও এতে রক্ষা পায়। তাই 'মাথার খোপায় ফুল আর গায়ে বোরখা চড়িয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে পড়ে সে বাড়ির বাইরে। এবং মুখে আনন্দ হাস্য ধরে রাখে। তার এই হাস্য অভিব্যক্তি কেউ দেখতে পায় না।'[৯৬] অথচ বোরখা পরিহিতা রেহেনার কল্পনারূপে মুগ্ধ হয়ে এবং ফুলের গন্ধের আকর্ষণে বিভোর হয়ে পিছু নেয় চল্লিশজন লোক—আধবুড়ো হারুণ, রংমিস্ত্রি আরিফ, রিকশাওয়ালা জাবেদ, নবীন মৌলবি জাকির, কোরণ, গন্নাখাঁদা, চোর, খোঁড়া থেকে শুরু করে প্রাইমারি স্কুলের বিপত্নীক হেডমাস্টার পর্যন্ত সমাজের নানান স্তরের মানুষ। লেখককে অনুসরণ করে বলা যায়, যেহেতু গরিব মুসলিম পাড়া থেকে বেরোনো বউবেটিদের মাঝে একমাত্র রেহানাই বোরখা পরে, তাই সে অনেক বেশি জাঁকালো ভাবে পরপুরুষের নজরে পড়ে। আর বোরখার বিবিকে যেহেতু দেখা যায় না, তাই কল্পনায় সে অনেক বেশি রূপসী ও যৌন অনুভূতিতে লোভনীয় হয়ে কাম উদ্রেক করে। তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয় ফুলের সুরভি। অবশ্য এতোকিছুর মধ্যেও কালামের পক্ষে বিবিকে দোষারোপ করা সম্ভব হয় না। কেননা সে পর্দায় থাকে, তাছাড়া পুরুষদের আকৃষ্ট করার কোনোরকম অবৈধ কাজও করে না। পাশাপাশি কালামের কথামতো সে কোরান পাঠ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া থেকে শুরু করে সংসারের সমস্ত কাজই নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করে।

এতদসত্ত্বেও কালো বোরখার বিবি ‘নিজে পরকীয়া করতে পারে তার সঙ্গে কেউ পরকীয়া করতে পারে না। কাউকে দেখতে ভালো লাগে, তাকে খানিকটা লোভ নিয়ে দেখে। পুরুষদের দেখার পরিতৃপ্তি পায় সে। এবং পুরুষদের পরিতৃপ্তির মতো দেখে সে। প্রেম নয়, দেখা এই দেখার ভেতরও তো এক স্বাধীনতার আনন্দ আছে। যাকে দেখতে ভালো লাগল, তাকে তো বোরখার ফুটোগুলো দিয়ে দেখার সাধ মেটাতে পারে।’[৯৭] এই বোরখা রেহানাকে পছন্দের গাছ ও পাখি দেখার স্বাধীনতার পাশাপাশি বাজারের ভিড়ের মধ্যেও পছন্দের পুরুষ গোরাকে(বদিউর) খোঁজারও স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু যখন বোরখার মধ্যে থেকে গোরা ভেবে, পিছু নেওয়া নবীন মৌলবি জাকিরের হাত ভুল করে ধরে ফেলে, তখনই এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয় সে। কারণ হাত ধরার মুহূর্তেই তার হাত থেকে প্রেম নিবেদনের মাধ্যম, কাজললতাটি পড়ে যায় এবং জাকির তা মুহূর্তের মধ্যে কুড়িয়ে নেয়। জাকির তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিক নয়, তবু ভুল করে রেহানা তাকেই প্রেমে আহ্বান জানায়। আর নবীন মৌলবি জাকির মতলব করে, সর্বসমক্ষে কাজললতাটি ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে, তাকে প্রেম নিবেদনে যাওয়ায় বাধ্য করে।

প্রকৃতপক্ষে বোরখার অন্তরালে রেহানা যেমন ফুলশাশুড়ির মৃত্যুতে ইচ্ছেমতো হাসি বা কান্নায় মগ্ন থাকার সুযোগ পায়, তেমনি নবীন মৌলবির এই শয়তানিতেও সে ইচ্ছে হলে হাসে, আবার পরক্ষনেই কাঁদে। পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম বা কামবোধে আক্রান্ত হওয়া, কোরান পড়া ও ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত নবীন মৌলবির পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত ও পাপ কাজ। কিন্তু নবীন মৌলবি এই গর্হিত কাজের মধ্য দিয়ে, রেহানার জীবনের সমস্যাকে আরও বেশি জটিল করে। এমনকি মৃতার বাড়িতে পর্যন্ত, মৃতাকে স্নান করানো, কাফন পরানো প্রভৃতি ধর্মীয় কাজের অজুহাতে সে, রেহানার রূপ ও যৌবন দেখার সুযোগ সন্ধান করে। এইসময় মৃতাকে কাফন পরানোর সময়, রেহানার খোঁপা থেকে ফুলটি মৃতার মাথার কাছে পড়ে যায়। সে ফুলটি মৃতার মাথায় গুঁজে দেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের অত্যাচার, অবমাননা, তালাক, যৌননির্যাতন ও কামনা-বাসনার হাত থেকে নারী পুরোপুরি মুক্তি পায় মৃত্যুতে, এই সত্যই এখানে প্রকাশিত।

## ৩) দুই নারী

'দুই নারী' ছোটগল্পে মৌলানার স্ত্রী নাসিরা, বিয়ের চোদ্দবছর পর যেন নিজের জীবনের কথা ভাবার সময় পায়, যখন তার গর্ভের শেষসন্তানের বয়স হয় আট বছর। তার আগের পক্ষের সন্তানদুটো বাবার জুতোর দোকানে আর তার নিজের সন্তানদুটো স্কুলে চলে গেলে, নাসিরা বাড়িতে অনেকটা সময় একা কাটানোর অবকাশ পেয়ে যায়। তাছাড়া চার বছর আগেই দেওয়েরা অন্যত্র চলে যায়। তাই এই অবকাশে নানা ভাবনাচিন্তা তার জীবনে ভিড় জমায়। অবশ্য তাদের বাড়িতে আশ্রিতা এক দূরসম্পর্কের চাচিশাশুড়িও তার এই অবকাশ যাপনের সঙ্গী হয়। কিন্তু তার সান্নিধ্য নাসিরার অবকাশ পুরোপুরি ভরাতে পারে না। তাই সংসারে সে আজ একটি শিশুর অভাববোধ করে। কারণ ইচ্ছে থাকলেও সে তার অবশিষ্ট সময় টিভি দেখে, গান শুনে, বাজারে গিয়ে বা বাইরে ঘুরে কাটাতে পারে না। কারণ কোরান হাদিস চর্চাকারী সম্মাননীয় মৌলানা এগুলোকে গুনাহ(পাপ) বলে মনে করে। তাই একজন রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ওস্তাগর, দর্জি ও শ্রমিকের বউ টিভি দেখে, গান শুনে, বাজারে গিয়ে অবসরযাপন করতে পারে, কিন্তু নাসিরার সেই অধিকার নেই। নাসিরা এসব ভালবাসলেও মৌলানার স্ত্রী হওয়ায় তাকে বাড়তি বেশ কিছু নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলতে হয়। তাই তাকে বোরখা পড়েই বাইরে বেরতে হয়, 'বোরখায় যতই কষ্ট হোক না। বোরখা ছাড়া তো বেরবার উপায় নেই। বোরখা না পরেই সে যেত। বোরখাটা তার বেরোনোকে সমর্থন করে বলেই ঐ কালো রঙের টেরিকটের বোরখাটা চড়িয়ে নেয়। কেউ তাকে দেখতে পাবে না, পর্দার জন্যই বোরখা তাকে পরতে হয়।'[৯৮]

সংসারের কাজের ফাঁকে ঘরের বাইরের পৃথিবীর রাস্তাঘাট, লোকজন নাসিরাকে বারবার হাতছানি দেয়। তাই বাড়ির বদ্ধ পরিবেশে হাঁপিয়ে ওঠা নাসিরা, ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে, বেশকিছু সময় ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় তাকিয়ে থাকে। এইভাবে রাস্তার লোকজন, দোকানপাঠ, মালিক-কর্মচারী ও যানবাহনের সঙ্গেও তার পরিচিতি বাড়ে। এই গোপন দেখার আনন্দে সে কিছুটা হলেও মনে মনে বাইরের পৃথিবীকে স্পর্শ করে। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ও সাধ থেকে বঞ্চিত নাসিরার 'বাপের বাড়ির জন্য মন কেমন করে। কুমারী জীবনের আনন্দ ও স্মৃতি তাকে হাতছানি দেয়। বাবা চাচাদের স্নেহস্পর্শ আদর যত্ন আজও সে পেতে চায়। দিনে

দিনে বছরের পর বছর মা বাবা ভাই বোনেরা সব পর হয়ে গেল।’[৯৯] আমাদের সমাজে নাসিরার মতো অনেক মেয়েই, বিয়ের পর এই চরম সত্যের সম্মুখীন হয়। সে তার আজন্মলালিত পরিবেশ, পরিবার, প্রতিবেশ ও নিয়মকানুন ত্যাগ করে স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সমস্ত নিয়ম ও শাসন মেনে চলায় বাধ্য হয়।

অবশ্য সমাজ, শিক্ষা, পরিবার তথা ব্যক্তিবিশেষের মানসিক ভিন্নতার উপর একজন নারীর জীবনের চলার পথ নির্ভর করে। মৌলানার স্ত্রী নাসিরাকে বোরখা পরতে হয়, অথচ বাঙালি মুসলিম সমাজে বোরখাপরিহিত নারীর সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র। আর্থসামাজিক করণে অনেক মুসলিম নারীকেই কাজের সূত্রে বাইরে বেরোতে হয়। ‘হাসিনার পুরুষ’ ছোটগল্পে লেখক এই সমাজবাস্তবতাকে রূপায়িত করেছেন। আবার অনেকেই ইচ্ছেমতো, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বোরখা ছাড়াই অনায়াসে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারে। অনেকের মতো নাসিরার মনেও বোরখা ছাড়াই বাড়ির বাইরে বেরোনোর প্রলোভন জাগে। কারণ একদিকে বোরখার গড়ন দেখে মৌলানা তাকে চিনে ফেলে এবং মৌলানার নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তাকে। অন্যদিকে বাজারে হাতেগোনা বোরখা পরিহিতার দিকে সকলের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে নাসিরা বিব্রতবোধ করে। তাই সে অন্তত একদিনের জন্যে হলেও, বোরখা না পড়ে বেরোনোর পরিকল্পনা করে। এইসময় চাচির তরমুজ খাওয়ার সাধ, নাসিরার এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ এনে দেয়। সে বোরখা না পড়ে, শাড়ি পরেই বাজার থেকে তরমুজ এনে চাচিকে অবাক করে দেয়।

আফসার আমেদ দেখিয়েছেন, অবরুদ্ধ নারী সবসময় না হলেও, মাঝে মাঝে নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার পেলেও আনন্দিত হয়। কিন্তু সমাজে বা পরিবারে, একটি দিনের জন্যও সে নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার পায় না। তাই একটা দিন মৌলানার নিয়মের বাইরে গিয়ে, মৌলানার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার আবেগ ও উত্তেজনার আনন্দে নাসিরা মনে-প্রাণে কতটা প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার বাস্তবসম্মত বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। তার এই আনন্দের ছোঁয়ায় চাচিও আপ্লুত। সারাজীবন ধরে, স্বামী ও সংসারের সুখের জন্য নাসিরা তথা চাচিকে সবসময় আত্মত্যাগ করে যেতে হয়েছে। আজকের এই ক্ষণিকের মুক্তি ও সাধপূরণের আনন্দকে সম্পূর্ণ উপভোগে তারা আগ্রহী। গোটা তরমুজ এই দুই নারী মিলে, তারিয়ে তারিয়ে

মনের আনন্দে উপভোগ করে। নাসিরা জানে তার জীবনের এই নিজস্বতা ও প্রাণময়তা অত্যন্ত সাময়িক। আবার তাকে থাকতে হবে সেই, 'নিরুচ্চার ও নিরুপায় হয়ে। মৌলানার বউ হয়ে। এবং তার কাছে সবকিছু সহনীয় লাগবে। মৌলানার বউ হওয়ার ভেতর সে গর্বিত হয়ে হয়ে থাকবে। মৌলানার কাছে তার আত্মসমর্পণের কণামাত্র দ্বিধা থাকবে না। যেমন করে গাছের পাতা ও পাখির মৃত পালক ঝড়ে পড়ে তেমনই হবে তার আত্মসমর্পণ।'[১০০]

একসময় নাসিরার এই নীরস জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠে চাচি। 'ঘরের ভেতর অহরহ তারা দুই মহিলা কাটায়। মৌলানার দূর সম্পর্কের চাচি ও সে। চাচি বয়স্কা ও বিধবা। তিন কুলে কেউ নেই। আজ বছর সাত হল এই সংসারের একজন হয়ে উঠেছে। চাচি তাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। রান্নার জোগাড় করে দেয়। মশলা বাটে, আনাজ কাটে। ঘর ঝাঁট মোছামুছি করে।'[১০১] নাসিরা তার জীবনের কষ্ট ভুলতে অনেকসময় কোরান পাঠ করে, আবার অনেক সময় চাচির সঙ্গে গল্প করে। নাসিরার মতো চাচিও এই অন্তঃপুরের চারদেয়ালের মধ্যে একাকী হাঁপিয়ে ওঠে। তাই নাসিরাকে চোখের আড়াল করতে চায় না সে। তাদের এই বর্ণহীন ও বৈচিত্র্যহীন জীবনকে পান-জর্দা দিয়ে সামান্য বর্ণময় করার চেষ্টা করে তারা। শুধুমাত্র মৌলানার বাড়ির আশ্রিতা বলে, নাসিরার মতো অনিচ্ছা সত্যেও চাচিকেও শেষবয়সে বোরখা পরে বাড়ির বাইরে বেরোতে হয়। জীবনের এতোদিনের সমস্ত স্বাধীনতা হারিয়ে, মৌলানা নির্ধারিত নিয়মনিষ্ঠা মেনে নিতে বাধ্য হয় সে। আর এখানে এসেই এই দুই নারীর পথ এক হয়ে যায়। তাইতো 'নাসিরা ও চাচি দুই মেয়েতে ভালো পটে। বেশ বোঝাপড়া। দুজনের মধ্যে এমনই ভাবসাব যে একে অপরের সান্ত্বনা সহায়তা নিয়ে একে অপরে বাঁচে। দুজনের মধ্যে বয়সের তফাত যথেষ্ট হলেও দুজনেই এক্ষেত্রে নারী।'[১০২] তাই তরমুজ খাওয়ার মধ্য দিয়ে নাসিরার মতো চাচিরও অবদমিত ইচ্ছা, সাধ ও আকাঙ্ক্ষা বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পায় এবং ক্ষনিকের এই স্বাধীনতা, স্বপ্ন ও সাধকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে।

মূলত সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ 'দুই নারী' ছোটগল্পে একই পরিবার বা পরিবেশে বসবাসকারী নারীর অবস্থানগত সমতা ও অসহায়তাকে তুলে ধরেছেন। তবে চাচির মতো বয়স্কা নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তথা পুরুষের শাসনের ভয়ে চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত

নিয়মনিষ্ঠাকে মেনে নিলেও, নাসিরারা একদিনের জন্য হলেও সেই ভয়কে জয় করে এবং নিজস্বতায় জেগে ওঠে। আর নাসিরার এই জেগে ওঠার মধ্যেই লেখক পরবর্তী নারীজীবনের মূলসূত্রকে ছুঁতে চেয়েছেন। হাসিনার মতো নাসিরা ও চাচিকেও ক্রমাগত নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন করেই বাঁচতে হয়। হাসিনা আম খেয়ে আর নাসিরা ও চাচি তরমুজ খেয়ে, নিজের মতো বাঁচার আনন্দটুকু উপভোগ করে। আবার বিধবা হাসিনার সঙ্গে একসময়ের বিপত্নীক মৌলানার জীবনের ধারা তুলনা করে আমরা দেখতে পায়, সমাজের নরনারীর অবস্থানগত বৈষম্যের এক বিরাট পার্থক্যকে। এখানেই 'হাসিনার পুরুষ' ও 'দুই নারী' গল্পদুটো পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। আর এই ব্যাপারে লেখকের সচেতনতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

**হিন্দু-মুসলিম পরিণয় প্রসঙ্গঃ**

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে আজও হিন্দু-মুসলিম পরিণয় একটি অনেক বড় সমস্যা ডেকে আনে দুজন প্রগতিশীল নরনারীর জীবনে। ধর্মগত ভিন্নতা থেকে আসা সামাজিক ও পারিবারিক বাধা বা বিরূপতা তাদের চলার পথকে নানাদিক থেকে বন্ধুর করে তোলে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, যে আবেগ ও প্রেমের টানে তারা ধর্মের ও সমাজের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই আবেগঘন প্রেম কমে যাওয়ায় তাদের দাম্পত্য জীবনে নানান সমস্যা বা সংকট নিয়ে আসে। এই সমস্যা অন্য কোনো শারীরিক অক্ষমতা বা মানসিক দুর্ভাবনা থেকেও হতে পারে। 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসটিতে প্রথম হিন্দু-মুসলিম পরিণয় প্রসঙ্গে লেখক, নারীজীবনের এক অভিনব সংকটকে জীবন্ত করে তুলেছেন। পাশাপাশি ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিমের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থানের মতো এক বৃহত্তর সমস্যাকেও রূপায়িত করেছেন।

**সঙ্গ নিঃসঙ্গ**

আফসার আমেদের 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত ১৯৯৩ সালে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায়। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। এই উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্র দীপা

একজন অমুসলিম রমণী কিন্তু সে মুসলিম যুবক নিজামের স্ত্রী। এদিক থেকে একজন মুসলিমের স্ত্রী রূপে দীপার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মুসলিম নারীর বিবাহিত জীবনের অসহায়তা, নিরাপত্তা ও সংকট বিষয়ক নানান প্রশ্ন। পাশাপাশি লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বা বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে, সংখ্যালঘিষ্ঠ নিজামদের অসহায়তা ও আত্মপরিচয়ের সংকটের দিকটিও। রাষ্ট্রনীতির যে স্তরে বারবার তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে হয় বৃহত্তর দেশ, রাজ্য, সমাজ, কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে স্বল্পপরিসরের পরিবার পর্যন্ত। দীপা ও নিজামের দাম্পত্যজীবনের মাঝেও এই চরম সত্যের প্রকাশ ঘটে। একজন মুসলমানের বধূ রূপে তালাক, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ক, সন্তানহীনা দীপার জীবনের নানান যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন, দুর্ভাবনা ও তাড়না উপন্যাসটিকে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে।

এগারো বছর আগে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে গিয়ে, জীবনীশক্তিতে জয়ী দুজন নরনারী, সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে দাম্পত্যজীবন শুরু করে। নিজামের মতো দীপাও আত্মীয়-পরিবার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে একজন মুসলমানকে বিয়ে করলেও দীপাকে তার ধর্ম ত্যাগ করতে হয় নি। তারা হিন্দুপাড়ারই একটি ফ্লাটে বাস করে। নিজামের সংসারে সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন দীপা, ইচ্ছেমতো সিঁদুর পড়ে, পারিপার্শ্বিক উৎসবের আমেজে পুজোর সময় সে কেনাকাটাও করে। এমনকি দীপার বাড়ির কাজের মাসি মালতীও একজন অমুসলিম। রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিলায়েত ও আমীর খাঁর সুরলহরি দিয়ে দীপার দাম্পত্যজীবন নানান সুরের মূর্ছনায় একসময় ভরে উঠেছিল। দীপা নিজেই মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসঙ্গীত গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে নিজের মনের আবেগ ও আনন্দ প্রকাশের পাশাপাশি নিজামকে মুগ্ধতায় ভরে রেখেছিল। সবকিছু মিলিয়ে ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিজামের ভালোবাসার মুগ্ধতায়, বিয়ের প্রায় পাঁচ-ছয় বছর তাদের জীবন অতিবাহিত হয় নিরঙ্কুশ সুখ ও শান্তিতে। সাংসারিক পারিপাট্যে, পারস্পরিক আন্তরিকতায়, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় বসবাসের স্নিগ্ধতায়, আত্মীয় পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও, নিজামের সঙ্গে তার দাম্পত্যজীবন স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কলেজজীবনের প্রেমের প্রেরনায় অনেক কিছু ত্যাগ করে ও অনেক সম্পর্ক হারিয়েও দীপার জীবনের প্রায় ছয় বছর, পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময়, সঙ্গ, সহায়তা, অপেক্ষা ও পরিতৃপ্তির আনন্দে

পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল, ধর্মের কোনো জায়গা সেখানে ছিল না। সারাদিন নিজামের ভালবাসার আকর্ষণে দীপা রঙিন প্রজাপতির মতো ক্লান্তিহীন ভাবে ঘোরাফেরা করতো।

আফসার আমেদ দেখিয়েছেন, জীবনের আকাঙ্খার অপূর্ণতা একজন নারীকে দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নের সম্মুখীন করে। তার এই সংকট অনেকসময় তাকে অমানবিক করে তোলে, তার সহজাত বিশ্বাস হারিয়ে যায়। তাই সন্তান ও সন্তানের আশা হারিয়ে, বিয়ের ছয় বছর পর দীপার জীবনের সব ছন্দ প্রায় এলোমেলো হয়ে যায়। এক অনাগত দুর্ভাবনা তার দাম্পত্যজীবনের প্রায় সব আনন্দকে কেড়ে নিয়ে, বসবাসের অশান্তি ও কদর্যতায় এক একসময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। তবে তার এই দুর্ভাবনা, এতো ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার মূল কারণ হল, সে নিজামের স্ত্রী, একজন মুসলমানের স্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে 'দীপার সন্তানের মৃত্যু ও সন্তান ধারণের ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ার ঘটনাকে দীপা যেভাবে দেখছে, সেটা সাংঘাতিক ও ভয়ঙ্কর। এক মানসিক বিপর্যয় হয়েছে দীপার। এটা আর এক ধরণের হিস্টিরিয়া। বিকৃতি। তাদের হিন্দু মুসলমানে বিয়ে হওয়ার জন্যে এ অভিশাপের শিকার হয়েছে। দীপার পরিবারের সকলের অভিশাপে এসব হয়েছে। এটা এখন দীপার বদ্ধমূল ধারণা। এটা এক ধরনের মানসিক বিকার দীপার। সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে উঠেছে ওদের। ভয়ানক বিচ্ছিন্নতা।'[১০৩] মূলত মৃত সন্তান প্রসবের পর থেকেই, দীপার জীবনের স্বাভাবিকতা ও সহজতা হারিয়ে যায়। নিজামের সঙ্গে তার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা, বসবাসের নির্ভরতা, আন্তরিক কথাবার্তা এবং দাম্পত্যের মাধুর্যতা অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। সন্তান হারানোর যন্ত্রণা, সন্তানদানের অক্ষমতা, একাকিত্ব, দুর্ভাবনা, অসহায়তা প্রভৃতির জন্য দীপা যেমন নিজেকে কষ্ট দেয়, তেমনি নিজামকেও কষ্ট দেয়। সে মাঝে মাঝে নিজামের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, আবার মাঝে মাঝে 'ভীষণ ও ভয়ংকর' হয়ে যায়।

তাছাড়া মুসলমানকে বিয়ে করে আত্মীয় পরিবারের দ্বারা অভিশপ্ত হয়, এই ভাবনার পাশাপাশি দীপা একজন মুসলমানের স্ত্রী হওয়ায়, সবসময় এক চরম নিরাপত্তাহীনতায়, নিজামের ভালোবাসা হারানোর আতঙ্কে আক্রান্ত থাকে। মুসলিম ধর্মে বহুবিবাহ বৈধ। এক্ষেত্রে অনেক মুসলিম পুরুষই প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হলে, হয় তাকে তালাক দেয় কিংবা দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনে। স্বজনহারা ও সন্তানহারা দীপা স্বাভাবিকভাবেই নিজের দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তার

ব্যাপারে এক চরম দুঃশ্চিন্তায় অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই সে কারণে-অকারণে নিজামের ধর্মীয় অনুভূতির দুর্বল জায়গায় বারবার আঘাত করে, 'না, আমি মরে গেলে ভাল ছিল। কতদিন এই ভালবাসা থাকবে তোমার?' নিজামের হাতের ভেতর থেকে নিজের বাঁ হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চায় দীপা।

নিজাম আরো জোরে চেপে রাখে। 'কি বলছ কি?'

'তুমি আর একটা বিয়ে করতে পার।'

'ছিঃ ছিঃ।'

'করার অধিকার তোমার আছে। তুমি মুসলমান। চারটে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে।'

'দীপা!'

'আমি নিরাপদ নয় তোমার কাছে।'[১০৪]

নিত্যদিনের এই তিক্ততা থেকে নিজেকে বাঁচাতে নিজাম যখন 'বার' থেকে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরে, তখন নিজের দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তা নিয়ে দীপার দুঃশ্চিন্তা ও ভয় আরও বেশি তীব্রতর হয়। সে এই অবস্থায় মুসলমান নিজামকে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যায়গা থেকে আঘাত করে অকপটে বলে, 'মাতাল অবস্থায়ও তোমরা তালাক দিতে পার।'[১০৫] এইভাবে দুজন নরনারীর দাম্পত্যের সমস্ত মাধুর্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবাষ্পে নষ্ট হয়ে যায়। সম্পর্কের তিক্ততার তীব্রতায় তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। নিজামও মাঝে মাঝে নিজের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার জায়গা থেকে দীপাকে উপেক্ষা করে, ভুল আচরণ করে। দীপার যন্ত্রণা, একাকিত্ব, আশংকা ও ভয়ের যুক্তিসঙ্গত কারণ জেনেও, সে নিজের সংখ্যালঘু জনিত অপমান ভুলে যেতে এবং দীপার অমূলক আশংকার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে, পরের দিন আরও বেশি মদ খায়। আর এই ভুল পন্থায় দীপাকে বোঝাতে চায়, 'সে তালাক দিতে বা ত্যাগ করতে চায়নি। মুসলমান মানেই খারাপ, কথাটার মধ্যে যে অন্ধত্ব আছে তেমনি, মুসলমান মানেই তাদের স্ত্রীদের ধরে ধরে তালাক দেয় এই কথার মধ্যে একই অন্ধত্ব। হ্যাঁ, কিছু অর্থলোভী মানুষ তালাকের সুযোগ গ্রহণ করে। এই বিধির খারাপ দিকটা নিজাম মানে। তা ছাড়াও তো নারীপুরুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন আছে! প্রেমে সহমর্মিতায় বন্ধুতায় সহযোগিতায়

বিধিরহিত বিধির অক্ষরবিন্যাসের অনেক ঊর্ধ্বে তারা থাকে। আসলে নিজামের প্রেমকে কিছুটা অভিযুক্ত করে বসে দীপা। শরিয়তি আইন আর প্রেম এখানে সমার্থক নয়।'[১০৬] নিজামকে এতো ভালোবেসেও, এতো কাছ থেকে চিনেও, শুধুমাত্র এই অন্ধত্বের জন্যই দীপার জীবনের সমস্ত শান্তি নষ্ট হয়।

নিজামকে সন্তানসুখ দিতে না পারার অসহায়তা থেকেই দীপার মনে আশঙ্কা জন্মায়, নিজামের জীবনে বা সংসারে তার প্রয়োজন একদিন ফুরিয়ে যাবে। নিজাম সন্তানের জন্য অন্যান্য অনেক মুসলমান পুরুষের মতোই হয় আর একটি বিয়ে করবে, নয় তাকে তালাক দেবে। এদিকে নিজামকে পাওয়ায় জন্যই দীপা অন্যান্য সমস্ত বন্ধনকে ছিন্ন করেছে। স্বাভাবিকভাবেই নিজামের ভালোবাসা ও সংসার ছাড়া তার আর কোনো জায়গা নেই। একজন মুসলমানের স্ত্রী না হলে, দীপার মনের এই আশংকা, আতঙ্ক ও নিরাপত্তার প্রশ্ন এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত না নিঃসন্দেহে। ১৯৯৩ সালের ২৯ শে মে, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'টানা তিন তালাকে বিচ্ছেদ নয়, ফতোয়া মুসলিম গোষ্ঠীর' খবরে দীপা কিছুটা স্বস্তি পেলেও, তার মনের গহীনে সারাক্ষণ, নিজামকে হারিয়ে ফেলার একটা আতঙ্ক কাজ করে চলে। এই ভয়ের জায়গা থেকেই সে, কাজের মাসি মালতিকে নিয়ে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা ও গুছিয়ে রাখার মধ্যে দিয়ে যেন সংসারে নিজের প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করে। আবার কখনো ধর্মকে আশ্রয় করে। তাই বিয়ের এগারো বছর পর সে নিজামকে নিয়ে প্রথম বেলুড় মঠে যায় মানসিক শান্তি খুঁজে পেতে।

তবে মাঝে মাঝে আত্মিক সংকটে জরাজীর্ণ দীপা নিজামের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করলেও, তার সুন্দর মনের সৌজন্যতাবোধ কিন্তু হারিয়ে যায় নি। তাই তালাক বা বহুবিবাহ প্রভৃতি নানান অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ নিয়ে নিজামকে আঘাত করে সে অনুতপ্ত হয়, মর্মাহত নিজামের কাছে বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করে। মন ভালো থাকলে যেমন সে বাঙালি বধূর সাজে, দরজা আলগা রেখে নিজামের অপেক্ষা করে, তার পছন্দের চাইমিন, চা, সিগারেট ও গান শোনার সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে। তেমনি মন খারাপ করে চুপচাপ শুয়ে থাকলে, ব্যাঙ্ক ফেরত ক্ষুধার্ত নিজামের পছন্দের খাবার না তৈরি করলেও, অন্তত চা, মিষ্টির ব্যবস্থা সে করে রাখে। অনেকসময় দীপা তার আন্তরিক

ভালোবাসা ও যত্নে নিজামের প্রয়োজন ও অনুভূতিকে স্পর্শ করে মুগ্ধ করে একজন প্রকৃত জীবনসঙ্গীর মতোই। তৃষ্ণার্ত নিজামকে জলপানের কথা স্মরণ করিয়ে, খবরের কাগজ পড়ার সময় বেশি পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে, নিজামের কাঙ্ক্ষিত বিলায়েত বা আমির খাঁর গান চালিয়ে, নিজামের পছন্দের রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে, বাথরুমের আলো জ্বালিয়ে, ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দিয়ে, বারবার চা এর জোগান দিয়ে এক এক সময় দাম্পত্যের স্নিগ্ধতায় নিজামের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে দীপা। আবার এক এক দিন জীবনের এই স্নিগ্ধতা থেকে সরে এসে, নিজের জীবনের পাশাপাশি নিজামের জীবনকেও তিক্ততায় ভরিয়ে তোলে। দীপার মানসিক বিপর্যয়ে, স্বামীস্ত্রীর স্বাভাবিক কথা বলার সম্পর্কও তারা একসময় হারিয়ে ফেলে। দীপার মনের এই অস্বাভাবিক আতঙ্ক ও জটিলতার জন্যই নিজাম সাহানারার কথা গোপন করে।

নিজাম, সাহানারার কথা গোপন করায়, সন্দেহবাতিক দীপার মানসিক বিপর্যয় বহুগুনে বাড়িয়ে তোলে। যদিও নিজামের অতিথি হোসেন ও সাহানারার আতিথেয়তায় কোনো ত্রুটি সে করে নি, কিন্তু মনে মনে আরও ভয়ংকর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। এক চরম আশঙ্কা থেকে দীপা, সাহানারাদের বিদায় দেওয়ার এক ঘণ্টা পরেই নিজামের খোঁজে ব্যাঙ্কে যায়। বাইশ-তেইশ বছর বয়সের উজ্জ্বল সাহানারার লাবন্যে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজাম, দীপাকে মিথ্যে বলে হোসেন ও সাহানারার সঙ্গে সিনেমা গেছে কিনা, তা যাচাই করে দেখতে। সাহানারার প্রসঙ্গ তুলে দীপা অকারণে নিজামকে ইতর, ছোটলোক, বিশ্বাসঘাতক ও চরিত্রহীন বলে আক্রমণ করে। আবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জায়গা থেকে নিজামকে সে অপমান করে বলে, 'ও যথেষ্ট অ্যাডাল্ট। তোমরা মুসলমানরা তোমার বয়সে ওই বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেনি কেউ, বলছ ?'

'আরে ও তো আমার বোন হয়।'

'বোনকেই তোমরা বিয়ে কর।'[১০৭]

শেষপর্যন্ত সাহানারার হিন্দু প্রেমিকের কথায় দীপা আশ্বস্ত হয়। ক্রমে দীপার এই অকারণ দুর্ভাবনা, আতঙ্ক, অসহায়তা ও দুঃখ নিজামের কথায় অনেকটাই দূর হয়। নিজাম দীপাকে বোঝাতে সফল হয় যে, সন্তান হারানোয় দুর্ঘটনার দায় তাদের দুজনের, দীপার একার নয়। তাই দীপার জীবনের তথা তাদের দম্পত্যজীবনের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতেই একটি

দত্তক সন্তানের সিদ্ধান্ত নেয় নিজাম। দীপা সন্তানের সুখস্বপ্নে মনের সমস্ত দুর্ভাবনা ও আতঙ্ক ভুলে গিয়ে, আবার নতুন জীবনীশক্তিতে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

একথা সত্য যে, দীপা শেষপর্যন্ত নিজামের স্ত্রী হয়েই থাকে, একজন মুসলমানকে ভালোবেসে, মুসলমানের স্ত্রী হতে পারে না। তাই সে বারবার নিজামকে ধর্মের জায়গা থেকে আঘাত করে। অথচ নিজাম কখনো দীপার ধর্মকে খাটো করে নি। তার স্বাধীনতা বা ধর্মাচরণে কোনোরূপ বাধা দেয় নি। বরং দীপা নিজামকে বেলুড়মঠে নিয়ে গিয়ে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করায়। নিজামের এই সংকট কিন্তু দীপা বোঝে না। পাশের ফ্লাটের দিদি যখন ছেলের কুরুচিকর আচরণকে 'এঃ মুসলমান' বলে সম্বোধন করে, তখনও সে দিদির কথায় সহজ ভঙ্গীতে হেসে ওঠে। সংখ্যাগুরু দীপা, সংখ্যালঘু নিজামের এই অপমান, হীনমন্যতা, অসহায়তা ও আত্মপরিচয় জনিত সংকটের সঙ্গী হতে পারে না। কারণ এই রাষ্ট্র, সমাজ, কর্মক্ষেত্রে বা পারিবারিক অবস্থানে সংখ্যাগুরু সমাজের একজন হিসেবে, দীপা কখনো এই হীনমন্যতা বা আত্মপরিচয়ের সংকটের সম্মুখীন হয় নি। তাই সে নিজেও বারবার নিজের অভিশপ্ত জীবনের জন্য নিজামের ধর্মকে দায়ী করে, মুসলিম সমাজ ও ধর্ম তুলে আক্রমণ করে। নিজামের মানসিক যন্ত্রণা, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গ জীবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠতে পারেনা দীপা।

'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসে যে সময়কালের কথা লেখক আফসার আমেদ বলেছেন, সেই সময়ের অধিকাংশ মুসলিম নারীদের তুলনায় ভাবনা-চিন্তায় ও ব্যবহারে সাহানারা অনেকটাই আলাদা। যে সময়ে মুসলিম মেয়েরা সহজে কলেজের গণ্ডী পেরোতে পারতো না, সেইসময় সাহানারা বি-কম পাশ করেছে। এই শিক্ষা তার মনে সমাজে প্রচলিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস জুগিয়েছে, যা একদিন নিশ্চয় তার মুখে প্রতিবাদের ভাষা জোগাবে। তার দিদি জাহানারা যেখানে নিজামকে নিজের ভালোবাসার কথা বলতে পারেনি, সেখানে সাহানারা একজন অমুসলিম ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছে। শুধু তাই নয়, সমাজের ও পরিবারের বিপক্ষে গিয়ে প্রেমিকপুরুষকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তও সে নিয়েছে। সাহানারার এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা, তা জানা যায় না। কিন্তু মুসলিম সমাজের একজন নারীর পক্ষে, অমুসলিম ছেলেকে বিয়ে করার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত সেই সময়ের প্রেক্ষিতে একেবারেই ব্যতিক্রমী।

তাছাড়া নিজস্ব মতাদর্শের দিক থেকেও সে অনেকটাই উদার ও আধুনিক-'জানেন নিজামদা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, আমি একদম দেখতে পারি না। আমার অত জ্ঞান নেই, পাণ্ডিত্য নেই কিন্তু। এক এক সময় নিজেকে এত অসহায় মনে হয়।'[১০৮] এই অসহায়তার জন্যই মনে মনে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও, সে পরিবারের চাপে কোলকাতায় পাত্রকে দেখাতে আসে, বাধ্য হয় নিজের এই অপমান সহ্য করতে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজে তালাক ও বহুবিবাহ বহুলাংশে কমে যায়। এই সমাজসত্যের কথা সাহানারা জানে বলেই, দীপার মতো সে তালাক বা বহুবিবাহ নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। বরং তার চিন্তা বা ভয় অন্য জায়গায়, 'জানেন নিজামদা, আমার খুব ভয় করে, আমার কোথায় বিয়ে হবে—এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে হল, তার সঙ্গে আমার বনিবনা হল না। অথচ তার সংসার করে যেতে হবে। সংসারে মেয়েদের স্বাধীনতা বলে কিছুই নেই। বিশেষ করে আমাদের সমাজে। দুশ্চিন্তা হয়, হয়ত আত্মহত্যা না করে বসি।'[১০৯] এখানে সাহানারা মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকারের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে। তার শিক্ষিত মন নারীর অধুনা জীবনসংকটকে স্পর্শ করেছে। সেদিক থেকে যুক্তি, উপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনায় সাহানারা অনেক বেশি আধুনিক।

'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসের আর এক মুসলিম নারী, নিজামের মায়ের জীবনযন্ত্রণার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য। নিজাম ও দীপার পরিণয় প্রসঙ্গে, স্বামী ও সন্তানের লড়াইয়ে এই রমণী সবথেকে বেশি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এত বছরের দাম্পত্যজীবনেও সে স্বামীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি। স্বামীর সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিতেই, বারো বছর নিজামকে না দেখার যন্ত্রণা পেয়েছে সে। স্বামীর জেদের কাছে তার মাতৃত্বের আকুলতা রুদ্ধ হতে বাধ্য হয়। দীপাকে বিয়ে করায় নিজামকে ত্যাজ্যপুত্র করে তার বাবা। অথচ সন্তানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করার যন্ত্রণা নিজামের মাকে বয়ে বেড়াতে হয় সারাজীবন। তার মতামত ও চাওয়া-পাওয়ার কোনো মুল্য নেই সংসারে। এতদিনের সংসারজীবনেও নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বামীর অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার ভাষা সে অর্জন করতে পারে নি।

আফসার আমেদ এই উপন্যাসে প্রথম, কলকাতাকে পটভূমি রূপে গ্রহণ করেছেন। লেখক অশিক্ষিত, দরিদ্র জনসাধারণের মাটির পৃথিবী থেকে সরে এসেছেন, শহুরে শিক্ষিত ও

মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিনতায়। এই উপন্যাসে লেখক কলকাতার চলিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। এখানে যেমন তিনি দীপার মধ্য দিয়ে একজন মুসলমান বধূর সংকটকে নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, তেমনি বৃহত্তর সমাজভাবনায় বাঙালি সংখ্যালঘু নরনারীর আত্মপরিচয়ের সংকটের বাস্তবোচিত বর্ণনা দিয়েছেন, 'মুসলমান হয়ে জন্মানোর গ্লানি প্রতিটি মুসলমানকে বোধহয় কম বেশি বহন করতে হয়। এটা ভারতবর্ষের মুসলমানদের একটা বড় সমস্যা। অফিসে, পাড়ায়, রাস্তায় পথচলতি কোলাহলতায় নিয়ত এক সমস্যা বয়ে বেরায়। তার মধ্যে তাকে বাস করতে হয়, ছদ্ম স্বাভাবিক ও ছদ্ম স্পষ্ট হতে হয়। এই সমস্যা ও গ্লানি নিরপেক্ষ রেখেই তাকে থাকতে হয়। কোনো প্রতিবাদ না করেই তাকে থাকতে হয়। প্রতিবাদ করলে বিশ্রী দেখায়, সাম্প্রদায়িক মনে হয়। অপমান সহ্য অনেক ভাল, সাম্প্রদায়িক চিহ্নিত হওয়ার চেয়ে।'[১১০] পাশাপাশি নিজামের মা, জাহানারা ও সাহানারার সামাজিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে আফসার আমেদ, উপন্যাসমধ্যে মুসলিম নারীর ক্রম পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল জীবনের একটি স্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

**দাঙ্গা প্রসঙ্গঃ**

**ব্যথা খুঁজে আনা**

আফসার আমেদের 'ব্যথা খুঁজে আনা' উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে, 'শারদীয় প্রতিক্ষণ' পত্রিকায়। ১৯৯৪ সালে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সময়সচেতন লেখক আফসার আমেদ, উপন্যাসের কাহিনি অংশে রামমন্দির ও বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে, ১৯৯২ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার এক বাস্তবচিত্রকে সুনিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। ১৯৯২ সালের ৬-ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়, পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা শহরও তা থেকে রক্ষা পায় নি। সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এই উপন্যাসে দাঙ্গাবিধ্বস্ত শহর কোলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার মানুষের জীবনসংকটকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বসবাসকারী অসহায়, দরিদ্র বস্তিবাসীরাও এই সংকট থেকে রক্ষা পায় নি। যাদের জীবনে রামমন্দির বা বাবরি মসজিদের

কোনো গুরুত্ব নেই, অধিকাংশ দিন যারা প্রায় না খেয়ে থাকে, দাঙ্গাকারীরা তাদের বস্তিতে আগুন দিয়ে ন্যূনতম আশ্রয়টুকুও কেড়ে নেয়। লেখক এই ভয়ংকর দাঙ্গার কারণ খুঁজতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতা ও কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষের পাশাপাশি দায়ী করেছেন স্বার্থান্বেষী, সমাজবিরোধী দাঙ্গাকারীদের অসুস্থ মানসিকতাকে। এই অমানবিক দাঙ্গায় একাধারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হিন্দু, মুসলিম এবং অসহায় বস্তিবাসীরা। অথচ হিন্দু বা মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সিংহভাগ মানুষই দাঙ্গাবিরোধী মনোভাব পোষণ করে। লেখক এই উপন্যাসে এই সত্য তুলে ধরার পাশাপাশি দেখিয়েছেন, দাঙ্গাকারীদের প্রকৃতভাবে কোনো ধর্ম হয় না। তারা কেবলমাত্র নিজেদের সুবিধার্থে নিরীহ, শান্তিকামী সাধারণ মানুষের জীবনকে আতঙ্কগ্রস্ত ও দুর্বিষহ করে তোলে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব এসে পড়ে নারীজীবনেও সমানভাবে। অলকা ও জয়তীর মতো নেহা, নেশা, জমিলা ও নাজমার জীবনেও দাঙ্গা এক চরম সংকট ডেকে আনে। এই সংকট একদিকে যেমন নাজমার আসন্ন বিয়েকে বিপর্যয়ের মুখে এনে দাঁড় করায়, তেমনি নেশার বিপর্যস্ত জীবনকে আবার নতুন করে সাজানোর সুযোগ এনে দেয়।

নবদম্পতি নেহা ও গালিবের মাদকতাময়, আবেগপূর্ণ প্রেমময় জীবনযাপনে দাঙ্গার আতঙ্ক বারবার ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। নেহা শিক্ষিত হলেও অন্যান্য নারীর মতো বাবরি মসজিদ ধ্বংসের খবরে তেমন বিচলিত না হয়ে, গৃহকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে তাদের কোয়ার্টার হিন্দুপাড়া তারাতলায় এবং বাড়ি দমদমের একটি হিন্দু পাড়ায় অবস্থিত বলে, সে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা না করে পারে না। কারণ যেকোনো দাঙ্গায় মুসলিম পাড়ায় অবস্থিত দু-একঘর হিন্দু বাড়ির যেমন নিরাপত্তার চরম সংকট দেখা দেয়, তেমনি কোনো হিন্দু পাড়ায় অবস্থিত দু-একঘর মুসলিম পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই দাঙ্গা জনিত মানসিক নিরাপত্তাহীনতাবোধ ও উৎকণ্ঠা নেহার নতুন দাম্পত্যের আবেগ ও মাধুর্যকে বারবার ক্ষুন্ন করে। এমনকি গালিবও নেহাকে একান্ত করে পাওয়ার চরম মুহূর্তেও দাঙ্গার খবর শোনার উত্তেজনায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মানুষ হওয়ার জন্য, তাকে বারবার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে অফিসে, রাস্তায় ও চায়ের দোকানে অকারণে অপমানিত হতে হয়, যা তার মনকে উত্তেজিত করে। হিন্দুপাড়ায় থাকার দরুন সে নিজের মুসলিম পরিচয় সকলের সামনে না বলতে পারার

গ্লানিতে মনে মনে নিজের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গালিবের মনের দাঙ্গাজনিত এই সমস্ত অপরাধবোধ, ক্লান্তি, উত্তেজনা ও আতঙ্কের প্রভাব পড়ে নববধূ নেহার জীবনে। বাবার বাড়ি যেতে না পাওয়ার জন্য নেহা যে অভিমান করে, সেই অভিমান ভাঙ্গাতে গালিবের একান্ত ও নিবিড়তাকে ক্ষুন্ন করে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংকট-চিন্তা। তাই মাত্র দেড়মাসের বিবাহিত গালিব শীতের রাতে, লেপের মধ্যে নেহাকে একান্ত উদ্দামতায় পেতে চেয়েও, টিভিতে দাঙ্গার খবর শোনার সময়, 'নেহা দেখল, গালিব তার কাছ থেকে একটু একটু করে সরে গেল। বুক থেকে নেহাকে সরিয়ে দিয়েছে গালিব। হাতটাও নেহার শরীর থেকে তুলে নিয়েছে। এক অনাস্থার দশায় আছে গালিব।'[১১১]

ক্রমে কোলকাতার চারদিকে ছড়িয়ে পড়া দাঙ্গার খবরে ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষের কথার প্রেক্ষিতে, তাদের জীবনে নেমে আসে, এক নিরাপত্তাহীন আতঙ্ক। তাই তারা স্টোভের পিন নেওয়ার জন্য আগত প্রতিবেশীর দরজার কড়া নাড়ানোতে আতঙ্কিত হয়। ঘরে বন্দী অবস্থায় প্রতি মুহূর্তের আতঙ্কে এই নবদম্পতি অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। দাঙ্গার রুদ্ধশ্বাস আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেতে তারা দাঙ্গা বহির্ভূত কিছু আলাপের চেষ্টা করে। বি. এ. পাশ নেহা উচ্চতর ডিগ্রি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে গালিবের কাছে। লুকোচুরি খেলার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শান্তিকামী মানুষের প্রচেষ্টা ও সরকারী উদ্যোগে কোলকাতা শহরে অনেকটাই শান্তি ফিরে আসে। নেহার পরিপাটি করে সাজসজ্জার মধ্যেও এই ইঙ্গিত খুঁজে পায়। এই সময় আসলামের আকস্মিক আগমন ও তার সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কথায় নেহার জীবনের আনন্দ ও সাজসজ্জা অনেকটা বিঘ্নিত হয়। কিন্তু শান্তিকামী গালিব, আসলাম বাড়ির হবু জামাই ও চাচাতোভাই হওয়া সত্ত্বেও একজন দাঙ্গাকারীকে আশ্রয় না দিয়ে, প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে। নেহা তার জীবনকে সাজাতে খুলে রাখা টিপটি পুনরায় কপালে পরে, চোখে কাজল পরে। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয়, তাই বাড়ির মধ্যেই নেহা তার প্রেমের স্বর্গ রচনায় উদ্যোগী হয়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আবার নেহার দিদি, নেশার জীবনে একভাবে আশীর্বাদ নিয়ে আসে। তার পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে প্রায় একবছর থেকে সে বাবার বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছে। স্বামীর অত্যাচারকে সে মুখ বুজে সহ্য করে নি। তাই স্বেচ্ছায় এক কাপড়ে তার

বাবার বাড়িতে চলে আসা, স্বামী বদিউরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এটি তার একটি প্রতিবাদ। ইতিমধ্যে বদিউরের ভাই তাকে তিনবার ফিরিয়ে নিতে আসে, কিন্তু নেশা তাকে বারবার ফিরিয়ে দেয়। কারণ তার ইচ্ছা, তার স্বামীই তাকে সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে যাক। এদিকে বদিউর ইচ্ছে সত্ত্বেও শালাদের হাতে অপমানিত হওয়ায় আশঙ্কায় একবারও শ্বশুরবাড়ি আসতে পারে নি। ফলে এই একবছর নেশার জীবনের সংকট জটিল আকার ধারণ করে। যদিও বাবার বাড়িতে মায়ের অসুস্থতার জন্য তার অবস্থান ছিল সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে। নেহার বিয়ের পর তার এই প্রয়োজন আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। তবুও বাবা, মা ও ভাই নৌশাদের মতো নেশার মনেও, তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা সারাক্ষণ তাড়িত করত। তাছাড়া বদিউরকে জীবনে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যথিত নেশা, বিষণ্নমনেই সংসারের সমস্ত কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নেশার অনিশ্চিত জীবনের বিষণ্নতার থেকে বড় হয়, নিজেদের নিরাপত্তা। হিন্দু পাড়ায় বসবাস করার দরুন তারা সারাক্ষণ প্রাণভয় ও আতঙ্কে বিনিদ্র প্রহর গুনতে থাকে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ভাঙার খবরে যখন কোলকাতা শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কয়েকজন উত্তপ্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন যুবকের শাসানিতে, এই পরিবার একটি ভয়ংকর জীবন সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, 'কিন্তু পরিস্থিতি আরো ভতাবহতার দিকে চলে যাচ্ছে অতিদ্রুত। সামনে ভয়াল অন্ধকারের সম্ভাবনার অশুভ ইঙ্গিত বাতাসে টের পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে এখানে থাকা অসম্মানের, অপমানকর। প্রতিনিয়ত মানসিক পীড়ন রক্তের মধ্যে বয়ে বেড়ায়। নিদ্রায় জাগরণে শান্তি থাকে না। ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে সময়ের প্রতিটি বিন্দু যাপন। আগের অভিজ্ঞতার চেয়ে আরো অনেক বেশি ভয়াভয়তার ইঙ্গিত পাচ্ছে নৌশাদ। অথচ গতকালও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিবেশ ছিল না। সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল।'[১১২]

এইরকম পরিস্থিতিতে যেকোনো মুহূর্তে তাদের উপর নেমে আসতে পারে দাঙ্গার ভয়াল রূপ। এহেন চরম নিরাপত্তাহীন, সংকটময়, ভয়ার্ত মুহূর্তে বদিউরের অভাবনীয় আকস্মিক আগমনে সকলেই যেন প্রাণ ফিরে পায়। এই সংকটময় মুহূর্তে বদিউর একজন প্রকৃত মানুষের মতো সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে, যথার্থ বাড়ির জামাই ও নেশার স্বামীর দায়িত্ব পালন করে পরিবারটিকে উদ্ধার করতে আসে। বদিউরের আগমনে একদিকে যেমন এই পরিবারটি দাঙ্গার

নিষ্ঠুর আতঙ্ক থেকে রক্ষা পায়, তেমনি তারা নেশার জীবনের সমস্ত বিষণ্নতা ও অনিশ্চয়তা কাটিয়ে, একটি স্বস্থিত ভূমি খুঁজে পায়। এইদিক থেকে বলা যায়, দাঙ্গা নেশার জীবনের সমস্ত বিরহ, ক্লান্তি, বিষণ্নতা ও জটিলতাকে দূর করে, নতুনভাবে সংসার-জীবন শুরু করার একটা সুযোগ এনে দেয়।

নেহা ও নেশার মা হাঁপানি রোগাক্রান্ত এমন একজন মহিলা, যে ঠিকমতো খেতে পর্যন্ত পারে না। এই অসহায়, দুর্বল রমণী দাঙ্গায় আতঙ্কগ্রস্ত পরিবারের কল্যাণের জন্য, নিরুপায় হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে নামাজের মধ্য দিয়ে, 'নৌশাদের মা নামাজের পাটিতে ঠায় বসে আছে। সেই যে সন্ধ্যার নামাজ পড়তে বসেছিল, নামাজ শেষ করে সেই থেকে বসে আছে। রাতের নামাজ আবার পড়ে নেবে। রাতের নামাজের সময়ের অপেক্ষা করছে। ঠোঁট দটো তার সারাক্ষণ নড়ছে। সরু ঠোঁট দুটি। যেন ফুলের পাপড়ি নড়ছে। বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দোওয়া দরুদ পড়ছে ঠোঁটদুটি।'[১১৩] তাই এই চরম সংকটকালে, বদিউরের আকস্মিক আগমনে, বিপদমুক্তির আনন্দে সে কেঁদে ফেলে। রোগা ও অসুস্থ শরীরেও, বাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে সে গৃহিণীর কর্তব্য একেবারেই বিস্মৃত হয় নি। স্বামী জিশান আলির তৎপরতার মাঝেও সংসারের মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দ্রুত হাতে গুছিয়ে নিতে সে ভোলে না।

১৯৯২ সালের দাঙ্গা যেমন নেশার বিপর্যস্ত দাম্পত্যজীবনকে একটি সুন্দর পরিণামের দিকে নিয়ে গেছে, তেমনি নাজমার আসন্ন বিয়েতে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের সিদ্ধান্তে, চাচাতো ভাই আসলামের সঙ্গে নাজমার বিয়ের দিন ঠিক হয় ২৯শে ডিসেম্বর। বাবার সিদ্ধান্তে হলেও, আমির খানের মতো সুন্দর ও পরিপাটি চেহেরার আসলামকে, নাজমা ধীরে ধীরে ভালবাসতে শুরু করে। এমনকি আসলামের মায়ের দেওয়া আশীর্বাদী সোনার হারটিও সে সবসময় পরে থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার দিন আসলামের হাতে একটি শাবল ও একটি রড দেখে নাজমার মন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। দাঙ্গাকারীর একজন রূপে আসলামের প্রতি তার জেগে ওঠা ভালোবাসা ভয় ও লজ্জায় কেঁপে ওঠে। এই অমানবিক কাজে আসলামকে বাধা দিতে না পারার অসহায়তায়, 'ছাদের সিঁড়ির কাছে গিয়ে নীরবে কাঁদতে থাকে নাজমা। তার আব্বা আর চাচা দুজনে ঠিক করেছে তাদের বিয়ে। আসলাম দেখতে সুন্দর। সকলেরই পছন্দ হবার কথা। কিন্তু কোথাও যেন এক আপত্তি ছিল। আসলামের

স্বভাবের ব্যাপারে। চোয়াড়ে, বদরাগী। সে সব মেনে নিয়েছিল নাজমা। এখনো মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তাই সে কাঁদছে। সে যে মেয়ে হয়ে জন্মেছে। মেয়ে হয়ে জন্মাবার খুব দুঃখ আছে। এটা তার আত্মবিসর্জনের কান্না।'[১১৪]

একজন আত্মসচেতন, শিক্ষিতা, মুক্তমনা নারীর পক্ষে কখনোই কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দাঙ্গাকারীকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে দাঙ্গাকারীদের অমানবিকতায় অমুসলিম প্রতিবেশী জয়িতাদের তাদের বাড়ি আশ্রয় নিতে হয়, সেজদা রাকিবকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তার বাকি দাদা ও বাবা পুলিশের ভয়ে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়, সেই দাঙ্গাকারীর কোনো একজনের সঙ্গে সে তার জীবন কাটাতে পারবে না। তাই শেষপর্যন্ত সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংকট কাটিয়ে নাজমা আসলামের মায়ের দেওয়া আশীর্বাদী সোনার হারটিও খুলে ফেলে। কারণ হারটি তার কাছে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রণাদায়ক বোঝা হয়ে উঠছিল। তাই হারটি খুলে মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে, পক্ষান্তরে বিয়েতে অসম্মতি জানিয়ে, সে শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পেয়েছে। অবশ্য মাও তার সমব্যাথি হয়ে, তাকে সমর্থন করেছে স্বামীর মতামতের কথা না ভেবেই। তাছাড়া পরিবারের মানবিক সংস্কারে লালিত রাকিব ও গালিবও যে নাজমার ইচ্ছেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহযোগিতা করবে, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। এক্ষেত্রে দাঙ্গা নাজমার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুরক্ষিত করার এবং নিজের জীবন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা অবকাশ এনে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

নাজমার মা জমিলা বিবির সংসারজীবনে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার খবরে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কিন্তু মসজিদ ভাঙার দরুন সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তার সংসারজীবনে নানারকম প্রভাব ফেলে। এই দাঙ্গা দেশ, রাজ্য বা শহরজুড়ে যখন এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তখন প্রকৃত গৃহিণীর মতোই লক্ষ্য করা যায় 'জমিলার সংসার জুড়ে সতর্কতা অনেক বেশি। সংসার যেন ঠিকভাবে চলে। সংসারকে যেন ক্ষুন্ন করে না কিছু। দেশে দুঃসময় লেগেছে, কিন্তু সংসার আক্রান্ত না হয়। এটা দেখে জমিলা। সংসারকে স্বাভাবিকভাবে গড়াতে দিতে চায়। ঘরটুকুই তার সাম্রাজ্য। দৈনন্দিনের খুঁটিনাটির ব্যত্যয় না ঘটে সেটা দেখে। একটু আগে ডাল বড়ি দিয়েছে। চাল ধুতে গিয়ে দু চারটি চালের কণা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, প্রতিটি কণা খুঁটে খুঁটে তুলেছে। কাঁথাবালিশ রোদে শুকতে দিয়েছে। বাইরে দুঃসময় আছড়াচ্ছে। সে

জানে। সেখানে জমিলার করার কিছু নেই। ঘরের স্বাভাবিকতা দিয়ে তাকে রোধ করতে যায় যেন। সযত্নে ও ঘনিষ্ঠতায় সারাক্ষণ সজাগ জমিলা।’[১১৫] তাই তার সংসারসাম্রাজ্য থেকে দূরে, দাঙ্গাবিদ্ধস্ত কোলকাতার তারাতলার কোয়ার্টারে থাকা মেজছেলে গালিবের নিরাপত্তার কথা ভেবে সে উদ্বিগ্ন হয়। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস আনার জন্য সেজছেলে রাকিব বাড়ির বাইরে বেরোলে, কার্ফু আইন অমান্য করার অপরাধে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে, সন্তানস্নেহে আকুল জমিলা সারাদিন চোখের জল ফেলে। তবে শুধু নিজের সংসার বা সন্তানদের প্রতি নয়, জমিলার এই আন্তরিক ও সজাগ-সযত্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়, দাঙ্গায় আশ্রিত প্রতিবেশী অনিলবাবুর পরিবারের প্রতিও। অন্তঃসত্ত্বা জয়িতা চারদিকে এই বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে গর্ভস্থ সন্তানের সাড়া না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লে, জমিলা ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলে গিয়ে জয়িতার পাশে দাঁড়ায় মায়ের সমস্ত উৎকণ্ঠা ও আকুলতা নিয়ে। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আশ্বাসে জয়িতা এই সংকটের মাঝেও কান্না থামিয়ে অনেকটা আশাবাদী হয়। চাচির কথায় জয়িতা ভরসা পায়। নানা টানাপড়েনে জয়িতার সন্তানের অনুভুতি ফিরে পেলে, জমিলার মুখেও যুদ্ধজয়ের শান্তি ও স্বস্তি দেখা যায়। কিন্তু এই সংকট কাটানোর পরক্ষণেই, রাকিবকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তার মাতৃসুলভ কান্না শুরু হয়ে যায়। আবার যখন তার সংসারসাম্রাজ্য থেকে স্বামী ও সন্তানেরা পুলিশের চিরুনিতল্লাশের ভয়ে অন্যত্র গমন করতে বাধ্য হয়, তখনই কান্নার বাঁধ ভাঙে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তার সাম্রাজ্যকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এই সংকটের মাঝে, অলকা ও জয়িতাকে বিদায় জানাতে গিয়েও সে কেঁদে ফেলে। তবে এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতেও কিন্তু জমিলা নাজমার আসলামকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তকে পক্ষান্তরে স্বাগত জানায়। পাঁচ সন্তানের জননী জমিলার সুখের সংসারজীবনে দাঙ্গা এক নিরাপত্তাহীন যন্ত্রণার জন্ম দিয়ে যায়।

জমিলার বড়ছালে নাকিবের স্ত্রী হামেদার মধ্য দিয়ে, এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের বড়বৌ-এর এক সার্থক জীবনচিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। সে একান্নবর্তী পরিবারের বধূরূপে রান্নার কাজে শাশুড়িকে সবরকম সহযোগিতা করে। আবার ছোটননদ নাজমার সঙ্গেও তার একটি ঠাট্টামিশ্রিত, বন্ধুত্বের মধুর সম্পর্ক দেখা যায়। শ্বশুরমশাই বরকতুল্লার গলার আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় কাপড় তুলে দেওয়া, মুসলিম পরিবারের একটি অতিপরিচিত সংস্কারকেই নির্দেশ করে। একজন সহানুভূতিশীল রমণীর মতোই হামেদা, জয়িতার সংকটে

পাশে থাকে এবং সংকটমুক্ত জয়িতার আনন্দে সেও খুশি হয়ে ওঠে। জমিলার সংস্পর্শ ও স্নেহে সিক্ত হামেদাও এক অসাম্প্রদায়িক উদার মানসিকতা পোষণ করে। আবার একজন অতি সাধারণ নারীর মতোই পাড়ায় পুলিশের চিরুনিতল্লাশির চিৎকার-চেঁচামেচি ও নারী-শিশুর কান্নায় সেও ভয় পায় এবং তার সবচেয়ে ভরসার মানুষ স্বামীকে আশ্রয় করে আতঙ্ক ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। অথচ স্বামী-সন্তানদের বিদায়কালে কান্নায় ভেঙে পড়া শাশুড়িকে কিন্তু হামেদাই সামলানোর চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে হামেদার জীবনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলিম পরিবারের একজন দায়িত্বপরায়ন, স্নেহশীল, যত্নবান পুত্রবধূর জীবনচিত্র অংকন করেছেন লেখক এই দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে।

তবে একথা সত্য যে, আফসার আমেদ তাঁর ‘ব্যথা খুঁজে আনা’ উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন, তার বাস্তব ও জীবন্ত বর্ণনা একটি ঐতিহাসিক দলিল রূপে বিবেচ্য। যেখানে সমীর, কাজল, নুরুল ইসলাম ও বরকতুল্লার মতো দাঙ্গাবিরোধী, উদার ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পাশাপাশি রয়েছে কানাইবাবু, মিহিরবাবু, আসগার আলি ও আসলামের মতো সাম্প্রদায়িক, স্বার্থপর ও দাঙ্গাসৃষ্টিকারী কিছু অমানবিক মুখ। এই দাঙ্গা গ্রামের সকলের সামনে, সকলের প্রয়োজনের সহজলভ্য কাজের মানুষ, পাগলার পরিচয় সুস্পষ্ট করে তোলে। তবে আফসার আমেদ সুনিপুণ দক্ষতায় দেখিয়েছেন যে, আমাদের এই ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কখনোই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সমর্থন করে না। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কিছু স্বার্থপর, অসৎ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষ পরিকল্পনামাফিক দাঙ্গা সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে বারবার তাদের এই অসৎ, অমানবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় সময়ের কতগুলি ক্ষতসৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

তাছাড়া এখানে আফসার আমেদ সম্পূর্ণরূপে একটি শহরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটকে আশ্রয় করেছেন। এরফলে নারীর একটি সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানগত একটি পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের নারীরা শিক্ষিতা, আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তারা অনেকসময় সাবলীলভাবেই নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তাই নাজমা শেষপর্যন্ত অপছন্দের পাত্র আসলামকে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নেহা বিবাহিত জীবনের মধ্যে থেকেও আরও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে এবং স্বামীর

অত্যাচারে অতিষ্ঠ নেশা, স্বামীর সংসার ত্যাগ করে প্রায় একবছর বাবার বাড়ি আটকে থাকার সাহস দেখিয়েছে। এতদসত্ত্বেও বদিউর এই এক বছরে দ্বিতীয় বিয়ে করার বা নেশাকে তালাক দেওয়ার কথা না ভেবে, নেশাকে সম্মানের সঙ্গে সংসারে ফেরানোর চেষ্টায় বারবার ভাইকে পাঠিয়েছে। দাঙ্গার চরম সংকটে বদিউর নিজস্ব অহংকার ত্যাগ করে, প্রকৃত মানুষের মতো নেশার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে, নেশাকে ফিরিয়ে নিয়েছে। এখানে 'অন্তঃপুর' উপন্যাসের ফিরোজা ও এই উপন্যাসের নেশার মধ্যে, স্থানভেদে নারীর একটা অবস্থানগত ও অধিকারগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখক নারীর এই পরিবর্তিত অবস্থানকে ছুঁয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

**রাজনীতি প্রসঙ্গঃ**

**স্বামী স্ত্রীর নৈকট্যের ভিতর**

রাজনৈতিক মতবিরোধ, জয়পরাজয় শুধুমাত্র একটি দেশ, রাজ্য, জেলা বা পঞ্চায়েতকে প্রভাবিত করে না, একটি পারিবারিক অশান্তির কারণও হতে পারে, নারীর ব্যক্তিজীবনের সমস্যা ও সংকটকেও ঘনীভূত করে তুলতে পারে, সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ, তারই একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন, 'স্বামী স্ত্রীর নৈকট্যের ভিতর' ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে 'আজকাল' পত্রিকায়। পরবর্তীতে লেখকের 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ছোটগল্পে, এক সময়ের প্রেমিকা হামিদার প্রতি আনিসের প্রেমাবেগ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক হারকে কেন্দ্র করে ভিন্নধারায় বয়ে চলার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কারণ তাদের সম্পর্ক তৈরির মূলকেন্দ্রে এই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। লেখক এই গল্পে দেখিয়েছেন, বাইরের একটি রাজনৈতিক শক্তি, কিভাবে একজন নিরপরাধ নারীর দাম্পত্যজীবনের সমস্ত নিরাপত্তাকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে তুলতে পারে।

গ্রামের লাইব্রেরিয়ান আনিসের সঙ্গে হামিদার বই আদান-প্রদানের সম্পর্ক ধীরে ধীরে এক নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু আনিসকে ভালোবাসার পেছনে হামিদার মনে

প্রথমেই একটি রাজনৈতিক ভয় কাজ করেছিল। তাদের গ্রামের রাজনৈতিক দলাদলির ক্ষেত্রে হামিদার দাদারা ছিল আনিসদের দলের প্রতিপক্ষ। এক্ষেত্রে 'এই এলাকায় আনিসদের রাজনৈতিক দলের শক্তি ও প্রাধান্য প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি। তাদের দলের বিধায়ক থাকায়, পুলিস প্রশাসনও তাদের হাতে থাকে, ফলে তারা এক ধরণের ক্ষমতা ভোগ করছিল। এ কথা তো আনিস স্বীকার করে, তাদের কর্মীরা বিরোধীদলের কর্মীদের ওপর হামলা করলেও পার পেয়ে যেত। হামিদার আনিসের প্রেমে সম্মত হওয়ার পেছনে সেই বাধ্যতা ছিল, সেই ভয় তাকে বাধ্য করেছে প্রথমে। এই স্বীকারোক্তি পরে জানিয়েছে হামিদা। কিন্তু পরে নাকি প্রেমে সত্যিকারের মজে উঠেছিল, এ কথা অস্বীকার করতে পারেনি হামিদা।'[১১৬] একসময় আনিস হামিদার জীবনসর্বস্ব ওঠে এবং আনিসকে স্বামীরূপে পাওয়ায় জন্য সে তার পরিবারের বিরুদ্ধে যেতেও পিছুপা হয় না। কারণ নিজের প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিয়েতে হামিদার দাদারা কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিল না। তাই আনিসের প্রেমের টানে হামিদা তার পরিবারের সকলের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে, দাদাদের চরম অপমানের মুখে ঠেলে দিয়ে, আনিসকে বিয়ে করে। শুধু তাই নয়, তার দেড়বছরের বিবাহিত জীবনে সে একবারও বাবার বাড়ি যায় নি, দাদাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ পর্যন্ত রাখে নি। তার দাম্পত্যজীবনে তখন কোনো ছন্দপতনও ঘটে নি।

বিয়ের দেড়বছর পর আনিসদের দলের প্রার্থী হেরে যাওয়ায়, হামিদার অজান্তেই তার দাম্পত্যজীবন, এক চরম সংকটের মুখে এসে দাঁড়ায়। আনিসদের দলের হার মানেই হামিদার দাদার দলের জিত। নিজের দলের পরাজয়ে আনিস মনে মনে যখন খুব আহত, সেই মুহূর্তে দাদার জয়ের খবরে হামিদার মুখে এক অদ্ভুত কমনীয় হাসি লক্ষ্য করে আনিস। সে তখন নিজের স্ত্রীকে প্রতিপক্ষ দলের একজন রূপে ভাবতে শুরু করে। যদিও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আনিসকে নানাভাবে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে হামিদা, কিন্তু আনিস তার এই সহানুভূতি ও আন্তরিক চেষ্টাকে ভুল বোঝে। সহসা আনিস এতদিনের বিবাহিত জীবনে প্রথম দুর্ব্যবহারের স্বরে তার সঙ্গে কথা বলে বসে। পরাজয়ের গ্লানিতে মগ্ন আনিস এই দুর্ব্যবহারের পরেও, ভালোবাসা দিয়ে হামিদার মান ভাঙাতে ভুলে যায়। এইভাবে বাইরের একটি রাজনৈতিক ঢেউ, হামিদার জীবনে এক নীরব ব্যথার সূচনা করে।

মূলত নিজের দলের পরাজয়ে আহত ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আনিস হামিদার স্বভাবসুলভ প্রফুল্লতা ও প্রসন্নতাকে একেবারেই মেনে নিতে পারে না। এমনকি হামিদার এই প্রসন্নতার কারণ হিসেবে সে, নিজের দলের পরাজয়কে মনে মনে কল্পনা করে। কারণ 'এই মুহূর্তে আনিসের মানসিক অবস্থার একেবারে বিপরীত দশা নিয়ে আছে হামিদা।...এই হামিদাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় আছে কি আনিসের? বরং প্রত্যাখ্যানের স্বাধীনতা আছে।'[১১৭] অথচ হামিদা মনের এই প্রসন্নতা কিন্তু আনিসের দলের পরাজয়ে নয়। সে একজন প্রকৃত সহধর্মিণীর মতোই আনিসের পাশে থেকে, স্বামীকে খুশি রাখার জন্যই নিজেকে খুশি রাখে। কখনো স্বামীর পিঠে নিজের শরীর এলিয়ে সমবেদনা জানায়, সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে আবার কখনো ভিন্ন পরিবেশে মন ভালো করার উদ্দেশ্যে ছাদেও নিয়ে যায়। কিন্তু আনিসের 'ভাবনার চোখে' হামিদার এই ভালোবাসা, সহানুভূতি ও প্রচেষ্টা সাজানো মিথ্যে বলে প্রতিভাত হয়। এমনকি নির্জন ছাদে হামিদার প্রেমিকস্বামীর সান্নিধ্যে আসার ঘটনার মধ্যেও এক বাধ্যতাকে কল্পনা করে আনিস। এই সময় মানসিকভাবে ভূতগ্রস্ত আনিস 'দুই হাতের কাছে নৈকট্যে হামিদাকে নিয়ে নেয়। যে নৈকট্যে হামিদাকে পায়, তাতে হামিদার গলা টিপে মেরে ফেলার মতো আনুকূল্য থাকে, আবার বুকে জড়িয়ে নেওয়ারও। এই দুইয়ের কোনও মাঝখান কিছু থাকলেও, এই মুহূর্তে তা অস্বীকার করতে ভালোবাসে আনিস।'[১১৮]

প্রকৃতঅর্থে একটি সমাজ বা সভ্যতা শিক্ষিত হয়ে উঠলেই যে নারীর জীবন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে, এই ধারণার সত্যাসত্য তুলে ধরেছেন লেখক আলোচ্য গল্পে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, সমাজ বা ধর্মনির্বিশেষে শুধুমাত্র পুরুষের ভাবনা, ইচ্ছে ও ভালোবাসার উপরই নির্ভর করে একজন নারীর জীবনের গতিপ্রকৃতি। তাই হামিদার মতো নারীরা যেখানে নিজের পিতৃকুলের সমস্ত স্নেহের বন্ধনকে ত্যাগ করে, অপমানিত করে বেরিয়ে আসে প্রেমিকের হাত ধরে, সেখানেও তাকে নিজের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয়। নারীর এই ত্যাগের মর্যাদা আনিসের মতো অমানবিক, সুবিধাবাদী ও দাম্ভিক পুরুষরা দিতে জানে না। তাই তাদের স্বামী-স্ত্রীর নৈকট্যের ভেতর ভালোবাসা ও বিশ্বাসের জায়গা দখল করে বাইরের একটি রাজনীতি। পুরুষের এই মানসিকতার জন্য, তাদের জীবনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়, অনেকসময় মর্মান্তিক পরিণতি নেমে আসে। সমাজ সচেতন লেখক আফসার আমেদ এই সমস্ত গল্পের মধ্য

দিয়ে দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র শিক্ষিত পরিবার এবং সেই পরিবারের শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত সন্তান হলেই একজন নারীর জীবনকে স্বর্গীয় আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে না, এক্ষেত্রে সবথেকে বেশি প্রয়োজন স্বামীর মানবিকতা, সহানুভূতি, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি স্ত্রীর প্রাপ্য সম্মান ও ভালোবাসা।

**দাম্পত্যের বিচিত্র আখ্যানঃ**

আফসার আমেদের বিভিন্ন কথাসাহিত্যে তালাক, বহুবিবাহ, অসমবিবাহ ও বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে মুসলিম নারীর জীবনে আসা নানা সমস্যা ও সংকট বারবার ওঠে এসেছে। এছাড়াও দুজন নরনারীর রুচিগত পার্থক্য ও মানসিক চাহিদার ভিন্নতা হেতুও যে তাদের দাম্পত্যজীবনের ছন্দপতন ঘটতে পারে, তার প্রতিও আফসার আমেদের সমাজদৃষ্টি সমানভাবে সজাগ। তিনি বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্যে এই সমাজসত্যকে তুলে ধরেছেন। দাম্পত্যজীবনকে কেন্দ্র করে নারীজীবনের এই বিচিত্র সমস্যা ও সংকট, শিক্ষিত-অশিক্ষিত থেকে শুরু করে ধনী-দরিদ্র যেকোনো মুসলিম সমাজেরই হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আলোচ্য লেখকের ‘পাণিগ্রহণ’, ‘সঙ্গ’, ‘স্বামীপ্রেমিকের কাছে পত্র’ প্রভৃতি ছোটগল্প উল্লেখ্য।

**১) পাণিগ্রহণ**

আফসার আমেদের ‘পাণিগ্রহণ’ ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে, শারদীয় ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকায়। পরবর্তীকালে এটি লেখকের ‘শ্রেষ্ঠগল্প’ সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ছোটগল্পে লেখক একটি গ্রামীণ, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের কাহিনিকে পটভূমি রূপে গ্রহণ করেছেন। এই পারিবারিক কাহিনির সূত্রেই এসেছে নাহারের বিবাহিত জীবনের নানান টানাপড়েনের এক পরিচিত বাস্তব চিত্র। বাঙালি মুসলিম নারীর বিবাহিত জীবন শুধুমাত্র তালাক, বহুবিবাহ, অবরোধপ্রথা, শ্বশুরবাড়ির প্রতিকূল পরিবেশ এবং শাশুড়ির পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের জন্যই বিপর্যস্ত হয় না, স্বামীর জীবনে অন্য কোন নারীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতিও যে তার দাম্পত্য জীবনের নিশ্চিন্ততাকে গ্রাস করে, আফসার আমেদ এই চিরাচরিত

সমাজসত্যকেও তাঁর নানান ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। 'পাণিগ্রহণ' ছোটগল্পে লেখক এই সমস্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাহারের দাম্পত্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে।

বিংশশতকের আশি নব্বই-এর দশকে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে বাঙালি মুসলিম সমাজ বিভিন্ন কারণে দ্বিধাগ্রস্থ ছিল। তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও নাহার, বড় দাদার বাধায় অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে নি। পাশাপাশি তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা না ভেবেই, বি.এ. পাশ করার একমাসের মধ্যেই করিমের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়। কারণ সরকারী চাকরিরত, শিক্ষিত, সম্মানীয় পরিবারের সদস্য করিম, বিয়ের পাত্ররূপে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। করিমের দাদা গ্রামের একটি হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং তিনিই বাড়ির কর্তা। একুশবছর বয়সী নাহারের উপযুক্ত বয়সেই, উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পরেও নাহারকে, তার কলেজজীবনের চঞ্চলতা, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখার চপলতা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মনিহারির দোকানে পছন্দমতো জিনিস কেনার উচ্ছ্বলতা বারবার হাতছানি দেয়। অন্যান্য অনেক নারীর মতো নাহারও, তার কাঙ্ক্ষিত জীবনের সমস্ত আবেগ ও চঞ্চলতাকে ভুলে গিয়ে, ধীরে ধীরে সংযত হতে বাধ্য হয় স্বামীর খুশির জন্য। নাহারের মতো নারীদের, পরিবার ও স্বামীর পছন্দকে গুরত্ব দেওয়ার শিক্ষাই যেকোন সমাজ তথা সম্প্রদায় দিয়ে থাকে। নিজের মতো করে বাঁচার আনন্দ খুঁজে নেওয়ার বা নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শিক্ষিত সমাজেও, অধিকাংশ নারীই পায় না।

পাঁচ মাসের বিবাহিত জীবনের অধিকাংশ সময়ই নাহারকে নিসঙ্গ বিষণ্ণতায় কাটাতে হয়েছে। কারণ 'দুবছর হল শাশুড়ি মারা গেছে। এখন ভাসুরের দুই ছেলে, জা আর ভাসুর আর তারা দুজন নিয়ে এ সংসার। খুবই ছোট সংসার। ভিড়ভাট্টা একেবারে নেই। নাহার ভিড়ের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। এখানে এসে প্রায় সময় তাকে একা একা কাটাতে হয়। দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। আজ সতের দিন হল তার শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। জা প্রায়সময় রান্নাঘরে কাটায়। জা তাকে একেবারে রান্নাবান্নায় হাত লাগাতে দেয় না। একজন কাজের মেয়ে আছে, জাকে সে সাহায্য করে।'[১১৯] তাছাড়া বড় জায়ের সঙ্গে নাহারের বয়সের ও মানসিকতার তারতম্য এতটাই বেশি যে, তাদের মধ্যে কোনরূপ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনা। সারাদিনের গৃহকর্মে ক্লান্ত নাহারের বড়জা, অবসর সময় ঘুমিয়ে কাটাতে পছন্দ করে। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের

অধিকাংশ গৃহবধূরা তখন দূরদর্শনে বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখার মধ্য দিয়ে বা গল্পের বই পড়ার মধ্য দিয়ে অবসর যাপন করে। নাহারের শ্বশুর বাড়িতে দূরদর্শন থাকলেও, ভাসুরের কড়া নির্দেশে শনিবার ও রবিবার ছাড়া তা দেখা যায় না। অন্যদিকে অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের মতো গল্পের বইয়েরও যথেষ্ট অভাব ছিল সেখানে। তাছাড়া করিমের অফিস থেকে সন্ধ্যেবেলা তাড়াতাড়ি ফেরার সুযোগ থাকলেও, নাহারের কথা না ভেবে, সে ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাত নটা-দশটার আগে বাড়ি ফেরে না।

নববধূ নাহারের জীবনের এই শূণ্যতা, করিমের প্রতি তার অনাবিল প্রেমানুভূতিতে তখনও ভরে ওঠেনি। কারণ করিমের প্রতি 'সেই সময় নাহার অনেক বেশি অনাগ্রহী, নিশ্চল, শীতল থাকতো। করিমের প্রতি প্রেম তার জমেনি। প্রথমের দিকে করিমেরই আগ্রহ ও আকুতি বেশি ছিল।'[১২০] ক্রমে কাঁচের চুড়ির আনুষঙ্গে নাহারের জীবনে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। বাঙালি মুসলিম সমাজের সধবা নারী শাখা, লোহা বা সিদুঁর পরে না, কিন্তু এই সমাজের অনেকেই বিয়ের পর কাঁচের চুড়ি পরা বাধ্যতামূলক মনে করে। নাহারও কাঁচের চুড়ি খুব পছন্দ করে। তাই তার কথায় করিম এক ডজন কাঁচের চুড়ি নিয়ে আসে। করিমই অত্যন্ত যত্নে, মোহনতায় ও আন্তরিক প্রেমবোধে নিজের হাতে, সেই চুড়ি নাহারের হাতে পরিয়ে দেয়। করিমের ভালোবাসার ছোঁয়ায় সেই কাঁচের চুড়িগুলো খুব সহজেই নাহারের হাতে প্রবেশ করে। পাশাপাশি এই ভালোবাসার ছোঁয়ায় নাহারের জীবনে, করিমের প্রতি প্রেম আসে। এই পাঁচমাসের মধ্যে তার প্রেম আরও ঘনীভূত হতে থাকে। ক্রমে সে মনে মনে করিমকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ায় আকাঙ্ক্ষা ও দুর্ভাবনায় অস্থির হয়। করিমের পূর্বপ্রেমিকা জাহানারা সম্পর্কে সে অবশ্য মাঝে মাঝেই শঙ্কিত হয়। বিবাহিত জীবনের এই পাঁচমাস, জাহানারার প্রতি করিমের অবিরাম ঘৃণা তাকে আশ্বস্ত করলেও, তার দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে, একটা দুর্ভাবনায় সে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

তবে নাহারের এই দুর্ভাবনা যে অমুলক নয়, এক বৃষ্টিস্নাত রাতে তা প্রমানিত হয়। সেদিন গ্রিলের দরোজায় লেগে, তার হাতের শেষ কাঁচের চুড়িটিও ভেঙ্গে যায়। এর মধ্য দিয়ে যেন লেখক নাহারের দাম্পত্য সম্পর্কের ভবিষ্যতকেই স্পষ্ট করেন। স্বামীর অপেক্ষারত নাহারের আন্তরিকতা ও সাজসজ্জার প্রতি করিমের অনাগ্রহ, বিরক্তি এবং অন্যমনস্কতার মধ্যে

নবদম্পতির প্রেমঘন আবেগ বা অনুভূতির রেশমাত্র ছিল না। নাহার করিমের প্রেমের গভীরে ছটপট করলেও, একটি প্রেমহীন যান্ত্রিক সম্পর্কের জায়গা থেকেই করিম, নাহারের হাত থেকে জল, গামছা, লুঙ্গি ও চা তুলে নেয়। এমনকি স্বামীর মানসিক অনুভূতির মতো, শারীরিক অনুভূতি থেকেও সেদিন বঞ্চিত হয়। সে স্বামীর কোন এক অপ্রিয় সত্যকে গোপন করার বিরক্তি জনিত অনুভূতিকেও ধরতে পারে। ফলে এক গভীর মানসিক সঙ্কট ও দুশ্চিন্তা তাকে গ্রাস করে। অথচ করিমের আহ্বানে, সমস্ত সঙ্কট ভুলে গিয়ে সে স্বামীর বুকে আত্মসমর্পণ করে। করিমের সামান্য আদরে সে তার মনের গভীরে জন্ম নেওয়া সমস্ত অভিমান ভুলে যায়। যদিও জাহানারা সম্পর্কে সে পুরোপুরি সংশয়মুক্ত নয়। করিমের আনা কাঁচের চুড়ি প্রসঙ্গে তার মনে হয়, 'তাদের প্রেমের অহিতকর কিছু তৎপরতা ঠেকা দিতে কি চুড়ি কিনে এনে সামাল দিচ্ছে করিম? সে জানে না, বুঝতে পারে না। করিমের পূর্বপ্রেমিকার কথা পাড়তে নাহারের খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু করিম তার পূর্বপ্রেমিকার প্রসঙ্গ তুললেই দারুন খেপে ওঠে। জানতে ইচ্ছে করে করিমের সঙ্গে তার কোনো অ্যাপয়েনমেন্ট ছিল কিনা। এটা জিজ্ঞাসা না করতে পারায় তার এক রুদ্ধতা আসে।'[১২১]

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর, নাহারের অপেক্ষা না করেই করিমের একটা দূরত্ব বজায় রেখে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে, স্বামীর অপেক্ষায় ক্লিষ্ট নাহারের মন সংশয়ের পাশাপাশি বেদনাহত হয়। উপরন্তু ভোররাতে করিম যখন তার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে স্বপ্নে আসা জাহানারার কথা বলে, তখন তার বুকে এক নিষ্ঠুর বেদনার ঝড় বইতে থাকে। এই ঝড়ে রাতের ঘুম, স্বস্তি ও ভালোবাসা উড়ে যায়। তাই সেই মুহূর্তে ঘুমন্ত করিমের, তার কোমরে হাত রাখাকে সে মেনে নিতে পারেনা। এমনকি ঘুমন্ত করিমের প্রশান্তির মধ্যেও সে জাহানার উপস্থিতি অনুভব করে। ফলে করিমের সঙ্গে একই ঘরে বা বিছানায় রাত কাটাতে ব্যক্তিত্বময়ী নাহারের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই পরদিন সকালে করিমের উৎফুল্ল হাসিমুখ এবং সুমিষ্ট স্বরে গেয়ে ওঠা আনন্দের সুরে, নাহার তার সঙ্গী হতে পারে না, সঙ্গী হতে চায়ও না। বরং সে নিজের অন্তরের ব্যথা, অস্থিরতা, ঝড় ও দুঃখ সকলের কাছে গোপন করে, দৈনন্দিনকাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। সে বুঝতে পারে, যে জাহানারা এক সময়ের মুগ্ধ প্রেমিক করিমকে নিজে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে যদি প্রেমিক করিমের জীবনে দ্বিতীয় নারীর উপস্থিতির ঈর্ষাজনিত কারণে

করিমকে ডাকে, তাহলে করিম প্রেমিকার আহবানে সাড়া দেবেই। পক্ষান্তরে স্বামী হওয়ার দরুন সে, নাহারকে হয়তো সারাজীবন ভালোবাসার ভান করে যাবে। জীবনের এই সংকটে ভয় পেয়ে, সে অনুভব করে ‘এখন জাহানারা আবার নাহারের কাছ থেকে ভালবাসা কেড়ে নিয়েছে। বিয়ের পরপর ত করিম নাহারকে ভালবাসায় যথেষ্ট উদ্দামই ছিল। উদ্দামতা প্রথম প্রথম হয়েই থাকে। কিন্তু মুখে ভালবাসি, ভালবাসি, এই মিথ্যাচার না করে করিম। কেননা তাকে ত করিমের সঙ্গেই বাঁচতে হবে। তাকে ভালবাসা দেবার মুহূর্তগুলিতে করিমের মন যেন শূন্য না থাকে। করিম পূর্বপ্রেমিকায় ভালবাসা স্থানান্তরিত না করে। ভালবাসার বিনিময়ের অন্তত ফাঁক ত দেখতে পাবে? করিম ভালবাসার ভান করবে, ভালবাসাহীন আছে, এটা ধরা পড়বে তখনই, যদি সত্যি না ভালবাসে। তখন বুঝতে হবে করিম পূর্বপ্রেমিকায় তার ভালবাসা কেন্দ্রীভূত করেছে।’[১২২]

বাঙালি সংস্কারে লালিত, শিক্ষিতা নাহারের প্রেমিকা মন সমস্ত জেনে, বুঝেও স্বামীর মিষ্টি ডাকে আবার করিমকে একান্ত করে পাওয়ার আবেগে ভাসে। করিমের প্রশংসায় সব দুঃখ ভুলে, খুশি হয়ে ওঠে। তাই করিমের চুড়ি পরানোর প্রস্তাবে সমস্ত মানসিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে, করিমকে দেখার তৃষ্ণায়, নারীজীবনের সবচেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত শাড়ি ও গয়নার কথাও তার মনে আসে না। জাহানারার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, নাহার শুধুমাত্র করিমকে আপ্রাণ ভালবাসতে চায়, স্বামীর ভালবাসায় পুরোপুরি সিক্ত হতে চায়। বুকের মধ্যে জমে ওঠা সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ভুলে, নিজের সমস্ত জীবন ও মন সে করিমকেই সমর্পণ করতে চায়। একদিন করিম যেভাবে কাঁচের চুড়ি পরানোর সযত্নতায় ও প্রেমঘনতায় প্রেমিকস্বামী হয়ে, নাহারের জীবনে দাম্পত্যপ্রেমের স্বর্গীয় সুখ বয়ে এনেছিল, পাঁচমাস পরেই পূর্বপ্রেমিকার সংস্পর্শে এসে করিমের মধ্যে পরিবর্তন আসে। তাই আজ অন্যমনস্ক করিম, প্রেমের স্পর্শহীনতায় নাহারের হাতে যখন আবার সেই চুড়ি পরানোর চেষ্টা করে তখন আন্তরিকতা ও যত্নের অভাবে, একে একে সমস্ত চুড়ি এমনভাবে ভাঙতে থাকে, যেন নাহারের দাম্পত্যজীবনের সমধুর ও স্বর্গীয় বন্ধন একে একে ছিন্ন হতে থাকে। নাহার তার প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করে নিঃশব্দ ব্যথায় দীর্ণ হতে থাকে। আর এইভাবে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সমাজে নাহারের মতো আরও বহু শিক্ষিত নারী, এক প্রেমহীন দাম্পত্যের

মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। সমাজে এর কোনো প্রতিকার আজও খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ সমাজ কখনো মানুষের মনের উপর শাসন চালাতে পারে না। তাই আফসার আমেদের মতো সমাজসচেতন লেখকেরা, সেলিমা বা নাহারদের আপাত আকর্ষণীয় ও সুখী দাম্পত্যজীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এই সমস্ত ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে।

**২) সঙ্গ**

আফসার আমেদের 'সঙ্গ' ছোটগল্পটি সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এক ভিন্ন ধারায় বয়ে চলা নারীজীবনের গল্প। 'সঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয়, শারদীয় 'আজকাল' পত্রিকায় ১৯৯৩ সালে। পরবর্তীতে এটি লেখকের 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মরিয়ম নিজের সংসারে অধিকারগত স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আমাদের সমাজে যেখানে পুরুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের উপর সংসারে স্ত্রীর থাকা বা না থাকাটা নির্ভর করে, সেখানে স্বামী মতিনের সংসারে থাকাটা নির্ভর করে মূলত মরিয়মের ইচ্ছের উপর। তাছাড়া লেখক তাঁর বিভিন্ন গল্পে দেখিয়েছেন, পুরুতান্ত্রিক মুসলিম সমাজের কোনো কোনো পুরুষ, ধর্মকে আশ্রয় করে একাধিক নারীর সঙ্গ লাভের লালসায় বহুবিবাহ করে থাকে। আলোচ্য গল্পের মতিন অভিমানবশত স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করে, সংসার থেকে পালিয়ে বাঁচতে ধর্মকে আশ্রয় করে। একজন লোভী, আদর্শহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অলস প্রকৃতির মানুষ কখনই প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। তাই ধর্মকে ভালোবেসে বা কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, স্ত্রীর উপর রাগ করে শুধুমাত্র দিনাতিপাতের জন্য মতিন মাঝে মাঝে মৌলবির বেশে মসজিদে আশ্রয় নেয়। সেখানে সে আজান দেয়, নামাজ পড়ায়, বাচ্চাদের আরবি শেখায়। এর বিনিময়ে তার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

অন্যদিকে মরিয়ম সম্পূর্ণ একা হাতে ঝোড়া চুবড়ি বুনে, জ্বালন কুটো কুড়িয়ে, তেলাই পাটি বুনে অনেক কষ্টে সন্তানদের মানুষ করে। সে তার জীবনসংগ্রামে স্বামীকে কখনই পাশে পায় নি। বরং মতিন 'বিবাহিত তিরিশটা বছর জ্বালিয়ে খাক করেছে তাকে। এখন লোকটা আরো বুড়ো, ক্ষয়াটে এবং শয়তান হয়েছে। তার সঙ্গে অভিমান বোধও সমানতালে দেখিয়ে

যায়।'[১২৩] মতিনের ব্যবহারে অতিষ্ঠ মরিয়ম একবার প্রতিবাদ করলে বা রাগ দেখালেই লোকটা অভিমানে, বাড়ি থেকে পালিয়ে হুগলীর খানাকূল মসজিদে আশ্রয় নেয়, ইমামতি করে। বর্তমানে মরিয়মের 'দুই ছেলের বউ হয়েছে। এক মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই পেয়েছে। কম বয়সী আরো দুটি ছেলে ও এক মেয়ে আছে মরিয়মের। একেবারে ভরা সংসার। ঝমঝম করছে। একটুও ফুরসৎ নেই তার থেকে বেরিয়ে আসার।'[১২৪] বড়ো ছেলে ফেরি করে আর মেজো ছেলে জন খাটে বলে, তার সংসার সুখ সাচ্ছন্দে ভরা। এই ভরা সংসারে মতিনের সঙ্গলাভের জন্য মরিয়ম মাঝে মাঝে স্বামীর সমস্ত অন্যায় আবদার বা বদ অভ্যাস মেনে নেয়। তাছাড়া ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর প্রতি তার একটা মায়াও এসে গেছে। তাই মতিন কাঁচা ডিম খাওয়ার মতো অন্যায় কাজ করলেও মরিয়ম কিছু বলে না। এমনকি নতুন জামাই এর কাছে মতিনের জুতো চাওয়া বা বিড়ি কেনার পয়সা চাওয়ার মত গর্হিত, অপমানজনক ক্রিয়াকাণ্ডও মরিয়ম অনেক কষ্টে সহ্য করে। নিজের ঘর মেয়ে জামাইকে দিয়ে, মতিনের ছোট ঘরে অসুবিধা করেই থাকে মরিয়ম। তবুও মতিনের চলে যাওয়া চায় না সে। তাই 'মরিয়ম ভাবে, একদিক থেকে মতিনকে এ সংসারে থাকতে দেয়াটা মরিয়মের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। মরিয়ম চায় থাকুক। লোকটার প্রতি মায়ামমতা দেখালই না হয়।'[১২৫]

ত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে মতিন কোনোভাবেই মরিয়মের কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে প্রাণের দোসর হয়ে উঠতে পারেনি। তাই মরিয়ম তার দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে, স্বামীর সঙ্গসুখে কখনো শান্তি বা স্বস্তির খোঁজ পায় নি। বরং মতিনের উপস্থিতি তার সংসারজীবনের মনোরম পরিবেশকে অনেকসময় দূষিত করে তোলে। ফলে ক্লান্ত মরিয়মের মন, জমে থাকা নানান কথায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। মনের কথা বলে হালকা হওয়ার জন্য নে নির্জনে কোনো গাছ বা পাখির সন্ধান করতে থাকে মনে মনে। কারণ তার মনের কথা বলার জন্য মনের মতো একজন সঙ্গীর বড় অভাব তার জীবনে। তার জীবনের এই অভাব পূর্ণ করে, পাশের বাড়ির চাচাতো দেওর নিশার। যদিও নিশারের সঙ্গে তার কোনরূপ অবৈধ পরকীয়ার সম্পর্ক নয়, শুধুমাত্র 'কথা বলার সম্পর্ক। সংসারের সকলের সাক্ষাতেই তাদের কথা চলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পান আসে, চা আসে। নিশারের বউ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েও যায়। আসলে সঙ্গ পেতে ভালবাসে মরিয়ম। অনেক সময় যেমন মতিনের সঙ্গ চায় মরিয়ম।'[১২৬]

নিশার যেহেতু কর্মসূত্রে বোম্বেতে থাকে, তাই মরিয়ম সবসময় তার সঙ্গ পায় না। অনেকদিন পরপর সে বাড়ি ফেরে। এবারও প্রায় আটমাস পরে নিশার হঠাৎ বাড়ি আসে। এই আটমাস ধরে মরিয়মের মনে জমেছে সংসারের নানা কথা, পাড়া-প্রতিবেশীর নানা প্রসঙ্গ। অন্যদিকে নিশারের ঝুলিতেও জমেছে অনেক কথা। তাই নিশারের আসার খবরে, তার সঙ্গলাভের আনন্দে মরিয়মের 'কেন যে মনে হয়, সে ভাল শাড়ি পরে নেই, গায়ে বাস সাবান মাখেনি কতদিন। এখন মনে হয়, তার মন ভাল থাকার জন্য নিয়মিত গায়ে বাস সাবান মাখা দরকার। নিশার এসেছে বলে নয়। একটু ভাল শাড়ি পড়লেও মন ভাল থাকে। মনকে যত্নে রাখার কথা উদয় হয় মরিয়মের মনে। মন একটু গুছনো গাছানো না থাকলে চলে।'[১২৭] এইভাবে নিশারের আগমনে মরিয়ম মনের আনন্দে নিজের পরিচর্যার কথা ভাবে। সংসারের জন্য আত্মনিবেদিত মরিয়ম নিজের মনের কথা ভাবার মধ্য দিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে। এখন তার আর স্বামী মতিনকে প্রয়োজন নেই। তাই নিশারের ভাবনায় ভাবিত মরিয়ম মতিনকে দেখে আঁতকে ওঠে। মতিনের অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করে। সে চায় অভিমান করে মতিন চলে যাক। তাহলেই মতিনের ঘরে নিশারের সঙ্গে সে গল্পের আসর জমাতে পারবে। মনের মতো সঙ্গীর সঙ্গে, মনের জমানো সমস্ত দুঃখ, বেদনা, আনন্দ ও সংগ্রামের কথায় সে খুশিতে ভরে উঠবে। মতিনের প্রতি তার সমস্ত বিরক্তি, রাগ ও ক্লান্তিকে সে পুকুরের জলে ধুয়ে, নতুন সাজে নিজেকে তৈরি করে নিশারের সঙ্গলাভের আকুলতায়।

মূলত মরিয়ম সম্পূর্ণ নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টা দিয়ে, অনেক কষ্টে সংসারে সুখ নিয়ে আসে। ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূদের প্রতিও সে যথেষ্ট আন্তরিক। সে স্বামীর প্রতিও আন্তরিক হতে চায়। এমনকি মতিনের ব্যথা ও অভিমানও সে বোঝে। কিন্তু অলস, আত্মসুখপরায়ণ মতিন কখনই স্ত্রীকে বোঝার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি। তাই ত্রিশ বছরের দাম্পত্যজীবনেও তারা পরস্পরের প্রকৃত জীবনসঙ্গী হতে পারে নি। অন্যদিকে নিশার মরিয়মের সংসারজীবনের কেউ না হয়েও, তার মনের কথা বলার একজন প্রকৃত সঙ্গী হয়ে ওঠে। নিশারের সঙ্গে কথা বলার সূত্রে মরিয়ম নিজের জীবনসংগ্রামের প্রত্যয় খুঁজে পায়, মনের সুখ ও স্বস্তির খোঁজ পায়, নিজের বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়। এক অশিক্ষিত গ্রামীণ সমাজে, একজন পরপুরুষের সঙ্গে এক আধুনিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় মরিয়মের ঐকান্তিকতা ও দুঃসাহস আমাদের বিস্মিত করে।

সংসারের সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের জন্য বাঁচার মধ্যেও নিজের মনের মতো কথার সঙ্গী খুঁজে নেওয়ায় মরিয়ম একজন অধিকারসচেতন আধুনিক নারীজীবনের আদর্শকে ছুঁতে পেরেছে নিঃসন্দেহে।

### ৩) স্বামী প্রেমিকের কাছে পত্র

আফসার আমেদের 'স্বামী প্রেমিকের কাছে পত্র' ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'আজকাল' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে এটি লেখকের 'সেরা ৫০টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাঙালি নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের অনেক পুরুষই নিজের শহর ও পরিবার ছেড়ে, কর্মসূত্রে ভিন্ন শহরে বা রাজ্যে মাসের পর মাস থাকতে বাধ্য হয়। যেসমস্ত দরিদ্র, পশ্চাদপদ, প্রায় অশিক্ষিত শ্রমিকেরা দাদন নিয়ে দলবদ্ধভাবে এক জেলা থেকে অন্য জেলা বা রাজ্যে যায়, কাজের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের বাড়ি ফেরার কোনো স্বাধীনতা থাকে না। কাজের শেষে তারা নিজের পরিবারে ফিরে আসে এবং কিছুদিন আপনজনের সঙ্গে অতিবাহিত করে আবার নতুন করে বাইরে যাওয়ায় জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে। এইসমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকেরা সাধারণত যেকোনো পারিবারিক ও ধর্মীয় উৎসব পরিবারের সকলের সঙ্গেই উৎযাপন করে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এইসমস্ত পরিবারের স্ত্রীগণ, তাদের দাম্পত্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে একেবারেই দ্বিধাহীন থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত পুরুষেরা চাকরি বা ব্যবসাসূত্রেও ভিন্ন জেলা বা রাজ্যে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকে। এক্ষত্রে তাদের বাড়ি ফেরার একটা স্বাধীনতা থাকে। বিশেষকরে একজন চাকরিজীবী রবিবার বা দু-একটি ছুটির দিন মিলিয়ে মাঝে মাঝেই এক জেলা থেকে কাছাকাছি আর এক জেলায় অপেক্ষমাণ স্ত্রীর কাছে ফিরে আসতেই পারে। তবে এইরকম পরিস্থিতি কোনো কোনো মুসলিম নারীর জীবনে সংকট বয়ে আনে। তাদের দাম্পত্য জীবনে একটা নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়। কারণ ইসলাম ধর্মে বৈধ বহুবিবাহের সুযোগ নিয়ে অনেকেই কর্মক্ষেত্রে দ্বিতীয় সংসার পাতে। শিক্ষিত চাকরিজীবী থেকে শুরু করে অশিক্ষিত ব্যবসায়ী, উভয়ক্ষেত্রেই এটি একটি অতি পরিচিত ও স্বাভাবিক সমাজবাস্তবতা। এই সমাজসত্যকেই লেখক উক্ত ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন।

মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা কনিজার স্বামী জয়নাল চাকরিসূত্রেই কোলকাতাই থাকে। মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতার দূরত্ব খুব বেশি নয়। তাছাড়া যোগাযোগ ব্যাবস্থাও খুব ভালো। তাই জয়নাল ইচ্ছে করলেই মাসে একবার বা দুবার অনায়াসে বাড়ি আসতে পারে। চাকরিজীবনের প্রথম দিকে সে তাই করতো। কিন্তু বিয়ের সাত বছর পর, জয়নাল এই প্রথম প্রায় তিনমাস বাড়ি ফেরে নি। জয়নালের এই আচরণে কনিজা মনে মনে আহত হয়। কলেজজীবনের সহপাঠী জয়নালকে সে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল। অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই কনিজা চাকরিসূত্রে জয়নালের দূরে থাকাকে মেনে নেয়। কারণ সে নিজে একজন শিক্ষিতা নারী হয়েও, অর্থনৈতিক ভাবে পুরোপুরি স্বামীর উপরই নির্ভরশীল। তাই প্রেমিক স্বামীর একমাস বা পনেরো দিনের বিরহযন্ত্রণাকে সে একরকম বাধ্য হয়েই সহ্য করে। কিন্তু বিবাহের সাত বছরে এক নাগাড়ে তিনমাস স্বামীর বিরহ সহ্য করার দুর্দিন তার জীবনে এই প্রথম আসে। এমনকি জয়নালের তাকে ছেড়ে দীর্ঘদিন দূরে থাকার কারণটিও সে মনে মনে অনুভব করে। সে বোঝে, জয়নাল স্বেচ্ছায় তাকে উপেক্ষা করে, এই চরম যন্ত্রণাময় একাকীত্বের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। যদিও কনিজার জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে তাদের দুবছরের সন্তান রূপ। কিন্তু একজন নারীর জীবনে কখনই তার সন্তান, স্বামীর বিরহের পরিপূরক হতে পারেনা। তাই প্রতি মুহূর্তে সে জয়নালের বিরহে কাতর হয়, জয়নালের অপেক্ষায় উদাস হয়। অথচ তার এই তিনমাসের একাকীত্ব ও বিরহযন্ত্রণার কথা একটিবারের জন্যও সে স্বামীকে লেখা পত্রে প্রকাশ করে না।

বরং এই তিনমাসে সে জয়নালকে যে নয়টি পত্র লেখে, তার প্রত্যেকটি পত্রের অধিকাংশ জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে রূপের নানান সম্ভব-অসম্ভব আচরণ ও কথার বর্ণনা। শুধু তাই নয়, সন্তানের এই খুঁটিনাটি কাল্পনিক বর্ণনার মাঝেও 'নিজের কথা এড়িয়ে থেকেছে কনিজা। হয়তো বা তা সচেতনভাবে। ছেলেকে সর্বস্ব করতে চেয়েছে। কনিজাকে যে প্রত্যাখ্যান দিয়েছিল জয়নাল, সেই ব্যথার কথা একবারও বলেনি। তার মানে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কনিজাকে ছেড়ে থাকা কনিজা সত্য বলে জেনেছ। কিংবা এমনও তো বলা যায়, জয়নালের উপর অধিকারের প্রশ্ন তোলেনি। প্রতিবাদের ভাষায় কথা বলেনি। এটার তো একটাই মানে, জয়নালকে কনিজার সাক্ষাৎ প্রয়োজনীয়তা তেমন কনিজার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তার মানে

কনিজা প্রেম ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে, তার মানে জয়নালের প্রতি অনাসক্তি জানায়।'[১২৮] এইভাবেই শিক্ষিতা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কনিজা মনের অপরিসীম বিরহযন্ত্রনাকে গোপন করে, স্বামীকে লেখা প্রতিটি পত্রে স্বামীকে অনাসক্তির বদলে অনাসক্তি জানিয়ে যোগ্য জবাব দিয়ে চলে। ক্রমে ক্রমে নারীরা শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তাই এই পর্বে রচিত আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের নারী, নিজেদের উপযুক্ত সম্মান ও অবস্থানকে চিনে নিচ্ছে অত্যন্ত সচেতনভাবেই। তাই প্রেমিকস্বামীর কাছে লেখা পত্রের বিষয়বস্তু থেকে স্বামীপ্রেমিকের কাছে লেখা পত্রের বিষয় আলাদা হয়ে যায়, উপেক্ষার উপযুক্ত জবাব দিতেই, নিজের চাওয়া-পাওয়ার বদলে সন্তানের কথায় সর্বস্ব হয়ে ওঠে।

তাই কনিজা তার মনের সমস্ত যন্ত্রণার কথা একবারও প্রকাশ করে না চিঠিতে। অথচ এই তিনমাস সে ঠিকমতো ঘুমোতে পারে নি, নিরন্তর নিঃসঙ্গতার বেদনা সহ্য করেছে। কারণ এই বিরহব্যথার কথা শুধুমাত্র একজন বিরহকাতর প্রেমিকস্বামীর কাছেই বলা যায়। কিন্তু যে প্রেমিক শুধুমাত্র একজন হৃদয়হীন স্বামী রূপে স্ত্রীকে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করার সাহস করে, তার কাছে মনোবেদনা প্রকাশ করার দীনতা, কনিজার মতো আধুনিক নারীরা করতে পারে না। তাই সে মনের সমস্ত আবেগ চেপে রেখে, কোন পত্রেই স্বামীর বাড়ি ফিরে আসার ব্যাকুলতা পর্যন্ত প্রকাশ করে না। স্বাভাবিক ভাবেই জয়নালের মনে হয়ে, রূপ কনিজার জীবনসর্বস্ব হয়ে উঠেছে, কনিজা রূপকে নিয়ে খুব ভালো আছে। তার বাড়ি ফেরা বা না ফেরা কনিজার জীবনে তেমন কোন প্রভাব ফেলেনা। কনিজাকে প্রত্যাখ্যানের বেদনা দিতে ব্যর্থ হয়ে, জয়নাল মনে মনে বিস্মিত হয়। এমনকি জয়নালের আকস্মিক আগমনের মুহূর্তেও কনিজা, তার অন্তরের ব্যাকুলতাকে গোপন করে, এক অপ্রস্তুত ও অস্বস্তিভাব দেখায়। অবশ্য শেষপর্যন্ত স্বামীর আগমনে, সে তার সমস্ত সংযম হারিয়ে, নারীসুলভ বিরহব্যাকুলতাকে প্রকাশ করে ফেলে। তখন পত্রের কনিজার সঙ্গে বাস্তবের কনিজাকে মেলাতে ব্যর্থ হয় জয়নাল। পাশাপাশি পত্রে বর্ণিত রূপের সঙ্গেও সে বাস্তবের রূপের কোন মিল খুঁজে পায় না। জয়নাল বুঝতে পারে, প্রকৃতপক্ষে কনিজা নিজের সমস্ত আবেগ গোপন করতেই, পত্রে রূপ প্রসঙ্গে মিথ্যে গল্পের আশ্রয় নিয়েছে। জয়নালের পরিকল্পনা বুঝতে পেরেই সে, নিজের ব্যাকুলতা, বিরহব্যথা ও নিঃসঙ্গতার কথা বলে, নিজেকে ছোট হতে দেয় নি স্বামীর কাছে। এখানেই কনিজার স্বাতন্ত্র্য।

সে অন্য কোনো সাধারণ মেয়ের মতো চোখের জলের দোহাই দিয়ে স্বামীকে ঘরে ফেরার আকুলতা জানায় না। জয়নাল তাকে সামান্য মেয়েমানুষ ভেবে পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই পরাজিত হয়। তাই সে অকপটে স্বামীকে বলে, 'তুমি আমাকে ত্যাগ করে ছিলে, আমি তোমাকে যদি আমার কষ্টের কথা জানাই, তাহলে তোমার উল্লাস হত না কি?'[১২৯]

জয়নালও শিক্ষিতা কনিজার বুদ্ধিমত্তা ও আত্মমর্যাদাবোধকে স্বীকার করে। সে বুঝতে পারে কনিজাকে সাধারণ মেয়েমানুষ ভেবে অবহেলা করা যায় না। তবুও মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কিছু শিক্ষিত পুরুষের বহুগামিতা ও কাপুরুষতার কাছে কনিজার মত শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী নারীকেও শেষপর্যন্ত হেরে যেতে হয়। কারণ কিছু পুরুষ শিক্ষিত হয়েও, মনের মধ্যে সেই আদিম লালসাকে বয়ে নিয়ে চলে। এই লালসার হাতে বন্দী মুসলিম সমাজের কিছু শিক্ষিত স্বামীও স্ত্রীকে তালাক দেয় বা খুব সহজেই দ্বিতীয় সংসার পাতে। স্বামীর কাছে তাই কনিজার প্রশ্ন 'এ ব্যাপারে কি নিরাপদ আমরা? ইচ্ছা করলেই ছেড়ে দিতে পার।'[১৩০] শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বেশিরভাগ পুরুষের মানসিকতাই এখানে এক। তারা নারীর জীবন নিয়ে ইচ্ছেমতো খেলা করতে পারে, 'ছেড়ে থাকার মতো ত্যাগ করতে, ত্যাগ করার মতো করে ছেড়ে থাকতে, সবাই, সব পুরুষই হয়তো পারে, জয়নাল আরও পারে, একেবারে ত্যাগ করতে।'[১৩১] এক্ষেত্রে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সব নারীর জীবনে এই সংকট একই সরলরেখাই দাঁড়িয়ে। শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠাও নারীর একান্ত জরুরী। এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় একজন নারীর, এই জীবনসংকট থেকে মুক্তির সোপান হবে, এই সমাজসত্যই আফসার আমেদ পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন 'স্বামী প্রেমিকের কাছে পত্রে' ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে।

**আফসার আমেদের ভাষারীতিঃ**

মূলত কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ, তাঁর কিস্‌সার মধ্যে পাঠকদের এক উদ্ভট, আধ্যাত্মিক ও অতিরঞ্জনের জগতে, এক চরম সামাজিক সত্য ও কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন করে, এক অভিনব উপন্যাসরসে ঋদ্ধ করে তুলেছেন। লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব যে, তিনি তাঁর কিস্‌সায় নিকা, তালাক, বিবিজান, ইমাম, গাঁজাখুরি, গোঁজামিল, পিরান, দোস্তি, ঝোড়া, রোয়াব,

তাবিজ, গুনাগার, আজান, ফজরের নামাজ, মিলাদ-মওলুদ, বেশরা কাজ, বেহেস্ত, দোজখ, মৌলানা, ফেরেস্তা, জিন, পরী, পির আওলিয়া, শয়তান, কামেল বান্দা, মুরুব্বি মুসুল্লি, জেনা করা, মহব্বত, পরেজগার বান্দা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাদের নিজস্ব ভাষারীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে এই সমাজের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনার একটি অকৃত্রিম পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তাছাড়া অনেকক্ষেত্রে লেখকের অসাধারণ বর্ণনা পাঠকের চোখের সামনে একটি সুস্পষ্ট ছবি এঁকে যায়, নিম্নলিখিত বর্ণনায় তা সুস্পষ্ট- 'বেচারা, রওশনেশা কোন এক যুবতি তার মন কুরে কুরে খায়, যেমন করে কাঠঠোকরা গাছের বুকে ঠোঁট ঠুকে ঠুকে গাছের বুক ফোকর করে ছাড়ে, তামনি করে ফেলবে এই মেয়েটি তাকে', 'একেবারে মাখন মাখন শরীর, ছুঁলেই হাতে লেগে যাবে', 'দুশো টাকার রসে কেমন মাছির মতো ভন ভন করে মনটা', 'নারীবেশে কি যে লোভনীয় হয়ে উঠছে এই ছোকরা যে যারা দেখছে তাদের চোখে লালা ঝরা দেখে বোঝা যাবে'। লেখকের এই পর্বেই রচিত অন্যান্য অনেক উপন্যাসের শহুরে জগতের থেকে এই ভাষা একেবারেই ভিন্ন। এইভাবে কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে, এই পর্বের কথাসাহিত্যে একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ জনসমাজের সঙ্গে শিক্ষিত জনসমাজের আচার-আচরণ ও রুচিগত পার্থক্যের পাশাপাশি ভাষাব্যবহারের একটি সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে।

**আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে অমুসলিম সমাজঃ**

আফসার আমেদ এই সময়কালের মধ্যে 'একটি রহস্যের সমাধান', 'কারা যেন নীল ঘুড়ি ওড়ায় দূর আকাশে', 'ঘরের কথা', 'প্রবাসের রূপক', 'মনই তার গাছ ও গাছের পাতা আকাশ মাটি প্রান্তর', 'অর্থহীন কথা বলার নির্ভরতা', 'মেয়ের মা', 'আয়রে সোনা চাঁদের কণা' প্রভৃতি ছোটোগল্পও লিখেছেন। এই সমস্ত ছোটগল্পের প্রেক্ষাপটে আছে অমুসলিম সমাজের মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনালেখ্য। 'একটি রহস্যের সমাধান' ছোটগল্পে সদ্যমৃত স্ত্রী মায়ায় ব্যক্তিগত গোপন ডায়রির সন-তারিখ সংক্রান্ত রহস্যের সমাধান খুজে পান ব্রজমাধব, পুত্রবধূর মউদেবির ডায়রির ছেঁড়া অংশ থেকে। 'কারা যেন রঙিন ঘুড়ি ওড়ায় দূর আকাশে' ছোটগল্পে

বাইশ বছরের অজয়ের, প্রায় আটত্রিশ বছরের নমিতা কাকিমার প্রতি অসম ভালোবাসার কথায় লেখক মানবমনের বৈচিত্র্যময় অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। 'ঘরের কথা'য় শিক্ষিতা, চাকরিপ্রার্থী গঙ্গার ভাগ্যবিপর্যয়ের দুর্ঘটনা, তাকে শেষপর্যন্ত এক নিষিদ্ধ যৌনপল্লিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। নইলে সেও নিবেদিতার মতোই প্রেমিকপুরুষের সঙ্গে একটি সুখী দাম্পত্যজীবন লাভ করতো, কিংবা নিবেদিতারা তার মতো যৌনপল্লিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে পড়তো। অবস্থার বিপাকে গঙ্গারা জীবনের সমস্ত কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন হারিয়ে, এই নির্মম ও ঘৃণ্য জীবনে বাধ্য হয়ে বেঁচে থাকে। 'প্রবাসের রূপক' ছোটগল্পে সুমন সন্দেহবাতিক স্ত্রী অজয়ার সঙ্গে দাম্পত্যপ্রেমের স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে, নিজের বাড়িতেই প্রবাসজীবনের অস্বাচ্ছন্দ্য, অস্বস্তি ও অশান্তি ভোগ করে চলে। অবশ্য তার এই দমবন্ধকর প্রবাস থেকে বেরিয়েও সুমনের মুক্তি নেই, তাকে গঙ্গার স্নিগ্ধ বাতাসেও খুন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। মনের মানুষের সঙ্গে ঘর করেও, নিত্যদিনের অভাব, অনটন, কর্মব্যস্ততা এবং মনের দৈন্যতায়, মাধবী ও নন্দর জীবনে প্রেম একসময় শৃঙ্খল হয়ে ওঠে 'মনই তার গাছ ও গাছের পাতা আকাশ মাটি প্রস্তর' ছোটগল্পে। 'অর্থহীন কথা বলার নির্ভরতা' ছোটগল্পে কোলকাতার কর্মব্যস্ত জীবনে নিত্যদিনের ধর্ষণ, দাঙ্গা, হত্যা, আত্মহত্যা, খুন, দুর্ঘটনা প্রভৃতি মানুষের স্বস্তি ও নিরাপত্তাকে বারবার প্রশ্নের মুখে নিয়ে আসে, আর এই প্রশ্ন ও ভাবনাকে ভুলে থাকতেই গল্পের কথক অর্থহীন কথার প্রতি নির্ভরশীল। 'মেয়ের মা' ছোটগল্পে স্বামীর প্রত্যাখ্যাতা দুই কন্যার জননী অন্নপূর্ণা, বড়মেয়ের দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তা নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত। অথচ আশালতার স্বামী সুভাষ যখন স্বেচ্ছায়, কয়দিনের মধ্যেই আশালতার মান ভাঙাতে অন্নপূর্ণার বাড়ি আসে, তখন মেয়ের এই সৌভাগ্যসুখে, ভাগ্যবিড়ম্বিতা অন্নপূর্ণা মনে মনে আবার ঈর্ষা অনুভব করে। 'আয়রে সোনা চাঁদের কণা' ছোটগল্পে উচ্চশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনের ক্লান্তি, মিথ্যে, ভণ্ডামি, কৃত্রিমতা ও ধান্দাবাজীদের ভিড়ে কথক আফসার হাঁপিয়ে উঠেছেন। তার শৈশবের মাঠ, রূপকথার গল্প, গ্রামের কৃষকদের সরলতা ও মায়ের স্নেহপূর্ণ সান্নিধ্য বারবার তাঁকে হাতছানি দেয়। কোনো জাদুর স্পর্শে শৈশবের রূপকথাময় জীবন ফিরে পাওয়ার আকুলতায় কথক বিভোর।

এইভাবেই আফসার আমেদ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন আলোচ্য গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর প্রথম পর্বে রচিত কথাসাহিত্যের গ্রামীণ, পশ্চাদপদ, দরিদ্র,

অশিক্ষিত মুসলিম সমাজ থেকে ধীরে ধীরে পৌঁছে গেছেন মফঃস্বল ও শহরের শিক্ষিত, চাকরিজীবী জনসমাজে। মানুষের চেতন-অবচেতন মনের নানান আলো-আঁধারির সঙ্গে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। যৌনকর্মীদের জীবনযন্ত্রনা ও অসমপ্রেম থেকে শুরু করে মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও মনের নানান জটিলতা লেখক এই পর্বের গল্পে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এই পর্বেই তিনি কিস্‌সা-কাহিনিরও অবতারণা করেছেন। এইভাবে লেখক পৌঁছে গেছেন গ্রাম ছেড়ে শহরে, বিভিন্ন মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ মনের জটিল গহনে এবং বিভিন্ন কিস্‌সা-কাহিনিতে।

## উৎসনির্দেশ:


১. আফসার আমেদ, *অন্তঃপুর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮১

২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৩৯

৩. আফসার আমেদ, *ধানজ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা, ধানজ্যোৎস্না,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২১

৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২২

৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২২

৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৭

৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৮

৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৩

৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৩

১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭

১১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭-৪৮

১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৪৮

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৪

১৪. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র (১), বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি- ২০১৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৩৭

১৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৮

১৬. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা- ৩৪

১৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা -৪৯

১৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৬৪

১৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা -৬৬

২০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা -৮২

২১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা -৮৮

২২. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা -৮৯

২৩. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা -১১৭

২৪. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা -১১৮

২৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা -১১৮

২৬. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র (১), কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি- ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১২২

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১২৭

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১৩১

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১২৯

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১৩৩

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৩০-১৩১

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১৩৮

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ১৩৯

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা নং – ১৪০

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা নং – ১৫১

৩৬. রবীন্দ্ররচনাবলী( ১৩ খণ্ড), *ভারতবর্ষীয় বিবাহ, সমাজ,* পৃষ্ঠা নং- ১৩

৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১৯৩

৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা নং -২০০

৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১৭৩

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা নং -২০২

৪১. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, নোঙর,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা--১৫৪

৪২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা--১৫৬

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৫৯

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৬২

৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৬৪

৪৬. আফসার আমেদ, *দ্বিতীয় বিবি,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২০

৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৫

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২৭

৪৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬০

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৪

৫১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৪

৫২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৬

৫৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৯

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৩

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯

৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৮৫

৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৯

৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫১

৫৯. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র (২), এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা নং – ৩৯

৬০. তদেব, পৃষ্ঠা নং -৩৭-৩৮

৬১. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ৯৯

৬২ তদেব, পৃষ্ঠা নং – ১০০

৬৩ আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প, দুই বোন,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা –২১৩

৬৪. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২১৪

৬৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২১৪

৬৬. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, পাগলের জবানবন্দি,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২২৫

৬৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২২৯

৬৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২২৭

৬৯. আফসার আমেদ, *কিসসা সমগ্র (২), এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা নং -৮৯

৭০. তদেব, পৃষ্ঠা নং -৪৭

৭১. তদেব, পৃষ্ঠা নং -৯০

৭২. তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৪

৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং -৬৭

৭৪. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ৯৯

৭৫. তদেব, পৃষ্ঠা নং – ১০০

৭৬. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প, হাসিনার পুরুষ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা –১৮১

৭৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৮৪

৭৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৮৫

৭৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৮২

৮০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৮৭

৮১. আফসার আমেদ, *অন্তঃপুর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৭

৮২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৭৫

৮৩. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, দুই নারী,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা--১৭৬

৮৪. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৭৮

৮৫. আফসার আমেদ, *অন্তঃপুর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১-১২

৮৬. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, রক্তলজ্জা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা--১৩৯

৮৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৩২

৮৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৪৯

৮৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৩৪

৯০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৫৩

৯১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৩৩

৯২. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, প্রবাদ- প্রবচনে মুসলমান সমাজচিত্র,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১১, পৃষ্ঠাসংখ্যা –৩১

৯৩. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(১), বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি- ২০১৬, পৃষ্ঠা নং - ৫৬-৫৭

৯৪. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(১), কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি- ২০১৬, পৃষ্ঠা নং - ১৪৫

৯৫. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ১৪৭

৯৬. তদেব, পৃষ্ঠা নং – ১৫১

৯৭. তদেব, পৃষ্ঠা নং – ১৬২

৯৮. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, দুই নারী,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা--১৮০

৯৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৭৮

১০০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৮২

১০১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৭৭

১০২. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৮১

১০৩. আফসার আমেদ, *সঙ্গ নিঃসঙ্গ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৩

১০৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩০

১০৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪১

১০৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৬

১০৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১২৪

১০৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৭

১০৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৮

১১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২০

১১১. আফসার আমেদ, *ধানজ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা, ব্যথা খুঁজে আনা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৩

১১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১৩

১১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১২৮

১১৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৯৯

১১৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৯৯

১১৬. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, স্বামী-স্ত্রীর নৈকট্যের ভিতর,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২০০

১১৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২০১

১১৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২০২

১১৯. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প, পাণিগ্রহণ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা –১৬৬

১২০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৬৮

১২১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৭২

১২২. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৭৬

১২৩. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প, সঙ্গ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা –২০৭

১২৪. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২০৭

১২৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২০৮

১২৬. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২১১

১২৭. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২১১

১২৮. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, স্বামী প্রেমিকের কাছে পত্র,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৯৫-১৯৬

১২৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৯৭

১৩০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৯৭

১৩১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৯৮

# চতুর্থ অধ্যায়ঃ

# আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনঃ

# (২০০১-২০১০)

২০০১-২০১০ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত কথাসাহিত্যে, আফসার আমেদ পল্লীগ্রামস্থ অশিক্ষিত, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ মুসলিম জনজীবন থেকে পুরোপুরি সরে এসেছেন শহুরে মধ্যবিত্তের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ও মননের নানান টানাপোড়েনের দিকে। এই পর্বের বেশির ভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্পে ধরা পড়েছে আধুনিক জীবনযন্ত্রণায় ক্লান্ত অমুসলিম, শিক্ষিত, অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নরনারীর অন্তর্বেদনার কথা, তাদের জীবনের সংকটের কথা। পাশাপাশি যেসমস্ত উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রতিপাদ্য মুসলিম জনসমাজ, তাদেরও জীবনপ্রণালীতে উঠে এসেছে, আধুনিক চিন্তাধারায় সিক্ত এক পরিবর্তনের আলেখ্য। এই সময়কালে অনেক মুসলিম নারীই নিচু ক্লাসের শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে পৌঁছে গেছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত অঙ্গনে। শিক্ষিত মুসলিম পুরুষসমাজ আর চাকরিসূত্রে স্ত্রীর উপার্জনকে অপমানজনক বলে মনে করে না। বরং একজন উচ্চশিক্ষিতা ও চাকরিরতা পাত্রী, তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। একবিংশ শতকের শুরু থেকেই অনেক মুসলিম নারী, মেধার ভিত্তিতে এস.এস.সি ও এম.এস.সির মাধ্যমে শিক্ষিকা হিসেবে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আসছে। তাই কিছু কিছু নারীর জীবনে, ক্ষেত্রবিশেষে বহুবিবাহ বা তালাকের মত ভয়াবহতা নেমে এলেও, এই সময় তা তেমন গুরুতর সমস্যা হয়ে আসে না।

মূলত বিশ্বায়নের প্রভাব এইসময় মুসলিম নারীর জীবনেও পরিবর্তন নিয়ে আসে। সংখ্যাগুরু সমাজে নারী জাগরণের সূচনা হয় প্রায় ঊনবিংশ শতক থেকেই। বিভিন্ন সমাজ-সংস্কারক এই ব্যাপারে নানাভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিংশ শতকে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজেও এই জাগরণ কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। দেশভাগ পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীর জাগরণের পথে একটি বাধা সৃষ্টি করেছিল। দেশভাগে এদেশ থেকে প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায়। এদেশে যারা থাকেন তাদের অধিকাংশই দরিদ্র, অশিক্ষিত,

পশ্চাদপদ ও মৌলবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুসলিম মৌলবাদ সবসময় নারীর কণ্ঠস্বর রোধ করে, তাকে অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখায় বিশ্বাসী। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম নারীর সার্বিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। কিছু কিছু আরবি শিক্ষার উপরই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন আসে। বিশ্বায়নের প্রভাব পড়ে মুসলিম সমাজেও। টেলিফোন ও মোবাইল ফোন এই সময়, জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে ওঠে। মুসলিম নারীর জীবনেও ফোন, টেলিভিশন ও আধুনিক সাজসরঞ্জাম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তারা নিজেদের ভালো রাখার বিকল্প পথ অনুসন্ধান করে নেয়। পাশাপাশি নারীর অধিকার সচেতনতার কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। একবিংশ শতকে সে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে সে বৃহত্তর পৃথিবীর একজন হয়ে ওঠার পথে পা বাড়ায়। অনেকেই কর্মসূত্রে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়। তার উপর নেমে আসা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে। এই সময়কালের মধ্যে রচিত আফসার আমেদের কথাসাহিত্যেও আমরা নারীজীবনের এই পরিবর্তন দেখতে পায়।

কিন্তু গ্রামীণ মুসলিম সমাজের চিত্রটি এই শতকেও অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদিও বিশ্বায়নের প্রভাবে তারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করে, নিজের উপরে নেমে আসা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাবে অনেক সময় তারা হেরে যায় মৌলবাদী ও বিত্তবান পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে। তবে শিক্ষিত মুসলিম নারীরা নানাভাবে সংখ্যাগুরু সমাজের সঙ্গে, এক ছন্দে চলায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে তাদের এই পারস্পরিক আন্তরিক সান্নিধ্য, মুসলিম নর-নারীর জীবনকে অনেকটাই গতিময় করে তোলে নিঃসন্দেহে। অনেকসময় এই দুই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষদের নিবিড় সান্নিধ্য তাদের প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ করে। যদিও বিবাহের ব্যাপারে তাদের জীবনে পরিবারের পক্ষ থেকে চরম বাধা নেমে আসে। স্বাভাবিকভাবেই এহেন পরিস্থিতিতে তাদের জীবনের সংকট ভিন্ন খাতে বইতে থাকে, এই সংকটকেও সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এই পর্বের ছোটগল্পে ছুঁয়েছেন। আবার এইসময় ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা ও শহরে চাকরি করার সুবাদে অনেক শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের, গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার

একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে ছোটবেলা থেকে মুসলিম পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষদের, শহরের হিন্দুপাড়ায় বসবাসের যে দ্বিধা, ভয় ও প্রস্তুতি, তাও এই সময়কালের কথাসাহিত্যের একটি অতিপরিচিত চিত্র। আফসার আমেদ তাঁর 'আত্মপক্ষ', 'সন্ধ্যাবাসরের কথকতা', 'একটি গিটার', 'রাত কত হল?', 'সন্ধ্যার মেঘমালা', 'এলাটিং বেলাটিং সই লো', 'নিরুপায় অলৌকিক' প্রভৃতি ছোটগল্পের মধ্যে এই বৈচিত্র্যময় জীবনকেই রূপায়িত করেছেন।

**বহুবিবাহ প্রসঙ্গ:**

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখিছি, ইসলামধর্মে নারীকে অনেক বেশি সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতা দেওয়া হলেও ভারতীয় মুসলিম সমাজে, শরিয়তের আশ্রয়ে তালাক ও বহুবিবাহের নামে বারবার নারীর এই সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করা হয়। সাধারণভাবে দেখা যায়, সমাজে বিত্তশালী কামুক ও বহুগামী পুরুষেরাই বহুবিবাহে আসক্ত হয়ে থাকে। আফসার আমেদ বারবার তাঁর কথাসাহিত্যে এই সমাজসত্যকে রূপায়িত করেছেন। তবে বংশরক্ষার নামে অনেকসময় নিম্নবিত্ত পরিবারেও বহুবিবাহ দেখা যায়, লেখকের 'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তারা অনেকসময় একেবারে অল্পবয়সী বিধবা বা কিশোরীকে বিবাহ করায় আগ্রহ প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, অসহায় কমবয়সী নারীদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে। ফলে একজন বাবার বয়সী পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্যজীবন-যাপন একজন কিশোরীর পক্ষে কতোটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে, সেকথা আফসার আমেদ বারবার তুলে ধরেছেন। এই বহুবিবাহের কুফল যে কতটা সুদূরপ্রসারী হতে পারে, তাঁর একটি বাস্তব রূপরেখা সমাজসচেতন লেখক 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

**১) মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা**

আফসার আমেদের 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসটি পাঁচটি পর্বে বিভক্ত- ক-অশ্রু পর্ব, খ-মিথ্যাঘটনা পর্ব, গ-কল্পনা পর্ব, ঘ-প্রাক-বিবাহ পর্ব, ঙ-বিবাহ অভিযান পর্ব। এই

উপন্যাসের প্রথম অংশ 'অশ্রু পর্ব' প্রকাশিত হয় শারদীয় যুবমানস পত্রিকায় ১৯৯৭ সালে। 'কল্পনা পর্ব' ১৯৯৯ সালে ও 'প্রাক-বিবাহ পর্ব' ২০০১ সালে, সেই একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে সবগুলো পর্ব মিলে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক তালাক, বহুবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে ধর্মের অনুশাসন, ধর্মান্ধতা ও রক্ষণশীলতাকে আক্রমণ করার পাশাপাশি, মুসলিম নারীর জীবনে নেমে আসা অন্যান্য সংকটকেও তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, ধর্মের নামে ঘটে চলা পুরুষসমাজের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ করার সাহসও দেখিয়েছেন। এখানে লেখক কিস্‌সার মিথ্যা ও অবাস্তব জগতের অন্তরালে নারীজীবনের বাস্তব যন্ত্রণাকে রূপায়িত করেছেন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে। যে সমাজের প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরা তালাক, বহুবিবাহ, মাদ্রাসা নির্মাণ ও কতগুলো আচারকে ধর্ম বলে মনে করে, এই সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়, আফসার আমেদ এখানে এই সত্যকেও প্রকাশ করেছেন। সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় তাদের কোন উৎসাহ নেই। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক উন্নয়নের কথাও তারা ভাবে না। লেখক বারবার এই ব্যাপারে যে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, আলোচ্য উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

উক্ত উপন্যাসে দেখা যায়, 'হীরামন ড্রেস' এর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শওকত আলির বাবা, বিশাল টাকার মালিক আকরম হোসেন, ষাট বছর বয়সে যখন সুন্দরী কিশোরী নিগার বানুকে বিয়ে করে, তখন তার দ্বিতীয় পক্ষের ছোটছেলে শওকতের আত্মবিপর্যয় উপস্থিত হয়। প্রথম যৌবনে শওকত, বাবার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, সমবয়সী নিগার বানুর অপূর্ব রূপ সৌন্দর্যে মোহিত হয়। কিন্তু বাবার স্ত্রী, ছোটমা নিগার বানুর প্রতি কোনরকম যৌন আকর্ষণই চরম পাপ, তাই তখন থেকেই শওকত, নিগার বানুর সমস্ত সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার অবিরাম সংগ্রাম করে চলে। এই চিত্তবৈকল্য দমনে শওকত, ছোটমা নিগারবানুর ছায়া থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। এর ফলে তার স্ত্রী কিসমত বঞ্চিত হয়। নিজেও সবসময় আত্মতাড়নার শিকার হয়। কিসমত সপ্তাহে মাত্র একদিনই অন্দরমহলে স্বামীর সঙ্গে রাত কাটানোর সুযোগ পায়। তবে কিসমত স্বামীর মনের এই গোপন রহস্যের কথা জানতে পেরে, স্বামীকে প্রশ্ন করার সাহস দেখিয়েছে, মাত্র একবার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি শওকতের এই প্রশ্নের

মোকাবিলা করার সৎ সাহস না থাকায়, ভীরু কাপুরুষের মতোই সে চরম ক্ষিপ্ততায় চিরজীবনের মত কিসমতের কণ্ঠরোধ করে। এইভাবেই তারা বারবার নারীর প্রশ্ন করার অধিকার ও সাহসকে গলাটিপে হত্যা করে সমূলে। এই সমাজ নারীকে নিজের মতো করে বাঁচার, স্বপ্ন দেখার বা প্রশ্ন করার কোন অবকাশ দিতে জানে না।

মূলত লেখক তুলে ধরেছেন, বহুবিবাহের প্রভাবে শুধুমাত্র সেই কামুক ও বহুগামী পুরুষের স্ত্রীরাই নয়, পুত্রবধূ পর্যন্ত ভুক্তভোগী। ষাটবছর বয়সী আকরামের কিশোরী বধূ নিগার বানুর দাম্পত্য জীবনের বঞ্চনা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। বিংশশতকের শেষেও এই আমনবিক প্রথা মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তা থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসে। তাই শওকত বিস্তর টাকার মালিক হয়েও, কিসমতকে সতীনযন্ত্রণা পেতে হয় নি। তবে ছোটমা নিগার বানুর প্রতি শওকতের দুর্বলতার দায় যে কিসমতকে বয়ে বেড়াতে হয়, এই চরম সত্যকে লেখক তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে 'জিন্নতবেগমের বিরহমিলন' ছোটগল্পে বহুবিবাহে জর্জরিত, এক গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের যে ঘৃণ্য ও বাস্তব রূপ লেখক প্রকাশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অমানবিক ও লজ্জাজনক। অবশ্য ছোটমা নিগার বানুর প্রতি শওকতের এই আসক্তি প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে, শিক্ষাগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাদেবীর প্রতি শিষ্য চন্দ্রের আসক্তির অনুষঙ্গ। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই পৌরাণিক কাহিনিকে, তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায়, আধুনিক নারীজীবনের এক অভিনব রূপ প্রকাশ করেছেন। তবে 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসে আফসার আমেদের বহুবিবাহ প্রসঙ্গে এই সুদূরপ্রসারী ভাবনা নিঃসন্দেহে সমাজবাস্তবতার একটি উল্লেখযোগ্য নজির।

## ২) হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা

আফসার আমেদের 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা' উপন্যাসেও বহুবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। এই উপন্যাসে লেখক 'বহুগামী' পুরুষের, একাধিক বিয়ের জন্য দায়ী সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ও পারিবারিক দিকগুলোর একটি বস্তবসম্মত রূপ তুলে ধরেছেন। 'হিরে ও ভিখারিনী সুন্দরী রমণী কিস্‌সা' উপন্যাসের প্রথম অংশ 'কথা রূপকথা'

প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে, শারদীয় ‘উদার আকাশ’ পত্রিকায়। আর এর শেষ অংশ ‘অপরূপ কথা’ প্রকাশিত হয়, ঐ একই সালে ঈদ সংখ্যা ‘নতুন গতি’তে। পরের বছর ২০০৭ সালে এই দুটি অংশ মিলে ‘হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক, ফকিরপাড়ার বিত্তশালী ব্যবসায়ী সাহিলের জীবন বাড়ি, গাড়ি, প্রতিপত্তি ও স্ত্রী ফাহমিদার অকৃত্রিম ভালবাসায় একেবারে পরিপূর্ণ। ছেলে ফরিদ ও মেয়ে আনিসা তার জীবনকে আর একদিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে প্রখর সাহিলের সম্পত্তি ও অর্থের পরিমাণ ক্রমাগত উন্নতির মুখে। অথচ এই সফলতা, প্রতিপত্তি ও সাংসারিক সুখের মাঝেও সাহিল এক না পাওয়ার যন্ত্রণায় ক্লান্তিবোধ করে। সে মনে মনে কাঙ্ক্ষিত শান্তি, প্রেম ও সুখানুভূতির জন্য ব্যাকুল হয়, যা সে আর তার স্ত্রী ফাহমিদার কাছে পায় না। কারণ ‘ফাহমিদা কেমন বেঢপ মোটা হয়ে গেছে। বয়সের সঙ্গে মুখের লাবণ্যও ঝরে পড়েছে। একেবারে সাধারণ, অতি সাধারণ এক মেয়েমানুষ। ফাহমিদার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ কমে গেছে সাহিলের। কেন এমন হয়? জানে না সে।’[১]

সতেরো-আঠারো বছরের বিবাহিত জীবনে, ফাহমিদা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা না ভেবে, সবসময় সাহিলের সেবাযত্ন করে গেছে, তাকে সুখে রাখার চেষ্টা করেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির সাধারণ মেয়ে ফাহমিদা, বিয়ের প্রথম দিকে তার অসাধারণ রূপ-যৌবন দিয়ে সাহিলের প্রেমার্তি ও রূপজ মোহ তৃপ্ত করে তুলেছিল অনায়াসে। তখন সাহিলের মনেও কোন অশান্তি ছিল না। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার রমরমায় সাহিল যত বড়লোক হয়, ততই তার রূপজ মোহ ও লোভ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে কমতে থাকে ফাহমিদার শরীরের বাহ্যিক সৌন্দর্য। আমাদের সমাজের বেশিরভাগ রমণীর মতো ফাহমিদাও কখনো নিজের এই রূপ-সৌন্দর্যের কথা ভাবার সময় পায় নি সংসারের চাপে। সে একমনে স্বামীর সেবা ও সংসারের সমস্ত কাজকর্মের পাশাপাশি সন্তানদুটোকে বড় করে। সাহিলের পছন্দের আচার তৈরি করার পাশাপাশি, সাহিলের ‘পা টিপে দেয়, মাথা টিপে দেয়। জল চাইলে সে অপেক্ষা সহ্য করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ফাহমিদাকে দিতে হয়। তেমনই প্রস্তুতি থাকে ফাহমিদার।’[২] কিন্তু ফাহমিদার এই সেবা ও যত্নের মধ্যে সাহিল মাতৃত্বের স্বাদ খুঁজে পেলেও কাঙ্ক্ষিত প্রেমিকাকে খুঁজে পায় না। এমনকি তার ঘুমানোর ভঙ্গী, নাক ডাকা, প্রেমের

আলাপচারিতায় হাঁপিয়ে উঠার মধ্যে সাহিলের মন অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। তাই সে বারবার নারীর শারীরিক সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির জন্য লালায়িত হয়ে কখনো বিয়েবাড়িতে কোন এক অল্পবয়সী মেয়ের রূপে আক্রান্ত হয়, কখনো সুন্দরী ভিখারিনির খোঁজে ছুটে বেড়ায় আবার কখনো সুন্দরী যুবতি শালির প্রতি আসক্ত হয়।

মুসলিম সমাজের অর্থশালী ব্যক্তির একাধিক বিবাহে আসক্তি বারবার আফসার আমেদের সাহিত্যে ধরা পড়েছে। সাধারণত এইসমস্ত বিয়ের পেছনে থাকে নারীলোলুপতা ও রূপজ মোহ। সাহিল এই শ্রেণির মানুষের থেকে ব্যতিক্রমী নয়। ফকিরপাড়ার মানুষ সাহিলের পক্ষে, ফকিরের ঐতিহাসিক নিষেধ অমান্য করে অবৈধ যৌনাচার বা একাধিক বিয়ে করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও সম্মানের কথা ভেবেও সে বারবার নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। ম্যানেজার নিশার, সাহিলকে বারবার এই ব্যাপারে প্ররোচিত করে। সাহিলের প্রচুর অর্থাগমে গ্রামের প্রবীণ মানুষ ফতে আলি আশংকা করে, ফকির পাড়ার ঐতিহ্য ভেঙ্গে সাহিলের একাধিক স্ত্রীত্বে। এমনকি ফাহমিদাও সমাজের অন্যান্যদের মত বিশ্বাস করে, তার স্বামী সাহিলের মতো প্রানবন্ত, সুন্দর ও ধনী মানুষের, আর একটা বিয়ে করার মত সমাজবাস্তবতার কথা। বিগতযৌবন, মুটিয়ে যাওয়া ফাহমিদার প্রতি যে সাহিলের আগ্রহ ও আকর্ষণ হারিয়ে গেছে, ফাহমিদা তা আরও বেশি করে অনুভব করে ছোটবোন জাসমিনের আগমনে।

ইসলামিক হিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর জাসমিন, বারবার ফাহমিদার যুবতি বয়সের ভ্রম সৃষ্টি করে সাহিলের মনে। তার যৌবন, সৌন্দর্য, আধুনিকতা ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কাছে একসময় সাহিল হেরে যেতে বাধ্য হয়। কারণ হিসেবে লেখক বলেছেন, ‘সব পুরুষের মধ্যেই বহুগামিতার ইতিহাস আছে।’[৩] অর্থনৈতিক সাফল্য তাকে আরও বেশি করে বহুগামিতার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ফাহমিদাও মানে, সে আজ সাহিলের চাহিদা পূরণে অক্ষম, তার স্বামীর জীবনে অন্য কোন সুন্দরী রমণীর আগমন অনিবার্য। সতেরো আঠারো বছরের সংসারজীবনে তার ত্যাগ, ভালবাসা ও সেবাপরায়নতার মূল্য আজ সাহিলের আছে কমে গেছে। তার মানসিক সৌন্দর্যের কোনো মূল্য সাহিলের কাছে নেই। সে তার ভালোবাসা ও অভিমানের যথাযোগ্য মূল্যও স্বামীর কাছে সবসময় পায় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার স্থূলতা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যহীনতা

সাহিলের কাছে একসময় এতো বড় হয়ে ওঠে যে, সে বারবার অন্য নারীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। একথা জেনেই সুন্দর মনের মানুষ ফাহমিদা, স্বামীর সুখের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে তৎপর। তাই সে তার সংসারজীবনকে বৃহত্তর বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে, তুলনামূলক কম বিপদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে, 'তুমি এত ধনী হয়েছ, আর আমি তোমাকে সুখ দিতে পারছি না। তুমি আর একটা বিয়ে করে আনতেই পার। জাসমিনকে মনে ধরেছে, এতে আমি দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছি, কাকে না কাকে ধরে আনতে। তার আগেই আমি ব্যবস্থা করে দিতে চাই। আব্বুজির সঙ্গেই আমিই কথা বলে রাজি করাব। অন্তত জাসমিন সংসারের মন্দ চাইবে না, দিদির প্রতি তার ভালোবাসাও আছে।'[৪] তবে ফাহমিদার মানসিক যন্ত্রণার চিত্রটিও লেখক এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, 'পৃথিবীর কোনো বউই চায় না, তার জায়গায় অন্য কেউ থাকুক। হোক না সে আদরের ছোটবোন। ফাহমিদা পরিস্থিতির উপর নজর রেখে এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।'[৫] স্বামীর সুখের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেও, এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের যন্ত্রণায় প্রচণ্ড কষ্ট পায় সে। তাই তার চোখে ব্যথা করে, মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হয়, রোজ রাতে স্বামীকে হারানোর দুঃস্বপ্ন দেখে এবং মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ঘুমের ওষুধ নিতে বাধ্য হয়।

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সব সমাজেই, জামাইদার সঙ্গে ছোট শালির অবৈধ সম্পর্কের ঘটনা নিন্দনীয় হলেও বাস্তবসম্মত। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রমাণ মেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বোন' উপন্যাসে। তবে মুসলিম সমাজে একই সঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। কোরানের অন্তর্গত সুরা নিসায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন পুরুষ শালিকে বিয়ে করে, তবে এক্ষেত্রে তার প্রথম স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে। তাই জাসমিনের সঙ্গে সাহিলের বিয়ে প্রসঙ্গে, ফাহমিদার দাম্পত্যজীবনের করুণ পরিণতি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। যদিও লেখক এই প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করেন নি। যাইহোক শিক্ষিতা, আধুনিকা, বুদ্ধিমতী জাসমিনের মত মেয়েরা আবেগ বা প্রেম দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে জগত বা জীবনকে বিচার করে। সাহিলের পৌরুষ, বুদ্ধিমত্তা, প্রতিপত্তি ও অর্থ তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। সে নিজের অধিকার ও সম্মান সম্পর্কেও সচেতন। তাই জাসমিন সাহিলের অর্থ, প্রতিপত্তি ও চেহারায় আকৃষ্ট হলেও, ফাহমিদার নামের আড়ালের মিলনে

অপমানিত হয় এবং কামনার চরম মুহূর্তে ভীরু সাহিলকে ঘর থেকে বের করে দেয়। যদিও শেষপর্যন্ত সে নিজের লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়, সাহিলকে বহুবিবাহের পথে নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আফসার আমেদে বলেছেন,ইয়'পুরুষমানুষের সঙ্গে কোনো নারী যদি খেলে, সেই খেলায় নারীরই জয় হয়। সৃষ্টি কাহিনিতে সে কথাই আছে।'[৬]

**রিজি, রূপকথার আধুনিক নারীঃ**

আফসার আমেদের এক অসাধারণ নারী চরিত্র 'হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা' উপন্যাসের রিজি। লেখক তাকে 'রূপকথার নায়িকা' বলেছেন। কিন্তু তার মত আধুনিক নারী বাংলা সাহিত্যে খুব কম দেখা যায়। আমাদের সমাজে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানগত ও অধিকারগত সমতার কথা বলা হলেও, বংশের ধারা তথা ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে সবসময় পুত্রসন্তানকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে, মাদারি ফকির বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুন্দরী রিজি, স্বেচ্ছায় বংশের ঐতিহ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব নেয়। তাই 'রিজি ভিক্ষে করে, বংশের দর্শন জারি রাখতে চায়, আগলে রাখতে চায়। তার এই রূপ নিয়ে, রূপকে যথাবিহিত কাজে না লাগিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে যে তার এই স্বেছা সমর্থন, এক ধরণের কৃচ্ছ্রতা এক ধরণের জীবন উৎসর্গ মনে করে রিজি।'[৭] তাই সে রূপকে গোপন করে 'উলিঢুলি' নোংরা পোশাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভিক্ষে করে বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করে। এইভাবে সে প্রমাণ করে, শুধুমাত্র পুত্রসন্তান নয়, কন্যাসন্তানও বংশের ঐতিহ্য ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। সমাজের চিরাচরিত প্রথাকে ভেঙে ফেলার মধ্য দিয়ে, রিজি একজন আধুনিক মননের পরিচয়বাহী রূপে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করে।

রিজির নোংরা পোশাকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার দুটো কারণ লেখক নির্দেশ করেছেন। প্রথমত সুন্দর পোশাকে বেরোলে তাকে কেউ সহজে ভিক্ষা দিতে চায়বে না, দ্বিতীয়ত তার রূপ পুরুষের চোখে পড়লে, সে আর ভিক্ষাবৃত্তি করতে পারবে না। তার রূপ হয় কোন পুরুষের লোভের চোখে পড়ে, তার সর্বনাশ ডেকে আনবে, না হয় কোনো বড়োলোক তাকে বিয়ে করবে। দরিদ্র ঘরের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে, বড়োলোক বাড়ির শোভাবর্ধন করার ইতিহাস আমরা 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসে দেখেছি। সেখানকার সোনার খাঁচায় বন্দী সুন্দরীদের

জীবনযন্ত্রণার কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো ভয়ংকর জীবন রিজির কাম্য নয়। রূপজ মোহে আক্রান্ত পুরুষদের সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারী তার রূপ ও সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। এই উপন্যাসে ফাহমিদা তার শারীরিক সৌন্দর্য হারিয়ে, বাহ্যিক সৌন্দর্যকামী সাহিলের কাছে নিজের গুরুত্ব হারিয়েছে। সতেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে স্বামী ও সংসারের প্রতি তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সেবাপরায়ণতা হেরে যায়। তার সুন্দর মন ও আত্মত্যাগের কোন মূল্য সে পায় না সাহিলের কাছে। সাহিলের কখনো যুবতি শালির প্রতি কামার্ত মনোভাব প্রকাশ করা এবং বারবার ভিখারিনি সুন্দরী রিজির সন্ধানে ছুটে চলা, যে ফাহমিদার পক্ষে কতোটা মর্মান্তিক ও অপমানকর, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাই রিজি এমন একজন পুরুষের সন্ধান করে, যে তার রূপকে নয়, তাকে ভালোবেসে তার ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে গুরুত্ব দেবে। যদি তা না হয়, তবে এই বংশগত পেশা আমৃত্যু টিকিয়ে রাখার জন্য, সে আজীবন অবিবাহিত থাকতেও প্রস্তুত। এখানেই রিজি একজন আধুনিক নারী রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

তবে বাইশ বছরের রিজির মনে নিজেকে সাজিয়ে তোলার সাধের পাশাপাশি পুরুষ সাধ থাকাটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। নারীজীবনের এই চরম সত্যকে লেখক অস্বীকার করেন নি। তাই সে রাতের অন্ধকারে রূপকথার নায়িকা হয়ে ওঠে অপরূপ সাজে। আসুরা নানির অকুণ্ঠ প্রশংসায় সুন্দরী রিজি ভীষণ আপ্লুত হয়। সে তার এই অপরূপ রূপ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে গোপন করে রাখলেও, পুরুষকে দেখার সাধ তার বয়সী নারীর থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর তার এই পুরুষকে কাছে থেকে দেখার অপূর্ণ সাধ মেটে, তাদের ঘরে আশ্রিত অচৈতন্য সাহিলের সংস্পর্শে। এমনকি 'পুরুষসাধে' আক্রান্ত রিজি, লোভের বশবর্তী হয়ে, অচৈতন্য সাহিলের ঠোঁটে পরপর তিনটি চুম্বন করে, কারণ 'যেহেতু পুরুষটি ছিল অচৈতন্য, চুম্বনের দায় নিতে হবে না তাকে।'[৮] যদিও অচৈতন্য অবস্থায় সাহিলকে তিনবার চুম্বনে সে আনন্দিত। সে কিছুতেই সাহিলের কাছে ধরা দেতে চায় না। কারণ এই বড়লোক মানুষটি তাকে ভিক্ষাবৃত্তি করা থেকে বিরত করবে। তবে একথা ঠিক যে, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভিক্ষাদর্শনের আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য, রিজির একটি ঘোড়ার পাশাপাশি একজন পুরুষ সঙ্গীরও প্রয়োজন।

যদিও আধুনিক নারী রিজির সংকল্প, বংশের ইতিহাস রক্ষায় সে প্রয়োজনে একলা পথ চলবে। তবে তার এই পথ চলায় সে তার 'সহমতকামী পুরুষ'কেও মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করে, যা সে সাহিলের মধ্যে খুঁজে পায় না। রূপজমোহে আকৃষ্ট সাহিলকে সে তাই প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজের বংশের ঐতিহ্যের প্রতীক হিরেটি তাকে ভিক্ষে দেয়। রিজির মতো ভিখারিনির কাছে, সাহিলের মতো ভিখিরি, লোভী ও কামুক কোটিপতির পরাজয় ঘটে। এখানে জয়ী হয় আধুনিক নারী রিজির বিশ্বাস, সংকল্প ও ভিক্ষাদর্শন। তাই 'মনে মনে খুব খুশি হল রিজি। লোকটার দম্ভ দেখেছে। প্রেম আছে কিন্তু প্রেমের মধ্যে নিবেদনের কোনো দীনতা নেই, বিনয় নেই। ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে যা যা থাকে।'[৯] রিজি জানে সাহিলের দম্ভ, অহংকার এবং লোভ একদিন তার জীবনে পরিপূর্ণ সুখের অন্তরায় হয়ে উঠবে। তাই সে তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে দীন-দরিদ্র 'পুরুষহিরে' সাজু মাঝিকে। যে সাজুমাঝি রিজিকে ভালোবেসে, তার ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গী হতে চায়। আমাদের সমাজে নারী সবসময় পুরুষকে অনুসরণ করে যেতে বাধ্য হয় কিন্তু এখানে সাজুমাঝি পৌরুষের সমস্ত অহংকার ও দম্ভ ত্যাগ করে, স্বেচ্ছায় রিজিকে ভালোবেসে 'তার যাত্রার সঙ্গী হতে চায়', আর এখানেই রিজি রূপকথার আধুনিক নারী হয়ে ওঠে। আফসার আমেদ রিজির মধ্য দিয়ে নারীজীবনের এই চরম সত্যকে প্রকাশ করেছেন, নারীর নিয়ন্ত্রী হয়ে ওঠার পথ নির্দেশ করেছেন অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে, যেখানে নারী, পুরুষের অনুসরণ করে না বরং একজন প্রেমিকপুরুষ তার সঙ্গী হয়ে, তার স্বপ্ন পূরণের ভবিষ্যৎ পথকে করতে চেয়েছে আনন্দঘন। আধুনিক সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার পথে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সপ্রেম সহযোগিতা একান্তই কাম্য, আর এইপথেই একদিন সুস্থ ও সুন্দর সমাজজীবন গড়ে উঠবে। 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'র প্রতিবাদী নারী শাহনাজ ও শাবানা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অহংকারের বিরুদ্ধে, যে বন্ধুর পথ চলা শুরু করেছিল, তা রিজি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে।

### ৩) অশ্রুমঙ্গল

আফসার আমেদের 'অশ্রমঙ্গল' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় দিশা সাহিত্য পত্রিকায়, ২০০০ সালে। এর প্রায় দুই বছর পর ২০০২ সালে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

হয়। লেখক এই উপন্যাসে কুসুমপুর গ্রামের নারীদের জীবনের নানান সমস্যা ও সংকটকে সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও অসমবিবাহকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত নারীজীবনের যে যন্ত্রণাময় ইতিহাস লেখক বারবার তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন, তারই একটি ভিন্নতর ও সময়োপযোগী পরিবর্তিত রূপ আমরা এই উপন্যাসে খুঁজে পায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের আধুনিক বাস্তবসম্মত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপন্যাসটিকে একটি আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। যেখানে অনেক চেষ্টা করেও ভাগ্যহত, নিয়তিতাড়িত বদরনের মত নারীদের ভালবাসার মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। হাফেজার অন্তরের হাহাকারের প্রকৃত কারণ সকলের অলক্ষ্যে থেকে যেতে বাধ্য হয়। মুসলিম দরিদ্র পুরুষসমাজের একটি বড় অংশ কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকে। এই পরিযায়ী শ্রমিকের মা ও স্ত্রীর যন্ত্রণাময় অনুভূতিরও জীবন্ত আলেখ্য এই উপন্যাস। পাশাপাশি আছে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি মতিন মাস্টারের আধুনিক ও শিক্ষিত স্ত্রী, নিঃসন্তান সামিমার নীরব অশ্রুপাতের কথা।

‘অশ্রুমঙ্গল’ উপন্যাসের অন্যতম নারীচরিত্র হাফেজা। পারিবারিক বিরোধের জন্য প্রেমিক নাদেরকে সে স্বামী রূপে পেতে ব্যর্থ হয়। তার বিয়ে হয় মহরমের সঙ্গে। স্বামীর কাছ থেকে সুন্দরী হাফেজা, পাঁচ-ছয় বছর স্ত্রীর সমস্ত অধিকার ও মর্যাদা পেলেও, বহুগামি পুরুষ মহরম এক নারীতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। সে আর একটি বিয়ে করে এবং হাফেজাকে শারীরিক নির্যাতন করে সংসার থেকে তাড়িয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই হাফেজা পাঁচ বছরের সন্তানের হাত ধরে, বাপের বাড়ি কুসুমপুরে ফিরে আসে। মহরম হাফেজাকে তালাক দেয় না, হাফেজা আবার কোন পুরুষকে বিয়ে করে সুখী হোক, সেটা চায় না। মাঝে মাঝে সে মহরমের কাছ থেকে একশো বা পঞ্চাশ টাকা চেয়ে আনে। দরিদ্র বাবা ও ভাইদের সংসারেও সে উপেক্ষিত। বাড়ি বাড়ি কাজ করে, ‘চেয়েচিন্তে’ ছেলে হালিমকে নিয়ে কোনরকমে জীবন অতিবাহিত করে। কুসুমপুর গ্রামের নারীরা অবশ্য প্রায় সকলেই ভাগ্যহত, সংসারবঞ্চিত সরল হাফেজার প্রতি সহানুভূতিশীল। বছর ত্রিশের হাফেজা সুন্দরী ‘কিন্তু সে উলিডুলি থাকে, উলিডুলি থাকতেই ভালবাসে। চেয়েচিন্তে দিন চলে যার তার পক্ষে সাজগোজ করে থাকা সাজে না। মনটাকেও তেমনই মলিন করে রাখে। শুধু কেউ তাকে কী দেবে সেই দিকে লোভ।’[১০]

এমনকি একসময়ের মনের মানুষ নাদের মোল্লার কাছেও সে মাছ ও টাকা চাইতে দ্বিধা করে না। পেটের ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনের কাছে হাফেজার অন্যান্য অনুভূতি হারিয়ে যায়। তার মনের মধ্যে শুধুমাত্র একটিই সাধ উজ্জীবিত থাকে, কুসুমপুর গ্রামের আর সকল মেয়েদের মত তারও যেন একদিন স্বামীর ফোন আসে। তাই সে মহরমের কাছ থেকে তার নামে ফোন আসার সব ব্যবস্থা পাকা করে নিজের উদ্যোগে। অবশ্য মহরমের কাছে তার আর কিছু চাওয়ার নেই, শুধুমাত্র ফোনে কথা বলায় সে আগ্রহী।

লেখক আফসার আমেদ হাফেজার মধ্য দিয়ে, গ্রামবাংলার দরিদ্র মুসলিম সমাজের এক পরিচিত চিত্রকে তুলে ধরলেও, হফেজার মনের সৌন্দর্য ও হারানো প্রেমবাসনাকে জাগিয়ে তুলে, তাকে অনন্য করে তুলেছেন এই উপন্যাসে। যেদিন হাফেজা নাদেরের কাছ থেকে মাছ ও টাকা চেয়ে নিয়ে আসে, সেদিন সন্ধ্যার অবকাশে, নাদেরের বলতে চাওয়া কথার সূত্রে নিজের মনের ভালবাসার সন্ধান পায়। বারোবছর আগের প্রেমিক নাদেরের জন্য তার জীবনে এক নতুন ছন্দ আসে। উলিডুলি নয়, নতুন সাজে সে নিজেকে সাজায়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে চেয়ে নিয়ে আসার স্বভাবও সে ছেড়ে দেয়। অমানবিক মহরমের জন্য তার মনের মধ্যে কোন অনুভূতিই নেই, এমনকি 'শয়তান' মহরমের কথা ভাবতেও সে নারাজ। নাদেরের প্রেমে সে তার জীবনকে, নতুন সাজে সজ্জিত করে। অবশ্য বিবাহিত নাদেরের সংসারজীবনে প্রবেশ করে সে কোন অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় না, নাদেরের অর্থের প্রতিও আজ তার কোন লোভ নেই। নাদেরের প্রেম ও জীবনের কাছে তার প্রত্যাশাও অত্যন্ত সামান্য। ভালবাসার মানুষ নাদেরকে শুধু চোখের দেখাতেই সে তৃপ্ত। বারোবছর পরেও যে নাদের তাকে ভালবাসে, এই কথাতেই সে ভীষণ সুখী। হাফেজার এই নির্মল প্রেম একেবারেই কামগন্ধহীন ও পবিত্র। মনের মানুষ নাদেরকে শুধুমাত্র দেখার সাধ তাকে নতুনভাবে বাঁচিয়েও তুললেও, এই সামান্য সাধ থেকেও হাফেজা বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনায় অশ্রুবর্ষণ করে চলে। ফোনবিলাসী হাফেজার সঙ্গে কথা বলার সূত্রে, মহরমের মনে হয়তো কোনো অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। এতদিন পর স্ত্রীকে দিনের পর দিন বাবার বাড়িতে ফেলে রাখা তার অনুচিত মনে হয়। তাই মতিন মাস্টারের বাড়ির ফোনে, হাফেজাকে সংসারে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায়। স্বামীর এই সিদ্ধান্তকে অসম্মান করা হাফেজার মত সাধারণ নারীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। হাফেজা কুসুমপুর

ছেড়ে যাওয়ার বাধ্যতায়, নাদেরকে আর দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণায় অশ্রুবর্ষণ করতে থাকে। সকলে ভাবে স্বামীর সংসার ফিরে পাওয়ায় আনন্দে হাফেজা কাঁদে, এবং নানাভাবে তাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু প্রেমিকপুরুষকে আর দেখতে না পাওয়ার যন্ত্রণার কথা সে কাউকে বলতে পারবে না। সমাজ তাকে সেই অধিকার দেয় না। স্বামী নিজের 'গুনা'র মাপ চেয়ে, আবার সংসারে ফিরিয়ে নিতে চাইলে, স্বামীকে ক্ষমা না করার অধিকারও সমাজ নারীকে দেয় না। এখানেও সে নিরুপায়, তাই 'হাফেজা কাঁদছে, এত বছর পর নাদেরের সঙ্গে তার ভাব হল, আর স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেবে, এই নিষ্ঠুরতায় সে কাঁদে। স্বামী ভাবে, তাকে বাপের বাড়িতে অবহেলায় ফেলে রেখেছে, এখন ফিরিয়ে নিচ্ছে, সেই আনন্দে কাঁদছে। হাফেজা কাঁদতেই থাকে, কথা বলতে পারে না, কান্না তার উথলে উঠতে থাকে।'[১১]

সাধারণ দরিদ্র মুসলিম সমাজে, বহুবিবাহের দরুন হাফেজার মত মেয়েরা এইভাবেই বহুগামি পুরুষের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া মুসলিমধর্মে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও, হাফেজার পরিবার এই অন্যায় কাজ করে। সমাজ বা ধর্ম এক্ষেত্রে সবসময়ই নীরব থাকে। বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে নারীর জীবন নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যখন খেলা করে, তখনও ধর্ম তথা সমাজ নীরব থাকে। এইভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি বৃহত্তর মুসলিম সমাজ। একবিংশ শতকে এসেও এই সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তাই সম্ভব হয় নি। সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরে লেখক তাই বলেছেন, 'গ্রামটা গ্রামের জায়গায় যেমন ছিল, তেমনই আছে। তেমনই ভাঙাচোরা আছে গ্রামের রাস্তা। তেমনই গ্রামের খেতে সেচের অসুবিধে। যেমন ছিল, তেমনই আছে কর্মসংস্থানের অসুবিধে। গ্রামের মানুষ ছুটে চলেছে দূর-দূরান্তে কাজের জন্য। খরা-বন্যার সমস্যা তেমনই থেকে যাচ্ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য ঘরে ঘরে পৌঁছচ্ছে না তেমনই। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে জননীরা আগের মতো তেমনই মারা যাচ্ছে। তেমন অপুষ্টিজনিত রোগে শিশুরা ভুগছে। কোনো কিছুই টেলিফোন বদলাতে পারে নি। টেলিফোনের বদলাবার কথাও নয়।'[১২]

তবে একথাও সত্য, কুসুমপুর গ্রামের কিছু কিছু শিক্ষিত পরিবারে আধুনিক মননের পরিচয় পাওয়া যায়। মতিন মাস্টারের স্ত্রী সামিমা নিঃসন্তান। মতিন মাস্টারের মা, বংশরক্ষার জন্য, বারবার ছেলের দ্বিতীয় বিবাহের চেষ্টা করে। তাই 'মায়ের কাছে যেতে ভয় পায় মতিন।

মায়ের কাছে গেলে মা বলে আর একটা বিয়ে করতে। আর একটা বিয়ে করলে সামিমাকে দুঃখ দেওয়া হবে, এই কারণে সে আর একটা বিবাহ করবার কথা ভাবতে পারে না।'[১৩] এদিক থেকে মতিন, সামিমার প্রকৃত সঙ্গী হয়ে তার অশ্রু মুছিয়ে দেওয়ায় উদ্যোগী। একজন নারীর জীবনে পরিপূর্ণতা আসে মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে। এই মাতৃত্বের অভাবে সামিমা নিজেই অত্যন্ত যন্ত্রণাকাতর। শ্বশুর, শাশুরি ও পাড়া-প্রতিবেশি, এক মুহূর্তের জন্যও তাকে, তার এই অক্ষমতার কথা ভুলতে দেয় না। অথচ সামিমার এতে কোন দোষ নেই। তার এই অভিশপ্ত জীবনে সতীন যন্ত্রণা দিয়ে, তার জীবনকে আরও বেশি রক্তাক্ত করতে চায় নি মতিন, যা আমরা লেখকের 'দ্বিতীয় বিবি' উপন্যাসে পায়। নিঃসন্তান সামিমাদের জীবনে মতিন মাস্টারের মত সহানুভূতিশীল জীবনসঙ্গীর অত্যন্ত প্রয়োজন, যারা স্ত্রীর পাশে থেকে, তার দুঃখকে কিছুটা হলেও প্রশমিত করার চেষ্টা করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক মুসলিম পরিবারে, নারীর জীবনের এই পরিবর্তন আফসার আমেদ রূপায়িত করেছেন।

**বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গঃ**

**১) মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা**

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি, মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, একজন দরিদ্র ও অসহায় মুসলিম বিধবার পক্ষে, কাঙ্ক্ষিত ও উপযুক্ত স্বামী লাভের ক্ষেত্রে সামাজিক দিক থেকে সবসময় একটি বাধা আসা নানান সমস্যার কথা। সাধারণত দেখা যায় বাঙালি মুসলিম সমাজে একজন বিপত্নীক পুরুষের (বয়স্ক হলেও) বিবাহের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে যেমন সমাজের সকলে যত্নশীল ও উদ্যোগী হয়, একজন মুসলিম বিধবার (কমবয়সী হলেও) ব্যাপারে কিন্তু তেমন কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে না। বরং বিধবার বিবাহ সমাজের অনেক ক্ষেত্রেই নিন্দনীয় হয়ে উঠে। একজন বিপত্নীক পুরুষের মতো, একজন বিধবা নারীর নিঃসঙ্গ জীবনেও যে একান্ত আপন কোনো পুরুষসঙ্গীর প্রয়োজন, সেকথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভাবে না। যদিও ইসলামধর্মে একজন অসহায় বিধবাকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে, মুসলিম ধর্মের একটি সুন্নত পালন করা যায়, যা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এই ধর্মে কমবয়সী বিধবাদের পুনর্বিবাহে উৎসাহ দান করার কথা বলা হয়েছে। অথচ এই ব্যাপারে

আজও সমাজে সেভাবে কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় না। উপরন্তু যদি সেই বিধবার কোনো সন্তান থাকে, তাহলে সমাজ তার বিয়ের ব্যাপারে এক প্রতিকূল সংবাদ প্রচার করে। ফলে হাসিনার মতো কমবয়সী বিধবারা, একরকম বাধ্য হয়ে একাহাতে সন্তানদের বড় করে তোলায় ব্রতী হয়। কোনো পুরুষ যদিও একজন যুবতি বিধবাকে বিয়ে করতে রাজি হয়, তবে তার সন্তানদের কোনোরূপ দায়িত্ব নিতে চায় না। অথচ কতো মুসলিম নারীই যে একজন বিপত্নীক পুরুষকে বিয়ে করে, আগের পক্ষের সন্তানদের লালন-পালন করে তার পরিসংখ্যান বলা কঠিন। অবশ্য সৎমায়ের অত্যাচারের কাহিনিও সমাজে বিরল নয়। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। তবে সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ 'হাসিনার পুরুষ' ছোটগল্পে যে সমাজ সত্যকে তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। সেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী পুরুষ উভয়েই এক বা একাধিক সন্তানের জননী হাসিনার মতো বিধবাদের, বিয়ের বাপ্যারে অনীহার কথা প্রচার করে থাকে। এই প্রচারের শিকার হয়ে হাসিনারা নিজের ইচ্ছে, সাধ ও আকাঙ্ক্ষার কথা লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারেনা। এক্ষেত্রে তারা কিভাবে সমাজের এই প্রচারের হাতে সমর্পিত হতে বাধ্য হয়, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু আফসার আমেদ 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসে এই সমাজসত্যকে ভাঙলেন। যেখানে এক সন্তানের জননী, দরিদ্র ও অসহায়, বিগতযৌবনা বিধবা শাহনাজকে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও ধার্মিক শফীউল্লা বিবাহ করে সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মেটিয়াবুরুজের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী শওকতের প্রিয় ছোটভাই, ধার্মিক ও শিক্ষিত শফীউল্লা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে, বাড়ির কাউকে না জানিয়ে, আচমকা এক 'আধবুড়ি বিধবা' শাহনাজকে বিয়ে করে, ইসলাম ধর্মের সুন্নত পালন করে। আপাতদৃষ্টিতে শফীর এই বিবাহ ধর্মসম্মত ও সমাজের পক্ষে এক কল্যাণকর পদক্ষেপ মনে হলেও, উপন্যাসের কাহিনি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে লেখক তার অমানবিক ও মৌলবাদী চরিত্রকে স্পষ্ট করেছেন। তার এই হঠকারী সিদ্ধান্তে শাহনাজ ও তার কিশোরী মেয়ে শাবানার জীবনে চরম সংকট ও সমস্যা নেমে আসে। লেখক দেখিয়েছেন, শাহনাজের মতো চল্লিশবছর বয়স্ক বিধবা স্বপ্নেও নিজের বিয়ের কথা ভাবতে পারে না। স্বামীর মৃত্যুর পর চুকিবালির কাজ করে যাকে সংসার চালাতে হয়, সে তার কিশোরী মেয়ে শাবানার বিয়ের প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছু ভাবার অবকাশও পায় না। তাছাড়া

তার মতো বিধবাদের সমাজ নিজের জীবনের কথা ভাববার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই এই আকস্মিক বিয়েটা তার 'এক অস্বস্তিকর দুঃসময়' মনে হয়। অথচ এই বিয়ের বিরুদ্ধতা করার সময়, সুযোগ ও সাহস কোনটাই শাহনাজের ছিলনা। কারণ তার মত একজন অসহায় ও দরিদ্র সাধারণ বিধবার পক্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত শফীর প্রস্তাবের বিপক্ষে যাওয়া অসম্ভব ছিল, এই সমাজসত্যের প্রতিও লেখক আলোকপাত করেছেন। তাই সে এক লজ্জা ও আতঙ্কের মধ্যে থাকে। অন্য এক পুরুষের 'শয্যাসঙ্গ ভীতিকর', হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক শাহনাজের জীবনে। কারণ সমাজের চাহিদা অনুযায়ী তার মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন কাটানো উচিত। এই বয়সে পুনর্বার স্বামীর সাধ মেটানো তার পক্ষেও অপমানকর। তার উপর কন্যা শাবানার চিন্তায় ব্যাকুল হয় শাহনাজের মাতৃত্ব, 'শফীউল্লা তাকে বিয়ে করে কী সমস্যায় ফেলেছে, মেয়েকে সমস্যায় ফেলেছে, সেই অসহায়তার কান্নার মধ্যে ঢুকে গিয়ে শহনাজ মেয়ের এই কথায় কাঁদে। 'আমি তোকে ছেড়ে যাব কী করে। আমি কী যেতে চেয়েছি? আমি কী আমার ভালো কোনোদিন চেয়েছি?'... 'তোর কী হবে, শুনলে আলম কি আর তোকে বিয়ে করতে চাইবে? না যদি আসে কাল? ডুকরে ওঠে শাহনাজ।'[১৪] মেয়ের বিয়ে দেওয়ার বয়সে, মায়ের বিয়ে সমাজ ভালো চোখে দেখে না। তাই তার বিয়ের জন্য, মেয়ে শাবানার বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা বাস্তবসম্মত।

শাহনাজের মতো 'আধবুড়ি বিধবা'র, শফীর মতো মানুষের সঙ্গে বিবাহে সমাজে যে একটা গুঞ্জন ওঠা স্বাভাবিক তা লেখক প্রকাশ করেছেন। এই বিবাহে শফীর মা নিগার বানু ও বউদি কিসমতও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তারা দুজনেই শাহনাজ সম্পর্কে অপমানকর মন্তব্য করেছে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই সমাজের প্রতিনিধি, শফীর আপনজনরূপে এই আকস্মিক বিয়েতে তাদের সম্মানহানি হয়। কারণ শফীর মতো বিত্তবান, শিক্ষিত, জ্ঞানী ও ধার্মিক মানুষের স্ত্রী কোন অসহায় ও 'আধবুড়ি বিধবা' হবে তা সমাজবিরুদ্ধ। তবে এই বিয়েতে সর্বাধিক ক্ষুব্ধ হয় শওকতউল্লা। যে ভাইয়ের শিক্ষা ও ধর্মীয় জ্ঞানে সে গর্ববোধ করে এসেছে, তার এহেন ভিখিরির মত বিয়েতে বংশমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, সে প্রতিযোগী ব্যবসায়ী ও আত্মীয়দের ঠাট্টার পাত্র হয়। আমরা জানি কোন অসহায় বিধবাকে বিয়ে করার কথা সাহিত্যে বা নীতিকথায় যতই প্রশংসিত হোক না কেন, সমাজ আজও তা নিন্দার চোখে দেখে। আফসার

আমেদ এই সমাজ সত্যই এখানে তুলে ধরেছেন। মানুষের নীতি, বিবেচনা ও মানবিকতার কাছে তিনি বারবার এই প্রশ্ন তুলেছেন। যেখানে রক্ষণশীল মৌলবাদী মুসলিম সমাজ ধর্মের আচার-আচরণ, বিধি-বিধান মেনে চলায় সমাজকে বারবার প্ররোচিত করে, সেখানে বিধবাবিবাহের মতো ধর্মসম্মত মানবিক দিকটির প্রতি তাদের উপেক্ষার কথা লেখক তুলে ধরেছেন বারবার। আফসার আমেদের এই প্রয়াস যে একদিন সার্থক হবে, তা আশা করা যায়।

## ২) প্রেমপত্র

আফসার আমেদের 'প্রেমপত্র' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় 'দক্ষিণীবার্তা' পত্রিকায়, ২০০৩ সালে। এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। আফসার আমেদের অন্যান্য অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পের মত আলোচ্য উপন্যাসেও বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু 'এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা' উপন্যাস বা 'হাসিনার পুরুষ' ছোটগল্পে বিধবাবিবাহের যে সমস্যা ও সংকটের কথা লেখক তুলে ধরেছেন, প্রেমপত্র তা থেকে একেবারেই আলাদা। কোলকাতার কাছাকাছি একটি উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের অল্পবয়সী বিধবা আনারকলির নিংসঙ্গ জীবনে, প্রেমিক বাহারের আগমনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। পাশাপাশি এই উপন্যাসে আকিকা, নামাজ, কোরানপাঠ, খানা, জান্নাত-জাহান্নাম ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত পাপপুণ্য বিষয়ক ধর্মীর বিধানের খুঁটিনাটি বর্ণনায় লেখক সেই সমাজের একটি সুন্দর ও বাস্তব চালচিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তাঁর 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে আমরা দেখেছি, একটি অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত মুসলিম পরিবার তথা সমাজের গৃহস্থালির আনুপূর্বিক জীবনচিত্র ও অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবনযাপনের বাস্তবসম্মত আনন্দবেদনাকে আর 'প্রেমপত্র' উপন্যাসে উঠে এসেছে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের অন্তঃপুরবাসিনীদের দৈনন্দিনতার বাস্তবচিত্র।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে দেখা যায়, পিতার জীবিত অবস্থায় সন্তানের মৃত্যু হলে, মৃত সন্তানের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান, সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ', আবু ইসহাকের 'আবর্ত' প্রভৃতি সাহিত্যে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত মুসলিম বিধবা নারী ও অনাথ শিশুদের জীবননির্বাহের নানান সমস্যা

ও সংকটের কথা ধরা পড়েছে। কিন্তু ‘প্রেমপত্র’ উপন্যাসে জুলফিকার, মানবিকতার পরিচয় দিয়ে, ছোটপুত্রবধূ বিধবা আনারকলি ও রাহাতের সন্তান বাদশাকে প্রাপ্য সম্পত্তি লিখে দেওয়ার অঙ্গীকার করে, ‘বাপের কোলে ছেলে মরলে, মুসলিম আইনে সেই ছেলের স্ত্রী সন্তান সম্পত্তির কোনো কিছুই পায় না। আনারকলির বাপের বাড়িতেই আশ্রয় হত। বাপও সেটা চেয়েছিল। কিন্তু জুলফিকার চায়নি। আনারকলি এই ঘরের বউ, সসম্মানে এই বাড়িতেই থাকবে। জুলফিকার বেঁচে থাকতে আনারকলির নামে সম্পত্তি লিখে দিয়ে যাবে।’[১৫] এমনকি জুলফিকার, ছাব্বিশবছরের বিধবা আনারকলির পুনর্বিবাহের ব্যাপারেও উদারতা দেখিয়েছেন, যা সেই সময় ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত মানবিক ও অভিনব। যদিও আনারকলির পুনর্বিবাহের অস্বীকৃতিতে সে মনে মনে ভীষণ খুশি। কারণ বাড়ির পুত্রবধূ অন্য কোন বাড়ির বউ হলে, জুলফিকারের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হতো। বাঙালি মুসলিম পরিবার নিজের উদ্যোগে, বিধবা পুত্রবধূর বিয়ের আয়োজন করছে, এই সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজও তা বিরল। তবে শ্বশুর হয়েও আনারকলির নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা, বিনিদ্র রাত্রিযাপন ও ‘আনারকলির একাকিত্ব ও কষ্টের কথা অনুভব করছে জুলফিকার। বয়সের ধর্মে এই একাকিত্বের কষ্ট দুঃসহ যদিও, কিন্তু একদিন তো বয়স বাড়বে, শমিত হয়ে উঠবে এই কষ্ট, তখন বাড়বে একাকিত্ব। ধর্মে যদিও বলছে বিধবার বিয়ে দেওয়া জরুরি, আর অবশ্যকর্তব্য। আবার আনারকলির বিয়ে না করার অধিকারও আছে। আনারকলি এ সংসারে থেকে গেল। এখানেই জীবন অতিবাহিত করবে। যেমন জুলফিকারের সেবাযত্ন করে আসছিল, করে যাচ্ছে, করে যাবে।’[১৬]

লেখক আফসার আমেদ, বিধবা আনারকলির বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণা ও মানসিক দ্বন্দ্বকে এই উপন্যাসে অনেক বেশি প্রাণবন্ত করে বর্ণনা করেছেন। দুর্ঘটনায় রাহাতকে হারানোর পর শ্বশুরবাড়ির সকলের ভালোবাসা, স্নেহ ও নামাজ-কালাম-কোরানপাঠের মধ্য দিয়ে, আনারকলি একরকম ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করলেও, নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা, তার পক্ষে মেনে নেওয়া মাঝে মাঝে অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। তার একমাত্র সন্তান বাদশার দূরে সরে যাওয়া, তার এই যন্ত্রণাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে তোলে। সে রাহাতের মৃত্যুতে বারবার অসুস্থ হতো বলেই, বাদশা মায়ের কোল ছেড়ে, দাদিকে আশ্রয় করে। অথচ সে জানে, ‘এখনও তার বয়সি মেয়েদের বিয়েই হয়নি। আর তার সব শেষ? লোকজনের বোঝানো কথায় ভাগ্যের কথা বিশ্বাস

করে। আল্লা দিয়েছিলেন তাকে, আল্লা নিয়েছেন; আল্লা যা করেন ভালর জন্য। মনকে শান্ত করতে হবে। মেনে নিতে হবে সব। দুনিয়ার জীবন আসল নয়, আসল জীবন মৃত্যুর পর। তার জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। আল্লার পথে চললে তবেই বান্দারা বেহেস্তের জীবন পাবে, যে জীবন সুখপূর্ণ অনন্ত, যার কোনো শেষ নেই। পৃথিবীতে আল্লা পাঠান পরীক্ষা করার জন্য।'[১৭] আকরম মৌলবির উপহার দেওয়া ধর্মসাহিত্য ও ধর্মীয় বাণী তাকে আরও বেশি পরকাল ও ধর্মের পথে ঠেলে দেয়। তবুও যে আনারকলি জীবনকে ভালোবাসে, তা প্রমাণিত হয় ধর্মীয় গ্রন্থের চেয়ে, উপন্যাস পাঠের প্রতি তার অদম্য আগ্রহে, জাভেদের খাতায় রঙ দিয়ে সুন্দরবভাবে ছবি আঁকায়। জুলফিকারের বাড়ির প্রাইভেট মাস্টার বাহার, তাকে এই গল্প-উপন্যাসের বইগুলো, প্রতিনিয়ত লাইব্রেরি থেকে বদল করে এনে দেয়। আনারকলি অধীর আগ্রহে নতুন বইয়ের জন্য অপেক্ষা করে, কারণ 'বইটা তার প্রয়োজন। সময় সুযোগ পেলে বইটা সে পড়বে। অনেক রাত পর্যন্ত একা একা থাকার ভিতর বইকে আশ্রয় করবে। সাধ বলতে এই তার সাধ, এই তার লোভ, আর কোনো কিছু সাধ নেই, লোভ নেই। বিশ্বাস করে থাকতে নেই। থাকা উচিতও নয়। ঘুমুলেও স্বপ্ন দেখলে তার বেশ লাগে। গাছগাছালি পাখপাখালি আকাশ পৃথিবী তার ভাল লাগে। সে জানে বেঁচে থাকা তার হারিয়ে যায়নি, ফুরিয়ে যায়নি।'[১৮] জীবনের এই হাতছানি ভুলে থাকতেই সে সাংসারিক কাজকর্ম করে, বই পড়ে, নামাজ পড়ে ও কোরান পাঠ করে জীবনের প্রশান্তি খোঁজার চেষ্টা করে। রাহাতের মৃত্যুর পর সে এইভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

মানুষ জীবনের হাতছানি সবসময় অস্বীকার করতে পারে না। তাই রাহাতের মৃত্যুর সাত মাস পর, তাকে লেখা বাহারের প্রেমপত্র তার জীবনের সবকিছু বিপর্যস্ত করে দেয়। বাহারের প্রথম প্রেমপত্রের দুঃসাহসিকতা ও আকস্মিকতার মানসিক দ্বন্দ্ব, ভয় ও উত্তেজনায় আনারকলি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে জানে, বাহারের অবৈধ প্রেমনিবেদনের প্রতি তার কোন অনুভূতি না থাকলেও, এই প্রেমপত্রের কথা সর্বসমক্ষে এলে, সমাজ তথা পরিবার তাকে কলঙ্কিত ভেবে অপমান করবে ও বাহারকে গ্রামছাড়া করে ছাড়বে। বাহারের আসা বন্ধ হলে, নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী, পরমকাঙ্ক্ষিত নিত্যনতুন বই পাওয়া থেকে সে বঞ্চিত হবে। নিজের বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ জীবনে গল্প-উপন্যাসের নানান চরিত্র ও সম্পর্কের টানাপড়েনের

মধ্যে সে একভাবে তার বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পায়। বই তাকে বাঁচিয়ে রাখে, তাই সে বাহারকে বিপদে ফেলতে চায় না। সমস্তকিছু ভেবেই আনারকলি মনে মনে বাহারকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাহারের প্রেমপত্রকে উপেক্ষা করে, বাহারের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করে যায়। একজন বিধবার পক্ষে বাহারের অবৈধ প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার আর অন্য কোন উপায় সে খুঁজে পায় না। আনারকলি মনে মনে সংকল্প করে, ধর্ম, সংস্কার ও সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে, অবৈধ প্রেমনিবেদনে সাড়া দেওয়ার মত অপরাধে সে কিছুতেই যাবে না। কারণ 'ধর্মবোধ তাকে বলছে এসব কোর না, এসব অন্যায় হবে। আমলনামা নষ্ট হবে। দোজখে ঠাঁই হবে। দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে। সেই কষ্টের শেষ নেই, নিবৃত্তি নেই।'[১৯] মূলত আনারকলি পরকালের ভয়ে, জীবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যায়। সে বারবার বাহারের লেখা প্রেমপত্রকে নীরবে প্রত্যাখ্যান করে চলে। বাহারের সমস্ত প্রচেষ্টাকে সে উপেক্ষা করে স্বাভাবিক আচরণে বিরাজ করে। কিন্তু একজন অল্পবয়সী বিধবার পক্ষে, একজন আকর্ষণীয় পুরুষের প্রেমের আকুলতা যে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, নারীমনের এই গোপনতাকে লেখক আফসার আমেদ আলোচ্য উপন্যাসে স্পর্শ করেছেন বাস্তবতার আলোকে। তাই আনারকলির ব্যক্তিগত জীবনে এই প্রেমের আহ্বান নানান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সে কাজে ভুল করে, শ্বশুরের পানে বেশি চুন দিয়ে ফেলে, খাবারে অরুচি আসে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তার গহন রক্তাক্ত মনের অস্থিরতা, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। এই অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সে স্বামীর স্মৃতি, বাদশা ও ধর্মকে আশ্রয় করে, প্রেমের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করে চলে নানাভাবে।

কিন্তু আফসার আমেদ নারীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে দেখিয়েছেন, বাহারের লেখা একের পর এক প্রেমপত্রের মধ্য দিয়ে বিধবা আনারকলির মনের রুদ্ধদ্বার ধীরে ধীরে খুলতে থাকে এবং 'ভেঙে পড়তে থাকে ক্রমশ আনারকলি। ক্রমশ তার সমস্ত বাধা ও স্বেচ্ছা প্রতিরোধের বাঁধ খুলে যেতে থাকে। বাহারের প্রতি ভালবাসা তৈরি হতে থাকে। হু হু করে কান্না আসে তার। এই কান্না বোধহয় তার সমস্ত প্রতিরোধ ভাঙছে। ...জীবনের বড় কষ্টে আসে সে, অনেক একাকিত্বে আসে সে। কামনা বাসনাকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। উস্কে দিয়েছে বাহার। বাহারের কাছে যাওয়া খুব তার প্রয়োজন। খুবই তাড়না অনুভব করে সে।'[২০] তাই

রাতের অন্ধকারে বাহারের দুঃসাহসিক অভিসারকে সে ব্যর্থ হতে দেয় না, সমস্ত ধর্মভয় ও সামাজিক ভয়কে অমান্য করে সে প্রেমিকের কাছে ধরা দেয়। তাকেও যে একজন পুরুষ সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসে, এই ভাবনায় আনারকলি জীবনের আনন্দে ভরে উঠতে থাকে, কোকিলের ডাকে তার জীবনের ছন্দ আরও আনন্দমুখর হয়। কিন্তু একজন বিধবার পক্ষে এই আনন্দমুখরতা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা একেবারেই অনুচিত। কারণ 'লোকে তাকে বিমর্ষ দেখতে অভ্যস্ত'। তাই বাহারের ভালবাসার আকুলতা সে মনের গভীরে গোপন করে রাখে। এমনকি ভালবাসার মানুষ বাহারের সঙ্গে, বাপের বাড়ি যাওয়ার আনন্দ ও উত্তেজনাও সে লুকিয়ে রাখে। কারণ আনারকলি জানে, একজন বিধবার হাসি, আনন্দ ও ভালথাকা সমাজ তথা চরিত্রবিরোধী। যেকোনো উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠানে হারানো স্বামীর জন্য, বিধবা স্ত্রীর কান্না শুনতেই সকলে অভ্যস্ত। আনারকলিও রাহাতের মৃত্যুর পর দুটো ঈদের সকালে গলা ছেড়ে কেঁদেছে, বাবার বাড়ি এলে মায়ের গলা ধরে কেঁদেছে। কিন্তু বাহারের ভালবাসায় সে কান্না ভুলে জীবনের ছন্দে ফিরে আসতে থাকে। মেয়েরা যে বাবার বাড়িতে অনেক বেশি চঞ্চল, সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, বাহারের দৃষ্টি দিয়ে লেখক এই সত্যও তুলে ধরেছেন। যে শান্ত ও বিমর্ষ আনারকলিকে জুলফিকারের বাড়িতে দেখা যায়, বাবার বাড়িতে এসে সেই আনারকলির ভিন্ন রূপ বাহারকে আরও বেশি মুগ্ধ করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মুসলিম বনেদি পরিবারের বধূদের একা একা বাবার বাড়ি যাওয়ার প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নি। তাই বাহার মাস্টারের সঙ্গ পেতেই আনারকলি বাবার বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা করে। কারণ বিধবা আনারকলির যাত্রাপথে এর আগেও বাহার সঙ্গী হয়েছে। রাহাতের মৃত্যুর সময়ও, বাহারই তাকে সঙ্গে করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসে। তবে একজন বিধবা, পরপুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে বাসে বা ট্রেনে উঠবে, সমাজ তা ভালো চোখে দেখবে না, লেখকের এই অনুভূতিময় সূক্ষ্ম ও বাস্তব বর্ণনা প্রশংসার যোগ্য। তাই মনের সমস্ত ইচ্ছেকে গোপন রেখে, বাহার মাস্টার পরিচিত গ্রামের পথে, আনারকলিও সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটে। আনারকলিকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দেয় ভাসুরঝি নীলুফা। তবে বাসে ও ট্রেনে পরস্পরকে দেখার ও সান্নিধ্যলাভের আনন্দে তারা পরিতৃপ্ত হয়। প্রকৃতিও তাদের সঙ্গসুখের আনুকূল্য রচনা করে। কালবৈশাখীর ঝড়ে আনারকলির বাবার

বাড়িতে রাহাত থেকে যেতে বাধ্য হয়। ঝড় ও বৃষ্টিস্নাত অন্ধকার ঘরে একটা দূরত্ব বজার রেখে, বাহার আনারকলির বিশ্বাস জয় করার মধ্য দিয়ে আনারকলিকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে সমর্থ হয়। আনারকলি বাহারের মধ্যে এক বিশ্বাসযোগ্য প্রেমিক পুরুষের সন্ধান পায়, অনুভব করে বাহার তার শরীরকে নয়, তাকেই ভালবাসে।

একজন নারী, পুরুষের নির্মল ভালবাসায় সর্বস্ব বাধা অতিক্রম করার শক্তি রাখে। আবার সেই নারী যদি নিঃসঙ্গ বৈধব্যজীবন যন্ত্রণায় কাতর হয়, তাহলে এই নিবিড় ভালবাসার আহ্বান বারবার প্রত্যাখ্যান করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। রাহাতের মৃত্যুর পর জুলফিকারের প্রভুত্বের মধ্যে থেকে শ্বশুরের সেবা করা ও পরিপাটি করে ঘর সাজান ছাড়া 'আনারকলির আর কী আছে, বড় জায়ের ফরমাস শোনা, মেজ জায়ের ক্যাটকেটে কথা শোনা, আর ঘরদোর সাজানো গোছানো ছাড়া? হ্যাঁ রাতে অনেকটা সময় পায়। নির্জনতায় ভরে ওঠে তখন তার ঘর। আর তখন একা একা শুয়ে শুয়ে বই পড়ে। বই পড়া নেশা তার।'[২১] তার এই নেশারও যোগান দেয় বাহার। তাই আনারকলি ধর্মনীতি, সমাজনীতি, পরিবার ও বৈধতার সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে, গভীর রাতে ভালবাসার পুরুষের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে, 'ঘুমের মধ্যে মুখের মধ্যে ঠোঁটে কীসের যেন ভিজে স্পর্শ পায় বাহার। তারপর বুকের উপর একটা শরীর নেমে এসেছে। এক ভাললাগা ভার পায়। একটা নারীশরীর তার বুকের উপর নেমে এসেছে। ঘুম ভেঙে যায় বাহারের। অদ্ভুত এক অনুভূতি, শিহরন। ...আনারকলি কিনা চিনতে পারার পর আনারকলির ঠোঁটে ঠোঁট ডোবায় বাহার। আনারকলিকে বুকের মধ্যে আরো গভীর করে নেয়। আনারকলি এতখানি আত্ম-উদ্যোগী হতে পারে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি বাহার।'[২২] তবে তাদের এই প্রেমময় অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য পরস্পরকে লজ্জিত ও কলঙ্কিত করে নি। আনারকলি নিজের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় নিজেদের সংযত করে এবং একদিন বাহারকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ায় বিশ্বাস রাখে। সদ্যবিধবা আনারকলি পুনর্বিবাহের কথা না ভাবলেও, বাহারের প্রেম যে তাকে সেই পথেই চালিত করবে, এই সম্পর্কে আমাদের আর কোন সন্দেহ থাকে না।

মূলত অল্পবয়সী বিধবা আনারকলির মধ্য দিয়ে সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ, বিধবা নারীর নিঃসঙ্গ জীবনের এক চরম সত্যকেই তুলে ধরেছেন। একজন পুরুষের

ভালবাসার মাধুর্যই পারে, একজন বিধবার যন্ত্রণাময় জীবনকে বর্ণময় আনন্দমুখরতায় ভরে তুলতে। ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নিয়তিবাদ ও পরকালের জান্নাতি জীবনের লোভ মানুষকে একটা সময় পর্যন্ত বেঁধে রাখলেও, পুরুষের ভালবাসা ও জীবনের হাতছানি তাকে একসময় জীবনমুখী করে তুলবেই। একজন পুরুষকে হারানোর যন্ত্রণা ভুলে, পুনরায় জীবনের ছন্দে ফিরে আসার আকুলতায় সে ধরা দেবে। তাই রাহাতের শোককাতর, সদ্যবিধবা আনারকলি, শ্বশুর জুলফিকারের সামনে পুনর্বিবাহের অসম্মতি জানালেও, তার বয়সোচিত মানসিক ও শারীরিক চাহিদাকে লেখক বাস্তবতার আলোকে তুলে ধরেছেন। নারীর কামনা ও বাসনাকে ধর্মীয়গুরুরা অস্বীকার করলেও, লেখক নারীজীবনের এই চরম সত্যকে অস্বীকার করেন নি। আনারকলির নিঃসঙ্গ জীবনে, একমাত্র সন্তান বাদশা একটি আশ্রয় হতে পারতো কিন্তু সন্তানের সঙ্গে দূরত্ব আনারকলিকে আরও বেশি বাহারের ভালবাসার দিকে ঠেলে দেয়। পাপপুণ্যের ভয় ও ধর্মীয় বিধি-বিধান আনারকলির ভালবাসার জোয়ারে ভেসে যায়। লেখক বারবার বাহারের ভাবনার মধ্য দিয়ে, বিধবা আনারকলি ও বাহারের নিষিদ্ধ প্রেমের সপ্রশ্ন কারণ অনুসন্ধান করেন এবং নিজেই এর উত্তর দেন, 'প্রেম তো হয়, প্রেম তো কেউ করে না।'[২৩]

### ৩) এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা

লেখকের 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' উপন্যাসেও বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ আছে। মজমুনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর, নাজিম অল্পবয়সী বিধবা সিতারাকে বিবাহের কথা ভাবে। কিন্তু মধ্যচল্লিশের নাজিম, মাত্র সতেরো বছরের সিতারাকে বিয়ে করে, মানসিক ও রুচিগত সমস্যা ও সংকটের সম্ভাবনার কথা ভেবে পিছিয়ে যায়। সিতারার বাবা-মা এই অসমবিবাহকে অবশ্য কোন সমস্যা রূপে দেখে না, তাদের কাছে সদ্যবিধবা সিতারা বোঝাস্বরূপ। তাই বয়সের পার্থক্যের চেয়েও, নাজিমমাস্টারের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও চাকরি তাদের চোখে অনেক বেশি গুরুত্ব পায়। আবার এই উপন্যাসে দেখা যায়, নাজিম, কাঙ্ক্ষিত বিধবা নারী কুলসুমকেও বিয়ে করতে পারে না, কারণ শিশুকালে সে কুলসুমের মায়ের বুকের দুধ খেয়েছিল। মুসলিম ধর্মবিধান অনুযায়ী দুধ-মায়ের সন্তানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম অর্থাৎ অবৈধ।

আফসার আমেদ এই উপন্যাসে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে মুসলিম সমাজজীবনের এক স্বল্প আলোচিত বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে, এই সমাজ-বাস্তবতার শেকড়ে পৌঁছে গেছেন।

**বিধবাবিবাহ ও অসমবিবাহ প্রসঙ্গ, মুসলিম নারীর দুঃসাহসিক পদক্ষেপঃ**

**১) অশ্রুমঙ্গল**

আমরা এখানে অসমবিবাহ বলতে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের বিস্তর পার্থক্যকে নির্দেশ করছি। লেখকের 'অশ্রুমঙ্গল' উপন্যাসে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, অল্পবয়সী বিধবা বদরনের পুনর্বিবাহের পথে বাধা হয়, তার আগের পক্ষের দুটো সন্তান। বদরনের বড় ছেলে ফয়জুল কর্মসূত্রে বাইরে চলে গেলেও, সাত বছরের লালটুর ভরণপোষণের দায়িত্ব কোনো পুরুষ নিতে নারাজ। আমরা এর আগে লেখকের 'হাসিনার পুরুষ' প্রভৃতি ছোটগল্পেও, দরিদ্র মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহের এই সামাজিক সমস্যার প্রসঙ্গ দেখেছি। ক্যানসার আক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসায় সর্বস্বান্ত বদরন ও তার সন্তানকে 'বাপের ঘরে ভাজভাইয়েরা কতক্ষণ আর ভাত দেয়! এরা রাতারাতি হাসমতের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। ঘর পায়। পেটে খেতে পায়। মা-ছেলেকে নিয়ে অন্য কেউ বিয়ে করতে চাইল না। হাসমত রাজি হয়েছিল। বউয়ের সঙ্গে একটা ছেলে এসে থাকবে, থাকুক না। নিজেও তো আঁটকুড়ে। বছর দুই হল বুড়ি মারা যায় হঠাৎ করে। একা হয়ে যায় সংসারে। আবার বিয়ে করার সাধের কথা বলে বেড়াতে লাগল। রউফ তার মেয়ের সঙ্গে একদিনের কথায় বিয়ে দিয়ে ফেলল।'[২৪] এই বিবাহে বদরন একটি নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও পেটের অন্ন পেলেও, বাপের বয়সী স্বামী হাসমতের সংসারে সে তৃপ্ত নয়। বৃদ্ধ হাসমত, যুবতি বদরনের মন ও শরীরের চাহিদা মেটাতে অপারগ। তাই মন ও শরীরের টানে সে বারবার যুবক জয়নালের কাছে ছুটে যায়। জয়নালের স্ত্রীর অকালমৃত্যু, তাদের পথকে সুগম করে দেয়। বিপত্নীক জয়নালের ভালবাসার আকর্ষণে সে সমস্ত সামাজিকতাকে উপেক্ষা করে এবং লালটুকে হাসমতের সংসারে রেখে, বিয়ের নয় মাসের মাথায় জয়নালের সংসারে থাকতে শুরু করে। বিবাহের সামাজিক বন্ধনকে অতিক্রম করে, নিজের পছন্দমতো পুরুষের সঙ্গে বসবাস করার যে দুঃসাহস বদরুন দেখিয়েছে, তা একেবারেই আধুনিক।

আফসার আমেদ বদরনের স্নেহময়ী মাতৃত্বকেও মর্যাদা দিতে ভোলেন নি। তাই জয়নালের মাতৃহীন সন্তানের দেখাশোনার মাঝেও, ফয়জুল ও লালটুর জন্য তার প্রাণ কাঁদে। পরিযায়ী শিশুশ্রমিক, বড়ছেলে ফয়জুলের সঙ্গে কথা বলার জন্য ও লালটুকে দেখার জন্য সে বারবার কুসুমপুরে ফিরে আসে, এখানকার মানুষদের সমালোচনা, ঠাট্টা ও নিন্দার সম্মুখীন হয়েও। বুড়ো হাসমতের জন্যও তার মায়া হয়। কিন্তু অশিক্ষিত বদরনের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় জয়নালকে পাওয়ার লোভ। এমনকি হাসমতের অর্থ বা সম্পত্তির প্রতিও তার কোন লোভ নেই। তাই আধুনিক নারী বদরন অপছন্দের স্বামীকে ছেড়ে, পরপুরুষ জয়নালের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্য দিয়ে, সমস্ত লজ্জা, ভয় ও সামাজিকতাকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখায়। এমনকি সে তার এই নিন্দনীয় সম্পর্কের কলঙ্ককে, পাড়া প্রতিবেশী ও সন্তানদের কাছে গোপন করার চেষ্টায়, জয়নালকে তার পাতানো ভাই বানিয়ে তোলে। দিনের পর দিন পরপুরুষের সঙ্গে থাকার গ্লানি বা অপরাধবোধে সে আক্রান্ত নয়, বরং জয়নালের ঘরে বেশকিছুদিন অবৈধ সম্পর্কে থাকার পরেও হাসমতের ঘরে 'বদরন এল বীরদর্পে। কোনো অস্বস্তি, দ্বিধা বা লজ্জাবোধ তার মধ্যে দেখতে পেল না হাসমত। বুড়ো বয়সের কমবয়সি বউ বোধহয় এমনই হয়।'[২৫] ছেলের ফোন ধরার জন্য, মতিন মাস্টারের বাড়িতে উপস্থিত প্রতিবেশীদের ঠাট্টাপূর্ণ সমালোচনাকেও সে অনায়াসে অবহেলা করার সাহস দেখায়। সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে, নিজের মত করে বাঁচায় সে প্রয়াসী।

বদরনের এই দুঃসাহস ও জীবনতৃষ্ণা পরিপূর্ণতা লাভের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। জয়নাল তাদের সম্পর্ককে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চায়লে, অন্যের বিবাহিত স্ত্রী বদরনের জীবনে চরম সংকট ঘনীভূত হয়। কারণ হাসমত তাকে তালাক না দিলে, জয়নালকে সে বিবাহ করতে পারবে না। অন্যদিকে হাসমত বদরনের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিলেও বা লালটুকে আপন করে নিলেও, এই চরম সংকট থেকে বদরনকে মুক্তি দিতে একেবারেই নারাজ। তাদের অসমবিবাহের জন্য হাসমত দুঃখবোধ করে ঠিকই কিন্তু বদরনের তালাকের প্রস্তাবে সে আহত হয়। এই সমাজের পুরুষেরা নিজের স্বার্থে, অমানবিকভাবে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে কিন্তু একজন নারীর স্বার্থে, তাকে পছন্দমতো বাঁচার জন্য তালাক দিতে পারে না, এই মানবিক কাজ করার মত সৎসাহস ও পৌরুষ তাদের নেই, এই সমাজসত্যই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।

হাসমতও এর ব্যতিক্রম নয়, কারণ 'বুড়ো হয়ে গেলেও তো সে পুরুষমানুষ, তার পৌরুষে লাগে। প্রতিহিংসায় জ্বলতে থাকে। সে বুঝতে পারে একটা মাত্র তার হাতে অস্ত্র আছে, বদরনকে তালাক না দেওয়া। সে তার সদ্‌ব্যবহার করবেই। প্রাণ থাকতে বদরনকে তালাক দেবে না, এ তার সংকল্প।'[২৬]

স্বাভাবিকভাবেই তালাক না পেলে বদরন তার ভালবাসার মানুষ জয়নালকে চিরতরে হারাবে। বদরন জানে, জয়নাল তার জন্য অপেক্ষা না করে, অন্যত্র বিয়ে করবে আর 'তাকে এই বুড়োর সংসারে পচে মরতে হবে'। তাই সে এই তালাক পেতে মরিয়া হয়ে কখনো হাসমতকে অনুরোধ করে আবার কখনো কখনো আক্রমণ করে, 'বুড়ো বয়সে আমাকে বিয়ে করলে কেন? তোমার লজ্জা করল না? ...বুড়ো হয়ে এক জোয়ান মেয়েকে জ্বালাচ্ছ?'[২৭] জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে বদরন বারবার নিজের দুর্ভাগ্যকে দায়ী করে। তার স্বামীর অকালমৃত্যুই তাকে বুড়ো হাসমতের সংসারে এনে ফেলেছে। এই সংকট থেকে হাসমত বদরনকে মুক্তি দিতে পারলেও, নিজের স্বার্থে সে বদরনকে ধরে রাখায় বদ্ধপরিকর। তাই সামাজিক বিধিনিষেধকে তুচ্ছ করে, নারীর নিজের ভাগ্যকে জয় করার দুঃসাহসিক প্রয়াস একসময় ব্যর্থ হয়ে যায়। অপছন্দের পুরুষের সঙ্গে বদরন ঘর করতে বাধ্য হয়, তার বুকফাটা হাহাকার হাসমতের বাড়ির উঠোনকে বিষাদঘন করে তোলে। কিন্তু নিজের মত করে বাঁচার যে সাহস ও প্রচেষ্টা চালিয়েছে বদরন, তা যথেষ্ট আধুনিক। সামাজিকতাকে উপেক্ষা করে মনের মানুষের সঙ্গে বাঁচার চেষ্টায় রক্তাক্ত বদরনকে তাই পাঠকসমাজ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে। বদরনের জীবনের এই নিরন্তর সমস্যা ও সংকটের সহানুভূতিময় বর্ণনায়, লেখক মুসলিম নারীজীবনের বাস্তবতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। এইপ্রসঙ্গে লেখকের 'সন্ধ্যার মেঘমালা' ছোটগল্পটিও উল্লেখযোগ্য।

## ২) সন্ধ্যার মেঘমালা

আফসার আমেদের 'সন্ধ্যার মেঘমালা' ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে, 'আনন্দবাজার পত্রিকায়'। পরবর্তীসময়ে এটি লেখকের 'সেরা ৫০টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলিম সমাজে একজন অল্পবয়সী, নিঃসন্তান বিধবার পুনর্বিবাহিত দাম্পত্যজীবনের যে

সমস্যা, সংকট ও বাস্তবতা, তা বারবার লেখকের নানান উপন্যাস ও ছোটগল্পে এসেছে। পাশাপাশি কোনো দোজবরে বা তেজোবরে বিপত্নীক আধবুড়ো বা বুড়োদের দাম্পত্যে, কোনো অল্পবয়সী বিধবার যে মানসিক ও শারীরিক চাহিদার পার্থক্যজনিত সংকট, বিভিন্ন সময় লেখক তার চরম বাস্তবতাকেও আলোকপাত করেছেন তাঁর সাহিত্যের নানান শাখায়। সাধারণত দেখা যায় যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বিবাহ প্রসঙ্গে সবসময় পুরুষের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খার অনুকূলতা করে থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই একতরফা ভালোরাখার সামাজিক রীতিতে ফাটল দেখা দেয়, অনেকসময় নারীও চাপিয়ে দেওয়া বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে থেকেই, নিজেকে ভালো রাখার বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। এতোদিনের অসহায়তা, বঞ্চনা ও শোষণের বেড়াকে সে দুঃসাহসের সঙ্গে অতিক্রম করে এবং ভালো থাকার বিকল্প পথে সে চলতে শুরু করে সমাজ, ধর্ম ও পুরুষের অহংকারকে উপেক্ষা করে। শুধু তাই নয়, অসমবিবাহকে কেন্দ্র করে, এযুগের শিক্ষিত নারী, স্বামীর মনেও এক দ্বিধা ও অসহায়তা তৈরি করে অনায়াসে। যা মুসলিমসমাজে, অধিকারসচেতন আধুনিক শিক্ষিত নারীর একটি অভিনব ও ইতিবাচক প্রচেষ্টা। 'সন্ধ্যার মেঘমালা' ছোটগল্পে আধুনিক নারী আফসানার ভালো থাকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে লেখক এই অভিনব জীবনাদর্শের এক বাস্তবসম্মত রূপ তুলে ধরেছেন।

আফসানা মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হয়। যে বয়সে অধিকাংশ মেয়েরা বিয়ের বা কাঙ্ক্ষিত পুরুষের স্বপ্ন দেখে, সেই বয়সে আফসানা তার স্বামীকে হারায়। একজন নারীর জীবনে এর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বেশির ভাগ মুসলিম পরিবারের মতো বিধবা আফসানার পরিবারও তার দ্বিতীয় বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়। আফসার আমেদ তাঁর 'এক বশীকরণ কিস্‌সা' উপন্যাসে একজন অল্পবয়সী বিধবার কাঙ্ক্ষিত স্বামী পাওয়ায় সামাজিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' উপন্যাসটিও উল্লেখযোগ্য। যেখানে অল্পবয়সী বিধবা সিতারার পুনর্বিবাহের জন্য, তার বাবা মকবুলের তৎপরতা লক্ষণীয়। অসমবিবাহের দায় থেকে মুক্তি পেতেই কিন্তু মাঝবয়সী নাজিম মাস্টার সিতারাকে প্রত্যখ্যান করে। কিন্তু আলোচ্য গল্পে মধ্যচল্লিশের ভূগোলের শিক্ষক, বিপত্নীক শোভান, অল্পবয়সী বিধবা আফসানার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে আফসানার বড়লোক বাবার সম্পত্তি বা আফসানার গয়নার প্রতি শোভানের কোনো

লোভ ছিল না, কেবলমাত্র তার 'অল্পবয়স এক ধরণের স্নেহ আদায় করে নিয়েছিল শোভানের কাছ থেকে। কিন্তু শীতের সকালে স্নানের গরম জল, স্কুল থেকে ফিরলে ধোঁয়া ওঠা চা, কিংবা কইমাছ ঠিকঠাক ভেজে রান্না করা, অথবা খাওয়ার সময় চেয়ার সরিয়ে বসতে দেওয়ার যত্ন-উদারতা, এই দৈনন্দিনতার এক প্রয়োজনীয় মায়া তৈরি করতে পেরেছিল। ঘেমে গেলে মুখ মুছে ফেলা পর্যন্ত বলার ভিতর।'[২৮]

লেখকের সুতীক্ষ্ণ অনুভূতির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে, আফসানার জীবনের না পাওয়ার যন্ত্রণার কথা। সে শোভানের সংসার, জীবন তথা ঘর পরিপাটি করে সাজিয়ে ও মেয়ে নেহাকে আপন করে নিয়ে, তাদের সমস্ত প্রয়োজন মেটালেও, নিজে এক না পাওয়ার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। শোভানের কাছ থেকে সেও ভালো ভালো খাবার, যত্ন ও সেবা পায়, কিন্তু তার নবযৌবন এই সমস্ত কিছুর মধ্যে তৃপ্তি পায় না। সে মনে মনে বয়সোচিত প্রেমালাপের জন্য আকুল হয়, যা মধ্যচল্লিশের শোভান তাকে দিতে পারে না। এমনকি শোভানের পক্ষে অল্পবয়সী স্ত্রীর সবরকম চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। সে তার নবযুবতী স্ত্রীর মানসিক চাহিদা বুঝতেও চায় না। তাই সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুড়ো সাবান ও তেজপাতা নিয়ে আসার কথা শোভানের মনে থাকলেও, আফসানার শখের 'সেলাইয়ের পাঁচশো পঞ্চাশ' সুতোর কথা সে ভুলে যায়। মানসিক চাহিদা পূরণের জন্যই আফসানা নেহার গৃহশিক্ষক, আকর্ষণীয় ও সুন্দর যুবক মনোদীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে নিজেকে ভাল রাখার জন্যই মনোদীপের সঙ্গে মোবাইল ফোনে, নিজের কাঙ্ক্ষিত জীবন ও স্বপ্ন প্রসঙ্গে প্রেমালাপ করে, যা শোভানের কাছে গোপন থাকে না, 'সে মনোদীপের সঙ্গে যা সব কথা বলছে, সব শুনতে পায় শোভান। প্রেমালাপের কণ্ঠস্বর। বেশ ভালো প্রেম জমাতে পারেও। কী ভাবে মনোদীপের বাইকের পেছনে চড়ে কোমর জড়িয়ে ঘুরে বেড়াবে, রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করিয়ে ফুচকা খাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রেমালাপ।'[২৯]

মূলত আফসানার এই প্রেমালাপের মধ্য দিয়ে তার বয়সী অধিকাংশ নারীরই দাম্পত্যযাপনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। ক্যানসারআক্রান্ত ও অকালমৃত প্রথম স্বামীর দাম্পত্যযাপনেও তার এইসব আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে। আবার দ্বিতীয় স্বামী পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী শোভানের পক্ষেও তার এই ইচ্ছেপূরণ সম্ভব হয় না। আফসানার জীবনের এই

অন্ধকারময়তা ও অভাববোধ শোভানের তেরো বছরের মেয়ে নেহাও বোঝে। সেও তাই 'নতুন মাকে' ভালো রাখার এই বিকল্প খেলার উদ্যোগ নেয়। লেখক আফসার আমেদ আফসানা ও নেহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, সমাজে প্রচলিত সতীনকন্যা ও সৎমায়ের শত্রুতাপূর্ণ তিক্তসম্পর্কের চিরাচরিত ধারণাকে ভেঙ্গে দিলেন। কিশোরী নেহা, আফসানাকে সৎমা রূপে নয়, 'সই' রূপে দেখে, একজন নারীর না পাওয়ার যন্ত্রণার অনুভূতিকে দেখে এবং সহানুভূতিময় নারী হৃদয়ে, নারীকে ভালো রাখার চেষ্টা করে। তারই ব্যবস্থাপনায় আফসানা শুধুমাত্র ভালো থাকার জন্য, বেঁচে থাকার আনন্দ ও অনুভূতিতে ভরে থাকার জন্য, মনোদীপের সঙ্গে এই বিকল্প প্রেমালাপ করে, বন্ধ দরজার পেছনে। তাতে সে কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রাণরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই যখন 'ও-ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। বেরিয়ে এল আফসানা। মুখে হাসি হাসি। প্রসন্নতার লাবন্যে ভরে আছে। এ ঘরে চলে এল একবুক আলো হয়ে।'[৩০]

লেখক এই ছোটগল্পে নারীমনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে স্পর্শ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তিনি দেখিয়েছেন শোভান, আফসানার প্রয়োজনের সঙ্গী হয়ে উঠলেও, সন্ধ্যার আলো জ্বালাবার বা ভোরে ছাদে যাওয়ার সঙ্গী হতে পারে না। তাদের দুজনের মাঝে বয়স ও পরিস্থিতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে মনোদীপের সঙ্গে এই মিথ্যে প্রেমালাপে আফসানার মন পুরোপুরি তৃপ্ত নয়, তার আরও কিছু সাধ জাগে মনে। এই সাধের মধ্যে প্রকাশিত হয়, তার এই প্রেমালাপ কিন্তু পুরোপুরি মিথ্যে নয়। প্রিয়মানুষকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম অঙ্গ। আফসানাও একসময় মনোদীপকে নিমন্ত্রণ করার আবদার জানায় শোভানের কাছে, 'এই রবিবার গলদা চিংড়ি আনবে যখন মনোদীপকে নেমন্তন্ন করো না'। বাইশ বছরের স্ত্রী আফসানার এই অন্যায় আবদারে শোভানের পৌরুষে আঘাত লাগলেও, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে সে পারে না। বরং স্ত্রীর এই ছেলেমানুষিতে বিরক্ত শোভান, মনোদীপকে ছাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায়। শোভানের এই কঠিন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আফসানা, সে তার জীবন থেকে এই মধুর যাপন কিছুতেই হারাতে দেবে না। তাই 'হঠাৎ ক্ষুভিত চোখে বলে উঠল আফসানা, 'তোমার বোধ আছে নাকি যে বুঝবে? তুমি কিছুই বোঝো না।' তারপর আফসানা বিছানায় রাখা তার নিজের মোবাইলটার

দিকে তাকায় একদৃষ্টে। আর ডান হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নেয়। এ হাত ও হাত করে খেলে খানিকটা। তারপর মোবাইলটা দুহাতে জড়িয়ে বুকের কাছে নিয়ে হুহু করে কেঁদে ফেলে। বাঁধভাঙা তার অশ্রুপাত হয়।'[৩১]

মূলত একবিংশ শতকের অধিকারসচেতন আধুনিক নারী আফসানা। সে শোভানের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে, তাকে এক পরম নিশ্চিন্ত সংসার জীবন দিয়ে স্ত্রীর কর্তব্য পালন করে যাবে ঠিকই, কিন্তু নিজের জীবনের আনন্দ সে কাউকে কেড়ে নিতে দেবে না। বাথরুমে মোবাইল নিয়ে গিয়ে আফসানা, একথা স্পষ্ট করেই শোভানকে বুঝিয়েছে। নারীর শরীর, সেবা প্রভৃতির প্রতি পুরুষের আধিপত্য থাকলেও, মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে সে অপারগ। আর এই শতকের নারী আফসানা স্বামীকে গোপন করে নয়, তাকে জানিয়েই বেঁচে থাকার বিকল্প আনন্দ পেতে সচেষ্ট। নিজেকে ভালো রাখার সিদ্ধান্তে সে অবিচল। বরং শোভান তার নিশ্চিন্ত সংসারের মধ্যেও এক অসহায়, পৌরুষহীন নির্বোধের মতো স্ত্রীর সমস্ত ছেলেমানুষিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবেই নারী-পুরুষের এক অবস্থানগত পরিবর্তন সূচিত করেছেন আফসার আমেদ 'সন্ধ্যার মেঘমালা'য়। যেখানে ধর্ম, সমাজ, নীতি বা আদর্শকে সরিয়ে রেখে, লেখক আফসানার নারীমনের আশা-আকাঙ্খা ও বেঁচে থাকার প্রয়াসকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক অভিনব পদ্ধতিতে।

**তালাক প্রসঙ্গঃ**

**মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা**

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যে ইসলামি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকেই বলে তালাক। আরবি তালাক শব্দের অর্থ হল বাঁধন মুক্ত করা। ইসলাম ধর্মে তালাককে যতদূর সম্ভব প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রচারক ও শেষনবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) তালাককে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলার কথা বলেছেন। কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজে কোরান-হাদিসের অপব্যাখ্যা, নানাদিক থেকে নারীর অধিকার হরণ করে। এমনকি তালাক ও শরিয়তের নামে সমাজে

প্রতিনিয়ত কিভাবে এক চরম অবমাননা ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়ে চলেছে মুসলিম নারীসমাজ, তা আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে বারবার তুলে ধরেছেন।

'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসে তিনি এমন একটি তালাকের প্রসঙ্গ এনেছেন, যা মুসলিম সমাজের সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক মোল্লা ও মৌলবিরও অজানা। ধর্মীয়বিধানে তালাকের যতরকম প্রকৃতি আছে, সবগুলোই তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। বিশ্বসমাজে গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ ও মৌলবাদীর দ্বারা তালাকের সমস্তরকম বাস্তবায়ন ঘটেছে কোন না কোন ভাবে। লেখক এই উপন্যাসে সেই চরমসত্যের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। উপন্যাসের নায়ক শফীউল্লা, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে, যেমন 'আধবুড়ি বিধবা', সুন্দরী শাহনাজকে আকস্মিক বিয়ে করে, তেমনি বিয়ের তিন দিনের মাথায় নববধূকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয়। স্বাভাবিকভাবেই শফীর এই অপ্রত্যাশিত তালাকের খবরে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এখানে এমন একটি সমাজের কথা বলা হচ্ছে, যা কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে অবস্থিত হলেও, সংখ্যাগুরুদের সংস্কৃতি ও চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন। যেখানকার অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। শফীর মত বিত্তবান, শিক্ষিত ও ধার্মিক মানুষের কোন কাজকেই তারা অন্যায় বলে ভাবতে পারেনা। বরং এই অমানবিক ও অনৈতিক তালাকের পেছনেও ধর্মীয় যোগসূত্রের উপস্থিতি মনে করে স্বস্তি খোঁজে।

অন্যদিকে শফীর দাদা শওকতউল্লা বাড়িতে এক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে। 'আধবুড়ি বিধবা' শাহনাজকে ভিখিরির মত বিয়ে করে শফী যে বংশের সম্মানহানি করেছিল, তালাকের মধ্য দিয়ে সেই হত সম্মান যেন ফিরে পেল সে। যে সমাজের শওকত, শফী, হানিফ চাচা ও কাদের মৌলবির মতো লোকেরা নীতি নির্ধারণ করে, সেই সমাজের কখনো কোন উন্নতি হতে পারে না, আফসার আমেদের এই সমাজ অভিজ্ঞতার কথায় উঠে আসে সাচার কমিটির রিপোর্টে। তবে ২০০৬ সালের সাচার কমিটির কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী যে অল্পসংখ্যক মুসলিম শিক্ষিত মানুষের কথা জানা যায়, তাদের প্রতিনিধি রূপে লেখক নাসের মাস্টারের কথা বলেছেন। কিন্তু এই অমানবিক তালাকের বিরুদ্ধে নাসেরের মতো শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মানুষ প্রতিবাদ করলেও, ধর্মবিধান ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির কাছে সে হেরে যায়।

তাই শাহনাজের মতো নারীর জীবন নিয়ে 'ছিনিমিনি' খেলার সাহস পায় ক্ষমতাশালী পুরুষসমাজ। আফসার আমেদ নাসেরের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবেই শাহনাজের এই অপ্রত্যাশিত তালাকে সবথেকে বেশি ক্ষতবিক্ষত হয় নারীসমাজ। অপেক্ষারত নববধূ শাহনাজের ঘরে না গিয়ে, শফী প্রায় চল্লিশজন কর্মচারীদের, সারারাত ধরে এক মিথ্যে কাল্পনিক গল্প শোনায় এবং 'এই মিথ্যা ঘটনার বিবরণের শেষে কর্মচারীদের সাক্ষী রেখে তার নববিবাহিত বিবি শাহনাজকে তালাক দিল। তালাক্! তালাক্! তালাক্!'[৩২] শফীর সঙ্গে আকস্মিক ঘটে যাওয়া বিবাহ সম্পর্কে যেহেতু শাহনাজের অনুভূতি ইতিবাচক ছিল না, তাই সদ্যতালাকপ্রাপ্ত শাহনাজ বেদনার্ত না হয়ে, ক্ষোভে হিংস্র হয়ে ফেটে পড়ে। এখানে তার কিছু হারানোর ছিলনা বা তার কোন স্বপ্ন ভাঙেনি কিন্তু তার সম্মানহানি হয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত তালাক নেমে আসার কারণ না জানার বিভ্রান্তি তাকে আরও ক্ষিপ্ত করে। আফসার আমেদ নারীর মনের এই গভীরতাকে স্পর্শ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তিনি শাবানা, নিগার বানু, কিসমত, পারভিন, সাকিলার মনের গভীরে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওঠা ভয়ঙ্কর প্রলয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। তাই শফীর মা নিগার বানুর প্রেসার বেড়ে যায়, শওকতের পুত্রবধূ সাকিলার কোমরে ব্যথা শুরু হয় এবং পারভিনের শ্বাসকষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে লেখকের সহানুভূতি ও স্পর্শকাতর সমাজবোধ আমাদের নাড়া দেয়, 'শাহনাজের আগমনের চেয়ে তার চলে যাওয়া, ঘটনা হিসেবে অনেক বেশি চাঞ্চল্যকর, অনেক বেশি মর্মান্তিক, অনেক বেশি অপমানজনক। তার কারণ কী, সেই কারণের পেছনে যুক্তি কী, কেউই যে-সব জানে না, কেউই সে সব জানার জন্য প্রশ্ন করছে না শফীউল্লাকে। তাই বুঝি বাতাসের ভার বাড়ে অন্তঃপুরে।'[৩৩]

মূলত দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রত্যেক মুসলিম নারীরই সবসময় এক উৎকণ্ঠা ও ভীতি কাজ করে চলে। তবে লেখক তাদের মধ্যে একটি প্রতিবাদের সুরও জাগিয়ে তোলেন। তাই সমস্ত নারীসমাজের হয়ে, বাড়ির শিক্ষিত পুত্রবধূ পারভিন অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে, শফীকে প্রশ্ন করে, 'আপনি কেন তালাক দিলেন?... আপনি কিন্তু ঠিক কাজ করেননি, একজন নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন।'[৩৪] কিন্তু পারভিনের এই দুঃসাহস শফীর সহ্য হয়

নি। লেখক দেখিয়েছেন শফীর মতো অহংকারী, মূল্যবোধহীন মানুষেরা তালাকের মতো অন্যায়ের পাশাপাশি প্রতিবাদী নারীকণ্ঠকে কতটা নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে পারে। লেখক নারীজীবনের এই মর্মান্তিক অবস্থানকে আরও ভয়াবহ রূপ দিয়েছেন, তালাকের অযৌক্তিক ও অমানবিক কারণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে। তারা যখন জানতে পারে, মাকে বিয়ের তিনদিন পর, শাহনাজের কন্যা শাবানার রূপলাবণ্যে শফী মুগ্ধ হয় এবং তাকে বিয়ে করার উদ্দ্যেশেই এই তালাক দেয়, তখন লজ্জা ও ঘৃণায় তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

ইসলাম ধর্মে মা ও মেয়েকে একই সঙ্গে বিয়ে করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। লেখক এখানে তথাকথিত আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের 'ঘৃণ্য ন্যাক্কারজনক' চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। যে ধর্মের আশ্রয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে, নবী ও রসূলের কিস্‌সায় মগ্ন থেকে সমাজবাস্তবতা থেকে দূরে সরে, নিজেকে ন্যায়পরায়ণ ও সাধু ব্যক্তি ভাবে, লেখক তাকে বারবার পাগল আখ্যা দিয়েছেন। যদিও উপন্যাসের বাস্তবতায় দেখা যায় শফী মোটেই পাগল নয়। সে সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর, সুযোগ মত তার শিক্ষা, অর্থ ও ধর্মীয় জ্ঞানের সুনামকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। তাই তালাকের পর শাহনাজের পাওনা, পঞ্চাশহাজার মোহর পাঠিয়ে মূলত শাহনাজ ও সমাজকে ক্ষান্ত করার প্রয়াস করে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় মাকে তালাক দিয়ে, মেয়েকে বিয়ের পরিকল্পনা করে, ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করে সমাজের উত্তেজনা শান্ত হয়ে ওঠার। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের আশ্রয়ে অধর্ম ও মিথ্যেকে হাতিয়ার করে, ধর্মভীরু সাত্ত্বিক পুরুষ হিসেবে শফী নিজেকে সমাজ তথা পরিবারের কাছে উপস্থিত করে, যা একজন প্রকৃত মুসলিমের ধর্ম নয়। তাই শাবানার প্রতি অদম্য কামনায় পাগল শফীউল্লার পক্ষে মনে করা সহজ হয়, আকাঙ্ক্ষার নারীকে না পেলে, তার সমস্ত আমলনামার নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধর্মের নামে মাত্র তিনদিন আগের বিবাহিতা স্ত্রী শাহানাজকে শফী সর্বসমক্ষে তিন তালাক দেয়। কারণ 'শাহনাজ তার বিবাহিত ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গম করলে আর শাবানাকে পাওয়া জুটবেনা তার, সে পথ চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। সে শাবানাকেই পাবে অথচ অধর্ম করবেনা, যদি সে শাহানাজের সঙ্গে একটিবারের জন্য সঙ্গম না করে, তারপর তালাক দেয়, তাহলে তার পক্ষে জায়েজ হবে শাবানাকে বিয়ে করা। ধর্মের এই বিধান তার কণ্ঠস্থ।'[৩৫]

অথচ ইসলাম ধর্মে অকারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ, ধর্মের এই বিধানটির প্রতি মুসলিম সমাজের মোল্লা, মৌলবি ও দাম্ভিক পুরুষসমাজের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নারী-পুরুষ সকলের জন্যই ধর্মীয় বিধান নির্দিষ্ট। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ নিজেদের স্বার্থে এই বিধানকে চালিত করে চলেছে। যে সমস্ত ধর্মীয় বিধান নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারকেন্দ্রিক, সেই সমস্ত নারীকল্যাণকর বিধিনিষেধ পালনে তাদের চরম অনীহা। অন্যদিকে নারীসমাজ বহুবিবাহ, তালাক, অবরুদ্ধতা ও নির্যাতন প্রভৃতির দ্বারা প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হতে হতে, নিজস্বতায় জেগে উঠার সাহস হারিয়ে ফেলে। আর যদিও কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে সে নিজের তথা নারীসমাজের উপর নেমে আসা অমানবিক নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করে, তাহলে তার এই ক্ষমতাকে সমূলে নষ্ট করে ফেলে মৌলবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। তাই কোলকাতার মধ্যে থেকেও মেটিয়াবুরুজের মুসলিমসমাজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যেখানে শফীর মত ভণ্ড ধার্মিকরা ভবিষ্যতে এই সমাজের নেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখে, শওকতের মত সমাজের বিত্তশালী মানুষেরা অপরাধ জগতের সাহায্যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে, মৌলবি ও প্রশাসনকে হাতে রাখে, সেই সমাজের নারীর জীবন দুর্বিষহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সমাজঅভিজ্ঞ সাহিত্যিক আফসার আমেদ এই বাস্তবতাকে নির্দেশ করে দেখিয়েছেন, যারা আচারগত ধর্মপালনকে সর্বস্ব মনে করে কিন্তু আত্মিক দিক থেকে থাকে অন্ধ, সেই সমস্ত অমানবিক মানুষেরা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও কলঙ্কিত করে।

**অসমবিবাহ প্রসঙ্গঃ**

**মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা**

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বয়সের অস্বাভাবিক ব্যবধানকে অসমবিবাহ বলে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের এই ব্যবধান অনেকসময় কুড়ি-পঁচিশ বছরের মতো হতে পারে, আবার তা ছাড়িয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছিও হতে পারে। মুসলিম সমাজে অনেকসময় দেখা যায়, অনেক বিপত্নীক পুরুষই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেক কমবয়সী অসহায় ও দরিদ্র নারীদের, পুনর্বিবাহের জন্য নির্বাচন করে থাকে। অনেকসময় মাতৃহীন সন্তানদের লালনপালনের কথা মনে রেখে কোনো কোনো মাঝবয়সী

বিপত্নীক পুরুষ সাংসারিক প্রয়োজনের নামে বিয়ে করে, আবার কোনো বিপত্নীক বৃদ্ধও নিজের বার্ধক্য জীবনের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা থেকে মুক্তির জন্যও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে থাকে। কোনো কোনো বিত্তশালী কামুক পুরুষ একাধিক স্ত্রীলাভের জন্য অনধিক চারটি বিয়ে করে থাকে। 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা' উপন্যাসেও অর্থশালী আকরম দুজন স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র লালসা চরিতার্থের জন্য ষাট বছর বয়সে, সুন্দরী কিশোরী নিগারবানুকে বিবাহ করে। নৈতিকতা ও মানবিকতার দিক থেকে দেখলে, আকরম হোসেনের এই অসমবিবাহ অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু ধর্মের আশ্রয়ে তার মতো কতশত মুসলিম বিত্তশালীরা যে এই লজ্জাকর বিবাহ করে থাকে, তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়। তবে একথাও সত্য যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিবিরুদ্ধ বিয়ের প্রবণতা বর্তমানে অনেকটাই কমেছে।

তবে তা নির্মূল হয়ে যায় নি, তার প্রমাণ আফসার আমেদ 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'র মধ্যে দিয়েছেন। যেখানে মেটিয়াবুরুজের সবচেয়ে বড় ধনী শওকত দ্বিতীয় বিয়ের পথে না গেলেও, সে-ই পঁয়তাল্লিশ বছরের শফীর সঙ্গে, কিশোরী শাবানার বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থাপনা করে গেছে খুব উৎসাহ ও আড়ম্বরের সঙ্গে। মায়ের প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে শাবানার এই নজীরবিহীন বিবাহ নানাদিক থেকে অসম এবং অভিনব। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বয়সের দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির দিক থেকেও এই বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে একটা অসাম্য থাকে। ইসলাম ধর্মে নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিবাহসম্পন্ন করা ধর্মবিরোধী ও অমানবিক। কিন্তু শাবানার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তাকে অপহরণ করে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে, শফীর মতো বকধার্মিকের মুখোশ খুলে দিয়েছেন লেখক। যেখানে দরিদ্র ও অসহায় নারীগণ, নিজের সমস্ত স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে, এই সমস্ত পুরুষের লালসার শিকার হয়। শফীর কবল থেকে বাঁচার জন্য, শাহনাজ ও শাবানার আত্মগোপনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় অর্থ ও প্রতিপত্তির কাছে। এক্ষেত্রে মায়ের প্রাক্তন স্বামী, মধ্যচল্লিশের শফীর সঙ্গে, কিশোরী শাবানার ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনের মর্মান্তিক ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়।

তাছাড়া এই উপন্যাসের সমাজবাস্তবতা অনুসরণে আমরা ভিন্ন দিক থেকেও অসমবিবাহের ভয়াবহতা তুলে ধরবো, যা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচিগত পার্থক্য থেকে আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 'মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা'

উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন, মুসলিম বিত্তবান পুরুষেরা গরিব ঘরের সুন্দরী ও শিক্ষিত কন্যাদের 'ছোঁ' মেরে নিজের বাড়ির বধূ করে নিয়ে আসে এবং পরিবারের শোভাবর্ধন করে। এটি বড়লোক পরিবারের একটি জনপ্রিয় সংস্কৃতি রূপে দেখা দেয়। এই সম্পর্কে লেখকের বাস্তব সমাজঅভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই সূত্রেই ধনী শওকতের অল্পশিক্ষিত মেজছেলে, আশিকের স্ত্রী হয়ে আসে দরিদ্র ঘরের কন্যা বিএ পাশ করা সুন্দরী পারভিন। উভয়ের মানসিক চাহিদা ও রুচিগত পার্থক্যের জন্য একদিকে যেমন দাম্পত্য জীবনের সমস্ত মাধুর্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়, তেমনি তাদের নিরুত্তাপ যৌনজীবন হয়ে উঠে নীরস ও গ্লানিময়, 'আশিক যখন তাকে চায়, চোখ বুজে তার উপর চড়াও হয়। পারভিনের চোখের দিকে কখনো তাকায় না। দৃষ্টি বিনিময়ের কোনো সুযোগই নেই তার সঙ্গে। ... স্বামীর সঙ্গ দিয়ে যাবে। সে তো সঙ্গ দেয়, অংশগ্রহণ করে কি? সেও এক অপমানকর হয়ে ওঠে। সম্পর্কের সংলগ্নতার ভিতর তাকে কাছে টেনে নেয় না, বরং অত্যাচার মনে হয়। যদিও একসময় জেগে ওঠে, তখন আবার ফুরিয়ে যায় আশিক। সে এক অসহনীয় যন্ত্রণাকর অবস্থা।'[৩৬] স্বামীর ভালোবাসার স্পর্শ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সান্নিধ্য পারতো পারভিনের জীবনের সমস্যা ও সংকট দূর করে দিতে, তার জীবন থেকে প্রেমিক নাসেরের স্মৃতি মুছে ফেলতে। কিন্তু পারভিনের কোন দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের দোসর হয়ে উঠতে পারেনা আশিকের মত ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা। তাই 'জীবন্মৃত' পারভিনদের ঐশ্বর্যের খাঁচায় বন্দী জীবন কাটাতে হয়। আকাশে ওড়ার সমস্ত পথই তার বন্ধ। এই বন্দিত্ব থেকে তার কিছুতেই মুক্তি নেই, পালিয়ে গেলে, অর্থের জোরে শওকতউল্লা আবার তাকে সেই খাঁচায় এনে ভরবে। আমরা অনুমান করতে পারি, তখন পারভিনের জীবন হয়তো আরও অনেক বেশি যন্ত্রণাময় হয়ে উঠবে। কারণ এই সমাজের 'পুরুষ জানে না তার নারীর কথা। পুরুষ নারীর মিলিত সমাজ অথচ। পুরুষকে কি এমন নির্বোধ হলে চলে?'[৩৭] সমাজসচেতন লেখকের এই প্রশ্ন ধর্ম, সমাজ তথা মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই উপন্যাসে আমরা বেশ কিছু বীরাঙ্গনা নারীর সাক্ষাত পায়। পারভিন শফীর অনৈতিক আচরণের যেমন প্রতিবাদ করেছে, তেমনি মা নিগার বানু সমাজের একজন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি রূপে প্রশ্ন করেছে, 'তুই মাকে বিয়ে করলি, আবার মেয়েকে বিয়ে করবি?'[৩৮] ধর্মসম্মত হলেও ছেলের এই অরুচিকর ও অমানবিক বিয়ের কথায়

সে লজ্জা পায়। ঘৃণায় সাকিলার বমি হয়, পারভিন বিশ্বাস করে শফীর মতো মানুষের পক্ষে কোন কিছুই দুঃসাধ্য নয়। আর শাহনাজ নিজের বিয়ের ব্যাপারে কোন প্রতিবাদের সুযোগ না পেলেও, শাবানার ব্যাপারে সে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মেয়েকে নিয়ে আত্মগোপন করে এবং শাবানাকে, শফী ও শওকতের হাত থেকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যদিও শেষপর্যন্ত ধর্মবিধি, ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির কাছে তারা প্রত্যেকেই হেরে যায়। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও রক্ষণশীল মৌলবাদের বিরুদ্ধে নারীর এই প্রতিবাদ সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ছিল অভিনব ও প্রশংসনীয়। একদিন তাদের এই প্রতিবাদ ও প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হবে, লেখকের এই আত্মপ্রত্যয়ে আমরাও বিশ্বাসী।

**মুসলিম নারীর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহবিচ্ছেদ প্রসঙ্গঃ**

কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের বেশিরভাগ উপন্যাস ও ছোটগল্পে মুসলিম নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের নানান সংকট ও সমস্যা বারবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে উঠে এসেছে। তিনি তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তালাকের প্রসঙ্গ এনেছেন। তালাকপ্রাপ্ত নারীর মর্মান্তিক জীবনের রূপকার বলা যেতে পারে তাঁকে। তবে তাঁর কিছু কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পে বিবাহবিচ্ছেদ বা ডিভোর্সের প্রসঙ্গও এসেছে। তিনি ‘এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা’ উপন্যাসে মজমুন ও নিজামের ডিভোর্স প্রসঙ্গে বলেছেন ‘বিয়েটা মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্টে হয়নি, তাই এটা তালাক নয়, ডিভোর্স।’[৩৯] তবুও লেখক ডিভোর্স শব্দটিকে এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। মুসলিম নারীর যন্ত্রণাময় দাম্পত্যজীবন থেকে মুক্তির এক উপায়স্বরূপ তিনি শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে তালাক যদি একজন মুসলিম নারীর জীবনের চরম বিপর্যয় ও সংকটের নাম হয়, তবে তার প্রেমহীন, মর্যাদাহীন দাম্পত্যজীবনের চরম সংকট থেকে মুক্তির উপায় হল এই ডিভোর্স। যেখানে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী তথা শিক্ষিত নারী, স্বামীর সমস্ত অপমান, নির্যাতন, মানসিক যন্ত্রণা ও সম্পর্কের তিক্ততা থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে আসে। যে পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ কথায় কথায় তালাকের ভয় দেখিয়ে নারীকে কোণঠাসা করে দমিয়ে রাখে, একবিংশ শতকে এসে অধিকারসচেতন ও শিক্ষিতা কিছু মুসলিম নারী ডিভোর্সের মধ্য দিয়ে সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে দেখিয়ে দেয়, তারও সম্মান আছে, নিজের

মতো করে বাঁচার অধিকার আছে। জীবনে চলার পথে সে সবসময় পুরুষের উপর নির্ভরশীল নয়, এই আত্মবিশ্বাস নারী ধীরে ধীরে অর্জন করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শতকের নারীসমাজ শিক্ষা, সচেতনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে তুলেছে। সমাজ ও সময়ের কাছে দায়বদ্ধ কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদ তাঁর 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' উপন্যাসে ও 'সন্ধ্যাবাসরের কথকতা' ছোটগল্পে এই সত্যকেই রূপায়িত করেছেন।

## ১) এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা

'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'শারদীয় পুরশ্রী' পত্রিকায় ২০০৯ সালে এবং 'ঘোড়সওয়ার' এর প্রথম প্রকাশ, 'শারদীয় মধ্যবর্তী'তে। এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। আপাত দৃষ্টিতে 'এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা' নামকরণের মধ্যে একটা মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবন বা রূপকথার একটা অনুষঙ্গ মনে আসতে পারে কিন্তু বাস্তবে এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে একটি অত্যন্ত আধুনিক জীবনালেখ্য। যেখানে মোবাইল, ফ্রিজ, ইনভার্টার থেকে শুরু করে ওয়াশিং মেশিন পর্যন্ত আধুনিক ভোগবিলাসের প্রায় সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান। 'লিভ টুগেদার' এর মতো অতি আধুনিক প্রসঙ্গও এখানে এসেছে। তবে মুসলিম নারী মজমুনের জীবনপর্যালোচনা এই উপন্যাসকে একটি আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

মজমুনের স্বামী, ফিজিক্সের শিক্ষক নাজিম, সামাজিকভাবে একজন সম্ভ্রান্ত, সৎ ও সম্মানীয় মানুষ। তার উপর ঘোড়াটি তার সদর্থক আভিজাত্য বাড়িয়ে, সমাজের চোখে তাকে আরও মহিমময় করে তোলে। অথচ মজমুন বারো বছরের বিবাহিত জীবনে, নাজিমের কাছে মানবিক আচরণ, স্ত্রীর মর্যাদা, ভালবাসা, যত্ন বা সহানুভূতি কিছুই পায় না। বরং নাজিম তাকে দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছে, ধর্ষণ করেছে, মেরে ফেলার কল্পনা করেছে। এমনকি মজমুনের বাবার মৃত্যুতে নাজিম, শোকাক্রান্ত স্ত্রীর পাশে পর্যন্ত দাঁড়ায় নি। তাই মৃত্যুর সময় তাবারোক আলি যখন, একমাত্র কন্যাসন্তান মজমুনকে বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বরী করে যায়, তখনই মজমুন তার অসুস্থ, প্রেমহীন বিবাহিত জীবন থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে নাজিমকে ডিভোর্সের প্রস্তাব দেয় এবং দুজনের অনুমতিতে চার মাস

আগে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। মূলত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠায় মজমুনকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করে নিঃসন্দেহে। নইলে আমাদের সমাজে কত শত মজমুন আজও নিরানন্দ ও অপমানকর দাম্পত্য সম্পর্ক বয়ে বেড়াতে বাধ্য হয়, তার পরিসংখ্যান দেওয়া দুঃসাধ্য।

মজমুনের ডিভোর্সের একটি বড় কারণ, নাজিমের খুব প্রিয় 'দোস্ত' ঘোড়াটি। ঘোড়ার পেচ্ছাপের গন্ধ মজমুন কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু এই ব্যাপারে নাজিম কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনবোধ করে নি। স্ত্রীর ভালোলাগা, মন্দলাগা বা চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে ঘোড়ার মূল্য বেশি ছিল নাজিমের কাছে। ঘরের সুখ-শান্তির চেয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও কৌলীন্য বেশি গুরুত্ব পায় তার কাছে, নাজিমকে ঘোড়াটি যা দিয়েছে।

মজমুনের সংসারজীবনে নাজিমের বিধবা দিদি নসিবার দাপুটে উপস্থিতি, কড়া স্বভাব ও অনধিকার শাসনও ডিভোর্সের অন্যতম কারণ। স্বামীর পেনশনভোগী নসিমার অন্যত্র বসবাসের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শধুমাত্র ভাইবউকে জ্বালানোর জন্যেই তাদের সংসারে থেকে যায়, বলে মজমুনের বিশ্বাস। অথচ দিদির প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় নাজিম দিদির অন্যায় আচরণ অদেখা করে, সবসময় মজমুনকেই রাগ দেখিয়ে সংকুচিত করে রাখত। তার উপর নসিবা দিনরাত তার প্রিয় দোলনার অপ্রীতিকর ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে মজমুনকে অতিষ্ঠ করে তুলতো, যার বিহিত করার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি নাজিম। বিবাহিত জীবনের বারো বছর মজমুন দোলনার এই বিরক্তিকর শব্দ শুনতে বাধ্য হয়েছে। অথচ ডিভোর্সের মাত্র কয়েকমাস পর, পছন্দের পাত্রী কুলসমের একটি কথায় নাজিম, তার দিদির প্রিয় দোলনাটি কেটে ফেলে। কারণ ক্ষণিকের দেখায় কুলসমের জন্য নাজিমের মনে প্রেমবোধ জাগ্রত হলেও, মজমুনের সঙ্গে 'বারো বছর বিবাহিত থাকার মধ্যে কোনো একদিনের জন্যও এই প্রেমবোধে সে আক্রান্ত হয় নি।'[৪০] তাই এই প্রেমহীন দাম্পত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, মজমুনের ডিভোর্সের প্রস্তাবে সে খুব সহজেই রাজী হয়।

মূলত মজমুন নাজিমের জীবনে প্রেমিকা বা স্ত্রী নয়, কেবলমাত্র একজন মেয়েমানুষ হয়ে উঠেছিল। সে, ভোগী নাজিমের কাছে শুধুমাত্র একটি নারীশরীর। তাই তার নিজস্ব চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা বা অনুভূতির কোনো গুরুত্ব নাজিম কখনো দেয় নি। এই প্রসঙ্গে মজমুন, নাজিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বলে, 'তুমি এক রাতে আমায় ধর্ষণ

করেছিলে। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেয়েছিলাম।'[৪১] তাই আশ্রিত নাজিমকে সে নবদম্পতির আসর বসিয়ে দেখাতে চেয়েছে, প্রেমসম্ভোগের স্বরূপ, 'বোধহয় এই অনুভূতির তিরস্কার নাজিমকে দেওয়া যাবে। যেখানে মজমুন আর তার শরীরসঙ্গিনী নয়। এর ভিতর দিয়ে সে সেই শিক্ষা পাবে। লোকটির শিক্ষার বড় অভাব ছিল, স্ত্রীকে শুধু মেয়েমানুষ ভাবত। আর তার শরীরকে শিকার করত। যৌনতার ভিতর তারও যে তৃপ্তি আছে, এই শিক্ষাটা পায়নি লোকটি। অথচ বিজ্ঞানের শিক্ষক। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পেছনে এটাও একটা অন্যতম কারণ। আর এইসব কারণের জন্যই এই সব আসর ও প্রদর্শনী তার কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে নিজেকে বুঝবার জন্য, সাজাবার জন্যও।'[৪২] অবশ্য একথা ঠিক যে, আমাদের সমাজে আজও অধিকাংশ নারীই স্বামীর কাছে ধর্ষিত হয়। তারা সন্তানের দিকে চেয়ে বা অনন্যোপায় হয়েই নিজেদের দাম্পত্যসম্পর্ককে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাবার দেওয়া সম্পত্তির জোরে, নিঃসন্তান মজমুন এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ অবশেষে খুঁজে পেয়েছে।

মজমুনের নিঃসন্তান হওয়ার পেছনেও আছে নাজিমের অমানবিক আচরণ। শিক্ষিত নাজিম শুধুমাত্র মানসিক নির্যাতন নয়, মজমুনকে শারীরিক অত্যাচারও করত। এই শারীরিক অত্যাচারেই মজমুন, মা হওয়ার ক্ষমতা চিরতরে হারিয়ে ফেলে। কারণ 'তার মনে পড়ে, বিয়ের এক দেড় বছরের মধ্যে, নাজিম তার তলপেটে লাথি মেরেছিল, আর সে এক দেড়মাসের গর্ভাধানে ছিল, গোপনে সে সন্তানকে নষ্ট হতে দিয়েছে। সন্তানধারণের ক্ষমতাও তার হারিয়েছে। একথা ডাক্তারের কাছে নিজে গিয়ে জেনেছিল। একথা স্বামীপুরুষকে কোনোদিন জানাতে চায়নি। ঘেন্না করেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে এটাও অন্যতম একটা কারণ। এই সম্পত্তি না পেলে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তার ছিল না। আর এই ক্ষমতাকে কেউ হীন করবে, তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে।'[৪৩]

সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ এক্ষেত্রে দেখিয়েছেন, এই সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষিতে একজন অল্পশিক্ষিত মুসলিম নারীর এই ক্ষমতায়ন সবসময় ইতিবাচক হয় না। শরিয়তের নিয়ম না মেনে, ভাইপোদের বঞ্চিত করে তাবারোক আলি, মজমুনকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। ফলে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন মজমুন, তার ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে বিভিন্ন রকম বিকল্প আসর ও প্রদর্শনীর আয়োজনে। এই আয়োজন কোনো সুস্থ রুচি বা

মানসিকতার পরিচায়ক নয়। বারো বছরের অসুস্থ বিবাহিত জীবনের যন্ত্রণা ও টাকার অহংকার তাকে অনেকটা প্রতিহিংসাপরায়ণ ও হিংস্র করে তোলে। তাই অল্পবয়সী বিধবা সিতারাকে প্রত্যাখ্যান করার পর, শরিয়তে আইনে পছন্দের পাত্রী বিধবা কুলসুমকে স্ত্রীরূপে পেতে ব্যর্থ নাজিম যখন মজমুনের কাছে ফিরে আসে, তখন শরিয়তের দোহাই দিয়ে নাজিমকে সে বারবার প্রত্যাখ্যান করে। অবশ্য তার এই প্রত্যাখ্যান, মানসিক বিতৃষ্ণা থেকেও জন্মেছে। শরিয়তের কথা পুরোপুরি ভেবে থাকলে, সে অবশ্য মুনির মাস্টারের সঙ্গে অপ্রীতিকর বা উত্তেজক কথায় যেত না। পাশাপাশি সে যেমন নিজের বর্তমান সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা নাজিমকে দেখিয়ে তৃপ্তি পায়, তেমনি ম্যানেজার এলাহিকে দিয়ে নাজিমের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার ব্যবস্থা করে। নাজিমের বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলো নানান বিকল্প প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করাতে চায়। তাই কখনো নবদম্পতির আসর বসায় আবার কখনো নবজাতকের কান্না ও প্রসূতির আর্তনাদ শোনার জন্য, প্রসূতি মায়েদের আসর বসায়, আবার কখনো বিকল্প প্রসেনজিতের আসর বসায়। এইসমস্ত আসরের মধ্য দিয়ে সে একদিকে যেমন নাজিমকে বিগত অপরাধের জন্য আক্রান্ত করে তেমনি নিজের জীবনের নিঃসঙ্গতা, টাকা দিয়ে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

অবশ্য টাকার জোরে ও এলাহির সহযোগিতায় মজমুনের আয়োজিত বিকল্প আসরগুলো নাজিম বা মুনির মাস্টার কেউই সমর্থন করে নি। এইসমস্ত আশ্চর্য আসরের আয়োজনের মধ্য দিয়ে মজমুন ক্রমে নাজিমের মন থেকে হারিয়ে যায়, যে নাজিম নিজের সমস্ত কৌলীন্য বিসর্জন দিয়ে নতুন করে মজমুনের সঙ্গ পেতে চেয়েছিল। অন্যদিকে কৈশোরের প্রেমবোধের জায়গা থেকে, যে মুনির মাস্টারের সান্নিধ্য লাভের জন্য 'আত্মজীবনী' লেখে মজমুন, সেই মুনির মাস্টারও তাকে ফিরিয়ে দেয়। 'আত্মজীবনী' সংশোধনের সময়, নবদম্পতির মধুর যাপনের কাল্পনিক বর্ণনায় যখন সে মুনির মাস্টারকে উত্তেজিত করে স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়, তখন প্রায় অপমান করেই সেদিনের মতো মুনিরকে তাড়িয়ে দেয়। টাকার প্রয়োজনে ও খাওয়ার লোভে দরিদ্র মুনির, মজমুনের আত্মজীবনী সংশোধনের প্রস্তাবে রাজি হলেও, মজমুনের সমস্ত কাজে সে সমর্থন জানায় নি। বরং মজমুনের নন্দনতত্ত্বের নামে নবদম্পতির প্রেম বিবরণের কাল্পনিক বর্ণনার সমালোচনা করে সে বলেছে, 'একটা ডাহা যৌন-বিকার-গ্রস্থতা বুঝিয়েছ তুমি।

...মানসিকভাবে তুমি অসুস্থ।’[৪৪] মুনিরের এই সমালোচনা ও বিদ্রূপতায় ক্ষুব্ধ মজমুন, অহংকারী অধীশ্বরীর মতোই মুনিরকে অপমান করেছে, ‘মনে করতাম আপনার প্রেমে আমি পড়েছি, এখন আপনাকে আমি ঘৃণা করি মুনিরদা, আপনি একজন অযোগ্য মানুষ। আপনার স্মৃতি আছে সাম্প্রতিক নেই। খুব কড়া করে ভাজলেও পচা মাছ আপনি, খাওয়া যাবে না, গন্ধ ঠিক পাওয়া যাবে।’[৪৫] এমনকি মুনির মাস্টারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বাড়িতে বিকল্প প্রসেনজিতের আসর বসিয়ে, সে একরকম ভাবে মুনিরকে হারিয়ে দেয় টাকার জোরে। পাশাপাশি এই মিথ্যে ও বিকল্পের কাছে মজমুন নিজেও মাঝে মাঝে হেরে যায়, হেরে যেতে চায়। তাই ‘সুতোহাটার পচা’কে জেনেশুনে সত্যিকারের প্রসেনজিৎ ভেবে চুমু খায়। তবে বিকল্প আসরের মধ্যেই মজমুন তার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে থাকার একটা জায়গা খুঁজে পায়। তাই একসময় মিথ্যে প্রসেনজিতের আসরের চমৎকারিত্বে সে পূর্বস্বামী নাজিমের উপস্থিতি ভুলে যায়, ‘প্রসেনজিৎ প্রদর্শনীর এই চাপে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। মানুষটা তো তার কাছে তুচ্ছ, খুবই নগণ্য। আর তার শাসনাধীন থেকে অনেকদিন হল সে বেরিয়ে এসেছে। ভেবে দেখল, এভাবে বিস্মৃত হওয়াটা সে চেয়েছিল, তার পক্ষে সুখকরও।’[৪৬]

তবে লেখক দেখিয়েছেন, কোনো বিকল্প বা মিথ্যে, মানুষের দীর্ঘস্থায়ী সুখের কারণ হতে পারে না। তাই মজমুনের এই জীবন আপাত সুখকর মনে হলেও, প্রকৃত সুখের সন্ধানে সে ব্যর্থ। যে আশ্রিতা ঝিউড়িকে একসময় সে বন্ধুনী মনে করে সুখী হত, অর্থের অহংকার ও প্রভুত্বের নেশায় শেষপর্যন্ত তাকে সে দাসীতে পরিণত করে। জেলবন্দী ডাকাতের স্ত্রী, বাইশ-তেইশ বছরের নিঃস্ব ঝিউড়িকেও কম বয়সের রূপলাবণ্যের জন্য সে হিংসে করে। নাজিমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার জন্য ঝিউড়িকে শাস্তি দেয়। আবার নাজিমের প্রতি শত্রুতা বোঝাতে ঝিউড়ি যখন মজমুনের অনুগামী প্রমাণ করার জন্য ছদ্ম অভিনয় করে, তখন ঝিউড়ির মিথ্যে অভিনয়ে সে খুশি হয়। এইভাবে আশ্রিতা ঝিউড়ি থেকে শুরু করে ম্যানেজার এলাহি পর্যন্ত অনেকেই তাকে ঠকায়। তার সম্পত্তির প্রহরী হাতিমের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেও বংশমর্যাদা ও ভূতের ভয়ে পিছিয়ে যায়। এইভাবে সে তার কাঙ্ক্ষিত পুরুষসঙ্গী পেতেও ব্যর্থ হয়। তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বিকল্প আসর ও বংশবদ ঝিউড়ি, লখা, হাতিম ও এলাহির আনুগত্যের মাঝেও মজমুন একা হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে অর্থের অহংকার ও প্রতিশোধস্পৃহা মজমুনের জীবনের পথকে অনেকটা নেতিবাচক করে তোলে। উপযুক্ত পরিবেশ, শিক্ষা, শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের সান্নিধ্য ও সুন্দর মানসিকতা, মজমুনকে ইতিবাচক সামাজিক কাজে চালিত করতে পারত। যা তার নিঃসঙ্গ জীবনের সুন্দর একটি পাথেয় হয়ে উঠত। সে তার সমস্ত অহংকার ও টাকার নেশা ত্যাগ করে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের সার্বিক উন্নয়নের কাজে ব্যস্ত হতে পারত, গ্রামে প্রসূতি ভবন গড়ে তোলা বা চন্দনার মত প্রান্তিক নারীর জীবন আলোকিত করার চেষ্টা করতে পারত তার বিপুল সম্পত্তি দিয়ে। কিন্তু বিকারগ্রস্ত মনে মজমুন কোনো সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি, সে আধুনিক জীবযন্ত্রণার শিকার হয়েছে মাত্র। মূলত সে কিস্‌সার অনিবার্যতার হাতে বন্দী, তাই নতুন নতুন কিস্‌সা তৈরি করার মধ্য দিয়ে, নিজেই কিস্‌সার চরিত্র হয়ে ওঠে, কিস্‌সার কথাকার আফসার আমেদের এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব।

## ২) সন্ধ্যাবাসরের কথকতা

আফসার আমেদের ‘সন্ধ্যাবাসরের কথকতা’ ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য়, ২০০৫ সালে। পরবর্তী সময়ে এটি লেখকের ‘সেরা ৫০টি গল্প’ সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমরা দেখেছি এই পর্বের ছোটগল্পগুলোতে লেখক গ্রামীণ মুসলিম জনসমাজ থেকে সরে এসেছেন শহুরে মধ্যবিত্তের দৈনন্দিনতায়। যদিও আলোচ্য গল্পের পটভূমি একটি গ্রাম কিন্তু এই গল্পের নাসিম, আসাদ, জাফর ও আয়েসার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত হয় শহরের একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্বাভাবিকভাবেই উচ্চশিক্ষিতা, চাকুরিরতা আয়েসার জীবনের ধারা অনেকবেশি আত্মমর্যাদাময়, সাবলীল ও আধুনিক। তার চৌদ্দবছরের বিবাহিত জীবনে, একসময় অন্য অনেক মুসলিম নারীর মতই সতীনযন্ত্রণা আসে। তার স্বামী জাফর নিজের স্কুলের এক ছাত্রীকে বিয়ে করে বসে। কিন্তু শিক্ষিতা, চাকুরিরতা ও আত্মমর্যাদায় দীপ্ত আয়েসা, অন্যান্য নারীর মত, স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনার মতো অপমান ও সতীনযন্ত্রণা সহ্য করে লাঞ্ছনাময় জীবনযাপনে বাধ্য নয়। তাই সে নিজেই জাফরকে ডিভোর্স দিয়ে, সেই যন্ত্রণাময় অপমানকর জীবন থেকে বেরিয়ে আসে। যে নারীলোলুপ স্বামী তার মত, ভালোবেসে বিয়ে করা যোগ্য স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায়, একজন কন্যাসম অল্পবয়সী ছাত্রীকে

বিয়ে করতে পারে, তার সঙ্গে সংসার করার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না আয়েসা। তাই কন্যা কুসুম হিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সে জাফরের দাম্পত্য থেকে বেরিয়ে আসে নিজের পরিচয়ে, নিজের মতো করে বাঁচার উদ্দেশ্যে। মেয়ের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সে, কুসুমকে 'আলামিন মিশনে' পড়াশোনার জন্য রেখে আসে আর নিজে স্কুলের কাছাকছি একটি বাড়ি কিনে স্থায়ী বসবাস শুরু করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলমধর্মে বৈধ বহুবিবাহের সুযোগ নিয়ে অনেক পুরুষই সাংসারিক বা পারিবারিক প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ করে থাকে। আবার অনেক নারীলোভী, বহুগামী মাঝবয়সী পুরুষ শুধুমাত্র নিজেদের লালসা চরিতার্থতার জন্যই একাধিক বিবাহ করে থাকে। তবে জাফরের মতো উচ্চশিক্ষিত প্রধানশিক্ষকের, একজন কমবয়সী ছাত্রীকে বিয়ে করার মতো অমানবিক ও অনৈতিক কর্মকে শুধুমাত্র গ্রামের জনসাধারণই নয়, আয়েসাও মেনে নিতে পারেনি, 'জাফর একটা গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিল। তারই স্কুলের এক ছাত্রীকে বিয়ে করে বসে। এই ঘটনায় গ্রামের মানুষ স্কুল বয়কট করে। খবরের কাগজে এ খবর বেরিয়েছিল। শেষপর্যন্ত জাফরের স্কুলের চাকরিটা যায়। জাফর অল্পবয়সী বউ নিয়ে থাকে। আয়েসা ডিভোর্স নিয়ে নেয়।'[৪৭] একসময়ের সহপাঠী নাসিম, আসাদ ও জাফরের মধ্যে সুন্দরী, ব্যক্তিত্বময়ী, মিষ্টভাষী ও আকর্ষণীয় অয়েসা, অনেককে নিরাশ করেই জাফরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। দুজনের শিক্ষকতা ও সন্তান কুসুমকে নিয়ে এক সুন্দর পরিপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল আয়েসা। কিন্তু জাফরের নিন্দনীয় দ্বিতীয় বিবাহে আয়েসার জীবনে চরম অপমানজনক দুর্ভাগ্য নেমে আসে। কিন্তু আর পাঁচজন অসহায় মুসলিম নারীর মত ক্রমাগত সতীনযন্ত্রণা ও সাংসারিক আশান্তি সহ্য করে তালাকের আশঙ্কায় দিন অতিবাহিত করতে আয়েসা বাধ্য নয়। তাই সে নিজেই দুইমাস আগে জাফরকে ডিভোর্স দিয়ে চলে আসে নিজের স্কুলসংলগ্ন থলিয়া গ্রামে, নিজের কেনা বাড়িতে।

আয়েসার বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের অন্যান্য সহপাঠী নাসিম, আসাদ প্রভৃতি বন্ধুদের সঙ্গে আয়েসার তেমন কোনো যোগাযোগ না থাকলেও, আয়েসার ডিভোর্সের খবর তারা খুব সহজেই পেয়ে যায়। তাই তারা একসময়ের অপূর্ণ সুপ্ত বাসনা পূরণের জন্যই স্বামীহীন, ডিভোর্সি আয়েসার কাছে ছুটে আসে কোনো এক রবিবারের সন্ধ্যাবাসরে। নিঃসন্দেহে আয়েসার জীবনের

এই সংকটময় মুহূর্তে, আয়েসার পাশে দাঁড়ানোর অজুহাতে, তারা নিজেদের অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থেই বেশি তৎপর ছিল। কিন্তু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আধুনিক নারী আয়েসা পুরনো বন্ধুদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন জানালেও, তাদের বাসনার হাতে নিজেকে বন্দী করেনি। আসাদ বারবার জাফরের প্রসঙ্গ তুলে, আয়েসার দুর্বলতার জায়গাটাকে ছুঁতে চেয়েছিল, কিন্তু আয়েসা তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে, বরং প্রাক্তন স্বামীর অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে তুলে ধরে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে বিদ্ধ করে বলে, 'জাফরের কথা শুধোচ্ছিলে? সে তো ভালোই আছে। চাকরিটা খুইয়েছে। এখন টিউশনি করে খায়।'[৪৮]

অর্থাৎ স্কুলশিক্ষিকা আয়েসার আজ আর কারও, কোনোরকম সহযোগিতা বা সহানুভূতির প্রয়োজন নেই। বরং আসাদ ও নাসিম টিউশনি করে খাওয়া বন্ধু জাফরকে সাহায্য বা সহানুভূতি জানাতে পারে। তাছাড়া জীবনের মাঝামাঝি সময়ে এসে দাঁড়িয়েছে আয়েসা। আজ তার যৌনসঙ্গীরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই সাপটিকে যদি আমরা যৌনতার প্রতীক রূপে ধরি, তাহলে সেই যৌনাকাঙ্ক্ষাকে সে, একটি জালার মধ্যে বিষধর সাপের মতোই প্লেট ও শিলনোড়া দিয়ে চাপা দিয়ে দিয়েছে। যেন সেই সাপটি কিছুতেই না বেরোতে পারে। এমনকি নাসিম ও আসাদ, তার বেডরুমে যাওয়ার পথে, সাপ ঢাকা জালায় যেন ধাক্কা না মারে, এই ব্যাপারেও আয়েসা তাদের সাবধান করে দেয়। তবে একথা ঠিক, প্রত্যেক মানুষেরই একটি যৌনচাহিদা থাকে, একথা আয়েসাও পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারে না। তাই সে অকপটে স্বীকার করে, 'বেডরুমে শুয়ে নিশুত রাতে ওর ফোঁস ফোঁস শুনতে পাই। ও ঘুমিয়ে গেলেও আমি বেশ বুঝতে পারি।'[৪৯]

অবশ্য আয়েসা একেবারেই নিংসঙ্গ নয়, সে তার জীবনযাপনের সঙ্গীরূপে তালাকপ্রাপ্ত হালিমাকে পেয়েছে। উচ্চশিক্ষিত আসাদ যখন এই কমবয়সী হালিমাকে 'একটা গোটা মেয়েমানুষ' বলে অসম্মান করে, তখন তা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আয়েসার নারীমনকে নাড়া দেয়। সে আসাদকে যোগ্য জবাব দিয়ে বলে, 'ওর নাম হালিমা। ওর স্বামী ওকে ছেড়ে দিয়েছে। আর বিয়ে করতে চায় না। আমার সঙ্গে থাকে। আমিও ওর সঙ্গে থাকি বলতে পার।'[৫০] এইভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে এই দুই নারী দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা পরস্পরকে আশ্রয় করে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে পারে কোনো পুরুষসঙ্গী ছাড়াই। একজন স্বামীকে

ডিভোর্স দিয়েছে, আর একজন স্বামীর কাছে তালাক পেয়েছে। একজন চাকরি করে, অন্যজন শারীরিক শ্রম দিয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে সম্মানিত জীবনযাপনের মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, 'এক সময় রান্নাঘর থেকে হালিমা এল। হালিমাকে কাছে ডাকল আয়েসা। আয়েসার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল হালিমা। হালিমা মুখে চমৎকার এক স্নিগ্ধতা। হালিমার বাঁ হাতটা আয়েসা তার ডান মুঠোর মধ্যে নেয়। হালিমা সোহাগভঙ্গিতে হাসে। আয়েসা নাসিমদের দিকে তাকিয়ে শুধল, 'কেমন দেখছ?'[৫১]

জীবনে চলার পথে আজ আর আয়েসা বা হালিমার অন্য কোনো সুবিধাবাদী বা স্বার্থপর পুরুষসঙ্গীর প্রয়োজন নেই, যারা তাদের জীবনকে নানাভাবে কণ্টকিত করে তোলে। তাই একবিংশ শতকের আধুনিক নারী আয়েসা, নাসিমের লুডো খেলার প্রস্তাবকে অট্টহাসিতে উড়িয়ে দিতে পারে। এমনকি নাসিমের প্রস্তাবিত নতুন আড্ডার বিষয়টিও সে একচোখ হাসির মধ্যদিয়ে অস্বীকার করে। নাসিম বা আসাদ প্রভৃতি পুরুষদের আয়েসা বুঝিয়ে দেয়, নারী শুধুমাত্র পুরুষের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার সামগ্রী নয়, স্বামীর পরিচয়ে বাঁচার জন্য, আত্মসম্মান ও নিজস্বতা বিসর্জনেও সে বাধ্য নয়। পুরুষসঙ্গী ছাড়াও নিজের মতো করে সুন্দরভাবে যে বেঁচে থাকা যায়, নিজস্বতায় উজ্জ্বল আয়েসার মুখে এই সত্যই প্রকাশিত, যখন সে, তার নিজের নতুন বাড়ি, মাঠ ও জীবন সম্পর্কে উচ্চারণ করে 'আমারই তো। ওখানে জ্যোৎস্না নেমে আসে। এই ঘরের অন্ধকারও আমার খুব প্রিয়। কোনো ঋতকথনের বাধ্যতা আমার নেই।'[৫২]

এইভাবে দুজন ভাগ্যবিড়ম্বিত রমণী, নিজের দুর্ভাগ্যকে জয় করে, পরস্পরকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার এক সুগম পথ খুঁজে নিয়েছে, যেখানে তারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। এই সংসার ও জীবন আয়েসার সম্পূর্ণ নিজস্ব। রাতের অন্ধকারে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনো পুরুষের কামনা বা বাসনা মেটানোর বাধ্যতাও সেখানে নেই। তাই আজ আয়েসার জীবনে, রাত্রিকালীন অন্ধকারের পাশাপাশি জ্যোৎস্নাও খুব আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। মূলত 'সন্ধ্যাবাসরের কথকতা' ছোটগল্পে, লেখক আফসার আমেদ আয়েসার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, নারীজীবনে শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠার গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক দিকটিকে, যা একজন মুসলিম নারীর জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি সেই সমাজকেও নানাভাবে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।

**বোরখা প্রসঙ্গঃ আধুনিক শিক্ষা ও বিশ্বায়ন, বোরখার অবরুদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রবণতাঃ**

**এলাটিং বেলাটিং সই লো**

আফসার আমেদের 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' প্রথম প্রকাশিত হয় শারদীয় 'বারোমাস' পত্রিকায়, ২০০৯ সালে। পরবর্তীতে এটি লেখকের 'সেরা ৫০টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমাদের দেশে বা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ পাশাপাশি দীর্ঘদিন বসবাস করেও, পরস্পর পরস্পরের কাছে অপরিচিত থেকে যায়। এই অপরিচয়ের জায়গা থেকে তাদের মনে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণাও তৈরি হয়। কিন্তু পরিচিতির নিবিড়তায় সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়ে, পরস্পরের মধ্যে এক সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব, তারই একটি বাস্তবচিত্র লেখক এই ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি পারস্পরিক সান্নিধ্য, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতায়, হাসিনার মতো মেধাবী কিন্তু আড়ষ্ট, অপটু, জড়ভরত ও পর্দাশীল নারীরা বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পায়, তারা নিজস্বতার আলোকে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়। এমনকি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বাবা-মা বা স্বামীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও তারা অর্জন করে। বৃহত্তর সমাজের সান্নিধ্যে এসে, অধিকার সচেতন শিক্ষিতা হাসিনা বেঁচে থাকার সমস্ত আনন্দ লাভে তৎপর হয় এবং একসময় বোরখার অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

সাধারণত মুসলিম সমাজে মেয়েদের জীবনে বিয়েটাকে চরম মোক্ষ বলে মনে করা হয়। এমনকি একবিংশ শতকের প্রথম দিকেও যে এই ধারণার পরিবর্তন হয় নি, আলোচ্য গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক তা প্রকাশ করেছেন। তাই কুয়েতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার আরিফের সঙ্গে, আঠারো-উনিশ বছরের মেধাবী হাসিনার, পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ করে বিয়ে দেয় তার বাবা-মা। হায়ার-সেকেন্ডারি পরীক্ষায় সতেরো র‍্যাঙ্ক করা হাসিনার স্বপ্ন ছিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। অন্যান্য আরও অনেক মেধাসম্পন্ন মুসলিম মেয়ের মত, হাসিনার এই স্বপ্নও বিয়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কাকাবাবু সিরিজের ভক্ত পাঠিকা হাসিনা, তাঁতের শাড়ি পড়তে পছন্দ করলেও, স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির কথায় তাকে আপাদমস্তক কালো বোরখায় ঢেকে, বাড়ির বাইরে বেরোতে হয়। কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ও স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত এই নারী কিন্তু দাম্পত্যপ্রেমের স্বর্গসুধা থেকেও

সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। পনেরদিনের ছুটিতে এসে, তাকে বিয়ে করার পরেই আরিফ কুয়েত ফিরে যায়। শ্বশুরবাড়ির সমস্ত রীতি-নীতি ও ধর্মীয় সংস্কার মেনে নিয়ে 'সে স্বামীহীন শ্বশুরবাড়িতে থাকে। একজন দেওরও নেই, একজন ননদও নেই। শুধু একজন জা আছে, আর শ্বশুর-শাশুড়ি। মাঝে মাঝে আরিফ ফোন করে। আরিফ একজন ইঞ্জিনিয়র। কুয়েতে নানা প্রজেক্টে কাজ করে। তার শুধু কাজ আর কাজ।'[৫৩] তাই উনিশ বছরের হাসিনাকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয় বিয়ের পরেও।

মূলত অধিকাংশ মুসলিম মেয়ের মত হাসিনাও কখনো 'নিজের ইচ্ছেমত চলতে' শেখেনি। তাই বাবা-মার ইচ্ছেতে পড়া বন্ধ করে বিয়ে করে, আরিফের ইচ্ছেতে ভবিষ্যতে কুয়েত যাওয়ার জন্য কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হয় ও শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছেমত নিজেকে কালো বোরখায় মুড়ে বারাসাতের বিপিও সেন্টারে আসে। এই কোর্সের সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও প্রাণচঞ্চল রিসেপশনিস্ট তানিয়া, ব্যবসার খাতিরে শান্ত মনে ডিল করলেও, বোরখায় মোড়া হাসিনাকে দেখে তার 'মনে হচ্ছে, হাসিনা খুবই আড়ষ্ট, অপটু, জড়ভরত। শুধু শুধু টাকা নয় ছয় করতে এসেছে। এই কোর্সের অনুপযুক্ত সে। হয়তো টাকা খরচ করার মতো টাকা আছে। সেই নিয়ে মজা। কিন্তু মজা প্রকাশ করা যাচ্ছে না। আধুনিক কর্মজগতে সুযোগ পাওয়ার জন্য হাসিনা পটু হতে এসেছে, এই পোশাকে, এই ভঙ্গিতে। এই বৈপরীত্য তাদের সবাইকে আহত করেছে। কিন্তু বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর, সেখানে কোনো বিরূপতা প্রকাশ করা যাবে না, তা ব্যবসানীতির বিরোধী হবে।'[৫৪]

স্বাভাবিকভাবেই এই অপরিচিত ও বিপরীত জগতে হাসিনাও খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়ে। শিক্ষক সুলগ্না ও সোহমের আন্তরিক ব্যবহার এবং অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, স্মার্টনেস ও সৌন্দর্যের মাঝে তার নিজেকে খুব বেমানান মনে হয়। তাদের যা আছে, তা হাসিনার নেই বলে মনে মনে তার সকলের প্রতি অভিমান হয়। তাই সকলের প্রতি অভিমান ও নিজের অসহায়তার জায়গা থেকে, সে প্রথম দিকে তাদের সঙ্গে মানাবার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে নি। এইসময় সে করিডর ও টয়লেটে নিজের স্বস্তি খোঁজার চেষ্টা করে এবং 'নিজের মধ্যে নিজেকে রাখার মনোভঙ্গিতে কাটায়'। কিন্তু মেধাবী হাসিনার শিক্ষাক্রমের প্রতি আগ্রহের জন্যই, একসময় কোর্সের প্রতি মনোনিবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মাউস ধরে

ক্লিক করতে শিখে যায়। অপরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে, মুখের পর্দা সরিয়ে, ধীরে ধীরে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করার আনন্দ খুঁজে পায় সে, 'সবাই তাকে দেখল, সবাই তাকে চিনল। বোধহয় এতদিন ঢেকে রাখা মুখটা মুক্তি পেল তাদের দেখার ভিতর। সহপাঠী-সহপাঠিনী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেখার ভিতর সে নিজেও নন্দিত হল। কেন, কেমন করে হল জানে না। এতে কোনো অপরাধ হয় কি তার? তা তো মনে হচ্ছে না। অন্যদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়েও ধরা দিচ্ছে সে। কোনো কিছুতেও তার কোনো খিন্নতা আসছে না।'[৫৫]

আফসার আমেদ এই ছোটগল্পে দেখিয়েছেন, উচ্চমাধ্যমিকে সতেরো র‍্যাঙ্ক করা, বুদ্ধিমতী, সুন্দরী ও কাকাবাবু সিরিজের ভক্তপাঠিকা হাসিনা কিন্তু তানিয়া, সুলগ্না, রোমনা বা অখিলেশের আধুনিকতা বা বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে কোনো অংশে কম নয়। শুধুমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তার আত্মবিশ্বাস গড়ে না ওঠায়, আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই উপযুক্ত পরিবেশে হাসিনা নিজের জড়তা কাটিয়ে ও বোরখার বাধা সরিয়ে সকলের সঙ্গে সহজ, সুন্দর, আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছন্দে। তার বাহ্যিক পোশাকের পাশাপাশি অন্তরেরও এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে। তাই আজ সে হাসি, ঠাট্টা ও বন্ধুত্বের অভিব্যক্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কখন সায়নের থুতনি স্পর্শ করে, কখন সোহমকে সরিয়ে দিয়ে, নতুন কিছু করার আনন্দে মেতে উঠে। আবার কখন কঠিন কোন সমস্যা সমাধানের আনন্দে 'সায়নের চুলের গোছা ধরে 'হো হো' করে হাসে হাসিনা'। নতুন কিছু করার আত্মবিশ্বাসে সে কোর্সের সকলকে অবাক করে দেয়। সব থেকে বড় কথা হল, নিজের এই পরিবর্তনে হাসিনা নিজেকে খুঁজে পায়, সে নিজের ভাষা খুঁজে পেয়েছে এবং নিজের ইচ্ছেমত চলার আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে। তাই সে একদিকে যেমন সুলগ্নাকে স্বামীর ইচ্ছেমত কুয়েত না যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে, নিজের স্বপ্নপূরণের কথা জানায় তেমনি ভুলবশত বোরখাটা না পড়েই সে বাড়ি চলে গেছে। অর্থাৎ চাপিয়ে দেওয়া বোরখার বন্ধন থেকে সে নিজেকে মুক্ত রাখতে চায় বলেই তার এই ভুলে যাওয়া। পক্ষান্তরে আধুনিক, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী হাসিনার আত্মজাগরণ ঘটায়, সে যেন তার উপর চাপিয়ে দেওয়া সমস্ত শাসন ও আবরণকে অস্বীকার করে, নিজস্বতায় ফুটে ওঠার শক্তি ও সাহস এবং নিজের মতো করে বাঁচার অভিব্যক্তিও খুঁজে পেয়েছে। পরিবেশ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ একজন মুসলিম নারীকে

কতটা আত্মবিশ্বাসী করে জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতে সহায়ক হতে পারে, সমাজসচেতন লেখক হাসিনার মধ্য দিয়ে এই সত্যকেই রূপায়িত করেছেন। হাসিনাদের এই অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস নারীকে মুক্তি দেবে এবং একদিন মুসলিম সমাজের উন্নতির পথকে সুগম করে, মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে, লেখকের এই প্রত্যয়ে আমরাও আশাবাদী।

**পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গঃ**

**অশ্রুমঙ্গল**

আমাদের দেশ তথা রাজ্যের যে কতশত পরিযায়ী শ্রমিক, নিজের শহরের বা রাজ্যের বাইরে কাজ করে, কোভিড-১৯-এর লকডাউন প্রক্রিয়ায় তা স্পষ্ট হয়। সমাজসচেতন লেখক তাঁর 'অশ্রুমঙ্গল' উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে অনেক আগেই আলোকপাত করেছেন, 'ফোন আসার পর হদিস পাওয়া যায়, কুসুমপুর গ্রামের অনেক পুরুষমানুষ অন্য অন্য সব প্রদেশে রুটি-রুজির জন্য আছে। তারা কেউ সোনার কারিগর, কেউ সাচ্চা জরির কারিগর, কেউ অয়েলডিং-এর কাজ করে, কেউ দর্জির কাজ করে। এই কুসুমপুরের মানুষজন ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ বাঙ্গালোর, কেউ গুজরাট, কেউ বা বিলাসপুর, জব্বলপুর—নানাজন নানা জায়গায়। তারা এক-দেড় বছর অন্তর আসে। তাদের বিশেষত স্ত্রী ও মায়েরা আসে ফোন ধরতে। জননী ও স্ত্রী দুজনেরই চোখ জলে ভরে যায়, প্রায়শই। কান্নার ধরণ, ডুকরে ওঠার ধরণ এক-একজনের এক-একরকম।'[৫৬] এইসমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের বিরহী স্ত্রীর নিঃসঙ্গ জীবনের বাস্তবসম্মত সমস্যা ও সংকটকে লেখক অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে তুলেছেন এই উপন্যাসের পরতে পরতে, 'দূরে বিদেশে গিয়ে পুরুষমানুষ খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি ফিরেও আসে না। স্ত্রী চায় তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক। কাকুতি-মিনতি থাকে, কান্না দিয়ে বোঝায় কখনো কখনো। কখনো কখনো শিশুর কান্না পৌঁছে দিয়ে থাকে, সন্তানের প্রতি টান যদি তৈরি হয়। প্রেমার্তিতে ভরে ওঠে সেই নারী।'[৫৭]

তাই দুই সন্তানের জননী লালমন ও নববিবাহিতা মনোয়ারা, এই দুই জায়ের জীবনে অন্নবস্ত্রের অভাব না থাকলেও, 'দুজনে তারা একই দুঃখে দুঃখী। দুজনেরই স্বামী বাইরে

থাকে।' মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে ফোনে কথা হলেও, বিরহী মনের অফুরন্ত অবকাশ তাদের ক্লান্ত করে তোলে, 'বড় একা একা শূন্য শূন্য লাগে। খেয়ে শান্তি নেই, বসে শান্তি নেই, শুয়ে সুখ নেই, ঘুমিয়ে সুখ নেই, ঘুম থেকে জেগে উঠে সুখ নেই। প্রতিদিন সূর্য ওঠে, সকাল হয়, দিন ঝলমল করে ওঠে, দিন ফুরিয়ে যায় একটু একটু করে। রাত আসে মনের বেদনা অরো বাড়ে।'[৫৮] মনের বেদনা ও বিরহযন্ত্রণা ভুলতে, এই দুই নারী রাতের অন্ধকারে পরস্পর পরস্পরের শরীর নিয়ে খেলা করে, চুমু খায় ও আলিঙ্গন করে, একভাবে শরীরের তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করে, 'একে অপরে গায়ে গায়ে লেপটে থেকে তারা যেন নিজেদের পুরুষ নিজেরাই তৈরি করতে থাকে। যেন একে অপরে তারা একে অপরের পুরুষ হয়ে উঠতে থাকে। অদ্ভুত খেলা পেয়ে যায় তারা। অদ্ভুত খেলায় মেতে ওঠে তারা।'[৫৯] লালমন ও মনোয়ারার দাম্পত্য-তৃষ্ণাকে আরও বেশি প্রকট করে তোলে, পাশের বাড়ির নবদম্পতির দাম্পত্য-যাপন। বড়ভাসুর ও জায়ের দৈনন্দিনতায় ভরা দাম্পত্যজীবনও তাদের বিরহকাতর জীবনের বেদনাকে অনেক বেশি ঘনীভূত করে। লালমন স্বামীর স্মৃতি ও দুটো সন্তান নিয়ে কখন কখন ব্যস্ত হলেও, নববিবাহিতা মনোয়ারা কল্প-পুরুষের ভয় ও ভাবনায় তাড়িত হতে থাকে। স্বল্পদিনের দাম্পত্যে সে তার দীর্ঘ অনুপস্থিত স্বামীর চেহারা ও কণ্ঠস্বরও যেন বিস্মৃত হয়। তাই জীবনের তাড়নায় সে বারবার লালমনের ঘরে ছুটে আসে। বিদেশ থেকে মাসে মাসে স্বামীর চিঠি ও টাকা এলেও, শরীর ও মনের ক্ষুধায় তারা আকুল হয়।

আফসার আমেদ দেখিয়েছেন, এইসমস্ত নারীরা, বেঁচে থাকার তাগিদে নিজেদের ভালো রাখার পথও খুঁজে নেয় নানাভাবে। পাড়া-প্রতিবেশীর বিবাহ অনুষ্ঠান, অনেক সময় তাদের বিরহকাতর জীবনে আনন্দ ও বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। আবার পুরুষহীন ভাল থাকার জন্যই তারা মাঝেমাঝে বাজারে গিয়ে মনের মত শৌখিন জিনিস কেনে, বিভিন্ন ধরণের খাবার খায় অথবা সিনেমার কথা বলে ও গান করে। আর দিনের পর দিন স্বামীর বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করে। বাঙালি মুসলিম দরিদ্র পরিবারে নারীজীবনের এই চরম সত্যকে লেখক এই উপন্যাসে সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কৃষিনির্ভর বাঙালি জীবনে নারী-পুরুষের জীবনে অমানুষিক পরিশ্রম ও চরম দারিদ্র্য ছিল ঠিকই, কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যে তারা সেই কষ্ট সহজেই ভুলে যেত। লালমনের বড়জায়ের দাম্পতযাপনে লেখক এই সত্যেরই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যান্ত্রিক

সভ্যতা ও মহাজনের করাল গ্রাস দরিদ্র চাষিদের শ্রমিকে পরিণত করে। তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের সংসারে আপাতদৃষ্টিতে অন্নবস্ত্রের অভাব ঘুচলেও, নারীর বিরহকাতর ও শূন্যজীবনের মর্মান্তিক সত্যকে লেখক স্পষ্ট করেছেন। পাশাপাশি বিদেশে কাজ করা ছেলের জন্য, মায়ের আকুলতা তিনি প্রকাশ করেছেন বদরনের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে লেখক 'অশ্রুমঙ্গল' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একবিংশ শতকের গ্রামবাংলার মুসলিম সমাজের এক বৈচিত্র্যময় ও বাস্তবসম্মত চিত্রকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন।

**শহরমুখো মুসলিম পরিবার ও হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান প্রসঙ্গঃ**

একবিংশ শতকের শুরু থেকেই অনেক শিক্ষিত, চাকরিজীবী মুসলিম পরিবার ছেলেমেয়েদের উন্নত শিক্ষা ও উন্নত চিকিৎসার সুযোগ লাভের জন্য শহরে বসবাসের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। অনেকে শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকে আবার অনেকে বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনে নিয়ে, একসময় শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। শহরের নবাগত মুসলিম পরিবারের কেউ কেউ নিজের আজন্ম পরিচিত সমাজ ও পরিবেশ ছেড়ে যখন হিন্দুপাড়ায় বাস করতে শুরু করে, তখন অজানার আতঙ্কে তারা নানান মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সম্মুখীন হয়। তার উপর ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত গুজরাতের দাঙ্গা তাদের এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। আফসার আমেদের অন্যতম আত্মজৈবনিক ছোটগল্প 'আত্মপক্ষ'এ লেখক নিজের পরিবার জীবনের মধ্য দিয়ে এই সমাজসত্যকেই তুলে ধরেছেন। যদিও গল্পের মধ্যে কোথাও লেখকের নাম নেই, কিন্তু তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও বন্ধুদের স্বনামেই, গল্পমধ্যে তাঁর উপস্থিতি সহজেই অনুমেয়। যেখানে লেখক তাঁর স্ত্রী নাসিমার মধ্য দিয়ে আলোচ্য জীবনসংকটকে তুলে ধরে, মুসলিম নারীজীবনের ভিন্ন একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

**আত্মপক্ষ**

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একজন মুসলিম নারীর জীবনের ছন্দ যে ভিন্ন সুরে বেজে উঠছে, তারই একটি সুন্দর পরিচয় 'আত্মপক্ষ' ছোটগল্প। 'আত্মপক্ষ' প্রথম প্রকাশিত শারদীয়,

'বারোমাস' পত্রিকায় ২০০২ সালে। পরবর্তীকালে এটি লেখকের 'সেরা ৫০টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। গল্পের প্রধান নারী চরিত্র নাসিমা কিন্তু বেশ শিক্ষিতা। সে তার দুই সন্তান অভি ও কুসুমকে যত্ন করে বড় করে তোলার পাশাপাশি লেখাপড়াও শেখায়। স্বামীর সমস্ত অভ্যেস, চাওয়া-পাওয়ার দিকেও তার সমান দৃষ্টি। এমনকি পুত্রবধূরূপেও সে দায়িত্বপরায়ণ। তাই অভি ও কুসুম, নানিকে নতুন বাসস্থানের কথা ফোনে জানানোর জন্য বেরিয়ে গেলে, নাসিমা স্বামীকে বলে, 'মা চিন্তা করছে, ঠিকঠাক এসেছি কি না। তুমিও তো গ্রামের বাড়িতে একটা খবর দিতে পারতে। তোমার মা-বাবা চিন্তা করছেন। পঞ্চায়েত অফিসে ফোন করলে কেউ খবর দিয়ে আসবে না?'[৬০] মায়েদের উদ্বেগের কথা যে একজন মা বা মেয়েই বেশি অনুভব করতে পারে, তা এখানে স্পষ্ট হয়েছে।

অবশ্য সংসারের প্রতি যেমন সে যত্নশীল তেমনি স্বামীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও যত্নে তার জীবন পরিপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীপুরুষের পারস্পরিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের সাহিত্যেও সমাজব্যবস্থার এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট। সময়ের দাবিতে একজন মুসলিম নারীর জীবনও স্বামীর সম্মান, যত্ন ও ভালোবাসায় নতুন মাত্রা লাভ করছে। তাই স্ত্রীর অসুস্থতায় স্বামীর জল তুলে দেওয়া, স্ত্রীর জন্য স্বেচ্ছায় অফিস ছুটি নিতে চাওয়া, স্ত্রীর জীবনের ছন্দপতনে দুশ্চিন্তা করা, তাকে অখুশি দেখে উৎকণ্ঠিত হওয়া এবং হাসিমুখ দেখে আরামবোধ করা, স্বামীর এই কাঙ্ক্ষিত আচরণ নাসিমার জীবনে পরম পাওয়া। তাছাড়া বাড়ি তৈরির ব্যাপারেও নাসিমার মতামত ও পছন্দই অধিক গুরুত্ব পায় তার স্বামীর কাছে, 'সামনের মাস থেকে বাড়ি করব। চোখের সামনে বাড়ি উঠছে। কোন্‌টা কীরকম হবে, নাসিমা ইচ্ছেমতো বানিয়ে নিতে পারবে। অফিসের লোনও স্যাংশান হয়ে গেছে। নাসিমারও স্বপ্ন নতুন একটা নিজস্ব বাড়ি।'[৬১]

এইসূত্রেই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে, স্বামীর বন্ধু অমরনাথের বাড়ি মহিষবাথানে, স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে আসে নাসিমা। শহরের হিন্দুপাড়ার নতুন প্রতিবেশীদের ধর্মাচরণ, সংস্কৃতি গ্রামের মুসলিম পাড়ায় বেড়ে ওঠা নাসিমার কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে প্রতিদিন পাঁচবার করে আজান শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু মহিষবাথানের নতুন বাড়িতে আজান শুনতে না পাওয়ায় নাসিমার কেমন যেন কষ্ট হয়। ছোটবেলা থেকে লালিত ধর্মীয় আবেগ থেকে, প্রতিবেশী

হরেনদার দেওয়া শেতলা পুজোর প্রসাদ খেতে সে ইতস্তত করে। নতুন বাড়ি গোছানোর ক্ষেত্রে হরেনদা, তার স্ত্রী ও পুত্র সুমিতের সহৃদয় সহযোগিতা ও পাড়ার তিনজন বউয়ের আন্তরিক সহাস্য উপস্থিতি নাসিমার ভালোলাগা সত্ত্বেও, সে মনে মনে এই হিন্দুপাড়ায় অস্বস্তিবোধ করে। উপরন্তু ঘর গোছানোর সময়, আলমারির তাকের উপর সে যখন একটি ফ্রেমে বাঁধানো কালীঠাকুরের ছবি দেখতে পায়, তখন ভয়গ্রস্ত-নিস্পলক দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। একজন মুসলিম নারীর মনে কালীঠাকুরের চিত্র বা মূর্তি এক অপরিচিত আতঙ্কের সৃষ্টি করে থাকে। তাই আতঙ্কিত নাসিমা, তার স্বামীকে, ঘর থেকে ছবিটি সরিয়ে ফেলার অনুরোধ করে। ধর্মভীরু নাসিমাকে আতঙ্কমুক্ত করার জন্যই, তার কথামতো লেখক অনুতপ্ত হৃদয়ে, সেদিন বন্ধুর শ্রদ্ধেয় ঠাকুরের ছবিটিকে অনাদরে খাটের তলায় ফেলে রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাসিমার মনে কোনো আনন্দ বা স্বস্তি দেখতে পান না লেখক। সে একেবারেই নিরানন্দ মনে সংসারের সমস্ত কাজ, বাড়িঘর গোছানো, স্বামী ও সন্তানদের দায়িত্ব যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পালন করে। এমনকি নতুন বাড়িতে এসে, এক অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ায়, রাতে ঠিকমতো ঘুমোতেও পারে না। তাই শারীরিকভাবেও সে অসুস্থতা বোধ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গুজরাটে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই দাঙ্গায় প্রায় ১০৪৪ জন নিহত, ২২৩ জন নিখোঁজ ও প্রায় ২৫০০ জন আহত হয়। নিহতদের মধ্যে প্রায় ৭৯০ জন মুসলিম ও ২৫৪ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল বলে অনুমান করা হয়। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে সেই সময় বহু নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের কাহিনি নানাভাবে খবরে আসে। এইসময়ে নিরাপদ মুসলিমপাড়া ছেড়ে, হিন্দুপাড়ায় চলে আসার মধ্যে, লেখকের ধর্মনিরপেক্ষ মনেও এক আতঙ্ক কাজ করে। যদিও তিনি নিজের মনের এই আশঙ্কার কথা নাসিমার কাছে গোপন রাখেন। এদিকে নাসিমা নিজে শিক্ষিত রমণী হলেও, সে খবরের কাগজ পড়ে বা খবর শুনে নয়, সেই সময়ের অন্যান্য অনেক গৃহবধূর মতো টিভি সিরিয়াল দেখেই অবসরযাপন করে। ফলে দেশের বা দশের বৃহত্তর কোন সমস্যা, তার সংসার বা জীবনে তেমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে না। যদি নাসিমার দেশের বা রাজ্যের যেকোনো সংবাদের প্রতি আগ্রহ থাকতো,

তাহলে দেশের সেই সময়ের পরিস্থিতির সংবাদ নাসিমার ধর্ম তথা জীবনের সংকটকে অনেক বেশি বাড়িয়ে তুলত।

অবশ্য দুই দিনের বসবাসের সহাবস্থানে ও প্রতিবেশীদের আন্তরিক পরিচয়ে নাসিমা একসময় তার মনের সমস্ত ভয়, জড়তা ও অসুস্থতাকে কাটিয়ে ওঠে এবং নিজের মনের এক অপরাধের ভার কাটিয়ে, কালীঠাকুরকে যথাস্থানে ফিরিয়ে এনে স্বস্তি পায়। কারণ 'নাসিমার বিশ্বাস, অন্যের ঠাকুর-দেবতাকে অনাদর অসম্মান করার জন্য তার পাপ হয়, আর সেই পাপের ফল, অসুস্থ হয়ে পড়া। দম বন্ধ হয়ে আসছিল, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আর অসুস্থ থাকতে থাকতে, বিকেলবেলা একথাটা তার মনে হয়। তখন সে কালীঠাকুরকে তাঁর আসনে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়। নিজে ঝেড়েমুছে যত্ন করে যথাস্থানে রাখে। তারপর থেকে সে সুস্থ হতে শুরু করে। এখন তার বসবাসের ঘরেই দেবী আছেন। আমি বুঝি, সমস্ত ব্যাপারটাই মানসিক ব্যাপার। নাসিমা ধর্ম মানে বলে অন্য ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান করা মানতে পারেনি, তাই তার মানসিক কষ্ট হয়েছিল। এখন দেবীকে যত্নের সঙ্গে রেখেছে।'[৬২]

এইভাবে নাসিমা অন্যের ধর্মের প্রতি সম্মান ও সম্প্রীতি দেখিয়ে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহযোগিতা ও আস্থায় ভারতবর্ষের মূল সুর। তাই নতুন প্রতিবেশীদের ভালোবাসা, সম্মান ও সহযোগিতায় নাসিমার মনের গহনে হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি অপরিচয়ের জায়গা থেকে যে ভয় ও সংকট বাসা বেঁধেছিল, তা স্বল্পকালের পরিচয়ের মিষ্টতায় এক সুন্দর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যঞ্জনা তৈরি করে। 'আত্মপক্ষ' ছোটগল্পে সমাজসচেতন লেখক আফসার আমেদ সম্প্রীতির এই বার্তাই দিয়েছেন।

### হিন্দু-মুসলিম পরিণয় প্রসঙ্গঃ

### একটি গিটার

আফসার আমেদের 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসে লেখক হিন্দু ও মুসলিম দুই ভিন্নধর্মের নরনারীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যা ও সংকট তুলে ধরেছেন। সেক্ষেত্রে একজন

মুসলিমকে বিয়ে করার ফলে, নিঃসন্তান দীপার মনে উদ্ভূত তালাক ও বহুবিবাহকেন্দ্রিক নিরাপত্তাহীনতা প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'একটি গিটার' ছোটগল্পে লেখক এই বিবাহিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যে সমস্যা ও সংকট দেখা যায়, তার একটি বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন। একসঙ্গে লেখাপড়া বা পাশাপাশি বসবাসের সৌজন্যে, বাঙালি হিন্দু পরিবারের কন্যা যেমন কোনো মুসলিম পরিবারের বধূ হয়ে আসে ধর্ম ও সমাজের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, তেমনি বাঙালি মুসলিম পরিবারের কন্যার, বাঙালি হিন্দুপরিবারের বধূ হয়ে আসার ঘটনাও বিরল নয়। ধর্মনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক বাধা উপেক্ষা করে, প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পরিবারের মেয়ে যখন তার প্রেমিকস্বামীর সঙ্গে ঘর বাঁধে, তখন সে মুসলিম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আফসার আমেদ আলোচ্য গল্পে এর একটি বাস্তবসম্মত রূপরেখা তৈরি করেছেন।

'একটি গিটার' ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে, শারদীয় 'বারোমাস' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে এটি লেখকের 'সেরা ৫০টি গল্প' সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখক এই গল্পের পটভূমি রূপে গ্রহণ করেছেন, শহর কলকাতার একটি শিক্ষিত, চাকরিজীবী ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের দৈনন্দিনতাকে। যেখানে 'ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ তেমন নেই। বাড়ির বয়স্ক লোকজন নামাজ পড়ে। আব্বুজি সরকারি চাকরি করে। অফিসার নয়। ইউ ডি ক্লার্ক। বাড়িতে হিন্দু বন্ধুদের যাতায়াতও আছে তার। কিন্তু ধর্ম মানে। ধর্মীয় পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করে না।'[৬৩] পরিবারের বড়কর্তা বৃদ্ধ দাদাজি ট্রাম কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী, দাড়িতে, পোশাকে এবং ধর্মীয় আচরণে ধর্মভীরু মনে হলেও, গোঁড়া বা রক্ষণশীল নন। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে গান-বাজনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু দাদাজির গান-বাজনার প্রতি অপরিসীম আগ্রহ। তাই পৌত্র আবিদের গিটার শুনে তিনি খুশি হন। বাড়ির মেয়েরাও যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে জীবন-যাপন করে এই গল্পে। শহুরে আলোবাতাস তাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অবকাশ দিয়েছে। তাই নেহা উচ্চশিক্ষা লাভের পাশাপাশি, ছেলেবন্ধুদের বাড়িতে নিয়ে আসার স্বাধীনতাও অর্জন করতে সমর্থ হয়। এতো প্রগতিশীল মনোভাব থাকা সত্ত্বেও, বাড়ির মেয়ের কোন হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করার আস্পর্ধা তারা মানতে পারে নি। কারণ তাদের কাছে, 'সেটা অপরাধ হয়। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'[৬৪]

আফসার আমেদ মুসলিম পরিবারের এক চরম বাস্তবতাকে এখানে তুলে ধরেছেন। তারা যতই শহুরে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মনোভাব পোষণ করুক না কেন, মেয়ের অমুসলিম ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করা তাদের কাছে চরম অপরাধ। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যদি পরিবারের ছেলে কোন অমুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে, তবে সেক্ষেত্রে তেমন অপরাধ তারা দেখে না। সমাজে তাদের মানও যায় না। যদিও 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ' উপন্যাসের নাজিমকে তার বাবা ত্যাগ করেছে। মুসলিম সমাজে এই ঘটনাও বিরল নয়। কিন্তু বাড়ির মেয়ের ভিন্ন ধর্মের পুরুষকে বিয়ে করা এখনো মুসলিম সমাজের চোখে একটি গুরুতর ঘৃণ্য অপরাধ, যা প্রচণ্ড লজ্জাজনক। তাই অতি আদরের মেয়ে নেহা বাড়ির সকলের চোখের মণি হলেও, তার পছন্দের অমুসলিম পাত্র রুদ্রকে, বিয়ে করার সিদ্ধান্ত পরিবারের কেউ মেনে নিতে পারে না। পাত্র হিসেবে কলেজের অধ্যাপক রুদ্র যতই যোগ্য হোক না কেন, তাদের দুজনের সম্পর্ক গড়ে ওঠার মধ্যে ধর্ম একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সংগ্রাম করেও নেহা শেষপর্যন্ত পরিবারের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়। তাই পরিবারের সকলের অমতে, সে প্রেমিক পুরুষ রুদ্রকে গোপনে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। রুদ্রকে বিয়ে করে নেহার চলে যাওয়ার পর পরিবারে যে মৃত্যুসম শোকের ছায়া নেমে আসে, তার একটি বাস্তবসম্মত সামাজিক ও ধর্মনৈতিক কারণ নির্দেশ করে লেখক বলেছেন, 'সে তার ইচ্ছেমতো বিয়ে করতেই পারত। পরিবারের পছন্দমতো পাত্রকে বিয়ে করলে কথা ছিল না। নেহা বিয়ে করেছে এক হিন্দু ছেলেকে। এটা একেবারেই অপছন্দ পরিবারের কাছে। কোনো অপছন্দ মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে যদি নেহা বাড়ি ছেরে চলে যেত কাউকে কিছু না বলে, তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করে চলে যাওয়া নেহার পক্ষে ক্ষমাহীন অপরাধ। আব্বুজি বলেছে তার মৃত্যুর সময় নেহা যেন মুখে জলও দিতে না আসে।'[৬৫]

মূলত নেহার বাবার এই অভিমানের কারণ ধর্ম ও সমাজের দিক থেকে অনুসন্ধান করে দেখা যায়, নেহার এই আকস্মিক চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে 'ওরা ভীষণ আহত হয়েছে। অপমানিতও। ...নেহা এই বাড়ি থেকে হারিয়ে গেল। তাকে ভালোবাসার পরিবর্তে এরা তাকে ঘৃণা করছে, অভিশাপ দিচ্ছে। এই অসহায়তা এই নিরুপায়তা তো তাদের হয়েছে।'[৬৬] মুসলিম ধর্ম তথা বিধি-নিষেধের কাছে তারা নিরুপায়, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের প্রশ্নের সম্মুখে

তারা অসহায়। তাই এইভাবে প্রিয় কন্যার চলে যাওয়ার শোকের পাশাপাশি অপমান, লোকলজ্জা, মানহানী ও ধর্মভয় তাদের আরও বেশি যন্ত্রণাকাতর করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই নেহার দাদা-দাদি ও বাবা-মার জীবনে হঠাৎ করে ছন্দপতন হয়। বাবা অফিস কামাই করে, দাদি অনবরত নামাজ পড়ে ও তসবি গোনে অন্যদিকে মা ও পিসিমা শোকাচ্ছন্ন পদে সংসারের কাজ করে। এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম নেহার ভাই আবিদ। বাড়িতে নেহার অভাববোধ তাকে কিছুটা কষ্ট দেয় ঠিকই, কিন্তু আধুনিকমনস্ক আবিদ মনে মনে দিদিকে সমর্থন করে, ফোনে দিদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

একবিংশ শতকের নারী নেহার জীবনে এই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস জুগিয়েছে সময়, শিক্ষা, পরিবেশ ও পরিবারের সকলের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা। তাই নেহা সকলের অসম্মতির মাঝেও নিজের জীবনকে বেছে নিতে পেরেছে, যে জীবন রুদ্রকে ছাড়া অসম্পূর্ণ ও প্রাণহীন। এই শতকের নারীরা নিজের মতো করে বাঁচার ও নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্জন করতে পেরেছে অনেক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায়। তাই নেহা শুধুমাত্র মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধে নি, সে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে একজন হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করে ঘর ছাড়ে, যা আজকের দিনেও মুসলিম সমাজ তথা পরিবারের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার প্রতিবাদ স্বরূপ। তবে একথা ঠিক যে, নেহা কিন্তু মোটেই স্বার্থপর বা বেপরোয়া নয়। মনের মানুষের টানে বাধ্য হয়ে ঘর ছাড়লেও, পরিবারের সকলের জন্য তার অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার প্রমাণ লেখক বারবার দিয়েছেন। পরিবারের দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য সে নিজেকে দায়ী করে এক অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছে। সকলের খবরাখবর নেওয়ার জন্য গোপনে আবিদকে ফোন করে এবং উদ্বিগ্ন মনে সকলের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন কামনা করে, বাংলার প্রতিটি মমতাময়ী কন্যার মতোই। গিটারের ঝংকারে তার শূন্যস্থান পূরণের সংবাদে, সে আনন্দে কেঁদে ফেলে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার অন্য পাঁচজন মেয়ের মত নেহারও আকাঙ্ক্ষা সকলকে নিয়ে আনন্দে থাকা। কিন্তু ধর্মের বেড়া তাকে এই পরিপূর্ণ আনন্দ পেতে বাধা দেয়। যেকোনো ধর্মেই, ভিন্ন ধর্মের নরনারীর মধ্যে পরিণয় আজও সমাজ ও ধর্মসম্মত নয়। সোশ্যাল মিডিয়া ও খবরের কাগজে নিত্যদিন প্রকাশিত এই বিষয়ক নৃশংস কাহিনিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তারই মাঝে আবার নেহা ও রুদ্রের মত মানুষের কাছে, ধর্মকে ছাড়িয়ে মানুষ বড় হয়ে উঠেছে। অবশ্য নেহার ভাই আবিদও তাদের মত বিশ্বাস করে, 'প্রেমের আবার হিন্দু-মুসলমান কী?' লেখকের মতো শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন মানুষেরা, নতুন প্রজন্মের এই মানবধর্মে আশাবাদী।

**মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম সমাজ ও নারীর জীবনঃ**

১৯৯৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, আনন্দবাজার পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আফসার আমেদ 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি এখনও তৈরিই হল না' নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বর্তমানে এটি লেখকের 'মুসলমান সমাজঃ নানাদিক' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত। এখানে তিনি বলেছেন, 'আজ একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে পশ্চিমবঙ্গে ২৭ শতাংশের মতো বাঙালি মুসলমান বসবাস করলেও তার অনস্তিত্ব অপরিচয় ও অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি ও আড়ালটাই বেশি চোখে পড়বে। সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্পের জগতে তারা গরহাজির। যে শ্রেণির ভিতর থেকে এই সব শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা উঠে আসবেন, প্রকৃত অর্থে সেই মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান শ্রেণির তৈরি হল না। বড়োই আক্ষেপের বিষয়।[৬৭]' তবে একবিংশ শতকের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সামান্য কিছু উচ্চশিক্ষিত, চাকরিজীবী মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের উপস্থিতি সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতিতে লক্ষণীয়। এই সময়কালে রচিত আফসার আমেদের কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্পে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এই সমাজে মুসলিম নারীর জীবনে তালাক, বহুবিবাহ ও অসমবিবাহের মত সমস্যা বা সংকট প্রায় অনুপস্থিত। খুব সামান্য হলেও, এইসময় এস.এস.সির হাত ধরে মুসলিম মেয়েরাও শিক্ষিকা রূপে, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করছে। পরিবার পরিকল্পনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিন্তা-ভাবনা ও রুচিবোধের দিক থেকে তারা, সংখ্যাগুরুদের মতই আধুনিক মনোভাবাপন্ন। তারা নিজের অধিকার ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। তবে আধুনিক যুগযন্ত্রণা, যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসন, নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা, সম্পর্কের অবনতি, নিঃসঙ্গতা, কর্মব্যস্ততা ও নেশাগ্রস্ততা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের চলার পথকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে, তাতে

ক্ষতবিক্ষত হয় দাম্পত্যের মধুর যাপন, মানুষের রূপকার আফসার আমেদ এই সত্যকেই তুলে ধরেছেন তাঁর 'জীবন জুড়ে প্রহর' উপন্যাসে।

### ১) জীবন জুড়ে প্রহরঃ

'জীবন জুড়ে প্রহর' উপন্যাসের প্রথম অংশ 'জীবন জুড়ে প্রহর' প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৭ সালে, ইদ সংখ্যা অনাহত পত্রিকায়। ঐ একই বছরে এর দ্বিতীয় অংশ 'ভাঙা সময়ের গন্ধ' প্রকাশিত হয় শারদীয় নন্দনে। তৃতীয় অংশ 'অন্ধরাত্রির গান' প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে, শারদীয় নতুন আলো পত্রিকায়। এই তিনটি অংশ মিলে ২০০৯ সালে, 'জীবন জুড়ে প্রহর' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বি.এল.আর.ও অফিসের কর্মচারী শাকিলের অন্যান্য সহকর্মীরা ঘুষ খেলেও, শাকিল এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সহকর্মীবন্ধুদের নিত্যদিনের উপেক্ষা ও অসহযোগিতা, শাকিলকে ভেতর থেকে অস্থির ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। অফিসের সমস্ত অপমান ও দুঃখ সে স্ত্রী মনোয়ারার শরীরের উত্তাপে ভোলার চেষ্টা করে, কিন্তু মনোয়ারাও তাকে প্রত্যাখান করে বারবার। আফসার আমেদ একবিংশ শতকের নারী মনোয়ারার মধ্য দিয়ে, মধ্যবিত্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসাধ ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে স্পর্শ করেছেন এই উপন্যাসে।

মনোয়ারা একজন শিক্ষিত, আধুনিক, অধিকারসচেতন ও সংসারী রমণী। স্বামী শাকিল বন্ধুবৎসল, পরোপকারী ও সাদামাটা একজন মানুষ হলেও, একটু বেশি পরিমাণে অভিমানী, 'ভেতরগোঁজা', শৌখিনতাহীন হওয়ায় মনোয়ারা, শাকিলের সংসারে সুখী হতে পারে না। শাকিলের দাম্পত্যে নানাকারণে তার স্বপ্নসাধ অধরা থেকে যায়। তাছাড়া শাকিলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণ তেমনভাবে মনোয়ারাকে আকর্ষণ করে না, তার মন ও শরীরকে জাগাতে পারে না। কম মাইনের চাকরি হলেও, তাদের ছোট সংসারে কোন অভাব হতে দিত না, হিসেবি মনোয়ারা। কিন্তু শাকিলের লটারি ও সিগারেটের নেশা, বন্ধুসঙ্গ ও বাইরের অপরিমিত হাতখরচ, মনোয়ারার সংসারসুখের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে। টিভি, মোবাইল, ফ্রিজ, শৌখিন পোশাক ও একটি সুন্দর বাড়ির যে চাহিদা মধ্যবিত্তের স্বপ্নসাধ, তা মনোয়ারা শাকিলের সংসারে পায় না। এমনকি শাকিলের কাছে সামান্য পঞ্চাশ টাকা চেয়েও

সে নিরাশ হয়। সামান্য ক্রিম, বাড়িতে পড়ার ব্লাউজ প্রভৃতি নিয়ে আসার ব্যাপারেও সাকিল খেয়াল রাখে না। প্রতিবেশী রউফ মাস্টারের স্ত্রী, কিসমত ভাবির সুসজ্জিত সংসারজীবন তাই মনোয়ারাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে, 'কিসমতের সংসারে শ্রী আছে। নতুন বাড়ি করেছে রউফ মাষ্টার। মেঝে মোজাইক করা। ঘরে ঘরে ভালো খাট পালঙ্ক। ফ্রিজ আছে, বড় রঙিন টিভি। আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, কত কি আসবাব। সে তুলনায় মনোয়ারার পুরনো ভাঙাচোরা বাড়ি। দালানের জানালা দরজা ভেঙে গেছে। পলেস্তরা খসা দেওয়াল, রঙহীন জানালা দরজা। কড়ি বরগায় ঘুণ। পেটমোটা টিকটিকিরা শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসহ্য।[৬৮]' তার উপর কিসমতের দেওর রাহাতের পোশাক, স্মার্টনেস, হাসি, চেহেরা ও মোবাইলে কথা বলার সুন্দর ব্যক্তিত্ব, শাকিলের খামতিকে আরও বেশি স্পষ্ট করে মনোয়ারার চোখে। তাছাড়া টিভিতে আসা বিজ্ঞাপন ও সিরিয়ালের চাকচিক্য মনোয়ারার জীবনের শূন্যতাকে যেন বেশি প্রকট করে তোলে। পাশাপাশি রয়েছে তার শাশুড়ির ভুল ধরে খোঁটা দেওয়া, যা বাঙালি সংস্কৃতির একটি চিরাচরিত রেওয়াজ। তাই এক এক সময় মনোয়ারার মনে হয়, 'ভাল একটা বরের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল তার'। মনোয়ারার এই অসন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজের আধুনিক যুগযন্ত্রণা।

এ কথা সত্য যে, শাকিল সময়, ভালবাসা, যত্ন ও সুমধুর যাপন দিয়ে মনোয়ারার জীবনের এই অভাব ও অসন্তোষ দূর করে দিতে পারতো। কিন্তু কোনভাবেই মনোয়ারার ইচ্ছে বা সাধকে গুরুত্ব না দেওয়ায়, শাকিলের সঙ্গে মনোয়ারার একটা দূরত্ব বাড়তে থাকে। সারাদিন অফিস ও সারাসন্ধ্যা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের বেশিরভাগ পুরুষ গভীর রাতে বাড়ি ফিরে আসে। শাকিলও একই পথের পথিক। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে, রাতের অন্ধকারে তাই শাকিল যখন মনোয়ারার শরীরের উত্তাপ কামনা করে, তখন সে শাকিলকে অবজ্ঞা ও অবহেলা দেখায়। এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে সে অনেকসময় স্বামীকে আহতও করে। কিন্তু যেদিন শাকিল একটি পুরনো মোবাইল কিনে, মনোয়ারার একটি স্বপ্নসাধ পূরণ করে, সেদিন মনোয়ারা মনের আনন্দে সাজগোজ করে এবং শাকিলের জন্য 'অপেক্ষা করে। আজ আর তার চোখে ঘুম নেই। নেই প্রত্যাখ্যান। এক আহ্বানের নন্দনে ভরে আছে। চাঁদের আলোয় সম্পূর্ণ অন্য রূপ তার। বোধহয় একটা ভালো শাড়িও পরেছে।'[৬৯]

মনোয়ারা সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে, কেজি ওয়ানে পড়া একমাত্র সন্তান মতিনের সমস্ত দায়িত্ব একাহাতে সামলায়। মধ্যবিত্ত বাঙালির একজন রূপে, মতিনকে ভালোভাবে মানুষ করার জন্য, মনোয়ারা দ্বিতীয় সন্তান নিতে নারাজ। কিন্তু সংসার জীবনের দৈনন্দিনতায়, সে শাকিলের কোনো সহযোগিতা পায় না। তাছাড়া বর্তমান সময়ের বাঙালি পুরুষসমাজ, শুধুমাত্র অফিস ও বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না, সে অনেক সময় অবৈধ পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। যা তাদের দাম্পত্যজীবনকে আরও বেশি সমস্যাসংকুল করে তোলে। শাকিলের জীবনে কুলসুমের আগমন এই সত্যকেই স্পষ্ট করে। এই সময় মুসলিম অন্দরমহলেও পরিবর্তন আসে। নারীরা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে পা বাড়ায়। বাড়িতে দাদার বন্ধুদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। এই সূত্রেই, বন্ধু আরিফের বোন কুলসুমের সঙ্গে শাকিলের সম্পর্কের গভীরতা। কিন্তু শাকিলের এই সম্পর্কের কথা মনোয়ারার কাছে গোপন থাকে না। সে কুলসুমের ব্যাপারে বারবার শাকিলকে প্রশ্ন করে, নিজের সন্দেহ ও আতঙ্কের কথা জানায়, রাগ প্রকাশ করে। তবু 'অভ্যাসে ভালোবাসা', 'মিথ্যের আলোছায়া' ও দাম্পত্যের অসুখ নিয়েই মনোয়ারারা বেঁচে থাকে।

কিন্তু শাকিলের মত সাধারণ মানুষেরা বারবার চেষ্টা করেও, কলেজপড়ুয়া, খোলামেলা ও প্রাণচঞ্চল কুলসুমের অদম্য আকর্ষণকে দমিয়ে রাখতে পারে না। তারা স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, অপরাধবোধ ও সামাজিকতার জায়গা থেকে বারবার এই নিষিদ্ধ সম্পর্ক থেকে বারিয়ে আসার সংকল্প করে এবং বারবার ভাঙে। আবার কুলসুমের প্রেমের আহ্বানে পুরোপুরি সাড়া না দিতে পারার যন্ত্রণায় শাকিল ক্ষতবিক্ষত হয়। মনের মানুষকে না বলতে পারার যন্ত্রণা ও অস্থির মানসিকতার আঁচ পড়ে মনোয়ারার জীবনেও। স্বামীর কথা বলার সঙ্গী হতে না পারায়, এক এক সময় মনোয়ারার মনে হয়, 'কি বলে, কি করে, কি ভাবে, কিছুই জানায় না লোকটা। বড় মাপা। শয়তানরা এমন চাপা হয়। সংসারে শুধু আগুন জ্বালিয়ে দিতে হয়।'[৭০] তবে কুলসুমদের গৃহবিবাদ মেটানোর ব্যাপারে, শাকিলের চরম পদক্ষেপ, এমনিতেই মনোয়ারার সংসারজীবনকে দগ্ধ করে দেয়। কুলসুমের কাছে পৌরুষ রক্ষা করতে গিয়ে শাকিল, মধুকে খুন করে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং মনোয়ারার জীবনকে চরম সংকটের পথে ঠেলে দেয়।

লেখক কুলসুমের মধ্য দিয়ে, এই সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনকেও সূচিত করেছেন। একবিংশ শতকে পা দিয়েও কুলসুমের কলেজে যাওয়াকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। তার কাকাতো ভাই সদু ও মধু, কুলসুমকে 'বেশ্যা' বলে অভিহিত করে। মেয়েরা যেখানে দেশশাসন থেকে শুরু করে আকাশে পাড়ি জমাচ্ছে, সেখানে এই সমাজের মেয়েদের বাড়ির বাইরে বেরোনো, বাইরের পুরুষের সঙ্গে আলাপচারিতা, তাদের কাছে নিন্দনীয়। অনেক মুসলিম পরিবার বাড়ির মেয়েদের আলাপচারিতা বাড়িতে আসা বন্ধু বা আত্মীয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। তাই প্রথম যৌবনে, কুলসুম দাদার বন্ধু শাকিলের সঙ্গে অবাধ আলাপচারিতার সুযোগ পায়। শাকিলের মিষ্টি ব্যবহার, সুখেদুঃখে ও বিবাদের মাঝেও তাদের পাশে থাকা, টাকা ধার দিয়ে সহযোগিতা করা ও গান শোনানোর মধ্যে নবযুবতী কুলসুম তার মনের মানুষকে খুঁজে পায়। সে শাকিলের প্রেমে পড়ে, শাকিলকে আরও একান্ত করে পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়। আবার ভীরু শাকিলের প্রত্যাখ্যান তাকে আহতও করে। তবে লেখক শাকিলের প্রতি, কুলসুমের এই গায়ে পড়া ভাব ও আগ্রাসনকে মাঝে মাঝে মনোয়ারার মধ্য দিয়ে সমালোচনা করেছেন, পাঠকও মাঝে মাঝে কুলসুমের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হয়েছে। তাছাড়া কুলসুম ও শাকিলের এই অবাধ আড্ডার সূত্র ধরে, তাদের মনে যে প্রেমের উন্মেষ ঘটে, তার একটি নেতিবাচক দিকও লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন মনোয়ারার জীবনযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

নিয়তিতাড়িত মধ্যবিত্ত সমাজের নারী মনোয়ারার, স্বামীর সর্বনাশের আশংকা ও 'উদ্বেগ-যন্ত্রণা' প্রকাশের মধ্য দিয়ে লেখক নারীর অন্তর্বেদনাকেই রূপায়িত করেছেন, 'শাকিল তার মন ভরায় না। শুধু অধিকার করতে চায়। তাদের এই অসহযোগে যেন কোনো নিয়তির তাড়না আছে। চলে গেল। অত ডাকল, পিছু ফিরল না। শাকিলকে সুন্দর ব্যবহার না দিয়েই থাকে সে। তারপর অনুতাপও হয়। তাদের সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব-রেষারেষি আসে জুটেছে। এই অস্বাচ্ছন্দ্য তাদের নিয়তি। ভালোবাসার মধু দিয়ে যাপন করতে পারছে না। কোথা থেকে যেন তিক্ততা চলে আসছে। এ জীবন যেন সে চায়নি। আরও ভালো জীবন পাওয়ার স্বপ্ন ছিল, সাধ ছিল।'[৭১] খারাপ স্বপ্ন দেখা শাকিলের জন্য মনোয়ারা 'আয়তল কুর্সি'(ইসলাম ধর্মের মানুষ বিশ্বাস করে, আয়তল কুর্সি পড়ে বুকে ফুঁ দিলে, শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারেনা, খারাপ

স্বপ্ন দেখে কষ্ট পায় না) পড়লেও, তার দাম্পত্যজীবনের এই সংকট যে চিরকালীন, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই উপন্যাসের অন্যতম মুসলিম নারী চরিত্র, স্কুলশিক্ষিকা রিজিয়ার দাম্পত্যজীবনেও নানা ধরণের সমস্যা ও সংকট লক্ষ্য করা যায়। রিজিয়ার স্বামী আনিস, উলুবেড়িয়ার এস.ডি.ও অফিসে চাকরি করে। তারা দুজনে মিলে উলুবেড়িয়ায় ব্যাঙ্কঋণ নিয়ে একটি বাড়িও করে। তাদের একমাত্র মেয়ে দিয়া, একটি নামকরা স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে, আঁকা শেখে। কাজের মাসি আলেয়া, রিজিয়ার সংসারের অধিকাংশ কাজ করে দেয়। আপাতদৃষ্টিতে তাদের এই সংসার, বাড়ি, প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা মধ্যবিত্তের পরম কাঙ্ক্ষিত সুখীজীবনের মাপকাঠি। কিন্তু আনিসের মানসিক রোগ, দিনের পর দিন অকারণে অফিস কামাই করে ঘরে থাকা, যেকোনো দুর্ঘটনা বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবরে অসুস্থতাবোধ করা ও নিদ্রাহীনতা, রিজিয়ার জীবনকে এক বিষাদঘন অস্থিরতা ও অশান্তিতে ভরে দেয়। দাম্পত্যজীবনের স্বাভাবিকতা থেকেও সে বিচ্যুত, বেশিরভাগ সময় তারা আলাদা ঘরে রাত্রিযাপন করে। কর্মব্যস্ত জীবনে তাদের মধ্যে অনেকসময় অসুস্থতার কথা ছাড়া স্বাভাবিক কথাবার্তা হয় না। অথচ নাট্যকার-নাট্যপ্রেমী ও সমালোচক আনিসকে সে কুড়ি বছর আগে প্রেম করে বিয়ে করে। নাটকের দল ভেঙ্গে যাওয়ার পরই আনিস মানসিকভাবে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে, রিজিয়ার জীবনে ছন্দপতন ঘটে। সংসারের সমস্ত দৈনন্দিনতা, দিয়া, স্কুল, খাতা দেখা থেকে শুরু করে সবকিছুই একা হাতে করে যায় রিজিয়া। এই ব্যাপারে সে আনিসের কোন সহযোগিতাই পায় নি কোনদিন। তার উপর আনিসের অসুস্থতা, দায়িত্বহীনতা ও মাঝে মাঝে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরা রিজিয়ার জীবনে একপ্রকার 'সন্ত্রাস' নিয়ে আসে। রিজিয়ার অনুপস্থিতিতে, তার প্রাক্তন ছাত্রী নিবেদিতার যখন তখন আনিসের কাছে চলে আসা, তাকে আরও বেশি সন্ত্রস্ত করে তোলে।

আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত সমাজের নারীর মত রিজিয়াও, আনিসের মদ খেয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফেরা, কিছুতেই মানতে পারে না। মদের গন্ধ সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মে যেহেতু মদ খাওয়া হারাম (কঠোরভাবে নিষিদ্ধ), এই বোধেও সে মনে মনে খুব কষ্ট পায়। আনিস ধর্ম না মানলেও, রিজিয়া কিন্তু ধর্মকে মন থেকে মানে। তাই শত

ব্যস্ততার মধ্যেও সে নামাজ পড়া ছাড়ে না। আবার মনে মনে আহত হলেও কিন্তু মাতাল আনিসকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, অবহেলা দিতে পারে না। আনিসের বন্ধু রাকিব মদ খেয়ে বাড়ি ফিরলে, রাকিবের স্ত্রী রুবিনা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। রাকিব বারান্দায় পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। রুবিনার এই আচরণে খুশি হয়ে, 'অন্ধকারে হেসে ওঠে রিজিয়া। হাসলে সে ভালো থাকে। কিন্তু হাসিটাই সে ঠিকঠাক পায় না। স্কুল গেলে নানা সমস্যা, ফিরে এসে আনিসকে নিয়ে সমস্যা। মেয়ের স্কুল আছে, পড়াশোনা আছে, নিজের টিউশানি আছে। আর সংসারের নানা কাজ, রান্নাবান্না তো আছেই। এতো কিছুর ভেতরে নিজের হাসিটুকু কোথায়?'[৭২] এযেন একজন মধ্যবিত্ত চাকরিরত রমণীর জীবনের রোজনামচা।

সমাজে পুরুষের চাহিদা বা অসুস্থতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সবসময়। তাই আনিসের অসুস্থতার মাঝে, রিজিয়ার নিজের জীবনের সমস্ত দুশ্চিন্তা ও সমস্যা ঢাকা পড়ে যায়। নিজের ছুটে চলা কর্মব্যস্ত জীবনের হিসেব করতে গিয়ে তাই এক একসময় রিজিয়ার মনে হয়, 'রুবিনা, রাকিবদার বউ কি এমনভাবে থাকে? সে তো চাকরি করে না, হাউস-ওয়াইফ। এমনটাই ভালো ছিল। স্কুল, পড়ানো, খাতা দেখা, ঠিকঠাক ট্রেন ধরা, কত ঝামেলা। এসব করে, ছেড়ে দেওয়া লাট্টুর মতো ঘুরে যাওয়ার মতো। নিজে কতখানি করে বলতে পারবে না।'[৭৩] তাই সাইকিয়াট্রিস্ট এর ওষুধে নিদ্রিত আনিসকে দেখে সে স্বস্তি পায়। আনিসকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টাই সে করেছে। ডাক্তার দেখানোর পাশাপাশি নিজের প্রাক্তন ছাত্রী, নাটকের মানুষ নিবেদিতাকে বাড়িতে ডেকেছে, যেন আনিস আবার নাটক লিখে, নাটকের দল গড়ে এবং জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। নিবেদিতার সঙ্গ আনিসকে অনেকটা ভালোলাগা জোগায়, নাটক লেখায় অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে বারবার সুন্দরী নিবেদিতার, আনিসের কাছে আসাটাও রিজিয়ার নারীমন মেনে নিতে পারে না। সামাজিকতার পাশাপাশি আনিসের চারিত্রিক স্খলনের ভয় তাকে তাড়িত করে, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বচসা হয় নিবেদিতাকে নিয়ে। দাম্পত্যের এই টানাপড়েনের জন্য, রিজিয়া মাঝে মাঝে ডিভোর্সের কথাও ভাবে কিন্তু মেয়ে দিয়া, আনিসের প্রতি ভালোবাসা ও সামাজিকতার জন্যই হয়তো রিজিয়া এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই জীবনের সংকটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, একসময় রিজিয়া তার সংযম হারিয়ে ফেলে, সে পুরুষের দম্ভকে আক্রমণ

করে, 'আমারই রোজগারে খাবে, আমারই উপার্জিত আশ্রয়ে থেকে অন্য মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করবে, বেরিয়ে যাও এক্ষুনি!'[৭৪] নিজের মনের ক্ষোভ প্রকাশে, সে মনে মনে আত্মপ্রসাদও লাভ করে।

কিন্তু রিজিয়া অধিকারসচেতন আধুনিক নারী হলেও, সে একজন আদর্শ স্ত্রী, একজন প্রকৃত অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় সে একনিষ্ঠ বাঙালি রমণীর পরিচয় বহন করে। তাই সে যেমন আনিসের মান ভাঙানোর জন্য ছুটির দিন মাংস-লুচি রান্না, নতুন শাড়ি পড়ার মধ্য দিয়ে নতুন সাজে সাজায়, তেমনি তার কথায় রাগ করে আনিস বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে, অভিমানী আনিসকে ফিরিয়ে আনার আকুলতায় অস্থির হয়ে, আনিসের পেছনে যায়। একা আনিসের অসুস্থতায় সে ভয় পায়। সেই আবার আপ্রাণ চেষ্টায় পুলিশের জাল থেকে আনিসকে ছাড়িয়ে আনে। এমনকি আনিসের অপরাধের জন্য, রাতের অন্ধকারে সে শাকিলের কাছে আনিসের হয়ে ফোন করে ক্ষমা চায়, শাকিলকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়। অসুস্থ স্বামীর যত্নেও রিজিয়ার বিন্দুমাত্র অবহেলা নেই। কিন্তু আত্মমর্যাদাশীল, রুচিসম্পন্ন, আধুনিক নারী রিজিয়া, অসুস্থ স্বামীর পাশে থাকলেও, 'বেপাড়া'য় যাওয়া ব্যভিচারী আনিসের ইচ্ছেকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখান করার দৃঢ়তা দেখায়, 'তোমার সঙ্গে কখনো মিলিত হব না। তুমি একজন ঘৃণ্য মানুষ, ব্যভিচারী।'[৭৫]

মূলত রিজিয়া নিজের কর্মব্যস্ত ও ক্লান্ত জীবনেও সামাজিকতাকে মান্যতা দেয়। এই সামাজিকতার জায়গা থেকেই, রিজিয়ার মত আত্মনির্ভরশীল আধুনিক নারীরাও, অসুস্থ দাম্পত্যজীবন থেকে সহজে বেরোতে পারে না। তাই সমস্ত প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে রিজিয়া আনিসের সঙ্গেই থাকে। সামাজিক অশান্তি ও মানসম্মানের কথা ভেবে, মধ্যরাতে স্বামীর জন্য দরজা খুলে দিতে বাধ্য হয়। তাদের ছোট মেয়ে দিয়া, মায়ের জীবনের এই সংকট বোঝে না। সে বাবাকেই বেশি ভালোবাসে, সবসময় বাবার ছবি আঁকে। মেয়ের এহেন আচরণেও রিজিয়ার রাগ হয়, সেও সবকিছুর মাঝে একা হয়ে যায়, অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করে। স্কুলের বাথরুমের সমস্যা, আনিসের অসুস্থতা, তার ডাক্তারের পরামর্শ মেনে না চলা ও অসামাজিকতার ক্লান্তির মধ্যেও সে 'সবকিছু যথাস্থিত রেখেছে। স্কুল সংসার, সব। আলেয়া রান্না করছে। যেন তার মন নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। সন্ধ্যাটা কেমন নিশ্চুপতা আর বিষণ্ণতায় ভরে আছে। অসুখের মৃদু

ঢেউ থাকছে সময় পতনের গর্ভে। তারও কিছু ভালো লাগে না। বাঁচার আনন্দ খোঁজে। আনিস তাকে শেষ করে দিচ্ছে।'[৭৬] রিজিয়ার জীবনের এই অনিঃশেষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেখক, বর্তমান সমাজের কর্মব্যস্ত নারীজীবনের এক অতিপরিচিত আলেখ্যকে তুলে ধরেছেন। যারা সমাজ-সংসার ও সন্তানের কথা ভেবে জীবনের সমস্ত অপমান ও কষ্টকে মেনে নেয়। আমাদের বাঙালি সমাজে এইভাবেই কত শত আলোছায়াময়, ভাঙাচোরা সংসার যে কোনরকমে টিকে আছে, তার হদিস মেলা ভার।

বর্তমান যান্ত্রিকসভ্যতার কর্মব্যস্ত জীবনে সামাজিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক বিকৃতি, পরিবারের ভাঙন ও নিংসঙ্গজীবনের যন্ত্রণায় অনুভূতিপ্রবণ মানুষ অস্থির হয়ে উঠছে। ক্রমে মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছে শাকিল, আনিস, অত্রি, নিবেদিতা প্রমুখ মানুষ। রিজিয়ার মতো সুন্দর ও সুস্থ মানুষেরও ক্রমে সে দিকেই যাত্রা। কারণ 'হিংসা প্রতিহিংসা ভ্রষ্টাচার দুর্নীতি'গ্রস্থ স্বার্থপর আধুনিক সমাজে, মানুষ মনের সুস্থতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। রাজনৈতিক নেতা অজয় সেনের মত মানুষের জন্য, সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জীবন আরও বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সত্য কথা বলতে মানুষ আজ ভয় পায়। নেশার ঘোরে আরতির স্বামী স্বপন, অজয় সেন সম্পর্কে সত্য কথা বলায়, জীবন-জীবিকার সমস্যায় পড়ে। মধ্যবিত্তসমাজ তাই আজ আত্মপরিচয়ের সংকটে ক্ষতবিক্ষত। নিষিদ্ধপল্লী, মদ, লটারি ও অবৈধ সম্পর্কের অন্ধকারে এই সমাজের কিছু কিছু পুরুষ হারিয়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারীর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য। এরই মাঝে অধিকারসচেতন আধুনিক নারী, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত অন্যায় আচরণ বা আবদারকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে না। বৈবাহিক ধর্ষণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার পাশাপাশি নিজের মনের কথা প্রতিষ্ঠার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যায় নিজের মত করে। মূলত মধ্যবিত্ত পুরুষসমাজের অতিরিক্ত বন্ধুবৎসলতা ও নেশা যে অনেকসময় মর্মান্তিক সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, 'জীবন জূড়ে প্রহর' উপন্যাসে লেখক এই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন ভাষার অসাধারণ চমৎকারিত্বে। মধ্যবিত্তের এই সংকট লেখকের 'রাত কত হল' ছোটগল্পেও ধরা পড়েছে। অন্যদিকে এই সংকট থেকে মুক্তির একটি পথনির্দেশ করেছেন লেখক তাঁর 'নিরুপায় অলৌকিক' ছোটগল্পে।

## ২) 'রাত কত হল'

আফসার আমেদের আত্মজৈবনিক ছোটগল্পের মধ্যে 'রাত কত হল' ছোটগল্পটি অন্যতম। এই গল্পে তিনি স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর স্ত্রী নাসিমার সঙ্গে দাম্পত্যযাপনের কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্তকে লেখক এখানে রূপায়িত করেছেন। এই ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে, ঈদ সংখ্যা 'নতুন গতি' পত্রিকায়। পরবর্তীতে এটি লেখকের 'সেরা ৫০টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্পের পটভূমিতে আছে আধুনিক যুগযন্ত্রণায় ভুক্তভোগী মানুষের নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, নিদ্রাহীনতা ও নিরাপত্তাহীনতার এক অসুস্থ জগৎ, যেখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক গতিকে নানাভাবে রুদ্ধ করে। আফসার আমেদের এই সময়কালের বেশিরভাগ ছোটগল্পে ধরা পড়েছে, একবিংশ শতকের নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধহীন সমাজ তথা রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে এই সংগ্রাম সমানভাবে লক্ষণীয়। কারণ হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন, 'এই সমাজ, এই রাষ্ট্র, এই পৃথিবীর মানুষ হয়ে বিশুদ্ধ আলো-বাতাসের'[৭৭] অভাব বোধ করে প্রতিনিয়ত। ২০০৬ সালে নন্দীগ্রাম নিয়ে রাজনীতি, জয়পুরের বিস্ফোরণ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাঙ্গামা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং খুনজখমের মাঝে মানুষের মনের শান্তি হারিয়ে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয় 'সন্দীপের অত সুন্দর একটা চাকরি, অত সুন্দর একটা বাড়ি, এমন সুন্দরী বউ অথচ সন্দীপ ভালো নেই। কেন? ওর জীবনযাপনে কোনো কিছু বাধা হয়ে আসছে। ওর মতো করে নিশ্বাস নিতে পারছে না।'[৭৮] তাই সে সারারাত জেগে থাকে। একটু শান্তির জন্য মাঝে মাঝে মদ খায়, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বন্ধুর কাছে অদ্ভুত আবদার করে নিজের গোটা আমিত্বকে নিয়ে। বন্ধু আফসারকে কখনো গভীর রাতে ফোন করে সমুদ্রে হাঁটা শেখানোর আবদার জানায় আবার কখনো নিজের শরীরের চারটি টুকরো করে ফেলার আবদার জানায়। রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার এবং কর্মক্ষেত্রে কোণঠাসা আধুনিক নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতিনিধি সন্দীপ তাই স্বস্তি ও শান্তি লাভে ব্যর্থ হয়ে বিনিদ্র রাত্রি জাগরণে বাধ্য হয়। সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত স্বার্থপরতা ও নীতিহীনতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে সন্দীপের মতো মানুষেরা বিবেকের তাড়নায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে জীবনের মাধুর্যময় ছন্দ হারিয়ে ফেলে। এমনকি

সন্দীপের স্ত্রী মেঘনাও তার এই অসহায়তা, নিদ্রাহীনতা ও মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গী হতে পারে না। তাই সন্দীপের জীবনের পথ আরও বেশি কঠিন হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সমাজের এই সংকট শুধুমাত্র বাইরের জগতেই নয়, প্রবেশ করে পর্দাশীন মুসলিম অন্তঃপুরেও। তাই সন্দীপের মতো আফসারের স্ত্রী নাসিমাও মানসিক রুগী। সেও নিদ্রাহীনতায় ভোগে। জীবনের অবসাদ কাটিয়ে ওঠার জন্য তাকেও অ্যান্টি-ডিপ্রেশনের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম অন্তঃপুরের চিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। তাই মানসিক রুগী হওয়া সত্ত্বেও নাসিমার জীবনে তালাক বা বহুবিবাহের মতো কোন সংকট বা সমস্যা নেমে আসে না, বরং সুস্থ হয়ে ওঠার সমস্ত সহযোগিতা সে স্বামীর কাছ থেকে অনায়াসেই পায়। অবশ্য শিক্ষিত নাসিমাও আফসারের প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী রূপে, সমাজ নির্ধারিত নারীর সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে, স্বামীর বন্ধুমহল, কর্মজীবন তথা ভাবনাচিন্তার জগতেও অনায়াসে প্রবেশ করার অধিকার অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তালাক বা বহুবিবাহের মতো সমস্যায় আজ তাকে আর ব্যাপৃত রাখে না বরং সেই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা তার জীবনে ও মননে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। অবরুদ্ধতার গণ্ডী অতিক্রম করে সে আজ দেশের তথা রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতি ও সমাজনীতির একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

পাশাপাশি স্বামীর সমস্ত দুর্ভাবনা ও অশান্তি কাটিয়ে শান্তিময় নিদ্রার ব্যবস্থাপনায় সে আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করে চলে, মন তথা শরীরের আশ্রয় দিয়ে। যা সেই সময়ের অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের তথা একটি দাম্পত্যের বাস্তবোচিত আলেখ্য। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সমাজ-পরিবার ও ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে দাম্পত্যের এই আলেখ্য অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা বয়ে আনে, সেই একই সময়কালে। তখনো গ্রাম বা শহরের বিশেষ বিশেষ সমাজে বা পরিবারে তালাক ও বহুবিবাহের মতো মর্মান্তিক সংকটে এক একজন মুসলিম নারীর জীবন ক্ষতবিক্ষত হতে দেখা যায়। তবে একথাও সত্য যে, বিংশ শতকের শেষের দিক থেকেই তালাক ও বহুবিবাহের সমস্যা অনেকটাই কমে আসে। ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোয় আলোকিত সমাজ তথা পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক অনেকটাই ইতিবাচক হয়ে ওঠে, আলোচ্য গল্পে লেখক সেই সত্যকেই তুলে ধরেছেন নিজের দাম্পত্য জীবনের চালচিত্রে।

### ৩) নিরুপায় অলৌকিক

আফসার আমেদের 'নিরুপায় অলৌকিক' ছোটগল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঈদ সংখ্যা 'নতুন গতি' পত্রিকায়, ২০০৯ সালে। পরবর্তী সময়ে এটি লেখকের 'সেরা ৫০টি গল্প' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। লেখকের আত্মজৈবনিক ছোটগল্পের মধ্যে 'নিরুপায় অলৌকিক' অন্যতম। যেখানে তার স্ত্রী নাসিমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, ধর্মীয় নীতির ঊর্ধ্বে একজন নারীর জীবন চর্চার কথা। স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে যার জীবনের একটি সুন্দর ও স্বস্তিময় দিক প্রকাশিত। যেখানে স্বামীর প্রতি তার তেমন কোন অভিযোগ নেই। কারণ তার স্বামী প্রহরীর মত সংসার ও সন্তানদের আগলে রাখে, প্রয়োজনীয় টিউশন দেয় এবং অবসর সময়ে নিজে পড়ায়। একথা সত্য যে, সমাজে অন্য অনেক নারীর চেয়ে নাসিমা স্বামীর কাছ থেকে অনেক বেশি পায়। আবার অফিসে থাকাকালীন সময়েও নাসিমা প্রায় রুটিনমাফিক স্বামীর ফোন পায়। ফোন করার মধ্য দিয়ে নিজের ভালোবাসার সান্নিধ্য জানায় নাসিমাকে। তবে স্বামীর এহেন যত্ন ও দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত কিছু আধুনিক নারীর কাম্য। তারা স্বামীকে অনেক সময় সাংসারিক কাজের দোসর রূপে মনে মনে কামনা করে। মাঝে মাঝে অভ্যস্ত জীবনের বাইরে গিয়ে, স্বামী যদি হঠাৎ হাফ সিএল নিয়ে, সময়ের আগেই ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরে, তাহলে স্ত্রীর দৈনন্দিন জীবনে এক আনন্দঘন মুহূর্ত তৈরি হয়। পাশাপাশি যদি তার স্বামী সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করে, তবে খুব খুশি হয়। তাই কল্পনার চোখে ভাবে 'কোদাল দিয়ে বাগানটা পরিষ্কার করলে। তারপর আরও কীসব কাজ সব, যা তোমার অপছন্দের। সব করলে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কলতলায় স্যাঁতলা পরিষ্কার করলে। সময় থাকতে ফোন করে গ্যাস বুক করলে।'[৭৯] স্বামীর এই অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহারে তার আরও একটু ভালোলাগা তৈরি হয়। স্ত্রীর মনে তখন স্বামীর জন্য আদুরে ভাব আসে, দাম্পত্য জীবনের এই সত্যকে লেখক নিজের অভিজ্ঞতা ও নামের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন।

কিন্তু একথাও সত্য যে, আধুনিক জীবনের ব্যস্ততায়, কাজের চাপে, অফিসের বসকে খুশি করার তাগিদে, পৌরুষের অহংকারে এবং বিশেষ করে ইচ্ছের অভাবে প্রায় কোন পুরুষই, স্ত্রীর এই ছোটখাট খুশি বা আনন্দের কারণ হতে পারে না বা চায় না। তাই 'নিরুপায় অলৌকিক' ছোটগল্পে লেখক নারীর কাঙ্ক্ষিত দাম্পত্য জীবনের সত্যকে অলৌকিক ভাবনার

আলোকে তুলে ধরেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের, নারীজীবনের চাহিদার ও নারী-পুরুষের সাংসারিক দায়িত্ববোধের সংজ্ঞাটি যে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, এই সমাজবাস্তবতাই এই ছোটগল্পের মূল প্রতিপাদ্য। স্ত্রীকে গৃহের সমস্ত দায়িত্ব পালন করার যে চিরাচরিত নীতি নির্ধারণ করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাচীরে ভাঙন ধরেছে। আধুনিক শিক্ষিত নারী স্বামীকে শুধুমাত্রও জীবনসঙ্গী রূপে নয়, সাংসারিক কাজের দোসর রূপেও আকাঙ্ক্ষা করে।

২০০১ সাল থেকে ২০১০ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে আফসার আমেদ আলোচ্য ছোটগল্পগুলো ছাড়াও প্রেম, সুখ অসুখ, সাড়ে বারোটায় রান্না শেষ হয়েছে, উপদ্রুত অঞ্চল, আত্মপ্রতিকৃতি, সুধা অ্যাপার্টমেন্ট, খুনের অন্দরমহল, অন্ধগলির রূপকথা, কোনোদিন দেখা হয় যদি, আশ্চর্য সাক্ষাৎকার, তেইশ বছর, খাঁচারপাখি, অভিসার, অন্ধকার স্টেশন, নষ্ট দুপুর, ভালো না লাগার কিছু প্রভৃতি ছোটগল্পও লিখেছেন। এই সমস্ত ছোটগল্পে একদিকে যেমন প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর জীবনের অবসাদগ্রস্ততা, নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধহীন মানুষের অনুভূতিহীন জীবনযাত্রা, খুন জিঘাংসা ও পরকীয়ার প্রতি নেশা তেমনি প্রকাশিত হয়েছে মীনাক্ষী, সীমা ও তুলির মত শিক্ষিত কিন্তু অসহায় দরিদ্র নারীদের, প্রিয়জনের ব্যায়বহুল খরচের জন্য নিষিদ্ধ শারীরিকতায় যেতে বাধ্য হওয়া। আফসার আমেদ তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের মনের অন্ধকার গলির সন্ধান দিয়ে চলেছেন নিরলসভাবে। লেখকের বহুমুখী প্রতিভা ও সমাজ অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে এই সমস্ত ছোটগল্প, যা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

## উৎসনির্দেশঃ


১. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-(২), হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা নং – ১১২

২. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১৮৩

৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১১১

৪. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১৪২

৫. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১৪৩

৬. তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৮৬

৭. তদেব, পৃষ্ঠা নং -১২৬

৮. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ১২১

৯. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ১৬৭

১০. আফসার আমেদ, *অশ্রুমঙ্গল,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫১

১১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা--৯৬

১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১২

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭

১৪. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-১, মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, আফসার ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮৩

১৫. আফসার আমেদ, *প্রেমপত্র,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১০

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১১

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-.১৯

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ২০

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৫৭

২০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৮-৮৯

২১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৬

২২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১১০

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৮৬

২৪. আফসার আমেদ, *অশ্রুমঙ্গল,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৮

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা--২২

২৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৮

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৬৮

২৮. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, সন্ধ্যার মেঘমালা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৪৩

২৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা--৩৪৩

৩০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৪৪

৩১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৪৬

৩২. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র-১, মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, আফসার ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৩

৩৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭৯

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩১৪

৩৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৭১

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২০

৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২১

৩৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৪৭

৩৯. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র (২), এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা নং – ২৪৭

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা নং -২২৩

৪১. তদেব, পৃষ্ঠা নং -২৫৩

৪২. তদেব, পৃষ্ঠা নং -৩০৭

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা নং -২৮০

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৩২১

৪৫. তদেব, পৃষ্ঠা নং -৩২১

৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা নং - ৩২৭

৪৭. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, সন্ধ্যাবাসরের কথকতা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯১

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা –২৯৩

৪৯. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯৪

৫০. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯২

৫১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯৪

৫২. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯৪

৫৩. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, এলাটিং বেলাটিং সই লো,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৫২

৫৪. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৫১-৩৫২

৫৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৫৬

৫৬. আফসার আমেদ, *অশ্রুমঙ্গল,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১০

৫৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা--১৪

৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৩৫

৫৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৩

৬০. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, আত্মপক্ষ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৬৫

৬১. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা –২৬১

৬২. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা –২৬৭

৬৩. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, একটি গিটার,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯৭

৬৪. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা –২৯৭

৬৫. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯৬

৬৬. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৯৭-২৯৮

৬৭. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ৪৭-৪৮

৬৮. আফসার আমেদ, *জীবন জুড়ে প্রহর,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৭

৬৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৪১

৭০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৫

৭১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৮৪-১৮৫

৭২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৯৪

৭৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১০২

৭৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা --১৩৭

৭৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৭৫

৭৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৭৯

৭৭. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, রাত কত হল,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩২০

৭৮. তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩২১

৭৯. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প, নিরুপায় অলৌকিক,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা—৩৬১

# পঞ্চম অধ্যায়ঃ

# আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন

# (২০১১-২০১৮)

আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে একবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এখানে একদিকে যেমন তালাক ও বহুবিবাহের প্রসঙ্গ উঠে আসে, তেমনি আবার নবউদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনসংকটের বিভিন্ন দিকগুলো লেখক স্পষ্ট করেছেন। এইসময়ের কথাসাহিত্যে উচ্চশিক্ষিত চাকরিজীবী মুসলিম নারীর জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ধারাকেও লেখক বাস্তবতার আলোকে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, এইসময় তিনি ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে সরে এসেছেন বর্ণবহুল কোলকাতার যান্ত্রিক ও নিঃসঙ্গ জীবনের আবর্তে। তবে লেখকের এই বর্ণবহুল জীবনের আবর্তে গ্রামের সহজ, সরল, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা হারিয়ে যায় নি। তাই লেখকের ২০১১ সাল থেকে ২০১৮ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে রচিত সাহিত্যের অঙ্গনে শহরকেন্দ্রিক মানুষ প্রাধান্য পেলেও, গ্রামের মানুষ ও প্রকৃতি নির্ভর লেখা 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়। আর একবার প্রমাণিত হয়, গ্রামীণ পরিবেশে লালিত আফসার আমেদের বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর কথাসাহিত্যে, গ্রামীণ সমাজজীবন ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতিকৃতি পাঠক তথা সমালোচকদের অনেক বেশি মুগ্ধ করে। এই সময়কালে তিনি 'খাঁচা', 'প্রথম প্রেম', 'একটি মেয়ে', 'ভূমিকম্পের আগে ও পরে' প্রভৃতি উপন্যাসের পাশাপাশি অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেছেন, যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে মূলত অমুসলিম জনসমাজ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের পর থেকেই লেখক প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ধারা তার নিজস্ব গতি হারিয়ে ফেলে। শেষপর্যন্ত ২০১৮ সালের ৪ঠা অগাস্ট, এই স্বনামধন্য সাহিত্যিক পরপারে পাড়ি দেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে বাঙালি পাঠক তথা সাহিত্যের জগতে সাময়িকভাবে একটি অন্ধকার নেমে আসে। মুসলিমসমাজে

প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামির অন্ধকারময় দিক ও নারীর জীবনের নানান সমস্যা ও সংকট নিয়ে লেখকের সুচিন্তিত মতবাদ ও প্রতিবাদ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

২০০৬ সালের সাচার কমিটির রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের শোচনীয় আর্থসামাজিক অবস্থান সুস্পষ্ট হয়েছে। এর প্রায় দশ বছর পর অর্থাৎ ২০১৬ সালে স্ন্যাপ ও প্রতীচী যে রিপোর্ট দেয়, তাতেও বাঙালি মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থার স্থিতিশীলতার কথাই উঠে আসে। আফসার আমেদের ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসের মধ্যেও সেই গ্রামীণ দরিদ্র ও পশ্চাদপদ মুসলিম জনসমাজকেই দেখতে পাই। পাশাপাশি এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে নিম্নবর্গের হিন্দু জনসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থানও। তবে এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা সম্প্রীতির কথাও এখানে প্রকাশিত। কিন্তু মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন ও পারিবারিক অবস্থানের কথা তো আর সাচার কমিটি বলতে পারে না। নরনারীর ব্যক্তিগত সমস্যা, সংকট, ভালোলাগা-মন্দলাগা, চাওয়া-পাওয়া ও মানসিক যন্ত্রণার কথা বলে মূলত কথাসাহিত্য। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকারবোধ, চাহিদা ও জীবনসংগ্রাম পরিবর্তিত হতে বাধ্য। আফসার আমেদ ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসে স্পর্শ করেছেন এই পরিবর্তিত সময়ের আখ্যানকেও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ জনসমাজের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনেও আধুনিক প্রযুক্তি জায়গা দখল করে বসে। এমনকি সমাজসচেতন লেখক মুসলিম নারীর জীবনের পরিবর্তিত সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকেও এখানে রূপায়িত করেছেন।

## পরিবর্তিত সময়ের আখ্যানঃ সেই নিখোঁজ মানুষটা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের চলার পথে প্রযুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে। আর এক্ষেত্রে পরিবর্তিত জীবনধারার সবথেকে বেশি সাক্ষ্য বহন করে কথাসাহিত্য। আফসার আমেদের ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসে আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি উঠে এসেছে মুসলিম নারীর জীবনচর্যার একটি পরিবর্তিত ধারাও। তাই বলে এই সমাজের নারীর জীবনে আবহমানকাল ধরে চলে আসা সমস্যা ও সংকট যে একেবারেই নির্মূল হয়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। একটি সমাজের পরিবর্তন মানে যে, আমূল পরিবর্তন নয়, সমাজসচেতন লেখক আফসার

আমেদ এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই এই উপন্যাসে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের পাশাপাশি, স্বামীপরিত্যক্তা সখিনার জীবনসংকটের কথাও বাস্তবসম্মতভাবেই উঠে আসে। পাশাপাশি মালিয়া গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আবিদ, চার বছর পর বিলাসপুর থেকে ফিরে এসে দেখে, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ গ্রামবাসীদের আর্থসামাজিক অবস্থানের স্থিতিশীল চরম সংকটকে। রূপকথার আশ্চর্য মানুষ আবিদের মধ্য দিয়ে লেখক, সাধারণ গ্রামবাসীদের সমস্ত সংকট থেকে মুক্তিলাভের একটি পথনির্দেশ করেছেন, সরকারি সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এমনকি ব্যক্তিগত সমস্যা ও দ্বন্দ্ব ভুলে তাদের বাঁচার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছে সে পরমাত্মীয়ের মত।

তবে বিংশশতকের প্রথম থেকেই মুসলিম সমাজে বিয়ের ব্যাপারে নারী কিছুটা হলেও নিজস্বতা বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে। তাই ভাটোরার সুন্দরী কন্যা দিলজান, ভালোবাসার মানুষ বিলালকে বিয়ে করে। তার মত সুন্দরী রমণীর অনায়াসে যেকোন স্বচ্ছল পরিবারে বিয়ে হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। তবে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাসকারী বিলালই তার মনের মানুষ। পরস্পরের সান্নিধ্যে থেকেই তারা জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে, প্রেমের শক্তিতে জয় করায় প্রত্যয়ী। তাই সামান্য আশ্রয়টুকু সারাতে না পারায় ও মুদির দোকানে মাত্র একশো ত্রিশ টাকা দেনার ভয়ে, তারা মালিয়া গ্রাম ছেড়ে, বাগনান স্টেশনে আশ্রয় নেয় হাসিমুখে। স্টেশনের পাকা মেঝেতে আশ্রয় পেলেও, সেখানে প্রতিরাতে সুন্দরী অল্পবয়সী দিলজানকে, গজা পুলিশের কুদৃষ্টি ও কুপ্রস্তাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। বেঁচে থাকার এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও বিলালের প্রতি তার কোন অনুযোগ বা অভিযোগ শোনা যায় না। এমনকি বিলাল যেহেতু রোজ ভোরবেলায় উঠে মাছের আড়তে মোট বয়, তাই স্বামীর নিশ্চিত ঘুমের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে, সে বিলালের কাছে ভজা পুলিশের কথাও গোপন রাখে। প্রকৃত সহধর্মিণীর মতোই দিলজান, নিজের সমস্যা ও সাধ-আহ্লাদের কথা গোপন করে, বিলালের সার্বিক স্বস্তির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। স্বজন ও ঘরছাড়া স্বামীর জীবনকে, নিজের সমস্যা ও সংকটের কথায় আরও বেশি করে ভারাক্রান্ত করতে সে চায় না। দিলজানের এই বৈশিষ্ট্য তাকে অনন্য করে, রূপবতী করে, যা শত অবহেলা ও অযত্নেও ঢাকা পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গ্রামের সহজ, সরল মেয়ে দিলজান গান ও গল্প শোনার লোভে হয়তো ভজা পুলিশের ফাঁদে খুব সহজেই পড়ে যেত। কিন্তু স্টেশনে আশ্রিতা এক বুড়ির সতর্কতায় সে সাবধান হয়। স্টেশনের অবাঞ্ছিত আশ্রিতা দিলজানের পক্ষে, একজন পুলিশের কুপ্রস্তাবের সঙ্গে একাকী সংগ্রাম করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু লাগাতার ঝড়বৃষ্টিতে স্টেশনে যাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ায়, দিলজানের সংকট আরও ঘনীভূত হয়। আর এই ঝড়বৃষ্টির মাঝেই 'সে নিখোঁজ মানুষটা' আবিদ ওরফে সাহেবমামার আগমনে দিলজান সংকটমুক্তির আশায় আনন্দিত হয়। কারণ মালিয়ার অন্যান্যদের মতো দিলজানও বিশ্বাস করে, 'সাহেবমামা ওরফে আবিদ আলি আশ্চর্য মানুষ।'[১] সে নিজের 'মুসকিল আসান' এর পথ খুঁজে পায়। যদিও নিজেদের জীবনের সংকটময় পরিস্থিতির কথায়, বুদ্ধিমতি দিলজান আবিদকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চায় নি। আবিদের মত মানি মানুষ তাদের পাশে আশ্রয় নেওয়ায় সে নিজেকে ধন্য মনে করে। আবিদের ক্ষুধানিবৃত্তির ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত হয়। এর মাঝেই আবার সে জুলেখার বিষয়ে আবিদকে প্রশ্ন করে, জুলেখার ভালোবাসার বিষয়ে সচেতন করে, আবিদের বর্তমান সংসারজীবন সম্পর্কে নারীসুলভ কৌতূহলও প্রকাশ করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভজা পুলিশের আগমনজনিত ভয় সে আবিদের কাছে গোপন করতে পারে না। আবার আবিদের উদ্যোগে যখন ভজা পুলিশ, বড়বাবুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখনও দিলজানের ভাল লাগে না।

প্রকৃতপক্ষে দিলজানের মত সহজ সরল, শান্তিপ্রিয় মেয়েরা শুধু ভালবাসতে জানে, শান্তিকল্যাণে থাকতে পছন্দ করে। তাকে কেন্দ্র করে কোনরূপ অশান্তি তাদের কাম্য নয়। তাই বেপরোয়া ভজাকে 'মারের ঘটনায় আঁতকে উঠেছিল দিলজান। তাকে ফিরিয়ে আনে আবিদ। নিজের জায়গাটিতে এসে ভয়ে কাঁপছিল দিলজান। চোখ তার বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। বিলালের ঘুম ভাঙেনি। তেমনি অকাতরে ঘুমোচ্ছিল।

আবিদ দিলজানকে শুইয়ে দেয়। ঘুমিয়ে যেতে বলে। ঘটনার অভিঘাত তার মনে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে। এখনও সে থরথর করে কাঁপছে। কথা বলতে পারছে না। মুখ থেকে অদ্ভুত অব্যক্ত শব্দ বেরচ্ছে।'[২]

স্বাভাবিকভাবেই স্টেশনের এক আত্মপরিচয়হীন সংকটময় জীবন থেকে, আবিদের সহযোগিতায় গ্রামে ফেরার আনন্দে দিলজান উচ্ছ্বসিত হয়। গ্রামের সামান্য পুকুরঘাটের পাথর

থেকে শুরু করে স্যাকরা বৌদি, আবীর ও জাভেদ পাগলাকে না দেখার তাড়না থেকে মুক্তি পেয়ে, সারিয়ে তোলা নিজের ঘরে আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার আনন্দে, দিলজান অনেকদিন পর নিশ্চিত সুখস্বপ্নে বিভোর হয়। দাম্পত্যের মাধুর্যে ভরে দেয় তারা সেখানকার আকাশ-বাতাস। তাই আবিদের প্রতি দিলজানের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাছাড়া আবিদ শুধুমাত্র তাদের ভাঙা ঘরই সারিয়ে তোলেনি, তাদের মুদির দোকানের দেনা শোধ করে, বাজার করে দেয়, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক নিয়ে আসে। এমনকি পঞ্চায়েত অফিসে উপযুক্ত পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে, বিলাল ও আলালের মত গ্রামের গরিব মানুষদের একশো দিনের কাজ পাইয়ে দেয়। পাশাপাশি চার বছর পরে গ্রামে ফিরে এসে আবিদ, মালিয়া গ্রামের দরিদ্র ও পশ্চাদপদ মানুষকে সরকারি অনুদান সম্পর্কেও সচেতন করে, 'উন্নয়ন কত দিক থেকে হতে পারে। রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ কত কি গ্রাম উন্নয়নের এক্তিয়ারে। স্কুল, বয়স্কশিক্ষা, স্বাস্থ্য, কী নেই? শৌচাগার, স্বনির্ভর প্রকল্প, বয়স্কভাতা কত কী।'[৩] তাই আবিদের আগমনে গ্রামবাসীর জীবনে সুখ আসে, আনন্দে মুখরিত হয়ে, 'কোনো বউড়ি সেই সুখে পড়শিকে দু কুনকে চাল ধার দিয়ে দেয়। কেউ একবাটি কচি আমড়ার টক দিয়ে আসে প্রতিবেশীকে। কেই বাসি করা শাড়ির পাট ভেঙে পরে। কোনো পুরুষ দু হাতা ভাত বেশি খেয়ে নেয়। কোনো বউ দুবার নুন দিয়ে তরকারিতে নিজের বোকামির কথা ভেবে হাসে। কেউ কেউ বারবার বিড়ি ধরায়। মুদি দোকানি পুনর্বার ধারে সওদা দিয়ে বসে খদ্দেরকে।

বউ ঝিরা কপালের টিপ কোথায় কোন্ দেওয়ালে, কোন্ ক্যালেন্ডারে এঁটে রেখেছে, দেখে নেয়, সেগুলো যে প্রয়োজনে লাগবে, তার আসন্ন বাস্তবতায় এসব করে।'[৪]

এতদসত্ত্বেও আবিদকে সবসময় একটা অপরাধবোধ তাড়া করে। সে তার একসময়ের বাগদত্তা জুলেখার কাছে অপরাধী। 'জুলেখার সঙ্গে প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠান পানচিনি' হওয়ার পরেও, বিবাহের চারদিন আগে আবিদ নিখোঁজ হয়। একজন নারীর জীবনে এই সংকট যে কতটা ভয়াবহ তা বলাই বাহুল্য। উপরন্তু সেই নিখোঁজ হবু স্বামী যদি নারীটির মনের মানুষ হয়, তাহলে তো কথায় নেই। আবিদের নিখোঁজ হওয়ায়, তারই মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে জুলেখার বিয়ে হয়। তিন মাসের একটি খোকাও আসে তার জীবনে। সেই মনের মানুষ আবিদের নিখোঁজ হওয়ার চার বছর পর মালিয়া গ্রামে ফিরে আসা যে সবচেয়ে বেশি জুলেখাকে প্রভাবিত

করবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। লেখক আফসার আমেদ জুলেখার এই গভীর মানসিক সংকটের একটি বাস্তবসম্মত চিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের কাহিনি অংশে দেখা যায় যে, কিশোর আবিদ সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করে। শহরের একদল মানুষ রূপনারায়ণ নদে পিকনিকে আসে। তাদের একটি পাঁচ বছরের বাচ্চাছেলে হঠাৎ নৌকা থেকে নদীতে পড়ে জোয়ারের জলে ভেসে যায়। এইসময় সনাতন মাঝির সাগরিদ আবিদ, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটিকে বাঁচায়। তার এই বীরত্বের কাহিনি টিভি, খবরের কাগজ থেকে শুরু করে মালিয়া গ্রাম পার্শ্ববর্তী পাঁচ-দশটি গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সূত্রেই আবিদের প্রতি জুলেখার মনে প্রেম জাগে। একদিন ফ্রকপরা জুলেখা নদীর ঘাটে আবিদকে দেখে, এরপরেও 'হাটে বাজারে দেখা হত তাদের। রাস্তা ঘাটেও। অছিলায় বাপ চাচাদের সঙ্গে এসে কথা বলত বাড়িতে। শাড়ি পড়ার পর একদম বিয়ের প্রস্তাব। আবিদ তখন যুবক। অদ্ভুত ভালো লাগা ছিল, এখনও আছে, কখনো কোনোদিন ভুলতে পারবে না জুলেখা। এক ঘুমের পর আলালের পাশে শুয়ে মনে পড়ে যায়। নৌকো নদী দেখলে মনে পড়ে। পাখি দেখলে মনে পড়ে।'[৫]

বিয়ের মাত্র চারদিন আগে আবিদ কেন নিখোঁজ হয়, এই প্রশ্নের উত্তর গ্রামের অন্য সকলের মতই বারবার জুলেখাও খোঁজার চেষ্টা করে। সতেরো-আঠার বছরের শিক্ষিতা ও সুন্দরী জুলেখা বিয়ের পাত্রী রূপে খুবই আকর্ষণীয়। তার দরিদ্র ও অশিক্ষিত স্বামী আলালের ভাবনায় বারবার এই সত্য প্রকাশিত। নিজের ভালবাসা ও যত্নে সে জুলেখার জীবনকে ভরিয়ে তোলার সার্বিক চেষ্টা করেও ভাবে, জুলেখার মত নারী আবিদেরই উপযুক্ত। অবশ্য লেখক দেখিয়েছেন, আলালের সংসারে জুলেখার কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু আবিদের ফিরে আসায়, জুলেখার মনের গভীরে থাকা প্রেমবোধ নতুন করে তাকে তাড়িত করে। যে প্রেমবোধ থেকে সে একসময় রুমালে আবিদের নামে ফুল তুলেছিল, সখী সোনামণির কাছে যন্ত্রণাকাতর অশ্রু ঝরিয়েছিল। আলালের স্ত্রী জুলেখা জানে, পরপুরুষ আবিদের জন্য তার এই তাড়না সংসারের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তাই 'তার কোনো গোপন বাসনার কথা কেউ জানবে না। বিয়ে যে মানুষটার সঙ্গে হয়নি তা নিয়ে লোকমানসে কোনো ক্ষান্তি, কোনো অতৃপ্তি জানাবে না সে। তাহলে তা গুনাহ্ হয়। আলালের প্রতি অবিচার করা হয়। খোকার প্রতিও।'[৬] তাই সে আবিদের

সঙ্গে দেখা করতে আসে, ছেলের জন্য আশীর্বাদ নেওয়ার নামে। তার মনের সমস্ত আকুলতা ও বেদনাকে গোপন করে, বাইরে থেকে শান্ত ও সংযত থাকার চেষ্টা করে। যদিও "ভেতরে ভেতরে জুলেখা খুব একটা ভালো নেই। সন্ধ্যায় তার এই অভিসার সে সমাজকে জানতে দেয় না, তাকে লুকিয়ে রাখে। কত বয়স আর তার এখন? একুশ। আলালটা বেশ ভালো। তাকে নিয়ে চলেছে পরিষ্কার মন নিয়ে। কোনো কদর্যতার ভাবনা তার মনকে ছোঁয়নি।'[৭] রাতের অন্ধকারে তিন কিমি হেঁটে এসেও, সেই নিখোঁজ মানুষটার সাক্ষাৎ পায় না সে। তাতে 'ব্যথিত মন আরো ব্যথিত হল জুলেখার'। কিন্তু তার মনের সমস্ত 'খেদ আর কষ্ট' গোপন করে দিলজানের সঙ্গে সই পাতায় এবং আবিদকে 'দাওয়াত' দিয়ে যায়। আবার দিনের পর দিন আবিদের অপেক্ষারত জুলেখা যখন কেঁদে ফেলে, তখন সেই কান্নার কারণ হিসেবে সে আলালকে বলে মা-বাবা ও দাদিদের জন্য মন খারাপের কথা। সামাজিক ও সাংসারিক প্রয়োজনে জুলেখা, এইভাবেই আলালের কাছে নিজেকে 'নির্দোষ' রাখে।

অন্যদিকে আবিদও মালিয়া গ্রাম সংলগ্ন পাঁচ-দশটি গ্রামের মানুষের নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেও, জুলেখাকে উপেক্ষা করে। এই ব্যাপারে গ্রামবাসীর কৌতূহলও কম নয়। অন্যের স্ত্রী জুলেখার কথাকে আবিদ সামাজিক প্রয়োজনে ইচ্ছে করেই সরিয়ে রাখে। তাছাড়া সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত আবিদ, জুলেখার সামনে দাঁড়াবার সাহস পায় না। জুলেখার প্রতি কৃত অন্যায়ের জন্য সে নিজেকে বারবার অপরাধী ভাবে। সে জুলেখার সই সোনামনির কাছে একথা স্বীকারও করে। এমনকি এই অপরাধের জায়গা থেকেই সে স্ত্রী নাজিমার প্রতি কর্তব্যপালনে প্রত্যয়ী। তবে জুলেখা মনে মনে আবিদের অপেক্ষা করে। আবিদের অপেক্ষায় অস্থির জুলেখার অবুঝ মন নানান স্বপ্ন সাজায়। তার সাংসারিক কাজে অনেক সময় ভুলও হয়। কিন্তু 'মনের ঘরের হুটোপাটি'র মাঝেও সে তার ভালোমানুষ স্বামী আলালকে অমর্যাদা করতে চায় না। আবার আলাল জুলেখার মনের বিভ্রান্তি ধরতে পেরেও, আবিদের প্রসঙ্গ তুলে জুলেখার মন তথা জীবনকে আক্রান্ত বা ব্যথিত না করে, তাকে ভালোবাসা ও যত্নে শান্ত করে। এমনকি আবিদকে কেন্দ্র করে জুলেখার মনে যে অস্থিরতা ও শূন্যতা তৈরি হয়, আলাল তার ভালোবাসা ও সান্নিধ্যে তা ভরিয়ে তোলায় প্রয়াসী। রাতের অন্ধকারে, নিখোঁজ মানুষের ডাক শুনে জুলেখা যখন বেরিয়ে পরে, তখনও সহানুভূতির সঙ্গে তার মনের ভুল ভাঙিয়ে দেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর সুখী দাম্পত্যজীবনের এই পরিবর্তিত ধারাকে লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও জুলেখা সবসময় তার অনুভূতি ও ভাবনার সঙ্গী করতে পারে না আলালকে। তাই আলালের পাশে শুয়েও 'কোনো সাড়া দেয় না জুলেখা। ঘুমিয়ে থাকার ভান করে পড়ে থাকে। কিছুতেই আর ঘুম আসছে না তার। সেই সম্পর্কের মায়া যে জাগিয়ে তুলছে। জেগে উঠছে নিজেও। এই সম্পর্কের জাগরণ তাকে আনন্দ দিচ্ছে, মারছেও বেদনায়। বেদনার চেয়ে আনন্দ অনেক বেশি। খোকাকে পেয়েছে, আলালকে পেয়েছে। একভাবে পাচ্ছে বোধহয় আবিদকেও। কোনো এক সময়ে নিখোঁজ মানুষটা তার সঙ্গে দেখা করে যাবে, যাবেই। তারই সজ্জায় সে সারাক্ষণ থাকে। তারই সজ্জায় তার সংসারে কত তার ভুল হয়। খোকার কাঁথাকানি শুকিয়ে গেলেও তুলতে ভুল হয়। রান্না পুড়ে যায়, ভাত গেলো হয়ে যায়।'[৮] বরং জুলেখার এই অনুভূতির সঙ্গী হয় ছেলেবেলার সই সোনামণি। আবিদের কথাপ্রসঙ্গে সে সইয়ের হাত ধরে কাঁদতেও পারে।

তবে একথা সত্য যে, জুলেখার মনে আবিদের জন্য একটি চিরস্থায়ী জায়গা থাকলেও, আলালের প্রতিও তার ভালোবাসা স্পষ্ট। আলালের মতো সহজ ও সুন্দর মনের মানুষকে না ভালোবেসে থাকতে পারে না সে। তাই স্বামী পরিত্যক্তা সখিনার সঙ্গে আলালের আলাপচারিতায় সে ক্ষুণ্ণ হয়। যদিও সখিনা আলালের বন্ধু রিয়াজের বোন। সে তার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার সমাধান করার জন্যই আলালের কাছে আসে। কিন্তু একজন সোমত্ত মেয়েকে আলালের সঙ্গে গল্প করতে দেখে জুলেখার মন খারাপ হয়, 'ভেতরে ভেতরে কান্না পায় জুলেখার। মন কাঁদেও। সংসারের এই নিষ্ঠুরতা সয়।'[৯] তাদের 'বিষম এই দৃশ্যে' রেখেই সে ছেলেকে নিয়ে পোলিও সেন্টারে যেতে বাধ্য হয়। এই যাত্রাপথে, আবিদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও সে মনে মনে লালন করে। অথচ তার নিজের রচিত এই 'অভিসার'ও ব্যর্থ হয়। কারণ আবিদের সঙ্গে তার 'দেখা হল না, কথা হল না। তার অভিসার নিবৃত্ত হল না। একথা কাউকে বলা যাবে না। কাউকে বলে কেঁদে হালকা হবে না। হয়তো সারাজীবন বয়ে বেড়াবে। সারাজীবন কি? জানে না। কিছুই জানে না। তাকে বিয়ে না করে, বিয়ের চারদিন আগে পালিয়ে যায় আবিদ আলি। চার বছর পর সেই আবিদ আলি এসেছে। সবার সঙ্গে দেখা হয়, তার সঙ্গে আর দেখা হয় না। দেখা হওয়ার সম্ভাব্য যাত্রায় গেলেও দেখা হয় না। কেন দেখা হয় না? কিছুই জানে না জুলেখা। এইটুকু শুধু সে জানে, সেই বিরহ যন্ত্রণা নিয়ে সে ফিরছে, তার নিবৃত্তি হয়নি। সে সংসারে ফিরে একরকম থাকবে। আর একরকম তার জীবনযাপন। সেখানে সে মিহি ও মোটা

বেদনার হিসেব জানে।’[১০] তার এই বেদনা জনমুখে আবিদের বহু প্রশংসাসূচক গল্প শুনে ও ‘পথমুখো’ সহপাঠী মধুমিতার কাছে আবিদের সঙ্গে তার প্রেমের গল্পের মধ্য দিয়ে আরও বেশি ঘনীভূত হয়। তাই ‘বাড়ির কাছে ফিরে এসে বেদনায় ভেঙে পড়ল সে। সখিনা এখনো যায়নি। আলাল মইয়ে চড়ে দেওয়ালে কাদার প্রলেপ দিচ্ছে, আর নীচে দাঁড়িয়ে সখিনা কথা বলেই চলেছে।

খোকাকে নিয়ে দৌড়ে ঘরে চলে যায় জুলেখা। শুইয়ে দেয় বিছানায় ঘুমন্ত খোকাকে। আর দরজায় খিল দিয়ে হু হু করে কেঁদে ওঠে।’[১১] নিজের ঘর-সংসারে জুলেখাদের আর একজন পুরুষের জন্য দরজায় খিল দিয়ে কাঁদা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এমনকি তাদের জন্য আবিদের পাঠানো জিনিসপত্র দিয়ে, বিলাল যখন প্রথম তাকে আবিদের নিখোঁজ হওয়ার কথা বলে, তখনো সে নিজেকে শান্ত ও সংযত রাখে। তবে নারীর মনের উপর প্রেমিক, স্বামী বা সংসার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। তাই আবিদের সঙ্গলাভের সুখস্বপ্নে সে মনে মনে হারিয়ে যায় কল্পনার কাঙ্ক্ষিত জগতে, ‘জুলেখা এখন জানালার কাছে দাঁড়ায়। তারপর ফিরে আসে বিছানার কাছে। খেলনাপাতির ভেতর খোকা পা ছুড়ে খেলছে। ঠোঁটে হাসি তুলে আনে খোকার জন্য। তারপর বেরিয়ে আসে উঠোনে। খুঁটিতে হাত দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারো জন্য অপেক্ষায় থাকে যেন। নদীর ঘাট উঠে আসে মনে। নৌকো নিয়ে ঘাটের দিকে আসছে লোকটা। তারপর উঠে এল তার মুখোমুখি। ধরল তার হাতটা।’[১২] তবে তার শিশুর কান্না তাকে বাস্তবতার কঠিন মাটিতে টেনে আনে। মূলত জুলেখার এই অতৃপ্তি, প্রিয়মানুষকে না পাওয়ার যন্ত্রণা আধুনিক জীবনেরই লক্ষণ। তবে একথাও সত্য যে, জুলেখা তার ভালোবাসার মানুষকে না পেলেও, ভালরাখার মানুষ পেয়েছে। আলাল তাকে সবসময় ভাল রাখার চেষ্টা করে। সমাজে নর-নারীর সম্পর্কের এই বোঝাপড়া অত্যন্ত জরুরী। তাতে একজন নারীর জীবনের চলার পথ অনেকটাই সহজ হয়। আর এইভাবেই মনের অপরিসীম বেদনাকে গোপন করে, এই সময়ের নারী, নিজেকে নির্দোষ রাখে সংসার, স্বামী ও সন্তানের কাছে, একজন সামাজিক মানুষ রূপে, এই সমাজসত্যই লেখক এখানে রূপায়িত করেছেন।

ভ্যানচালক নিমাই মোল্লা ও তার স্ত্রী ফতেমার মধ্য দিয়ে লেখক গ্রামবাংলার সুখী দাম্পত্যের একটি পরিচিত চিত্রকে স্পষ্ট করেছেন। অতিথি আবিদের কাছে, নিমাই মোল্লা তার

স্ত্রী ফতেমার যে দুটো ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বিচার চেয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাতে তার ক্রোধ নয়, ভালোবাসাই প্রকাশিত। এখানে ফতেমা আবিদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতে পারে, হাসি ঠাট্টায় যোগ দিতে পারে। সে তার দরিদ্র অন্তঃপুরে বন্দিনী নয়, রানী হয়ে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম নারীর জীবনে এই পরিবর্তন আসে। যেখানে ফতেমাদের প্রতিনিয়ত তালাক বা বহুবিবাহের মতো সংকটের ভাবনায় ক্ষতবিক্ষত হতে হয় না, স্বামীর অত্যাচারে সংসারে তাদের সারাক্ষণ কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে হয় না। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও, ভালোবাসায় তারা নিজেকে ভরিয়ে রাখে। তাই চরম দারিদ্র্যের মাঝেও ফতিমার হাসিটা থাকে অমলিন।

লেখক আফসার আমেদ এই উপন্যাসে রোশেনারার সুখী দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়ে এইরকমই আর একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায় যে, একসময় আবিদের বাবা ও রোশেনারার বাবা, উপযুক্ত বয়সে আবিদ ও রোশেনারাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য পরস্পরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আবহমানকাল থেকে চলে আসা এই রীতি গ্রামবাংলায় অতি পরিচিত। একসময় অভিভাবকের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় চেষ্টায়, সন্তানের জীবনে নানান সমস্যা ও সংকট নেমে আসার ঘটনাও বিরল নয়। সেখানে সন্তানের চেয়ে বড় হয়ে উঠত পিতার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের প্রতিশ্রুতির মূল্য স্বাভাবিকভাবেই হারিয়ে যায়। রোশেনারার বিয়ে হয় দরিদ্র ফেরিওয়ালা কাশেমের সঙ্গে। আবিদের সঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গ ছেলেবেলায় রোশেনারাকে খুব বিব্রত করত। আবিদকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ভয় ও লজ্জা তাকে তাড়িত করায় সে সবসময় আবিদকে উপেক্ষা করে চলত। কাশেমের স্ত্রী রোশেনারা আজ অনেক বেশি পরিণত। তাদের মত গরিবের বাড়িতে আবিদের আতিথ্যগ্রহণে সে তৃপ্ত, ‘রোশেনারা চা বানায়, রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর মাঝে মাঝে দেখা করে যায়। কী সৌভাগ্য তাদের, তাদের দোরে এমন মানুষ এসেছে। যার সুখ্যাতি আট-দশটা গ্রামে। হাসি ঠাট্টায় আড্ডার সময় কাটে। রোশেনারার প্রতিবেশী আত্মীয়েরা আবিদের জন্য নানা খাবার দিয়ে যায়। নানা তরকারিও। একটি বাচ্চা মেয়ে নেচে দেখালো। কেউ আবৃত্তি করে শোনাল।’[১৩] বাচ্চা মেয়েদের নাচ ও আবৃত্তি করা, গ্রামীণ মুসলিম সমাজের এই পরিবর্তনও এখানে লক্ষনীয়। এই পরিবর্তন আরও বেশি স্পষ্ট হয়, রোশেনারার ছেলে শরিফুলের ক্লাস নাইনে পড়া প্রসঙ্গে।

তাছাড়া একসময় যে পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, তার সঙ্গে রোশেনারার আত্মীয়সুলভ আচরণও পরিবর্তিত সময়েরই কথা বলে। স্বামী কাশেমের পাশে বসেই সে আবিদের প্রতি 'অভিমান ও প্রেমবোধের' জায়গা থেকে, তাকে পুনরায় হারাবার যন্ত্রণা থেকে আজ আয়েস করে কাঁদলেও, তার কোন অপরাধ হয় না। আবিদের মত এতো ভালোমানুষ কখনোই কোনো অপরাধ করতে পারে না বলে রোশেনারার বিশ্বাস। তাই বিয়ের চারদিন আগে, জুলেখাকে ছেড়ে আবিদের নিখোঁজ হওয়ার পেছনে, সে 'তাবিজের' কারসাজি অনুসন্ধান করে। গ্রামের সহজ, সরল ও অশিক্ষিত মেয়েরা অনেকসময় মানুষের অপ্রত্যাশিত আচরণের পেছনে অলৌকিক শক্তির উপস্থিতিকে বিশ্বাস করে। আফসার আমেদ রোশেনারার মধ্য দিয়ে, মুসলিম নারীর এই চিরাচরিত ভাবনাকেও স্পর্শ করেছেন। যেখানে শত অভাবের মধ্যেও, স্বামীর ভালোবাসা, আত্মীয় ও প্রতিবেশীর আন্তরিকতা রোশানারার জীবনের সরল পথকে আনন্দঘন করে তোলে।

এই উপন্যাসে লেখক আবিদের চাচির মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার দরিদ্র পরিবারের গৃহিণীর একটি বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন। বন্যায় মাটির ঘর চাপা পড়ে, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে আবিদ মা-বাবাকে হারায়। চাচার বাড়িতে থাকায় আবিদ সেদিন প্রাণে বাঁচলেও, অযত্ন ও অবহেলাকে সঙ্গী করেই সে বড় হতে থাকে। চাচি নিজের সন্তানদের ঠিকমতো খাবার জোগাতে পারতো না। তাই আবিদ ছিল তার সংসারে বোঝা স্বরূপ। তাই একসময় চাচি আবিদকে চরম অবহেলা ও উপেক্ষা দেখিয়েছে। অনাথ আবিদের কেউ খোঁজ বা যত্ন করার ছিল না। আবিদের বারবার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে এটাও একটা বড় কারণ। আবিদ চার বছর পর ফিরে এসে যখন চাচাদের অর্থসাহায্য করে, চাচি ও ভাবিদের জন্য শাড়ি নিয়ে আসে, তখন আবিদের এই আন্তরিকতায় চাচি অনুতপ্ত হয়। আবিদের কাছে সেই অবহেলা দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করে। দরিদ্র চাচির সংসারে আবিদ অবাঞ্ছিত মূলত অভাবের জন্য। সমাজবাস্তবতার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অভাবের সংসার না হলেও, একজন অনাথ ভাইপো কখনোই চাচা-চাচির সংসারে সাদরে সমাদৃত হয় না। লেখক আফসার আমেদ এখানে এই সমাজসত্যকেও স্পর্শ করেছেন।

মৃত্যুপথযাত্রী অসহায় বৃদ্ধা সবুরনের জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক, দারিদ্র্যপীড়িত সমাজের আর এক সত্যকে রূপায়িত করেছেন এই উপন্যাসে। নিঃসন্তান সবুরন একসময় অনাথ আবিদকে সন্তানসম স্নেহ ও যত্নে তৃপ্ত করেছিল। অল্পবয়সীবিধবা সবুরন একসময় নিজের পরিশ্রমে ও প্রতিবেশীদের সান্নিধ্যে একরকমভাবে জীবন অতিবাহিত করলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বজনহারা এই রমণীর শেষবয়সের সঙ্গী হয় তার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নী। কিন্তু নাতির অসুস্থতার খবর শুনে সেও দুদিন আগে চলে। গ্রামবাসীর অজান্তে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাবে সবুরনের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। জীবনসংকটের মধ্যেও আবিদের মা ডাক শুনে মুমূর্ষু 'সবুরনের চোখে হাসি, আনন্দ' ফুটে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সবুরনের জীবনের কাছে দাবী খুবই সীমিত। চরম দারিদ্র্য, অবহেলা ও একাকীত্বের মাঝেও একটি মাতৃসম্বোধনেই সে মরণকে হাসিমুখে বরণ করে। জীবনের কাছে তার যেন আর কিছু চাওয়ার নেই। সাধারণত গ্রামীণসংস্কৃতিতে মানুষের জীবনের এই কঠিন সময়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা পাশে দাঁড়ায়। অথচ তাদের অজান্তেই সবুরনের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর একমাত্র সাক্ষী হয় আবিদ। অবশ্য তার শেষযাত্রা ও সৎকারের ব্যবস্থাপনায় গ্রামবাসীদের আন্তরিক সহযোগিতা এই উপন্যাসে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

পশ্চিমবঙ্গে এস.এস.সি. শুরু হওয়ার পর, মুসলিম সমাজের অনেকেই উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা স্কুলে চাকরি পাওয়ার জন্য এই পরীক্ষায় বসতে থাকে। এক্ষেত্রে সকলেই যে চাকরি পায়, তা কিন্তু নয়। ফলে এই সময় সমাজে একজন শিক্ষিত বেকার পাত্রের চেয়ে, একজন অল্পশিক্ষিত চাকরিরত পাত্র মেয়ের বাবার কাছে অনেক বেশি কাম্য হয়ে ওঠে। সেই চাকরি যতই ছোট হোক না কেন। তাই সফুরার বাবা শরিফুলের পছন্দের পাত্র এস এস সি পরীক্ষার্থী, উচ্চশিক্ষিত বেকারযুবক ছোট্টু নয়, কোলকাতার এক বড় বিল্ডিঙের লিফটম্যানের সঙ্গেই সে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে। যদিও সফুরা ছোট্টুকে ভালোবাসে। আধুনিক যুগের নারী সফুরা তাই পছন্দের পাত্রকে পাওয়ার জন্য, বিয়ের আগের রাতে বাড়ি ছাড়ার মত কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। বিয়ের আয়োজন, বাবা-মা ও পরিবারের সম্মান তার ভালোবাসার কাছে হেরে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, নিজের মত করে বাঁচার, পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার দৃঢ়তা আজকের নারী অর্জন করেছে। বাবা-মা নিজস্ব মতামত সবসময় জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। বিয়ের ব্যাপারে মুসলিম ধর্মে নারীকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে,

সফুরা তার সদ্ব্যবহার করেছে মাত্র। তাই শেষপর্যন্ত আবিদের সহযোগিতা ও উদ্যোগে ছোট্টুর সঙ্গেই সফুরার বিয়ে হয়, বাড়ির সকলের আশীর্বাদ ও আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে আবিদের যে ভালোবাসা থেকে জুলেখা বঞ্চিত, সেই অপরাধবোধের তাড়না থেকেই মনের মানুষের সঙ্গে সফুরার বিয়ের সমস্ত উদ্যোগ করে আবিদ। কারণ 'সেই ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে চায় আবিদ। জনমানসে, জনপদে, নদীর ঘাটে, বটঅশ্বত্থের ছায়ায়, বেঁচে থাকার অনুভূতির প্রাণতায়। এই বেশ। একটা কিছু করা গেল। রাতে ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখতে পারবে।'[১৪]

মূলত এই ভালোবাসা জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসার কথাই বলে 'সেই নিখোঁজ মানুষটা'। এই ভালোবাসার মন্ত্রে নিমাই ডাক্তারের জীবন সুখে পরিপূর্ণ হয়। সুখে থাকার জন্য আবিদ এই ভালোবাসার মন্ত্র শেখায় অধীর মাস্টারকে। এই ভালোবাসার মন্ত্রে মুকুন্দ ও মালতী সমাজে প্রচলিত ট্যাবুকে ভাঙে। তাদের কাকা-ভাইজির প্রেম সমাজবিরুদ্ধ হলেও, ভালোবাসার মন্ত্রে তারা সমাজের সমস্ত অবহেলা, ঘৃণা ও অভিশাপকে উপেক্ষা করার শক্তি পায়। তাদের এই অসম সাহসের উপর ভর করে, জীবনের স্বপ্নপূরণ সমাজের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, যা পরিবর্তিত সময়ের আখ্যান। এই উপন্যাসে মৌলবাদের দাপট থেকে সাধারণ মানুষ মুক্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমজের চোখরাঙানিও এখানে অনুপস্থিত। দিলজানের গর্ভে সন্তান না আসার জন্য, বিলাল দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবে না, বরং দিলজানকে নিয়ে সাগরের কাছে কোনো গ্রামে যাওয়ার কথা বলে, 'ঘুটিয়ারি শরিফে' মানতের কথা বলে। অন্যদিকে আবার স্বামী পরিত্যক্তা বোন সখিনা ও বৃদ্ধা মায়ের, রিয়াজের সংসারে বোঝা হয়ে ওঠাও কিন্তু আধুনিক সমাজবাস্তবতার একটি বড় লক্ষণ। সার্বিকভাবে বলা যায় যে, অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' উপন্যাসটি আফসার আমেদের কাঙ্ক্ষিত রূপকথার আশ্চর্য নায়কের আখ্যান। যে নায়ক সাধারণ মানুষের জীবনে ভালোবাসার বীজমন্ত্র রোপণ করে, সুন্দরভাবে বাঁচার মন্ত্র শেখায় ও আধুনিকতার সমস্তদিক থেকে সচেতন করে এক সুন্দর সমাজজীবন গড়ে তুলতে পারে।

## উৎসনির্দেশ:

১. আফসার আমেদ, *সেই নিখোঁজ মানুষটা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৫

২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৪

৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩১

৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৬

৫. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩২

৬. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩১

৭. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩২

৮. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪৫

৯. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা —৮১

১০. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮২-৮৩

১১. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৩

১২. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৮

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৬

১৪. তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৭৭

# ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

# আফসার আমেদের সমসাময়িক অন্যান্য কথাসাহিত্যকারদের রচনায় মুসলিম নারীর জীবন

বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা হয় মূলত প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'(১৯৫৮) দিয়ে। যদিও 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস কিনা এ নিয়ে বাংলাসাহিত্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে, যা স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবন। 'আলালের ঘরের দুলাল'এ আমরা ঠকচাচা ও ঠকচাচিকে পাই। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অনেকটাই বিকৃত করা হয়েছে। একথা স্বীকৃত যে, এই ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিকৃত ইতিহাস থেকেই, সাহিত্যে বর্ণশ্রেষ্ঠরা অনেকসময় মুসলিমদের হেয় করে থাকেন। 'আলালের ঘরের দুলাল'ও এর ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া মুসলিমদের আর্থসামাজিক অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ব্রিটিশভারতে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখায়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা বর্ণশ্রেষ্ঠদের তুলনায় প্রায় একশো বছর পিছিয়ে পড়ে। খুব ধীরগতিতে ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষার প্রতি এগিয়ে আসে। কিন্তু দেশভাগে তথাকথিত শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক ও অর্থশালী মুসলিম জনসমাজ পূর্বপাকিস্থানে চলে যায়। এদেশে পড়ে থাকে মূলত অশিক্ষিত, পশ্চাদপদ, দরিদ্র ও গ্রামীণ অন্ধকারাচ্ছন্ন মুসলিম জনসমাজ, প্রায় ব্রাত্য হয়ে। বেশিরভাগ বর্ণশ্রেষ্ঠদের চোখে যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী শ্রমজীবী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িক, অপরাধপ্রবণ এবং অপর। বাংলা কথাসাহিত্যেও তাদের এই রূপই প্রকাশিত। বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আমরা যে সমস্ত মুসলিম নর-নারীর পরিচয় পাই, তারা প্রায় সকলেই পাঠকের মনে পক্ষান্তরে মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া ঠকচাচা থেকে শুরু করে জেবউন্নিসা পর্যন্ত যে সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত, তারা কেউই বাঙালি মুসলিম জনসমাজের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করে না। বাঙালির জনসমাজের একটি বৃহত্তর অংশই তখন

থাকে অন্ধকারে। ফলে সাহিত্যিক আবুল ফজলকে লেখা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠিকে অনুসরণ করে, এদেশের বাংলা কথাসাহিত্যকে আমরা আধখানা চাঁদের আলোর সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

প্রকৃতপক্ষে কথাসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায়, আলালের ঠকচাচি অনেকটা বাস্তবানুগ নারীচরিত্র হলেও, ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এর রাজকন্যা জহীরা ও রোশেনারার জীবন-দর্শন ও চাওয়া-পাওয়া সাধারণ মুসলিম নারীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একইরকমভাবে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনীর' আয়েষা, 'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবি, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দলনিবেগম ও 'রাজসিংহ'এর জেবউন্নিসা-দরিয়া বিবি প্রসঙ্গেও। বাঙালি মুসলিম নারীর সাধারণ জীবনের সমস্যা ও সংকটের কথা, এইসমস্ত ঐতিহাসিক রোমান্সপ্রধান অসাধারণ নায়িকার জীবনের সঙ্গে মেলে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দালিয়া' ছোটগল্পের আমিনা ও 'দুরাশা' ছোটগল্পে বদ্রাউনের নবাব, গোলাম কাদের খানের কন্যার মধ্য দিয়ে যে দুজন মুসলিম নারীর জীবনের চালচিত্র খুঁজে পায়, তাতে লেখকের মূল প্রতিপাদ্য ভিন্নধর্মী। একটিতে দালিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আমেনার মানসদ্বন্দ্ব ও অন্যটিতে লেখক ব্রাহ্মণ কেশোরলালের আচারগত ধর্মসর্বস্বতাকে নির্দেশ করেছেন। 'মুসলমানির গল্পে' হাবিব খাঁর আশ্রিতা কমলার মানসিক পরিবর্তনকে রূপায়িত করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' ছোটগল্পের আমেনার জীবনের যে সমস্যা ও সংকটের কথা লেখক বলেছেন, তাতে প্রাধান্য পেয়েছে হিন্দুপ্রধান গ্রামের জমিদার ও পূজারি তর্করত্নের দাপটের কাছে হেরে যাওয়া দরিদ্র চাষি গফুরের কথা। মহেশের প্রতি গফুরের অপত্যস্নেহ থাকা সত্ত্বেও অবস্থার বিপাকে সে মহেশকে হত্যা করে। একজন গো-হত্যাকারী চাষির প্রায়শ্চিত্তের আতঙ্ক ও মর্মবেদনাই এই ছোটগল্পের মুল প্রতিপাদ্য। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে শাহুজীর স্ত্রী অন্নদার জীবনযন্ত্রণার কথা আছে, যে কিনা মুসলমান বেদিনির জীবনযাপন করলেও, শাঁখাসিঁদুর ও নোয়া পরে, নিষ্ঠা সহকারে হিন্দুসংস্কার পালন করে। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' ও 'নারী ও নাগিনী' গল্পদুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কিন্তু লেখক এখানে তারিণী মাঝি ও খোঁড়া শেখের মধ্য দিয়ে, মুসলিম জনসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থানের বাস্তবতাকে

রূপায়িত করলেও, সুখী ও জোবেদার মধ্য দিয়ে মূলত জৈব ধর্ম বা জৈব আসক্তির মত মানবজীবনের আদিম প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের তমরেজের সদ্যবিধবা স্ত্রীর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, অন্নদা রায়ের মত মহাজনের সুদের কারবারে বন্দী দরিদ্র কৃষকপত্নীর চরম আর্থিক সংকটের কথা। বনফুলের 'তাজমহল' ছোটগল্পে ফকির শাজাহানের 'ক্যাংক্রাম অরিস' রোগাক্রান্ত স্ত্রীর জীবন-মৃত্যুর লড়ায়ের মধ্য দিয়ে লেখক, মূলত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসার এক অপূর্ব আলেখ্য রচনা করেছেন। যেখানে স্ত্রীর প্রতি ফকির শাজাহানের প্রেম, নিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতার কাছে, সম্রাট শাজাহানের তাজমহল অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। এখানে লেখক বোরখার প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে 'মেহেরবানি', 'কবর' 'বেগম' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে, মুসলিম সমাজের একটি বাস্তব আবহের অবতারণা করেছেন সুনিপুণ দক্ষতায়। সমরেশ বসুর 'আদাব' ছোটগল্পে প্রাক স্বাধীনতালগ্নে যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মধ্যে সম্প্রীতির আবহ রচিত, সেখানে মুসলিমমাঝির ইদের আগের রাতে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, 'পরবের দিন' তার বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের রক্তরাঙা চোখের জলের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সুতা-মজুরের বিহ্বল দৃষ্টিতে।

**নরেন্দ্রনাথ মিত্র**

তবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' ছোটগল্পে, মুসলিম সমাজে প্রচলিত তালাক, কীভাবে একজন নারীর জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে, তার একটি বাস্তবসম্মত দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়। এখানে শরিয়তের বিধিকে অপব্যবহার করে, মিথ্যা অপবাদে মাজু খাতুনকে তালাক দিয়ে, মোতালেফ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হলেও, সাধারণত কোনো অবিবাহিত বা বিপত্নীক সুদর্শন যুবাপুরুষ, কোনো বিধবাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারে না। এমনকি সামাজিক দিক থেকেও তা প্রশংসনীয় নয়, তা আমরা আফসার আমেদের কথাসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি। 'রস' ছোটগল্পের সিদ্ধহস্ত গাছি রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী, মাজু খাতুনকে, বিপত্নীক মোতালেফের 'নিকা' করার মধ্যেও একটা সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক মোতালেফের, প্রায় ত্রিশ বছর বয়স্কা, অতি সাধারণ চেহারার মাজুকে বিয়ে করা নিয়ে শিকদার বাড়ি ও কাজীবাড়ির মেয়েরা হাসি ঠাট্টাও

করে। অবশ্য মোতালেফের পছন্দ চরকন্দার এলেম সেখের বিবাহবিচ্ছিন্না সুন্দরী কন্যা ফুলবানু। আঠারো উনিশ বছরের ফুলবানুর 'রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন'। কিন্তু ফুলবানুর প্রথম বিবাহসম্পর্কিত সমস্ত খরচ উশুল করার জন্য, এলেম মোতালেফের কাছে পাঁচকুড়ি কন্যাপণ দাবী করে, যা সেইসময় দরিদ্র মোতলেফের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। 'গুণা'র টাকা জোগাড় করার ক্ষেত্রে, তার ভরসা শীতের রস ও পাটালির উপর। কিন্তু রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করার জন্য মোতালেফের একজন দক্ষ মানুষের দরকার, যা মূলত মেয়েদের কাজ। মোতালেফ জানে, পাটালিগুড়ের মধ্যেই রস তৈরির সমস্ত পরিশ্রম সার্থকতা পায়। কিন্তু মাতৃহীন মোতালেফের স্ত্রী বছর দুয়েক আগে মারা গেছে। তাই কথার মিষ্টতায় বশ করে, গুড় তৈরির দক্ষ কারিগর মাজুখাতুনকে বিয়ে করে গাছি মোতালেফ। বিয়ের ব্যাপারে মাজু গ্রামের আধবুড়োদের প্রস্তাব ফিরিয়েও দিলেও, স্বামীর শাগরেদ, মিষ্টভাষী সুপুরুষ, রসের কারবারি মোতালেফকে সে প্রত্যাখান করতে পারে নি। 'মনের মতো মানুষ' ও 'মনের মত কাজ' পেয়ে, মাজু কঠোর পরিশ্রম, ভালোবাসা ও যত্নে মোতালেফের শ্রীহীন গৃহের সমস্ত সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনে। অবিশ্রাম পরিশ্রম করে জ্বালানি জোগাড় করা থেকে শুরু করে পাটালি গুড় তৈরির কাজে সে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। সেই সেরা গুড় মোতালেফ চড়া দামে হাটে বিক্রি করে, পায় সম্মানও। শীতের মরসুম জুড়ে মোতালেফের অমানুষিক পরিশ্রমের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে গ্রামবাসী। কিন্তু রসের মরসুম ফুরিয়ে এলেই সকলে মোতালেফের কঠিন পরিশ্রমের প্রকৃত কারণ বুঝতে পারে, মাজু খাতুনকে তালাক দিয়ে, ফুলবানুকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে। মূলত মাজুখাতুন শুধুমাত্র একজন দক্ষ কারিগর ছিল মোতালেফের কাছে। যাকে মোতালেফ প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে, নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে, কন্যাপণের টাকা জোগাড় করার জন্যই বিয়ে করেছিল। রস শেষ হলে এই কারিগরের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় নিজের জীবন থেকে। ধর্মের আশ্রয়ে তালাককে হাতিয়ার রূপে ব্যবহারকারী মোতালেফদের সমাজ ও ধর্মের কাছে কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। অথচ তালাকপ্রাপ্ত মাজুরা, জীবনের সর্বস্বহারিয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

ইসলামধর্মে বহুবিবাহের প্রচলন থাকলেও, ফুলবানু মোতালেফের সংসারে সতীনের সঙ্গে ঘর করতে রাজি নয়। তাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পর, মিথ্যা অপবাদে মোতালেফ, মাজুকে

তালাক দেয়। নিজের হাতে সুন্দর করে সাজানো ঘর-সংসারে মাজুর কোনো অধিকার থাকেনা। মোতালেফের রূপজ মোহ, 'শয়তানি' ও 'ছলচাতুরি' এবং ধর্মীয় বিধানের কাছে মাজু হেরে যায়। মাজুর সমস্ত গুণপনা হেরে যায় ফুলবানুর অল্পবয়স ও সৌন্দর্যের কাছে। মাজুর জীবনের সমস্ত সুখ, স্বপ্ন ও নিরাপত্তা মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। মনের মত ঘর ও পুরুষকে হারিয়ে তালাকপ্রাপ্ত মাজুর 'অন্ধকার নিঃসঙ্গ' নারীজীবন, বৈধব্যজীবনের থেকেও বেশি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। প্রতিবেশীরা মোতালেফ ও ফুলবানুর দাম্পত্যের মাধুর্যের বর্ণনায়, তার জীবনের এই কাঠিন্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এই যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি পেতেই, নদীর ওপারের আধবুড়ো মাঝি নাদির শেখকে সে বিয়ে করে। রসের ব্যাপারী রাজেক মৃধার অকালমৃত্যু তাকে বৈধব্যযন্ত্রণায় আক্রান্ত করে, আরেক রসের ব্যাপারী মোতালেফ তাকে অকারণে তালাক দিয়ে, তার জীবনযন্ত্রণাকে দ্বিগুণ করে তোলে। তাই 'রসের ব্যাপারে মাজু খাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে। তবে নাদের শেখের সংসারে মাজু মাতৃহারা সন্তানদের পরিচর্যায় নিজেকে ব্যস্ত করে একরকম দিনাতিপাত করলেও, মোতালেফের প্রতি তার ভালোবাসা ও অভিমান হারিয়ে যায় না। তাই যে মোতালেফের কথায় সে জ্বলে ওঠে, দু-হাড়ি রস নিয়ে সেই অনুতপ্ত মোতালেব তার কাছে হাজির হলে, তার মনের সেই সুপ্ত অভিমান, চোখের জল হয়ে নেমে আসে।

মূলত 'রস' ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র শীতের মরশুমে খেজুর রস থেকে পাটালি গুড় তৈরির অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনার পাশাপাশি যে মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানুর মনের রসের সন্ধান দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু সামান্য কিছু কিছু কথার আঁচড়ে তিনি মুসলিমসমাজে প্রচলিত বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের যে বাস্তবসম্মত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে প্রকাশিত হয়েছে একজন মুসলিম নারীর জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্বেদনার কথা। এইসমাজে নারীর দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তা কতটা ঠুনকো, তা লেখক সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি মোতালেফ, তালাকের মত সহজ ধর্মীয়বিধানের অপব্যবহার করে, পরিকল্পনামাফিক মাজুকে বিয়ে করে তালাক দেওয়ায় জন্যই। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মোতালেফ, একজন শিল্পীর দক্ষতাকে ব্যবহার করে অপমানিত করেছে, গল্পের মধ্যে তার অমানবিক নিষ্ঠুরতার জন্য শাস্তিও সে পেয়েছে। কিন্তু তাতে মাজুর জীবনের যন্ত্রণা কমে না। তার মত তালাকপ্রাপ্ত নারীরা এক সংসার থেকে অন্য সংসারে ভেসে

যেতে বাধ্য হয়। প্রকৃতির নিয়মে লেখক অবশ্য পুরুষের অপরাধের শাস্তির কথা বলেছেন, যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত মোতালেফ, জীবিকার নিরাপত্তাহীনতায় ভুক্তভোগী হয়েছে। তবে ফুলবানুর মত নারীর জন্যও যে মাজু খাতুন বা গফুর সিকদারের মত মানুষেরা যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়, এই সমাজসত্যও লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর 'রস' ছোটগল্পে।

এইপ্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর 'রূপজালাল'(১৮৭৬) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে একজন মুসলিম নারীর লেখনীতে, একজন মুসলিম নারীর জীবনের সমস্যা ও সংকট উঠে এসেছে। মূলত লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনি এখানে রূপকের অন্তরালে প্রকাশিত হয়েছে, যে জীবন মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের ঘূর্ণাবর্তে ক্ষতবিক্ষত। লেখিকার মত শিক্ষাব্রতী, কবি, সাহিত্যিক ও উচ্চবিত্ত নারীকেও স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী হতে বাধ্য হতে হয়, সতীনযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তবে একথা সত্য যে, 'রূপজালাল' উপন্যাসে জালালের প্রথম স্ত্রী হরবানু ও দ্বিতীয় স্ত্রী রূপবানু শেষপর্যন্ত সমস্ত টানাপোড়েন অতিক্রম করে, একই সঙ্গে জালালের দাম্পত্যে সুখী হয় কিন্তু আত্মমর্যাদায় ভাস্বর নবাব ফয়জুন্নেসা ব্যক্তিগত জীবনে এই অপমান শেষপর্যন্ত মেনে নিতে পারেন নি। লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনে কোরান নির্দেশিত একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সমান আচরণের ফাঁকি ধরা পড়েছিল। তাই তিনি সেই দাম্পত্য থেকে বেরিয়ে এসে, বিভিন্নরকম সামাজিক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই জীবন উপন্যাসের রূপবানুর চেয়ে অনেক বেশি সম্মানীয় ও প্রশংসনীয়। এই উপন্যাসের মধ্যেই প্রথম বহুবিবাহে জর্জরিত মুসলিম নারীর যন্ত্রণাময় জীবনের ইতিহাসের বাস্তবতা ধরা পড়েছে, যা বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব।

মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তিনটি পর্বে বিভক্ত এই উপন্যাসের মহরম পর্ব - ১৮৮৫ সালে, উদ্ধার পর্ব - ১৮৮৭ সালে ও এজিদবধ পর্ব - ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। মূলত এই উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু সুদূর আরবের প্রেক্ষাপটে রচিত হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের বিরোধ তথা কারবালার প্রান্তে সংঘটিত যুদ্ধের করুণ পরিণতি হলেও, এর কাহিনি অংশে বর্ণিত বহুবিবাহের ভয়ানক বাস্তবতার মধ্যে ধরা পড়েছে, মুসলিম নারীর দাম্পত্য জীবনের এক অন্ধকারময় জগৎ। হাসানের দ্বিতীয় স্ত্রী জায়েদার সপত্নীদের প্রতি ঈর্ষা এবং স্বামীর প্রতি যে অভিমান লেখক তুলে

ধরেছেন, তার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক নারীর, স্বামীকে একান্ত করে না পাওয়ায় যন্ত্রণায় প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি জয়নাবের স্বামী আবদুলের, সম্পত্তির লোভে নিরপরাধ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মধ্যেও আমরা মুসলিম সমাজজীবনের আর এক চরম সত্যকে খুঁজে পায়। তালাকের যূপকাষ্ঠে বলি জয়নাবের মধ্য দিয়ে, তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম নারীর জীবনযন্ত্রণার করুণ পরিণতি তুলে ধরেছেন লেখক এই উপন্যাসে। এইভাবে জায়েদা ও জয়নব সুদূর আরবের বাসিন্দা হয়েও, বহুবিবাহ ও তালাকজর্জরিত মুসলিম নারীর অভিশপ্ত জীবনের প্রতিনিধিত্বে, দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে।

বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ'(১৯২৪) উপন্যাসে 'তারিণীভবনে' আশ্রিতা, দুই কন্যাসন্তানের জননী রাফিয়ার মধ্য দিয়ে, তালাকের আর এক ভয়াবহ দিক উঠে এসেছে। তার উচ্চশিক্ষিত ব্যারিস্টার স্বামী, রেজিস্ট্রি চিঠির মাধ্যমে, বিদেশ থেকে তালাকনামা পাঠিয়েছে। রাফিয়ার তেরো বছরের বিবাহিত জীবন, তালাকনামার রেজিস্ট্রি চিঠি সই করে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। ধর্মের আশ্রয়ে তালাক বা বহুবিবাহের মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এইভাবেই নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। এক্ষেত্রে ধর্ম বা মৌলবাদী সমাজ নারীর পক্ষে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনা। বরং তারা পুরুষের এইসমস্ত অমানবিক স্বার্থসিদ্ধির পথকে সুগম করায় প্রয়াসী। এমনকি একজন নারীর জীবনের এই বিপর্যয়ে বিবেকহীন, অমানবিক সমাজ শুধুমাত্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেই শান্ত থাকে না, সেই নারীর অসহায়তার সুযোগসন্ধানেও তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি লেখিকা বহুবিবাহে আসক্ত সমাজে, উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, শিক্ষিত জয়নাবের জীবনের বিপর্যয়ের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, অর্থলোভী হাজী নবাব হাবীব আলমের চক্রান্তে, স্বামী লতীফের দ্বিতীয়বিবাহের বাধ্যতায়। তালাক ও বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে, রাফিয়া ও জয়নাবের জীবনে যন্ত্রণার পাশাপাশি রোকেয়া তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন, সমস্ত অপমান অতিক্রম করে আত্মমর্যাদাশীল নারীর জীবনের ভিন্ন ধারাকে। যে ধারা সংসার জীবনকে ছাড়িয়ে, নারীকে একটি বৃহত্তর জগতে পৌঁছে দেয়। লেখিকা মুসলিম নারীর জীবনের এই সংকট ও সমস্যাকে অতিক্রম করার জন্যই তাদের শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার কথা বলেন। নারীকে নিজের পরিচয়ে বেঁচে থাকার শক্তি ও সাহসে, বেগম রোকেয়া তাঁর সৃষ্ট নারীদের গড়ে তোলেন প্রকৃত অর্থে

অধিকারসচেতন ও আত্মমর্যাদাশীল আধুনিক রমণীরূপে, যা শুধুমাত্র তৎকালীন সাহিত্যেই নয়, বিংশ শতকের অনেক সাহিত্যেও প্রায়শই অনুপস্থিত।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে বিদ্রোহী কবি রূপে সমধিক পরিচিত হলেও, তিনি 'বাঁধনহারা'(১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা'(১৯৩০) ও 'কুহেলিক'(১৯৩১) নামে তিনটি উপন্যাস এবং বেশকিছু ছোটোগল্পও লিখেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কথাসাহিত্যিক কাজী নজরুল ইসলাম তেমনভাবে সমাদৃত হননি। এমনকি তাঁর 'বাঁধনহারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রোপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও, তা প্রায় উপেক্ষিত থেকে যায় বাঙালির কাছে। তবে বর্তমানে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করায়, উপন্যাসটি আলোচনার আলোয় আসার সুযোগ পেয়েছে। নজরুল ইসলামের এই তিনটি উপন্যাসের কাহিনি অংশ জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে মুসলিম জনসমাজ। শিক্ষিত সংখ্যাগুরু মানুষের কাছে উপন্যাসগুলোর উপেক্ষার পেছনে, এটিও একটি বড় কারণ হতে পারে। অন্যদিকে যে মুসলিম জনসমাজের চিত্র তিনি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, তার বাস্তব ভিত্তিও সংখ্যালঘুদের জীবনের সঙ্গে অনেকটাই বেমানান। মূলত তাঁর সৃষ্ট মেহবুবা বা মেজবউ এর জীবনের মধ্যে আপামর মুসলিম সমাজ তথা নারীজীবনের তেমন কোন প্রতিফলন দেখা যায় না। ফলে সেইসময়ের সংখ্যালঘু সমাজও নজরুলের উপন্যাসে পুরোপুরি নিজেদের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায় নি। যদিও ভাষা ব্যবহার, ধর্মীয় আচার-আচরণ বা ধর্মীয় রীতি-নীতিতে তারা পুরোপুরি মুসলিম, তবু কোথাও যেন সেই সমাজবাস্তবতাকে অতিক্রম করে, কল্পনার রঙে লেখক তাঁর কাঙ্ক্ষিত মুসলিমসমাজের চিত্র অঙ্কন করেছেন উপন্যাস তিনটির মধ্যে। তবে নজরুল তাঁর উপন্যাসের মধ্যে নারীদের যে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন, তা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ছিল নজিরবিহীন।

### আব্দুল আযীয আল আমান

আব্দুল আযীয আল আমানের(১৯৩২-১৯৯৪) 'শাহানী একটি মেয়ের নাম'(১৯৬০) উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলত দক্ষ সম্পাদক আব্দুল আযীয আল আমান সম্পাদিত 'জাগরণ', 'কাফেলা' ও 'নতুন গতি' পত্রিকা হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের ধারক ও

বাহক। তাঁর 'হরফ প্রকাশনী' একসময় প্রকাশন জগতের বড় পীঠস্থান ছিল, যেখান থেকে রামমোহন রচনাবলী, মধুসূদন রচনাবলী ও দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী তিনি পাঠকের হাতে স্বল্পমূল্যে তুলে দিতেন। তিনি বেদ, গীতা, ভাগবত ও ধর্মপদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশেও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কাজী নজরুল ইসলামকে সর্বসমক্ষে তুলে আনা ও তাঁকে নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও আল আমানের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শুধু তাই নয়, সমস্ত অশিক্ষা ও কুসংস্কার থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজকে, আলোর পথে নিয়ে আসায় তিনি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাও প্রশংসার যোগ্য। বিশেষকরে মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য, তিনি নবাব ফয়জুন্নেসা ও বেগম রোকেয়ার মত বিদুষী মুসলিম নারীদের জীবনী তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন। সর্বোপরি তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'শাহানী একটি মেয়ের নাম' এর প্রতিবাদী নারী শাহানীর মধ্য দিয়ে, এই সমাজের মোল্লা-মৌলবিদের স্বার্থান্বেষী প্রকৃত চরিত্রকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। সামগ্রিকভাবে লেখক তাঁর এই উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র, পশ্চাদপদ, অশিক্ষিত মুসলিম জনসমাজের একটি বাস্তবসম্মত চিত্রকে রূপায়িত করেছেন। যে জনসমাজ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, চোখ বন্ধ করে ধর্মগুরু মোল্লা ও মৌলবিদের বলা প্রথাবদ্ধ পথকেই অনুসরণ করে চলে। ব্যতিক্রমী নারী শাহানী, সমাজের প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে বেরিয়ে আসে এবং একজন 'মাগী' হয়ে 'মদ্দা'র মত জনকল্যাণমূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার এই আস্পর্ধা ও কাজের ধারা সেই সমাজের মানুষ ও ধর্মগুরুরা মেনে নিতে পারে না। তাই শাহানীর বিরুদ্ধে বিচারসভা বসে। যে মুসলিমসমাজ নারীকে অন্তঃপুরে রেখে সন্তানপালন, গৃহকর্ম ও স্বামীসেবার মতো নির্দিষ্ট কাজে বন্দী রাখায় প্রয়াসী, আব্দুল আযীয আল আমানের শাহানী ধর্মগুরু ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই নিয়ম থেকে বেরিয়ে আসার সাহস দেখায়, যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে 'শোনো ও মানো'র গড্ডালিকাপ্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসে। মূলত লেখক মুসলিম নারীজীবনের একটি অভিনব দিককে তুলে ধরে, অন্যান্য নারীদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, যা সমসাময়িক কথাসাহিত্যে বিরল।

## গৌরকিশোর ঘোষ

এই প্রসঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষের (১৯২৩-২০০০) 'প্রেম নেই' (১৯৮১) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসে মূলত ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতবর্ষের যে বৃহত্তর রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে এক মহাকাব্যিক কলেবরে তুলে ধরেছেন লেখক, তাতে তৎকালীন মুসলিম সমাজে নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানটিও সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। যে সমাজ মূলত মোল্লা ও মৌলবি কথিত ধর্মীয় বিধানে পরিচালিত হয়। এখানে সাজ্জাদ, হাজিসাহেব ও শফীর মত প্রগতিশীল মানুষের পাশাপাশি, দাউদের মত নারীলোভী ও ধর্ষকামী পুরুষের সহাবস্থানে নয়মোনের দাম্পত্যজীবন স্বর্গীয় সুখে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর ফুটকিদের আত্মহত্যা করতে হয়। আর প্রিয় দুই নারীর এই বিপরীতধর্মী অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছবি(বিলকিস) নিজের দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তাহীনতার ভাবনায় মাঝে মাঝেই আকুল হয়। স্বাভাবিকভাবেই সে তার দাম্পত্যজীবনের পরমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় প্রায়শই। চরম দারিদ্র্যতা থেকে বিত্তশালী হয়ে ওঠার পথে ছবির পিতা হাজিসাহেব, সবসময় স্ত্রী নয়মোনের পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিয়ে এসেছে। এমনকি মুসলিম সমাজে, ধর্মের আশ্রয়ে যেখানে অনেকে একাধিক বিয়ে করে, সেখানে হাজিসাহেব বারবার সন্তান হারানোর বেদনা সহ্য করেও দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হয় নি। বরং সে দ্বিতীয় বিবাহ না করার যুক্তি দেখিয়ে নয়মোনের অনুরোধ উপেক্ষা করে এবং নিজের ভালবাসায় নয়মোনকে ভরিয়ে রাখে। পুত্রসন্তান না থাকা সত্ত্বেও বিত্তশালী হাজিসাহেব দ্বিতীয়বিবাহে রাজী হয় নি। স্ত্রীর সুবিধার্থে পুকুরের ঘাট বাঁধিয়ে দেওয়া এই সমাজ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে নিন্দনীয় হলেও, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্বে সেই সমালোচনাকে সে খুব সহজেই উপেক্ষা করে। একজন পুরুষের পক্ষে অন্যের নিকট স্ত্রীর প্রশংসা করার মধ্যেও হাজিসাহেব সেই সমাজকে অতিক্রম করেছে। এদিক থেকে বলা যায়, এই সমাজের অন্যান্য নারীর তুলনায় নয়মোনের জীবন অনেক বেশি সুন্দর ও পরিপূর্ণ।

পাশাপাশি লেখক মুসলিম সমাজের মিলাদ-মহফিলে মোল্লা-মৌলবিগণের ধর্মীর বিধান অনুসারে, মেয়েদের সবসময় 'আওরতে হাসিনা' হয়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়ার বাস্তবচিত্রও তুলে ধরেছেন। যেখানে বলা হয়, যেকোন পরিস্থিতিতে স্বামীকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখায় 'আওরতে

হাসিনা'র জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই একজন মুসলিম নারীর প্রতিনিধি হিসেবে বিলকিস, স্বামীর একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গে টগরকে বলে, 'আমাদের আর কী করার আছে? যখন মেয়ে হয়ে জন্মাইছি তখন কেতাবে যা লেখা আছে সেইভাবেই চলতি হবে। তুমি যদি আওরতে হাসিনা হতে চাও, তালি তুমারে আল্লাহ আর স্বামীগিরি মানতেই হবে। কেতাবে লেখা আছে যে সমস্ত স্ত্রীলোক স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে হিংসা না করিয়া সবুর করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আল্লাহতা'লা শহীদের তুল্য ছওয়াব দান করিবেন।'[১] ফলে কোন কোন পুরুষ নিজের সন্তুষ্টির জন্য একাধিক বিবাহে নিজেদের অপরাধ খুঁজে পায় না। এমনকি দাউদের মত বিকৃত মনের পুরুষেরা, অন্য নারীর প্রতি স্বামীর আসক্তিতে অপমানিত ফুটকির আত্মহত্যার কারণ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারে না, বরং তারা মনে করে, স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করার, একাধিক বিবাহ করার, ইচ্ছেমত তালাক দেওয়ার হক(অধিকার) তাদের আছে। উপন্যাসমধ্যে দাউদের বাবার দুটো স্ত্রী এবং বিলকিসের মাজে খালুর চারজন স্ত্রী বর্তমান। এমনকি মাজে খালুর চারজন স্ত্রীর মধ্যে অমানবিক ও লজ্জাজনক সংঘর্ষের কথাও লেখক তুলে এনেছেন বিলকিসের ভাবনায়। এহেন পরিবেশে নারীর জীবনের স্বপ্নসাধ ও নিরাপত্তা যে কতটা ক্ষতবিক্ষত হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ফটিকের মা চাঁদবিবির কাজের সঙ্গী নছিফার জীবনেও এই সত্যই রূপায়িত, যে তার দাম্পত্যজীবনে সতীনযন্ত্রণা ভোগ করার পাশাপাশি প্রায় না খেয়ে উদয়াস্ত কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে বাধ্য হয়। তার ধর্ষকামী স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনের মত ফরজ কাজকে উপেক্ষা করে, তিনজন স্ত্রীর ঘরে পালা করে রাত কাটানোর সুন্নত পালনকে ধর্ম মনে করে। লেখক ক্ষুধার্ত নছিফার কাঁচা চাল খাওয়া, স্বামীর যৌনক্ষুধা নিবৃত্তি করা ও সন্তান হারানোর যন্ত্রণার বর্ণনায় নারীজীবনের এক ভয়াবহ অন্ধকারময় দিককে তুলে ধরেছেন বাস্তবতার আলোকে।

এই উপন্যাসে নারীলোভী, ধর্ষকামী দাউদের স্ত্রী হওয়ার যন্ত্রণা থেকেই শেষপর্যন্ত ফুটকির আত্মহত্যা। ফুটকির অভিমান, আত্মমর্যাদা, স্বপ্ন, ভালবাসা ও সেবাকে উপেক্ষা করে, দাউদ বালবিধবা কালোজিরেকে নিয়ে পালিয়ে যায়। কালোজিরেকে বিয়ে করার পরিকল্পনার মধ্যে, দাউদ জেনার(ব্যাভিচার) পাপবোধ থেকে মুক্তি পেলেও, অভিমানী ফুটকি স্বামীর এই

অনাচার, অবহেলা ও মিথ্যাচারকে মেনে নিতে পারে নি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এই নারী তাই বারবার স্বামীর শারীরিক নির্যাতনকে সকলের কাছে গোপন করে রাখায় প্রয়াসী। চরম আত্মমর্যাদাবোধের জায়গা থেকেই সে মনে মনে তালাকের ভয়ে তাড়িত হতে থাকে। স্বামী দাউদের অনাচারে তার এই আত্মমর্যাদা ধূলিসাৎ হয়। দিনের আলোয় সকলের মুখোমুখি হওয়ার লজ্জা, ভয় ও অপমান থেকে মুক্তি পেতে, রাতের অন্ধকারে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। লেখক গৌরকিশোর ঘোষ দেখিয়েছেন, এইভাবেই ফুটকির মত একটি সুন্দর মনের মানুষ অকালে হারিয়ে যায়, যার কাছে আওরতে হাসিনা হওয়ার চেয়ে আত্মসম্মান অনেক বড় ছিল।

তবে বহুবিবাহের সমর্থনে কেবলমাত্র পুরুষসমাজই নয়, এই সমাজের নারীর মননেও যে টানাপোড়েন দেখা যায়, লেখক এই সমাজসত্যও তুলে ধরেছেন উপন্যাস মধ্যে। তাই জৈনুদ্দিন মৌলবির বিবাহযোগ্যা কন্যা সইফুন, বিলকিসের স্বামী শফীর দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন বোনে। সইফুনের মধ্য দিয়ে লেখক, মুসলিম নারীর জীবনের আর এক চরম সংকটকে স্পর্শ করেছেন। নারীর উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে মুসলিম সমাজে অনেক বাধা ও বিপত্তি দেখা যায়। সাধারণত মেয়েদের আরবি ও ফারসি শিক্ষার ব্যাপারে এই সমাজ যত্ন দেখালেও, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে তারা উদাসীন। এক্ষেত্রে শহুরে মেয়েদের যেখানে উচ্চশিক্ষালাভের পথ প্রায় বন্ধ অন্যদিকে বাল্যবিবাহের প্রবণতাও কম সেখানে সইফুনের মত উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের মেয়েদের জীবনে, করার মত কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে না। তাদের এই সমস্যা ও সংকট নিয়ে সইফুল্লা কিছু তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করলেও, নারীকে উচ্চশিক্ষার আলোয় নিয়ে আসার কোন উদ্যোগ বা চেষ্টায় সে করে নি। তাই বিলকিস বা সইফুনের শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেও, অন্যান্য শিক্ষিত পুরুষের মত সইফুল্লাও শেষপর্যন্ত নিশ্চেষ্ট থাকে। সইফুনের মধ্য দিয়ে লেখক মুসলিম নারীজীবনের আরেক সত্যকে রূপায়িত করেছেন। ইসলাম মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দিলেও, সইফুনেরা শেষপর্যন্ত প্রয়োজন ও পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকারে বাধ্য হয়। তাই পারিবারিক সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে, দাউদের মত অপছন্দের পাত্রকে সে স্বামীরূপে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেয়েদের শিক্ষালাভের পথের বাধা যেমন তাদের জীবনে সংকট ডেকে আনে, তেমনি পুরুষের উচ্চশিক্ষাও তাদের সম্পর্কের স্বাভাবিকতায় দূরত্ব সৃষ্টি করে। তাই অশিক্ষিত চাঁদবিবি, অল্পশিক্ষিত সন্তান রাখাল ফটিকের সঙ্গে যে একাত্মতা অনুভব করতেন, উচ্চশিক্ষিত উকিল সন্তান ফটিকের সঙ্গে সেই একাত্মতা খুঁজে পায় না। একইভাবে উচ্চশিক্ষিত স্বামীর দাম্পত্যে, বিলকিস বারবার একটা শিক্ষাগত ও রুচিগত ব্যবধান অনুভব করে। তার এই দীনতা মাঝে মাঝে তাদের সম্পর্কের মাঝে বাধাও সৃষ্টি করে। বিলকিসের দাম্পত্যজীবনের নিরাপত্তাহীনতার এটিও একটি বড় কারণ। শুধুমাত্র বিলকিসের জীবনে নয়, একসময় মুসলিমসমাজে স্বামীস্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতার এই পার্থক্যজনিত সমস্যা ছিল স্বাভাবিক, এক্ষেত্রেও লেখকের সমাজদৃষ্টি অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য।

এই উপন্যাসের আর এক চরিত্র দুলিবিবির জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক, নারীজীবনের আর এক সংকটকে নির্দেশ করেছেন। সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা নির্বিশেষে পরকিয়া প্রেম তথা অবৈধ সম্পর্ক, সমাজবাস্তবতার একটি বড় লক্ষণ। দাউদ একসময় সামাজিক ও ধর্মীয় বিধানকে লঙ্ঘন করে, চাটমোহরের বন্ধুপত্নী দুলিবিবির সঙ্গে যৌনসম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের এই গোপন সম্পর্কের ফলস্বরূপ, যখন দাউদের প্রতিকৃতির সন্তানের জন্ম দেয় দুলিবিবি, তখনই স্বামী মোকছেদ তাকে তালাক দেয়। তালাকপ্রাপ্ত, আশ্রয়হীনা দুলিবিবি শিশুসন্তানকে নিয়ে কখনো ভিক্ষাবৃত্তি করে আবার কখনো 'বাঁদিগিরি' করে। যদিও উপন্যাসের শেষে লেখক অনুতপ্ত দাউদের ভাবনায়, দুলিবিবির একটি সম্মানজনক আশ্রয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু দুলিবিবির এই নিশ্চিত আশ্রয়ই আবার সইফুনের দাম্পত্যজীবনে বাধা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে। গৌরকিশোর ঘোষ 'প্রেম নেই' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এইভাবেই স্বাধীনতাপূর্ববর্তী সময়কালে মুসলিম নারীজীবনের এক বৃহত্তর পরিসরকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। আর দেশভাগ পরবর্তী সময়ে, মুসলিম নারীর জীবনে বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, তালাক ও তার সামাজিক-পারিবারিক অবস্থানের নানানদিক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন আফসার আমেদ।

## সৈয়দ মোস্তফা সিরাজ

সৈয়দ মোস্তফা সিরাজ(১৯৩০-২০১২) এর 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮) উপন্যাসে একাধারে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় রীতিনীতি তথা সমাজতত্ত্বের নানান দিক মহাকাব্যিক বিশালতায় ধরা পড়েছে। একই ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আচার-আচরণের ভিন্নতা থেকেও যে বিরোধিতার সূত্রপাত হয়, তার এক বাস্তবসম্মত রূপও লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজের ফারাজী, পীরপন্থী, হানাফী, সুফী প্রভৃতির আচার-আচরণ ও ধর্মীয়বিধানের ভেদাভেদ মানুষের জীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে, একটি বিশালসমাজকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা স্পষ্ট করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। মূলত 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস, ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা থেকে, একজন রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ বদিউজ্জামানের 'অলীক মানুষ' হয়ে ওঠার কাহিনি। পাশাপাশি ধর্মান্ধ বদিউজ্জামানের কনিষ্ঠ সন্তান শফিউজ্জামানের ঘটনাপরম্পরায় ধর্মদ্রোহী থেকে একসময় ঘাতকে পরিণত হওয়ার কাহিনিও যুক্ত হয়েছে। এখানে একটি পরিবারের সদস্যদের মধ্য দিয়েই লেখক ধর্মীয় ভেদাভেদের চিত্রকে স্পষ্ট করেছেন। যে পরিবারের একজন ধর্মপ্রাণ সূফীসাধনায় নিরুদ্দেশ, একজন ধর্মের মোহে দিনের পর দিন মসজিদে আশ্রিত, আর একজন নাস্তিকরূপে গৃহপ্রাঙ্গণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সেই পরিবারের নারীদের জীবন কতটা সংকটময় হতে পারে, বৃহত্তর ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক প্রেক্ষাপটের মাঝেও লেখক সচেতনভাবে তার একটি রূপরেখা অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে।

বদুপীরের স্ত্রী সাইদার জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক, একজন অসাধারণ আধ্যাত্মিক মানুষের স্ত্রী হওয়ায় যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ করেছেন। বদিউজ্জমানের স্ত্রী, তিনসন্তানের জননী সাইদার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, চাওয়া-পাওয়ার কোনো পরোয়া না করেই, বদু একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংসার পাতে, ইচ্ছেমতো সংসারী হয় আবার ইচ্ছে হলে সংসার ছেড়ে মসজিদে আশ্রয় নেয়। মৌলাহাট গ্রামে আস্তানা গড়ে তোলার প্রায় একমাস বদিউজ্জমান স্ত্রী ও পরিবারের সংশ্রব ত্যাগ করে মসজিদে বাস করে। নতুন জায়গায় মানিয়ে নেওয়া, সংসার পাতা থেকে শুরু করে শাশুড়ি ও সন্তানদের আগলে রাখার সমস্ত দায়িত্ব সাইদাকে একা সামলাতে হয়। তাকে একা নিজের মনের ও শরীরের চাহিদার সঙ্গে লড়াই করে যেতে হয়। এলাকার আপ্লুত মুসলিম

জনসাধারণের কাছে তাই বদুপীর সম্মান ও শ্রদ্ধার মানুষ হলেও, সংসারের প্রতি উদাসীন স্বামীর প্রতি সাইদা মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বহুবিবাহের প্রবণতা থাকার দরুন, সাইদা স্বামীর এই উদাসীনতার পেছনে, বদুর দ্বিতীয় সংসার পাতার প্রয়াস খুঁজে পায়। আর এই ভাবনা থেকেই সে, এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে বদিউজ্জমানের শারীরিক চাহিদার সমস্ত আকুলতাকে জোর করে ফিরিয়ে দেয়। সে ধর্মীয় বিধিনিষেধের সমস্ত ভয় থেকে শুরু করে, বদুপীরের অলৌকিক জিনের ভয়কেও অনায়াসে উপেক্ষা করে। যে স্বামী তার মনের খোঁজ রাখেনা, সেই স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণে সে বাধ্য নয়, আর এখানেই সমস্ত ধর্মীয় সংস্কার অতিক্রম করে সাইদা একজন আধুনিক নারীজীবনের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। যে ছোটছেলে শফিকে সাইদা, প্রাণপণ আশ্রয় করে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়, সাইদার অনুমতি ছাড়াই বদিউজ্জমান তাকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে দূরে পাঠিয়ে দেয়, এই ঘটনাও সাইদাকে স্বামীর প্রতি বিরূপ করে। তবে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের আশংকা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ মেলে বদুপীরের ইকরাকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে। মূলত সাইদার মধ্য দিয়ে নারীর স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়া ও মর্যাদাকে লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে পীরের স্ত্রী হয়েও সন্তানের জন্য বদুর নিষিদ্ধ মাজারে যায়, অন্ধকার রাতে কামার্ত স্বামীকে প্রত্যখ্যান করে ও ধর্মীয় বাণীতে ভীত না হয়ে, স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে ধর্মজ্ঞানী বদুপীরকে প্রশ্ন করার সাহস দেখায়।

আবার ‘জন্তুমানুষ’ প্রতিবন্ধী মনিরুজ্জামানের স্ত্রী রুকুর মধ্য দিয়ে লেখক দাম্পত্যজীবনের আর এক ভয়াবহ সত্যকে তুলে ধরেছেন, ‘যখন-তখন একটা জন্তুমানুষের কামার্ত আক্রমণ, এমন-কি রজস্বলা অবস্থাতেও রেহাই নেই। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে রুকু তার অবশ শরীর রেখে পালিয়ে যায়-পালাতেই থাকে, দূরে-বহুদূরে। কিন্তু কোথায় যাবে? কার কাছেই বা তার এই মানসিক সফর? খালি মনে হয়, খোঁড়াপিরের দরগায় ভাঙা ফটকে কাঠমল্লিকার ফুলবতী গাছের কাছে উলটো মুখে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। ভয় পেয়ে পিছু হটে ফিরে আসে নিজের শরীরে। বেইজ্জত শরীরের ভেতর ঘৃণা, ঘৃণা আর ঘৃণা! নিজের ওপর, সব কিছুর ওপর।’[২] দরিয়াবানু স্নেহের কন্যা জীবন্মৃত রুকুর জীবনের এই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই হয়তো আত্মহত্যা করে। বাল্যবিবাহের বিরোধী বারি চৌধুরী বারবার দারিয়াবানুর রুকু-

রোজির বিবাহের ভুল সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। শেষপর্যন্ত এই বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্যই তিনি রুকুর মনের মানুষ তথা হবু স্বামী শফীকে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু পীরসাহেবের বাড়িতেই ধর্মের বিকৃতি ঘটে, রুকুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী মনিরুজ্জামানের সঙ্গে রুকুর বিয়ে হয়। অবশ্য স্বামীর প্রতি তার ক্রমাগত অবহেলা, উপেক্ষা ও ঘৃণা প্রতিবন্ধী মনিরুজ্জামানের মনেও আঘাত হানে। তাই একসময় রুকুর জীবন থেকে মনিরুজ্জামান স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য এর ফলে রুকু একজন জন্তুমানুষের জৈবধর্মের অত্যাচার থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পেলেও, স্বামীর প্রতি নিরন্তর ঘৃণার জন্য সে সারাজীবন এক অপরাধবোধে তাড়িত হয়। জীবনের উপান্তভূমিতে বারবার স্বামীর কাছে মনে মনে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই অপরাধবোধ ও অনুতাপ রুকুর জীবনের গতিকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। পীর পরিবারের সমস্ত ধারা মেনে, এক যোগ্য পুত্রবধূরূপে সে বদিউজ্জামানের পরবর্তী বংশধরদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলায় আত্মনিয়োগ করে, প্রকৃত মানুষের ধর্মপালনে ব্রতী হয়।

'অলীক মানুষ' উপন্যাসের অন্যতম নারীচরিত্র ইকরার মধ্য দিয়ে লেখক, হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে একজন নারীর মর্মান্তিক জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। হিন্দুরমণী অরুণা সতীদাহের আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে, মুসলিম রমণী ইকরা হয়েও শেষপর্যন্ত বাঁচতে পারে না। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একসময় সে বদুপীরের দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃতির খোলা আকাশে বিচরণকারী ইকরার পক্ষে পীরসাহেবের অন্তঃপুরে বন্দিনী হয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই তাকে তালাক পেতে হয় বদুপীরের কাছে। শেষপর্যন্ত সে পেটের দায়ে ভগবানপুরের সুতোকাটুনি অরুণাতে পরিণত হয়। কিন্তু পীরসাহেবের অন্ধভক্তরা শেষপর্যন্ত ইকরাকে বেঁচে থাকতে দেয় না। তার পেটের সন্তান কখনো আজিফার কাছে, কখনো অনাথ আশ্রমে বড় হয়। ইকরার মত প্রাণচঞ্চল, অসমসাহসী রমণী এইভাবে প্রচলিত ধর্মীয়বিধানের যূপকাষ্ঠে বলি হয়।

এইপ্রসঙ্গে বদিউজ্জামানের শ্যালকের স্ত্রী আজিফার জীবনের কথাও উল্লেখযোগ্য। আজিফার জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম রমণীর করুণ পরিণতিকে তুলে ধরেছেন। সন্তানের জন্মদানে অক্ষম আজিফাকে বিনা অপরাধে স্বামীর কাছে তালাক পেতে

হয়। সর্বস্বান্ত এই তালাকপ্রাপ্ত রমণী জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে সুতোকাটুনিতে পরিণত হয়। আবার লেখক জুলেখার বিবাহের সূত্রে, ফরিদুজ্জামানের মধ্য দিয়ে জুলেখার যে জন্মবৃত্তান্ত পাঠকের সামনে এনেছেন, তাতে ধরা পড়ে ধর্মজ্ঞানী বদুপীরের পরিবারে সংঘটিত চরম ধর্মবিরোধী কর্মকাণ্ডের বাস্তব চিত্র। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এইভাবেই তাঁর 'অলীক মানুষ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ধর্মের আড়ালে ঘটে যাওয়া অধর্মের প্রতি কটাক্ষ করেছেন তেমনি আবার মুসলিম নারীজীবনের নানান সমস্যা ও সংকটের বাস্তবসম্মত দিককে দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন।

## মহাশ্বেতা দেবী

'তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ' প্রবন্ধে লেখক আফসার আমেদ বলেছেন, 'দাম্পত্যের ভিতর নিত্যনতুন নানা সমস্যা এসে পড়ে, তা কখনো রোষের বশবর্তী করে পুরুষটিকে। এটা বাস্তব সত্য। যেমন ক্ষিপ্ত পুরুষ স্ত্রীকে গালি দিতে গিয়ে খুব আহত করে এমন গালি পর্যন্ত দিয়ে ফেলে। তেমনি 'তালাক' উচ্চারণের একটি সমধর্মী প্রবণতা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। সাধারণ্যে এমত তালাক দেওয়ার দৃষ্টান্ত সবচেয়ে বেশি। তার পরিণতি হয় মারাত্মক। পুরুষটির রাগ পড়ার পর আর কিছু করার থাকে না। স্ত্রীকে চলে যেতে হয় তার স্বামী সন্তান সংসার ছেড়ে। স্বামী তার ভুল বুঝতে পারার পরও পরিণতি এমনই ট্রাজেডির দিকে বাধ্যত যায়। অনেক সময় এমন বিবাহ বিছিন্ন স্বামী-স্ত্রী পুনরায় দাম্পত্য ফিরে পাবার জন্য যে ধর্মীয় পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে তা খুব একটা গৌরবজনক নয়। বিগত স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে হয়, সেই পুরুষটিকে দিয়ে নারীটিকে আবার তালাক দেওয়াতে হয়, তারপর পূর্বস্বামী পুনরায় বিয়ে করতে পারে নারীটিকে। এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।'[৩] মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) 'তালাক' ছোটগল্পে উক্ত সামাজিক সমস্যাকে রূপায়িত করেও, এক ভিন্নতর ও সম্মানীয় পথের সন্ধান দিয়েছেন, তালাকপ্রাপ্ত কুলসমের অসাধারণ মানসিকতার জায়গা থেকে। কুলসম ও আসগরের সুখী দাম্পত্য জীবনে একমাত্র বংশধরের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। মতবিরোধের চরম পর্যায়ে আসগর রোষের বশবর্তী হয়ে, কুলসমকে তালাক দিয়ে বসে। আসগরের সংসারে তালাকপ্রাপ্ত

কুলসমের আর কোন অধিকার থাকে না। তিল তিল করে গড়ে তোলা সংসারে যা কছু অর্থ, সোনা ও রূপা সে জমিয়েছিল, তার সব কছু নিয়েই কুলসম অভিমানে ঘর ছাড়ে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে, আসগর ট্রাজেডির নায়কে পরিণত হয়। যেকোনো উপায়ে কুলসমকে ফিরে পেতে মরিয়া হয় সে। কিন্তু আসগরের দাম্পত্যে ফিরে যাওয়ার কদর্য পথ কুলসম মেনে নিতে পারে না। অথচ ভালোবাসার মানুষ আসগরের সঙ্গে বসবাসের অভ্যেসও সে ত্যাগ করতে পারে না। তাই সমস্ত সামাজিক সমালোচনা, নিন্দা, ধর্মীয় বিধান ও পাপের ভয়কে উপেক্ষা করে সে, আসগরকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছাড়ে। কারণ হিসেবে সে আসগরকে দৃঢ়স্বরে বলে, ‘মোরে হেঁপো উগী এরফানের ঘরে ঠেলছিলে, ই তা হতে ভাল নয়?’[৪] তবে ধর্মীয় বিধানকে সে পুরোপুরি অগ্রাহ্যও করে না। সে তাই আসগরের সঙ্গে বসবাস করেও, একটা দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্তে অটল। আর এখানেই কুলসম সেই সমাজ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি আধুনিক হয়ে ওঠে। যে সমাজ বারবার ধর্ম ও পাপের ভয় দেখিয়ে নারীর সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে খেলা করে, কুলসম তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সেই সমাজের প্রচলিত আইনকে আমান্য করার দুঃসাহস দেখায়। আর্থিক স্বাবলম্বন নারীকে শক্তি ও সাহস যোগায় বলেই লেখিকা কুলসমকে আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলেছেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রতিবাদী কুলসমের মধ্য দিয়ে, মুসলিম নারীর জীবনে এক প্রভাতরশ্মির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

**আবুল বাশার**

আফসার আমেদের সমসাময়িক যেসমস্ত কথাকারদের সাহিত্যে মুসলিম নারীর জীবনের বৈচিত্র্যময় আখ্যান উঠে এসেছে, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল বাশার (১৯৫১-)। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে তালাক, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসমবিবাহ ও ‘হালালা বিবাহ’কে কেন্দ্র করে, মুসলিম পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ধর্মের আশ্রয়ে নারীহননের যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। মহাশ্বেতা দেবীর ‘তালাক’ ছোটগল্পের কুলসম নিজের মতো করে বাঁচার একটা পথ খুঁজে বার করলেও, আবুল বাশারের জাহেদা, মদিনা, রাবেয়া, কুলসম, শিরিন, নবীনা বা রাজিয়া শেষপর্যন্ত সমাজ ও ধর্মীয় আইনের

সংকীর্ণ জটিলতায় হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত সবধরণের সমাজেই, আবুল বাশারের নারীরা জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না। তাঁর 'সিমার' ছোটগল্পে এগারো বছরের জাহিদাকে, আঠারো বছরের যুবক সুখবাসের শারীরিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে, বিয়ের রাতেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। বুকে লোমহীন সুখবাসের এই অমানবিক নিষ্ঠুরতায়, সিমার নামটি যেন সার্থকতা লাভ করে। পিতা গিয়াসের চাকরির নিরাপত্তা ও ধর্মীয় নির্দেশ পালনেই জাহিদাকে অকালে ঝরে পড়তে হয়, 'মা জাহেদা, সুখবাসই তোমার সব মা। ইহকাল পরকালের সাথী। সুখদুঃখের শরীক। স্বামীর কথা কখনো অমান্য কোরো না। যখন যা চাইবে, সাথে সাথে পালন করবে। যত কষ্টই হোক, কোনো কিছুতেই না বলবে না। (হাদিসে আছে উটের পিঠে যেতে যেতে স্বামীর যদি কামনা জাগে, স্ত্রী তা সেই উটের পিঠেই নিবৃত্ত করবে।) কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না গিয়াসজী। আটকে গেল। কেননা জাহেদার এখনো স্ফুট পূর্ণিমা আসে নি। হায়েজ (মাসিক ঋতুস্রাব) হয়নি। কাঁচা নরম গা। হাড়গুলো পুরোপুরি শক্ত হয়নি।'[৫] সিমারের দ্বিতীয় স্ত্রী মদিনাকে বিনা অপরাধে তালাক পেতে হয়। যে মদিনার গরিব পিতা শুধুমাত্র একটু আশ্রয় ও সামান্য অন্নের আশায় সুখবাসের মত মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, তালাকপ্রাপ্ত মদিনার জীবন সেদিক থেকে আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়ে। তাই সুখবাসকে ভালবেসে, সুখবাসের আশ্রয়ে থাকার জন্যই সে ধর্ম নির্ধারিত 'হালালা বিবাহে' রাজী হতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও ষড়যন্ত্রের শিকার মদিনার আর কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়ে ফেরা হয় না। সে স্রোতের টানে এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়ে ভেসে যেতে বাধ্য হয় নিজের স্বপ্ন ও ইচ্ছের বিরুদ্ধে। কোরান ও হাদিসের আয়াত তার জীবনে তখন আর শান্তি ও স্বস্তি নয়, নিরন্তর এক কান্নার সুর বয়ে আনে। সমাজ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ লেখক আবুল বাশার জাহেদা ও মদিনার জীবনের মধ্য দিয়ে, মুসলিম নারীজীবনের এক মর্মান্তিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন।

লেখকের 'নাস্তিক' ছোটগল্পের শিক্ষিতা রাবেয়ার জীবনও শেষপর্যন্ত অন্ধকারে চলে যায়। উচ্চবিত্ত পরিবারের পুত্রবধূ রাবেয়াকে, হামিদুল রোষের বশবর্তী হয়েই তালাক দেয়। কিন্তু ভালবাসার মানুষকে হারিয়ে উদভ্রান্ত হামিদুল, রাবেয়াকে পুনরায় ফিয়ে পেতেই, একসময়ের বন্ধু মামুনের সঙ্গে রাবেয়ার 'হালালা বিয়ে'র ব্যবস্থা করে তিনমাসের জন্য। বন্ধু

হামিদুলের ঋণ শোধ করার জন্য ও রাবেয়ার প্রতি দুর্বলতা থেকেই উচ্চশিক্ষিত, তালাকবিরোধী, প্রগতিশীল নাস্তিক অধ্যাপক, এই নিষ্ঠুর অমানবিক হালালা বিবাহে রাজি হয়। হামিদুলের চেয়ে, মামুন রাবেয়ার অনেক বেশি প্রিয় মানুষ। এই প্রিয় মানুষের সঙ্গে আজীবন সংসার করার আকুলতা, তার সন্তানের জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বারবার প্রকাশ করেও, রাবেয়া নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বন্ধুর প্রতি সততায় মামুন একসময়ের প্রেমিকা রাবেয়াকে তালাক দেয়। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করা রাবেয়া এই ভাবেই দুজন পুরুষের হাতে যন্ত্রণাদগ্ধ হতে থাকে। চরম অবমাননা, দুশ্চিন্তা ও 'স্নায়বিক উত্তেজনা' থেকে সে এক একসময় জ্বরগ্রস্ত হয়ে পড়ে, প্রলাপ বকে। রাবেয়ার সমস্ত যুক্তি, তর্ক ও প্রতিবাদ একসময় মামুনের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। মামুন তাকে গোঁড়া ও হঠকারী হামিদুলের কাছে ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এখানে এসে মামুন নাস্তিক থেকে যেন মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু রাবেয়া জানে, মামুন তাকে স্পর্শ না করলেও, তাদের এই যাপনের সন্দেহ ও আঘাতে বারবার হামিদুল তার জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে। তাই লেখক রাবেয়ার মধ্য দিয়ে, হালালা বিয়েতে বাধ্য নারীদের জীবনের এক নিষ্ঠুর সত্যকে এইভাবে তুলে ধরেছেন, 'হামিদুলও আমায় চিরকাল সন্দেহ করবে। তুমি ওকে চেন না। তোমার চরিত্রের পবিত্রতা একটা ঠুনকো সেন্টিমেন্ট। মানুষের কাছে তার কোনোই দাম নেই। ... –কেন তবে তুমি আমায় বিয়ে করলে, বিয়ের সময় তোমার বিবেক কি লোভমুক্ত ছিল? আমাকে তুমি সাত দিন বাদে ফিরিয়ে দেবে, তখন আমার কী হবে? হামিদুল বিশ্বাস করবে না। ফের সে আমায় তালাক দেবে, তখন কী হবে, বল?'[৬] অথচ এই ভয় নিয়েই রাবেয়া হামিদুলের সংসারে ফিরে যেতে বাধ্য হয় ইদ্দতকাল পেরিয়ে। লেখক রাবেয়ার জীবনের অন্য কোনো আলোকময় পথ নির্দেশ না করে, তাকে শেষপর্যন্ত বোরখার আবৃত অন্ধকারের প্রাণী করে তোলেন।

অন্যদিকে লেখক তাঁর 'এক টুকরো চিঠি'র শিরিনকে আলোকময় পথের সন্ধান দিয়েও ধর্ম, অর্থ, সমাজ, রাজনীতি, প্রতিপত্তি ও অমানবিক নিষ্ঠুরতার কাছে হারিয়ে, চরম ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেন। বহুবিবাহে আসক্ত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি আখতার হাজী পাঁচ বিঘে জমি ও শহরের একটি বাড়ির বিনিময়ে, সুন্দরী ও মেধাবী কিশোরী শিরিনকে কৌশলে বিয়ে করে। তারপরেই শিরিনের জীবনের সমস্ত সুর ও ছন্দ হারিয়ে যায়। বুড়ো

হাজীর স্পর্শে ভীত-সন্ত্রস্ত শিরিনের মর্মান্তিক জীবনের চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন হাজীসাহেবের কন্যা মিনুর মধ্য দিয়ে, 'বাবা যেদিন শিরিনের ঘরে ঢুকতেন তাহাজুদের নামাজশেষে, সে রাত ছিল অত্যন্ত পাশবিক। শিরিন কাঁদতেন। মনে হত, শিরিনের গায়ে জোর করে কে যেন সুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। এক ধরণের বোবা কান্না শোনা যেত। ধর্ষণের সময় মেয়েরা বোধহয় এমনি করে কাঁদে। মাঝে-মাঝে পশুর মতন গোঁঙাতেন শিরিন। মা কেবল কপালে করাঘাত করে বলতেন—মেয়েটাকে শেষকরে দিলে হাজী। মেরে ফেললে গো।'[৭] শুধু তাই নয় শিরিনের জীবনের সমস্ত সাধ ও স্বাধীনতা হাজীর শাসনে হারিয়ে যায়। বাঙালি সাজসজ্জায় অভ্যস্ত শিরিনকে বোরখা পড়তে বাধ্য করা হয়। মাঝে মাঝেই হাজীসাহেবের মুসলিমলীগ অতিথিদের জন্য সারারাত জেগে চা ও খাবার যোগান দিতে গিয়ে ক্লান্ত শিরিনকে বারবার 'বোরখা খুলতে হয়, আর পরতে হয়। শিরিন দম বন্ধ করে কেবলই বলেন, মাই লাইফ ইজ হেল। জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।'[৮] এই জাহান্নামের আগুন থেকে পালাতেই শিরিন একসময় আত্মহত্যার চেষ্টা করে। হাজীর চেষ্টায় সে প্রাণে বাঁচলেও, তার গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। সেও জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ও হাসি হারিয়ে নিষ্প্রাণ পুতুল হয়ে ওঠে। কিন্তু কুলসমের দূরসম্পর্কের ভাই সাদিকুল, এই নিষ্প্রাণ পুতুলে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। প্রাণবায়ুতে ভরপুর শিরিন, হাজী সাহেবের অবাধ্য হলে, হাজীসাহেব প্রথম স্ত্রী কুলসমের সামনে শিরিনকে তালাক দেয়। এই তালাক শিরিনের জীবনে চরম মুক্তিরই নামান্তর। সে তার অর্জিত অঙ্কের পারদর্শিতায় ও সাদিকুলের সহযোগিতায় আর্থিক স্বনির্ভর হয়ে, নিজ্বস্ব ঘর গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ভণ্ডধার্মিক হাজী সাহেব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারে, একমাত্র সাক্ষী প্রথম স্ত্রী কুলসমকে আগাম এক তালাক দিয়ে ভয় দেখিয়ে ও মিথ্যার আশ্রয়ে শিরিনকে আবার দখল করে। শেষপর্যন্ত শিরিনের মতো একজন প্রাণবন্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা ক্রমাগত জীবন যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে, জীবনের সমস্ত শক্তি হারিয়ে সেই জাহান্নামে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে। শুধুমাত্র সমাজজীবন বা পরিবারজীবন থেকে নয়, তার গর্ভে লালিত সন্তানের অনুভূতি থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অসাধারণ মেধাসম্পন্ন শিরিনের মতো কতশত মুসলিম নারী যে এভাবে অকালে হারিয়ে গেছে, তার ঠিকানা নেই। মুসলিম নারী জীবনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন আখ্যান রচনায় আবুল বাশারের সমাজদৃষ্টি আমাদের বাকরুদ্ধ করে তোলে।

এই প্রসঙ্গে আবুল বাশারের 'ফুলবউ' (১৯৮৮) উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। এখানেও লেখক একটি বৃহত্তর পটভূমিতে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ, অসমবিবাহ, হালালা বিবাহ ও তালাককে কেন্দ্র করে নারীর জীবনে নেমে আসা মর্মান্তিক বাস্তবতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। 'এক টুকরো চিঠি' ছোটগল্পের শিরিন, বুড়ো স্বামীর কাছে ধর্ষিত হয়ে, 'জাহান্নামে'র পরাধীন জীবনযাপনে বাধ্য হলেও, 'ফুলবউ' উপন্যাসের কিশোরী রাজিয়া কিন্তু বুড়ো স্বামী নিসার হোসেনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। নিসারের চতুর্থ স্ত্রী হতে বাধ্য হলেও, বিয়ের রাতে কামার্ত স্বামীর হাত থেকে বাঁচতে 'বড় বউয়ের পায়ে বাসর ঘর থেকে ছিটকে আসে চৌদ্দ পনেরর একটি ভীরু যৌবন। বুবু আমাকে বাঁচাও, আমি বুড়োর কাছে শুতে পারব না। আমার ভয় করছে। বুড়োর চোখ দুটি জ্বলছে বুবু, মনে হচ্ছে মড়া। আমি পারব না। আমাকে তোমার পায়ের কাছে শুতে দাও।'[৯] যদিও বিস্তর 'ধ্বস্তাধস্তি' পরেও কিশোরী রাজিয়াকে 'বাগে' আনতে না পারায়, নিসারের কঠিন শাস্তিতে তার কনুই পুড়ে যায়। অথচ শিক্ষিত ও সুন্দরী রাজিয়াকে, নিসারের মা একসময়, নিসারের পুত্রবধূ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। পুত্র মিল্লাতের জন্য নির্বাচিত রাজিয়াকে বিয়ে করে নিসার হোসেন, রাজিয়ার দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে, শহরের বাড়ির বিনিময়ে। নবীসাহেবের সুন্নত পালন করার নামে নিসার হোসেনের এই ভণ্ডামি কন্যা নবীনা ও পুত্র মিল্লাত মেনে নিতে পারেনা। রাজিয়া বারবার নিসারের কাছে তালাক চায়, এমনকি তালাক না দিলেও 'খালাস' অর্থাৎ ইহলৌকিক মুক্তির জন্য নিসারের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়। কিন্তু নিসারের কাছ থেকে অভিসম্পাত ছাড়া সে আর কিছুই পায় না। শহরের বাড়ির দখল নিয়েই রাজিয়ার সঙ্গে মিল্লাতের পরিচয়। অপরিচয়ের আঁধার কাটিয়ে পরস্পর পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী থেকে অনুরক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণে আসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার, গুরুপত্নী তারার, সন্তানসম স্বামীর শিষ্য সোমের প্রতি প্রেমে, বাঁধাহীন আকুলতার কথা। রাজিয়া ও মিল্লাত দুজনেই শিক্ষিত, প্রগতিশীল ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও, সতীনপুত্র মিল্লাতের সঙ্গে রাজিয়ায় পরিণয়ে বাধা হয়ে আসে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কার। ধর্মের রক্ষক আকবর মৌলবিদের ধর্মের বিধান ও কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা, ধর্মধ্বজীদের প্রতিপত্তির কাছে হেরে যায় রিয়াজ, রাজিয়া ও মিল্লাত। 'ফুলবউ' উপন্যাসের প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল

শিক্ষিত মানুষেরা শেষপর্যন্ত পরাজিত হয় সমাজ ও ধর্মের কঠোর বিধানের কাছে। তাই শেষপর্যন্ত রাজিয়া অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

যে সমাজে সাদিক বা মবিনের মত শিক্ষিত কিন্তু গোঁড়া অমানবিক চরিত্রের মানুষেরা বাস করে, সেই সমাজে অসহায় রাজিয়ারা ধর্ষিত হতে পারে, কিন্তু কোন সম্মানীয় পরিবারের পুত্রবধূ হতে পারে না বা জীবনের স্বপ্নপূরণ করতে পারে না, এই সমাজসত্যই লেখক এখানে প্রকাশ করেছেন। নবীনার শিক্ষিত কামুক স্বামী সাদিক, অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা বা কোনো কুরূপা বিবাহের পাত্রীকে পাত্রস্থ করার জন্য, সুন্দরী রাজিয়ার সৌন্দর্যের টোপ ব্যবহার করার মত অন্যায় অমানবিক কাজ খুব সহজেই করে যেতে পারে। তাতেই এই সমাজের নারীদের জীবনে আরও বেশি করে সংকট নেমে আসে। সাদিকের দ্বিতীয় বিবাহেও নবীনা মুক্তি পায় না। সাদিক নবীনাকে তালাক দিতে চায় না, নবীনার বাবার সম্পত্তি পাওয়ার লোভে। তালাক না পাওয়ায় 'পরস্ত্রী' নবীনা, ভালবাসার মানুষ রিয়াজকে বিয়ে করতে পারে না। তাই চরম মানসিক উত্তেজনায় সেও মৃত্যুর পরপারে হারিয়ে যায়। এইভাবেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কুক্ষিগত ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানে বারবার রাজিয়া বা নবীনারা হেরে যায়। তাদের জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদ একসময় থেমে যেতে বাধ্য হয়। তবে সমাজঅভিজ্ঞ কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে নারীজীবনের আলোকময় উত্তরণ খুঁজে না পেলেও, মুসলিম সমাজে ধর্মকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা অধর্মের প্রতি তিনি যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাপট তথা প্রচলিত ধর্মের অসঙ্গতি মুসলিমনারীর জীবনকে কতটা ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে, আফসার আমেদের মত, আবুল বাশারও সেই সমাজসত্যকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

তবে একথা সত্য যে, আফসার আমেদ যে সহজ ভঙ্গীতে বাঙালি মুসলিম জনজীবন তথা নারীর জীবনের সমস্যা ও সংকটকে তাঁর কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন, তা তাঁর সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের তুলনায় স্বতন্ত্র। তাঁর কাহিনির সহজ-সরল গতি অন্য কোন সাহিত্যিকের রচনায় সহজলভ্য নয়। এমনকি আফসার আমেদের কথাসাহিত্য পাঠকালে পাঠকের সবসময় মনে হয়, যে সমাজবাস্তবতার কথা তিনি বলছেন, তা কল্পিত বা জোর করে

আরোপিত নয়। অবশ্য তাঁর 'কিস্‌সা সমগ্রের' কথা স্বতন্ত্র। যদিও কল্পনার আধিক্যের মাঝেও, সেখানে গল্পের সাধারণ গতি কোথাও বাধাপাপ্ত হয় নি। আফসার আমেদ তাঁর কথাসাহিত্যে, গৌরকিশোর ঘোষ বা মোস্তফা সিরাজের মতো বৃহত্তর কোন পটভূমিকে গ্রহণ করেন নি। গৌরকিশোর ঘোষ বা মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে বর্ণিত সমাজবাস্তবতা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। একই কথা আবুল বাশারের সমাজ বাস্তবতার ক্ষেত্রেও বলা যায়। কিন্তু আফসার আমেদের বেশির উপন্যাস ও ছোটগল্পের সমাজবাস্তবতা গ্রামীণ মুসলিম সমাজে আজও সমানভাবে পরিচিত ও প্রাসঙ্গিক। আফসার আমেদ যেখানে মুসলিম সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর জীবনের সমস্যা, সংকট ও মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে অন্যান্য সাহিত্যিকরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে পারস্পরিক ক্ষমতার লড়াইকে। এক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা ও সংকট অনেকটাই উপেক্ষিত।

অবশ্য আবুল বাশারের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। কিন্তু তিনি যে সমস্ত নারীর সংকট ও সমস্যাকে রূপায়িত করেছেন, তাদের অধিকাংশই কোন না কোন দিক থেকে অসাধারণ। রাবেয়া, রাজিয়া বা শিরিনের সংখ্যা এই সমাজে খুবই সীমিত। তাছাড়া আবুল বাশারের রচনায় দেখা যায়, তাঁর সৃষ্ট মুসলিম চরিত্রের বেশীরভাগই শিক্ষিত কিন্তু ধর্মের মোহে অন্ধ। এই গোঁড়া শিক্ষিত সমাজে নারী আরও বেশি শোষিত, বঞ্চিত, পীড়িত ও ধর্ষিত। শিক্ষিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্মের ভয়কে সহজেই জয় করতে পারে বলেই, তারা ধর্মীয় বিধানের অপব্যাখ্যা করে, ধর্মের বিকৃতি ঘটায় নিজেদের স্বার্থে। তাই বুঝি আবুল বাশারের কথাসাহিত্যে, নারীর জীবনের করুণ পরিণতি এতটা ভয়াবহ রূপে উঠে আসে। কিন্তু আমরা দেখেছি আফসার আমেদের সৃষ্ট নারীদের অনেকেই নিজেদের জীবনের সংকট থেকে মুক্তির একটি পথ খুঁজে নিয়েছে। তাছাড়া তাদের জীবনের পরিণতিও আবুল বাশারের নারীদের মতো এতটা ভয়াবহ নয়। মুসলিম সমাজে অশিক্ষিত নরনারীর মনে, তালাককে কেন্দ্র করে পারলৌকিক ধর্মভয় কতটা গভীর, মহাশ্বেতা দেবীর কাছে তা হয়তো স্পষ্ট ছিল না। তাই তাঁর সৃষ্ট মুসলিমনারী কুলি, খুব সহজেই জীবনের চরম সমস্যার একটি সমাধান খুঁজে নিয়েছে। অবশ্য অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হওয়াটাও এখানে একটি বড় সমাধান। আবুল বাশারের নারীরা এদিক থেকে অনেকটাই

পশ্চাদপদ। কারণ তিনি জানতেন মৌলবাদী, শিক্ষিত, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মুসলিমসমাজে নারীরা কতটা অসহায়। তাই হয়তো তিনি তাঁর নারীদের বারবার হারিয়ে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। গৌরকিশোর ঘোষ, মুস্তাফা সিরাজ ও আবুল বাশারের রচনার অনেকক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত ভাষা ও ধর্মীয় বিধিবিধানের ব্যাখ্যা, তাদের কাহিনির গতিপথকে অনেকসময় বাধাপ্রাপ্ত করে তুলেছে। কারণ কাহিনির গতিপথের চরম উত্তেজনার মাঝে, ধর্মীয় বিধানের বিস্তারিত উল্লেখ ও ব্যাখ্যায় কাহিনির গতি রুদ্ধ হতে বাধ্য। আফসার আমেদ এই সমালোচনা থেকে অনেকটাই মুক্ত। তিনিও অনেকসময় এমন কিছু শব্দের ব্যবহার করেছেন, যে শব্দের অর্থ বৃহত্তর শিক্ষিত বাঙালির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও পাঠক তার কথাসাহিত্যের সামগ্রিক রস আস্বাদনের পথে, মাঝে মাঝেই হোঁচট খেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাতে অন্তত এক শ্রেণির পাঠকের কাছে কাহিনির গতি থাকে অব্যাহত। নিজস্ব শব্দ ও সংস্কৃতির ব্যবহারে বর্ণিত জনসমাজ, তার পরিপূর্ণতা নিয়ে আফসারের কথাসাহিত্যে প্রাণবন্ত রূপে উঠে আসে। অবশ্য একথাও সত্য যে, এই সমস্ত ধর্মীয় তথা সামাজিক শব্দ ব্যবহারে লেখক তাঁর সমাজ তথা সাহিত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। তাই আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের পরিপূর্ণ রস আস্বাদনের জন্য, এই অপরিচিত অথচ প্রতিবেশীর মুখে উচ্চারিত শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধারে পাঠকেরও একটা দায়বদ্ধতা এসে যায় একজন সামাজিক ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ হিসেবে, এখানেই সাহিত্যসৃষ্টির সার্থকতা।

**উৎসনির্দেশ:**

১. গৌরকিশোর ঘোষ, *প্রেম নেই,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা নং- ৭

২. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *অলীক মানুষ,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং- ১১৫

৩. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক, তালাকঃ উচ্চারণের রকমফের নিয়েই মুফতিদের বিরোধ,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা নং- ৫৮

৪. মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র, ঊনবিংশ খণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৭, পৃষ্ঠা নং- ২৯৬

৫. আবুল বাশার, *গল্পগ্রন্থ সিমার, সিমার,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং—১৫

৬. আবুল বাশার, *গল্পগ্রন্থ সিমার, নাস্তিক,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং—৯৪-৯৫

৭. আবুল বাশার, *গল্পগ্রন্থ সিমার, এক টুকরো চিঠি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা নং—১১১

৮. তদেব, পৃষ্ঠা নং—১১৩

৯. আবুল বাশার, *ফুলবউ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, একাদশ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা নং—৬১

# উপসংহার

ভারতবর্ষের মত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক উপমহাদেশে, দীর্ঘদিন একসাথে বসবাসেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তার অভাব আজও পরিলক্ষিত হয়। দেশভাগ ও খণ্ডিত স্বাধীনতা উভয় সম্পদায়ের কাছেই এক যন্ত্রণাময় ইতিহাস। দেশভাগের সময় ভারতবর্ষ থেকে যে সমস্ত মুসলিম জনসাধারণ দেশত্যাগ করে পূর্বপাকিস্থানে চলে যান, তাঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষই গরিব ও অশিক্ষিত। এমনকি অধিকাংশের বসবাস দারিদ্র্যসীমার নিচে। আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে মূলত এই অসহায়, দরিদ্র ও পশ্চাদপদ মানুষের কথা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উঠে এসেছে। যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে তাদের কাছে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল ধর্মীয় শিক্ষা। ফলে দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসহায় মুসলিমসমাজ রক্ষণশীল মোল্লা-মৌলবির দ্বারা চালিত হতে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং মুসলিম ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য না জানার ফলে, নানাধরণের ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামিতে তারা আচ্ছন্ন। আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সঙ্গীত ও সংস্কৃতি থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার দরুন তারা পশ্চিমবঙ্গের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন, দারিদ্র্য-পীড়িত, অসহায় ও পশ্চাদপদ মুসলিমসমাজ বাঙালি লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি এক স্বতন্ত্র জনসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে। সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে এই জনসমাজের এক সার্বিক চিত্র ধরা পড়েছে। এই সমাজে বেড়ে ওঠা লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সচেতনতা তাঁর সৃষ্টিকে অনেকবেশি সমৃদ্ধ ও জীবন্ত করে তুলেছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাদের ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক ও লৌকিক বিশ্বাস, আর্থসামাজিক অবস্থান, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, লোকসংস্কৃতি ও আধুনিকতার এক অনবদ্য জগতের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে লেখক সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে এই জনসমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণার, যৌক্তিকতা ও আধুনিকতা সম্পর্কেও এক বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব গঠনের প্রয়াস করেছেন।

সমাজের কাছে দায়বদ্ধ লেখক আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে ধরা পড়েছে, মুসলিমসমাজ তথা নারীজীবনে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে চলা পরিবর্তনের একটি ধারাবাহিক

সুস্পষ্ট চিত্র। তালাক, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহের সমস্যা জর্জরিত নারীজীবনে, একটি নিরাপদ শক্তমাটির অনুসন্ধানও চালিয়েছেন লেখক তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর প্রথমপর্বের কথাসাহিত্যের নারীদের তুলনায়, একবিংশ শতকের নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথকে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে স্পর্শ করেছেন। এই শতকের নারীরা অনেক বেশি প্রতিবাদী। বিশ্বায়নের প্রভাবে তারা আধুনিক ভোগবাদী জীবনে যেমন বিকল্প সুখের সন্ধান করেছে, তেমনি নিজের উপরে ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদও করেছে। নারীর এই সংগ্রামী, আত্মমর্যাদাশীল মনোভাবের পেছনে যে সবথেকে বেশি প্রয়োজন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা, তা বারবার তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। একটি সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য যে আধুনিক শিক্ষা ও মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন, লেখকের এই মনোভাব সুস্পষ্ট। ‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসে লেখক, এর একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন, যেখানে রূপকথার নায়কের মতই আবিদ, অশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষের জীবনকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছে।

আফসার আমেদের কিস্‌সার ছয়টি উপন্যাস তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি। তিনি এই কিস্‌সার মধ্য দিয়ে পাঠকদের এক রহস্যময় জগতে নিয়ে যান, যেখানে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে, মুসলিম অধ্যুষিত প্রত্যন্ত গ্রাম তথা শহরের এই অপূর্ব অন্বয় রচিত হয়েছে। অথচ তাঁর কিস্‌সার রহস্যময় জগতেই লুকিয়ে রয়েছে মুসলিম নারীজীবনের যন্ত্রণাময় বাস্তব আলেখ্য। তবে কিস্‌সার কথায় তিনি পৌঁছে গেছেন দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে রাজপ্রাসাদে, গ্রাম থেকে শহরে, মৌলবাদী গোঁড়া সমাজ থেকে সংস্কৃতিমনস্ক আধুনিক সমাজে, সর্বোপরি মানুষের বিচিত্র মনের দরবারে। বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার প্রাপকের প্রতিভাষণ ‘এখনও গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা’য় লেখক বলেন, ‘কিস্‌সা নিয়ে আমি পাঠকদের কাছে রহস্যময়ই হতে চেয়েছি। নতুন কোনো কিস্‌সার খোঁজে আমি নিরন্তর থাকি। আমৃত্যু লিখব। লিখে যেতেই হবে। কেন-না লেখা দিয়ে যদি কিছু করা যায়। সমাজবিশ্বে মানুষের কত দুঃখ-দুর্দশা, কত অপ্রেম-অসহায়তা, অসাম্য, নীচতা, হিংসা, বঞ্চনা আর অসম্মান, তার বিরুদ্ধে লিখে যেতেই হবে।’[গাধা, পৃষ্ঠা নং-২৩৭] কিন্তু লেখকের অকালমৃত্যু তাঁর অঙ্গীকার পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও তিনি তাঁর সাহিত্যজুড়ে নিজের কাছে করা অঙ্গীকারকে পরিপূর্ণতা দানে যে ঐকান্তিকতা দেখিয়েছেন, তা আমরা এই গবেষণাসন্দর্ভের পরতে পরতে লক্ষ্য করেছি।

তবে একথাও সত্য, অমুসলিম জনসমাজ নিয়েও লেখকের সৃষ্ট সাহিত্যের সংখ্যা কম নয়। 'খোঁজে', 'বাঁচার খোঁজে', 'একটি মেয়ে', 'হত্যার প্রমোদ জানি', 'প্রেমিকা নেই', 'ছায়ারূপ টকিজ', 'খাঁচা', 'প্রথম প্রেম', 'ভূমিকম্পের আগে ও পরে' প্রভৃতি থেকে শুরু করে অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আফসার আমেদের প্রতিভার ভিন্ন ভিন্ন দিক। অমুসলিম জনসমাজ সম্পর্কেও যে লেখক সমানভাবে দক্ষ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমার গবেষণাসন্দর্ভের মধ্যে তা আলোচনার অবকাশ নেই। তাঁর বিশাল সৃষ্টির এই দিকটি অবশ্যই স্বতন্ত্র গবেষণার অপেক্ষা রাখে। পাশাপাশি মুসলিম নারীর জীবনযন্ত্রণার প্রতি লেখকের সহানুভূতিময় দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা গেলেও, সার্বিকভাবে মানুষের রূপকার আফসার আমেদের রচনায়, গোঁড়া মৌলবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, পুরুষের জীবনযন্ত্রণার কথাও উপেক্ষিত নয়, যা অবশ্যই স্বতন্ত্র গবেষণার দাবী রাখে।

এই গবেষণাসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায় 'আফসার আমেদের সমসাময়িক অন্যান্য কথাকারদের রচনায় মুসলিম নারীর জীবন' অংশে, কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের সঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বা আবুল বাশারের সাহিত্যের, আমরা যে একটি তুলনামূলক আলোচনার প্রসঙ্গ এনেছি, তাতে দেখা যায়, আফসার আমেদের কথাসাহিত্যের অনবদ্য জগৎ তথা সৃষ্টিকলা উক্ত সাহিত্যিকদের সৃষ্টজগতের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। অদ্ভুতভাবেই লক্ষণীয় যে, বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারকে আফসার আমেদের কথাসাহিত্য পরিপূর্ণতা দানে সহায়ক হয়েছে। মূলত লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের জগতকে একদিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি করেছেন বৈচিত্র্যমণ্ডিত। একজন বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি রূপে, আফসার আমেদের রচনায় নিজেদের সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি দেখার আনন্দই আমাকে, আমার কাজে অধিকতর উৎসাহ যুগিয়েছে। তাঁর কথাসাহিত্যের পরিচিতিদানেও আমার গবেষণা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কাছে আজও তিনি অপরিচিত। আজও কথাসাহিত্যিক আফসার আমেদের নাম শুনে বাঙালি পাঠকদের অনেকেই তাঁকে বাংলাদেশের লেখক বলে মনে করেন। আফসার আমেদের এই আত্মপরিচয়ের সংকট মূলত বাঙালি মুসলিমের আত্মিক সংকট। এই একই সংকটের দায়ভার বহন করে চলেছে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিসম্ভারও। তিনি

তাঁর অসাধারণ কিস্‌সা থেকে শুরু করে নানান অনবদ্য উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্যকে করে তুলেছেন সমৃদ্ধ। তবে একথাও সত্য যে, আফসার আমেদের কথাসাহিত্যে প্রকাশিত লেখকের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র আমার গবেষণাকে একটি বিশেষ মাত্রা দান করে নি, ধর্মীয়-সামাজিক ও জাতীয় ধ্যানধারণা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন করেছে এবং মানুষের তথা সমাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা বাড়িয়েছে, আর এখানেই আমার এই স্বল্পতম প্রচেষ্টার সার্থকতা।

# গ্রন্থপঞ্জি

## আকর গ্রন্থ

### উপন্যাস


১. আফসার আমেদ, *ঘরগেরস্তি,* স্বরলিপি , কলকাতা-৯, ১৯৮২।

২. আফসার আমেদ, *স্বপ্নসম্ভাষ,* দে'জ পাবলিশিং, সুভাষচন্দ্র দে, কলকাতা-৭৩, ১৯৯১।

৩. আফসার আমেদ, *সানু আলির নিজের জমি,* দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-০৭৩, জানুয়ারি, ১৯৮৯।

৪. আফসার আমেদ, *বসবাস,* তৃষ্ণা খাঁন, বাকশিল্প, কলকাতা—৭০০০৩১, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

৫. আফসার আমেদ, *আত্মপরিচয়,* সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯০।

৬. আফসার আমেদ, *অন্তঃপুর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ১৯৯৩।

৭. আফসার আমেদ, *ধানজ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা, ধানজ্যোৎস্না,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, ডিসেম্বর ২০০৩।

৮. আফসার আমেদ, *ধানজ্যোৎস্না ও ব্যথা খুঁজে আনা, ব্যথা খুঁজে আনা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, ডিসেম্বর ২০০৩।

৯. আফসার আমেদ, *সঙ্গ নিঃসঙ্গ,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৪।

১০. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(১), বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি- ২০১৬।

১১. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(১), কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি- ২০১৬।

১২. আফসার আমেদ, *দ্বিতীয় বিবি,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৭।

১৩. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(২), এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬।

১৪. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(১), মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, আফসার ১৩ বঙ্কিম স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬।

১৫. আফসার আমেদ, *অশ্রুমঙ্গল,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০২।

১৬. আফসার আমেদ, *প্রেমপত্র,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানুয়ারি ২০০৪।

১৭. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র(২), হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কোলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬।

১৮. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র (২), এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা,* দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৬।

১৯. আফসার আমেদ, *জীবন জুড়ে প্রহর,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০০৯।

২০. আফসার আমেদ, *সেই নিখোঁজ মানুষটা,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, জানুয়ারি ২০১৮।


**গল্পগ্রন্থ**


১. আফসার আমেদ, *আফসার আমেদের ছোটগল্প,* প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ১৩, ১৯৯২।

২. আফসার আমেদ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৮।

৩. আফসার আমেদ, *সেরা ৫০ টি গল্প*, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৭৩, ২০১৭।

**সহায়ক ধর্মগ্রন্থ**

১. কোরান

২. হাদিস

**সহায়ক অন্যান্য গ্রন্থ**

১. অধ্যাপক সাইফুদ্দিন, *কুরআন ও হাদিসের আলোকে তিন তালাক*, বুশরা পাবলিকেশন, মালদা, এপ্রিল, ২০১৭।

২. *আপন হতে বাহিরে*, সংকলন ও সম্পাদনা রাজ্যেশ্বর সিন্হা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০২০।

৩. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজঃ নানাদিক*, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ০৭৩, জানু য়ারি ২০১১।

৪. আফরোজা খাতুন, *বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।

৫. আফরোজা খাতুন, *তালাক ও রাজনীতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০।

৬. আবুল বাশার, গল্পগ্রন্থ *সিমার*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৭. আবুল বাশার, *ফুলবউ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, একাদশ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

৮. ওসমান গনী, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলার পুঁথি*, রত্নাবলী, ফেব্রুয়ারি ২০০০।

৯. কমল চৌধুরী, *স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯।

১০. গৌরকিশোর ঘোষ, *প্রেম নেই*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮।

১১. জাহিরুল হাসান, *বাংলায় মুসলমানের আটশো বছর*, ৯০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৯, জানুয়ারি ২০১১।

১২. মহাশ্বেতা দেবীর রচনাসমগ্র, ঊনবিংশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৭।

১৩. মানিক দাস, *হিন্দু-মুসলমানঃ সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার মৃদুপাঠ*, কলকাতা পুস্তকমালা, জানুয়ারি ২০০৫।

১৪. মিলন দত্ত, *চলিত ইসলামি শব্দকোষ*, গাঙচিল, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৮।

১৫. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, *চিত্রাঙ্গদা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ।

১৬. রাহুল সাহানা, *আফসার আমেদের উপন্যাসে সমকালীন বাংলার জীবনচর্যা ও সামাজিক রীতিনীতি*, 'অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ', বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮।

১৭. লায়েক আলি খান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজ ও চরিত্র*, সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০০

১৮. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, *অলীক মানুষ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৮।

## সহায়ক পত্রপত্রিকা

১. কলকাতা ২৪*৭ , ১৭ আগস্ট -২০১৭, ১-১০ পি এম

২. গাধা, আফসারআমেদসংখ্যা, সম্পাদক- মলয় সরকার, সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯০

৩. সাহিত্যসেবক, শারদ সাহিত্যসেবক-১৪২৫, ১৮ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা, মুখ্য উপদেষ্টা - পরিমল ঘোষ, সম্পাদক- হেমন্ত রায় বাগনান, হাওড়া -৭১১৩০৩

## সহায়ক ওয়েবসাইট

1. http://dhunt.in/kNZyh?s=a&uu
2. https://banlarmatimanush.com/afsar-ahmed-arup-midya-/
3. https://kulikinfoline.com/2020/12/20/kulik-robber-bangla-chhotogolpe-muslim-jonojibon-30-purushottam-singha/
4. https://www.galpopath.com/2016/12/blog-post-35.html
5. https://www.anandabazar.com>10
6. https://minorityyaffairs.gov.in>reports
7. nobojagaran.com
8. shodhganga.inflibnet.ac.in